সৌরভ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩৩৩। প্রথম সংখ্যা।

আমাদের কথা।

মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় "সৌরভ" পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে অনেক মাসিক পত্রিকা জন্মিয়াছে, অনেক পত্রিকা বিলুপ্ত হইয়াছে। এক একটী করিয়া মফস্বলের প্রায় সকলগুলি পত্রিকাই উঠিয়া গিয়াছে; কালপূর্ণ হইলে সৌরভেরও সেই দশা ঘটিবে। কিন্তু এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও "সৌরভ" এতদিন বাঁচিয়া আছে ইহাই সৌরভের পরিচালকগণের আনন্দের বিষয়।

আজ "সৌরভের" প্রতিষ্ঠাতা কেদারনাথ পরলোকে। তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আজ চৌদ্দ বছর আগের কথা আমাদের স্মরণ হইতেছে। আট বছর প্রকাশিত হইবার পর যখন ময়মনসিংহের মাসিক পত্রিকা "আরতি" অনিবার্য্য কারণে উঠিয়া গেল তখন কেদারনাথের দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি আর একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনের সম্পূর্ণভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। কেদারনাথের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিয়া অনেক হিতৈষী ব্যক্তি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তাঁহার এমনই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি কিছুতেই স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সৌরভ প্রকাশিত হইল।

তখন ময়মনসিংহ সহরে ভাল ছাপাখানা ছিল না। অক্লান্তকর্মী কেদারনাথ ঢাকার উৎকৃষ্ট প্রেসে "সৌরভ" [illegible] নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত করিয়াছেন। সুদীর্ঘ [illegible] তিনি এইরূপে অনেক অর্থ-ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া সৌরভ পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিন বছর পূর্ব্বে তিনি ময়মনসিংহ সহরে সৌরভের জন্য একটী ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। নিষ্কাম সাহিত্য-সেবা ভিন্ন কেদারনাথের "সৌরভ" প্রতিষ্ঠার অন্য কোনই উদ্দেশ্য ছিল না। একটী স্থানীয় মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে একাধিক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা থাকিলেও তাহাতে মফস্বলে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক জেলার পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষক পল্লী-সাহিত্য সংগ্রহ এবং সাহিত্য চর্চ্চার সুযোগ দিয়া নূতন নূতন লেখক তৈয়ার করার কাজ কেবল স্থানীয় মাসিক পত্রিকা দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই মহোদ্দেশ্য সাধনের জন্যই "সৌরভ" প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই জেলায় মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। এই জেলায় দীর্ঘকাল যাবত মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই ময়মনসিংহের ইতিহাসের বহু উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা বহু প্রাচীন সাহিত্যিক ও প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছি। যে ময়মনসিংহ গীতিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বহু অর্থ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে সেই সকল গীতিকার অনেকগুলিই এই সৌরভ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সৌরভে মুদ্রিত না হইলে এই অমূল্য গীতিকাগুলি মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত না; তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আজ ময়মনসিংহ গীতিকা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে ইহা আমাদের কত গৌরবের কথা।

আমরা সৌরভের প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। মফস্বল হইতে মাসিক পত্রিকা পরিচালন যে কিরূপ কঠিন কাজ তাহা কেবল ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সকল অসুবিধা উপেক্ষা করিতেছি।

ময়মনসিংহের "সৌরভ" পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র মাসিক পত্রিকা। সাহিত্যানুরাগী গ্রাহক গ্রাহিকাগণের অনুগ্রহ এবং সদাশয় লেখকগণের সাহায্যেই "সৌরভ" এতদিন জীবিত রহিয়াছে। আমরা আশা করি সৌরভ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে না।

গত বৎসর সৌরভ সম্পাদক স্বর্গীয় কেদারনাথের দীর্ঘকাল ব্যাপী অসুস্থতা এবং তাঁহার অকাল পরলোক গমনে 'সৌরভ' পরিচালনে নানা ক্রটী হইয়াছে। ভরসা করি, সৌরভের হিতৈষীবর্গ আমাদের এই সকল অনিচ্ছাকৃত ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা সৌরভের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের এবং লেখকগণের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। মঙ্গলময় ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।

রামায়ণী যুগে আহার্য্য ও আহার।

মদ্য-পান।

মদ্যপান প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজেই প্রচলিত দেখা যায়। বৈদিক যুগে সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞে নিবেদন করা হইত। সোমরসে মাদকতা ছিল; কিন্তু বাইবেলে উল্লেখিত দ্রাক্ষ রসে যেমন মত্ততা জন্মিত, সোমে তেমন মত্ততার কোন আভাস কোথাও লক্ষিত হয় না। ইরাণিদিগের মধ্যেও সোমের ব্যবহার ছিল। "অবস্থা" গ্রন্থে তাহা 'হাওমা' নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের অবসানে সোমের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। সোম প্রস্তুতের বিশেষ প্রক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়ই বোধ হয় ইহার প্রচলন একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল এবং সোম দেবতা স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। * অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে এর উপনিষদ সমূহে চন্দ্রকেই সোম বলা হইয়াছে।

রামায়ণে সোমরসের উল্লেখ মাত্র এক স্থানে আছে। (আ ৩২) তাহাও বৈদিক সোমকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রস্তুত প্রক্রিয়ার লোপ হেতুই সোমের বিলুপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। সোমের অভাবেই বোধ হয় রামায়ণে সুরার প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামায়ণে সৌরের মদ্য, সৌরীক মদ্য, (গৌড়ী মদ), মধু, সুরা, প্রভৃতি বহু-প্রকারের মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামায়ণে মদ্যপায়ীর প্রতি দোষারোপ থাকিলেও, এবং মদ্যপকে হেয় বলিয়া স্থানে স্থানে নিন্দিত করা হইয়া থাকিলেও দেখা যায়, তৎকালে দেবকার্য্যে ও অতিথি সৎকারে মদ্য ব্যবহৃত হইত। সীতা মদ্য দ্বারা গঙ্গা ও যমুনার পূজা করিবেন বলিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ভরতের আতিথ্য সৎকার উপলক্ষে নানাবিধ সুরার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি এক স্থানে রামের মদ্য পানেরও ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

১ সমুদ্র মন্থনে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে যে গল্প আছে, তাহার প্রক্ষিপ্ত, তাহা প্রথমাংশের প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুরা দ্রব্যবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত পানীয় পদার্থ, তাহা সমুদ্র মন্থনে এক দিনে উত্থিত হইয়া চিরদিনের জন্য রক্ষিত হইবার পদার্থ নহে।

সোমরসের অভাবেই সুরা রামায়ণের সমাজে চলিয়াছিল; সেই জন্যই আমারা দেবকার্য্যে তাহা নিবেদিত হইতে দেখি। কিন্তু সুরা যে সোমরস নহে, এবং তাহা যে মানুষকে মত্ত করিয়া হীন পন্থায় পরিচালনা করে, তাহাও তৎকালীন আর্য্য সমাজ বুঝিয়াছিলেন। তাই আমরা সমাজের উচ্চস্তর হইতে যে সুরাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত, তাহা রাজা দশরথ ও রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির কথা হইতে অবগত হইতে পারি।

---

* কেহ কেহ বলেন—আর্য্যগণের আদি বাস ভূমির তুষারমণ্ডিত হিমানী প্রদেশে সোম খাদ্য ও দেহ রক্ষার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় ছিল। এই কারণে সোমের ব্যবহার প্রাচীনতম আর্য্যদিগের প্রধান পানীয় ছিল। উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়া তাঁহারা সোমের অপকারিতা অনুভব করিয়া সোমপান ও প্রস্তুতের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদেশে তাঁহারাই সোমপান করিতেন না কেবল দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই নিবেদন করিতেন। এইরূপে সমাজ যখন দেবকার্য্যে সোমের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রাজা দশরথ, রাম ও লক্ষ্মণ সুরাপান সম্বন্ধে কিরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা কখনও সুরাপান করিয়াছিলেন কিনা অতঃপর তাহারই আলোচনা করা গেল।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে বর দানে বাধ্য করিয়া ধরিলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্র বিক্রামকং ধ্রুবম্।

বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ৭৮। ২। ১২

অর্থ—যদি আমি এইরূপ করি (তোমাকে বরদান করিতে যাইয়া রামকে বনে পাঠাই), তাহা হইলে আর্য্যগণ রথ্যাসমূহে সমবেত হইয়া আমাকে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে।

দশরথের এই উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের মদ্যপান নীতিবিরুদ্ধ ও অনার্য্যোচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ও অন্যান্য সাধারণের পক্ষে মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল কি না, বুঝা যায় না।

রাজা দশরথ অন্যত্র বলিতেছেন—

সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্য সতীং সতীম্।

রূপিণীং বিষ সংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥ ৭৬।২।১২

অর্থ—মানুষ যেমন বিষাক্ত মদ্য প্রিয় দর্শন বলিয়া পান করিয়া পরিণামে মদ্যকে বিষ বলিয়াই মনে করে, আমিও তেমনই অসতীকে সতী বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

রাজা দশরথের এই উক্তি দ্বারা মদ্যের ব্যবহার সপ্রমাণ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে পদস্থ নীতিপরায়ণ লোকদিগের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল, তাহাও ব্যক্ত হয়।

সুরাপান সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উক্তি উচ্চ নীতির পোষক; তাহা রামায়ণী সমাজের উচ্চ স্তরের অবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নহি ধর্ম্মার্থ সিদ্ধ্যর্থং পানমেব প্রশস্যতে।

পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪৬।৪।৩৩

অর্থ—ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে মদ্যপান প্রশস্ত নহে। কারণ সুরাপানের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের হানি হয়।"

লক্ষ্মণের এই নীতি উপদেশ দ্বারা লক্ষ্মণকে সুরাসক্ত মনে করা যাইতে পারে না বটে কিন্তু আর্য্য ভারতের তৎকালীন সাধারণ সমাজে যে সুরাপান চলিত না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

লক্ষ্মণ অন্যত্র বলিতেছেন—"পণ্ডিতেরা গো হত্যাকারী, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রতদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিতেছেন কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।" ১২।৪।৩৪

এই বাক্যেও সুরাপানকে দোষজনক বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরন্তু সুরাপান যে সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই।

লক্ষ্মণ নৈতিক উপদেশের ছলে সুগ্রীবকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রিয় সমাজই যে লক্ষ্মণ নির্দ্দিষ্ট উচ্চ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রামায়ণে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি?

রাজা দশরথের মদ্যপানের কথা আমরা রামায়ণে কোথাও দেখিতে পাই না, লক্ষ্মণের চরিত্র ও এ বিষয়ে নিষ্কলঙ্ক।

এইবার ভরতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাউক। ভরত অযোধ্যার নাগরিকগণ সহ রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাত্রা করিয়া পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তখন সেই সম্মানিত রাজ অতিথিগণের জন্য বিরাট সৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থায় যে না ছিল কি, তাহা বলা যায় না। ভরদ্বাজ বিবিধ প্রকারের সুরারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ কি রাজকুমারদিগের জন্য এগুলির ব্যবস্থা করেন নাই? তাঁহারা কি তাহা পান করেন নাই?

মহাকবি বাল্মীকি এক কথায় তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাহা—

"সুরাঃ সুরাপাঃ পিবন্ত পায়সং বুভুক্ষিতঃ।"

সুরাপায়ী যারা তাহারাই সুরাপান করিল আর বুভুক্ষুরা পায়স খাইল।

নীতির হিসাবে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল, শাস্ত্রের হিসাবে। যজ্ঞ ব্যতীত পায়স ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। মাতাল ও ক্ষুধিতের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। তাই কবি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। "সুরাঃ সুরাপাঃ পিবন্ত পায়সং বুভুক্ষিঃ।

এ স্থলে রাজপুত্র ও উচ্চ শ্রেণীস্থ অতিথিদিগকে রক্ষা করাই কবির ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে পরন্তু সমাজে যে শাস্ত্র ও নীতির ব্যভিচার অপ্রচলিত ছিল না, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

এইবার আমরা মহাকাব্যের আদর্শ পুরুষ, উচ্চ নীতির বিরাট বিগ্রহ রামের সম্বন্ধে যে দুই একটা উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করিব।

হনুমান অশোক বনে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে বলিতেছেন।

"ন মাংসং রাঘবোভুঙক্তেন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যংভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥" ৫।৩৬।৪১

অর্থ—(আপনার বিরহে) রাঘব মধু সেবন ও মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কেবল অরণ্য জাত সুবিহিত খাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শব্দকোষে মধু সুরা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য টীকাকারগণ মধু শব্দ মদ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। *

মধু শব্দদ্বারা আরণ্য মধুকেও বুঝায়, মদ্যকেও বুঝায় যে স্থলে অর্থ গ্রহণের সোজা উপায় আছে, সে স্থলে দূর কল্পনায় যাওয়া সাহিত্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দেন না; তাঁহারা বলেন—

"সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন যুজ্যতে।"

আমরা রামায়ণে মধু চাষের উল্লেখ পাই। দাক্ষিণাত্যের নিবিড় অরণ্যে তখন চক্র মধু রক্ষিত হইত। সুগ্রীবের এক মধুবনের উল্লেখ সুন্দরকাণ্ডের ৬১ সর্গে আছে। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া আসিলে বানরেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই রক্ষিত মধুবনের সমস্ত মধু ও ফল মূল পান ও ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল। মূলে আছে—

"ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্টা মধুবনং মহৎ। ১১"

তখন যে কেবল "ভ্রমান মধুকরাকুলান্" চক্র হইতেই মধু উৎপন্ন হইত তাহা নহে, কোন কোন বৃক্ষ হইতেও নাকি মধু ক্ষরিত হইত।

ভরদ্বাজ অতিথি সৎকার জন্য যে উগ্র সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধনার ফলে—

"তাশ্চকামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ।" ৬৯।২।৯১

এস্থলে বৃক্ষে মধুচক্র ছিল এবং তাহা হইতেই বৃক্ষ গাত্রে মধু ক্ষরিত হইতেছিল, এই স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ পায়।

* রামায়ণের বঙ্গানুবাদকদিগের মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বোধ হয় রামচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মধু শব্দের অনুবাদেও 'মধুপান' রাখিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "মদ্য স্পর্শ করেন না" অনুবাদ করিয়াছেন।

রাম বনবাস ভোগ করিতেছিলেন, সেই বনে যথেষ্ট মধুর বন রক্ষিত ছিল; এরূপ অবস্থায় রামসীতার মধুপান অর্থে "মদ্য পান" যাঁহারা করেন তাঁহাদের চরিত্র-জ্ঞানহীনতার ও রুচির দোষ দেওয়া যায় না কি?

এই প্রসঙ্গে "উত্তরকাণ্ডের" লেখক রাম ও সীতার চরিত্রকেও কিরূপ ভাবে দাঁড় করিয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই লেখক অযোধ্যার সমগ্র স্ত্রী সমাজকেও সুরাসক্ত করিয়াছেন এবং অযোধ্যায় একটী নির্জ্জন অশোক বনের সৃষ্টি করিয়া পাঠকদিগকে দেখাইয়াছেন—"কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদহ।
সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কংশুচিঃ॥ ১৮.৫২

অর্থ—রাম তাঁহার অশোক কাননস্থিত লতাগৃহে কুসুমাস্তরণে বসিয়া সীতাকে বাম হস্তে লইয়া মৈরেয় মধু (মদ্য) পান করাইলেন শুধু তাহাই নহে মৈরেয় মধুর সঙ্গে—

মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ—এর ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অবস্থায় যখন উত্তরকাণ্ডের রাম-সীতা প্রতিদিন উপবন বিহার করিতেন, তখন তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিনই পানোন্মত্তা রূপবতী। নৃত্যগীতে তাহাদিগকে প্রমোদিত রাখিত। *

রামায়ণের কবি রামের উক্তিতেও যে সুরাপানের বিরুদ্ধে মন্তব্য না বাহির করিয়াছেন, তাহা নহে। ভরত চিত্রকূটে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, রাম ভরতকে যে সকল রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

* উত্তর কাণ্ডের এই রাম-সীতার চিত্র বাল্মীকি চিত্রিত রাম সীতার চিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে কি না তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এই কাণ্ডে বর্ণিত এইরূপ বিষয়ের আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হইবার পর যখন 'পঞ্চমকার' সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়, এই কাণ্ড লিখিত হইয়াছিল এবং রামায়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

এই সময়ের রচিত গ্রন্থে স্বয়ং ভগবতীকেও পানাসক্তা করিয়া তোলা হইয়াছে। ভগবতী যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষাসুরকে বলিতেছেন "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।" চণ্ডী।

এই নিয়মে কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক মতের কালীপূজায় বাজারের মদ্যও দেওয়া হয়। স্বদেশীর প্রভাবে কোন কোন স্থলে মধু ও আদার ব্যবহার দেখা যায়। ইহা দোষের অভাবে পূর্ব্বার্থ পাঠক অনুমান করিবেন।

দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।

অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব॥ ৬৮। ২। ১০০

দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্ব্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ ও ত্রিবর্গ ইত্যাদি বর্গ সম্বন্ধে তুমি জ্ঞাত আছ কি?

এ দশ বর্গ দশ বিধ কামজ দোষ। স্মৃতি শাস্ত্র দশবর্গের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বাপঃ পরিবাদ স্ত্রিয়ো মদঃ।

তৌর্য্যত্রিকং বৃথাটাচ কামজো দশকগণঃ॥ মনু ৬ অঃ।

যিনি ভরতকে মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, গীতবাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ প্রভৃতি দশবর্গের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি যে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা মনে করিতে আমাদের কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না।

লোক চরিত্রে এরূপ ত্রুটী আজকাল বিরল নহে। কিন্তু এ স্থলে কেবল লোক চরিত্রের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না; কাব্যের দিকে এবং কাব্যকারের গৌরবের দিকেও সম্যক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে কবি লক্ষ্মণের মুখে সুরাপান সমর্থন করাইলেন না, ভরতের আতিথ্যে সুরার ব্যবস্থা রাখিয়াও ভরতের দ্বারা সুরা স্পর্শ করাইলেন না, তিনি যে তাহার আদর্শ সৃষ্টিকে কলঙ্কিত এবং ব্যর্থ উপদেষ্টা করিয়া চিত্রিত করিবেন, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি কি তাহা স্বীকার করিবেন।

রামায়ণে যজ্ঞাদিতে বা অন্য কোন দৈবানুষ্ঠানেই মদ্যের উল্লেখ দেখি না। পরবর্ত্তী মহাভারতের সমাজে যেমন ভদ্র সমাজের (বলরাম প্রভৃতি) মধ্যেও মদ্যের প্রভাব দেখা যায়, রামায়ণে কোন স্থানে ইঙ্গিতেও তাহা বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে সীতার গঙ্গা নদীও যমুনা নদীকে মদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবার উল্লেখকে আমরা একটু সন্দেহের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি। এই অনাবশ্যক সমাজ বিরোধী কথা দুটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি।

রামায়ণের সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ সমাজের প্রাথমিক অবস্থার সমাজ। এই সমাজে যে শাস্ত্রের সম্মান পদে পদে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা মহর্ষির বর্ণনায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক কার্য্যে যে গলদ থাকেও তাহাও ইহাতে আছে। ব্যভিচার ক্রমে ফুটিয়া উঠে, তখন পুনরায় সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ব্যভিচার অধিক প্রকাশ পাইলেই সেই সমাজ প্রাচীন হইবে না; বরং সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে পরবর্ত্তী হইবে।

মদের ব্যভিচার মহাভারতের যুগে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খৃষ্টোত্তর যুগে যে তাহা কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল নিম্নলিখিত উক্তি প্রত্যুক্তি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভিক্ষোমাংস নিষবণং প্রকরুষে কিন্তপ মদং বিনা।

মদ্যাচাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহে বরাঙ্গণাভিসহ।

বেশ্যাপ্যর্থ রুচিঃ কুতস্তবধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেনবা

চৌর্য্যোদ্যূত পরিগ্রহোঽহস্তি ভবতো নষ্টস্যকাস্যাগতি।

তাই বলিতেছি হীনতাই প্রাচীনতার প্রমাণ নহে।

৺কেদারনাথ মজুমদার।

নোতুন আলো

আজ প্রতীচীর গগন ভুবন জ্ঞানের আলোয় ফুটফুটে!
সেই আলোকে প্রাচ্যদেশের ঘুচলো আঁধার ঘুটঘুটে!
স্বপ্নলোকের মানুষ যারা, চোক মেলে' আজ আত্মহারা,
নাস্তানাবুদ্ হচ্ছে নাহক্, কয় না কথা মুখ ফুটে'!
দাম্ভিকতার মস্ত চূড়া আজ পলকে যায় টুটে'!

তাসের প্রসাদ যায় উড়ে' আজ ফাঁকির ফানুস যায় পুড়ে'!
লজ্জা ঘৃণা মজ্জাতে খুব ঢুক্‌ছে গিয়ে হাড় ফুঁড়ে'!
ছুট্‌লো পরম আত্মপ্রসাদ, জাগ্রত সব গণছে প্রমাদ,
যত্নে-পোষা অধঃপতন আর কি ছেড়ে যায় দূরে?
বিষাদ নিরাশ আল্‌সে জাতির আজকে হৃদয় খায় কুরে'!

আর্য্য বলে' বড়াই করি, আম্‌রা আবার আর্য্য কি?
আর্য্য হোলে পতন এমন ঘট্‌তো অনিবার্য্য কি?
তারাই খাঁটি আর্য্য বটে, কীর্ত্তি আঁকা বিশ্ব-পটে,
নিত্য নোতুন আবিষ্কারের ছাড়ছে কোনো কার্য্য কি?
মোরছে তবু মৃত্যু ভয়ে পন্থা পরিহার্য্য কি?

আকাশ পাতাল সাগর ভূতল জরিপ তারাই কোর্‌ছে রে!
মকর-পোতে যাচ্ছে ছুটে' জলের তলে ডুব মেরে'!
চেড়ে' বিরাট খেচর-গাড়ী শূন্যপথে দিচ্ছে পাড়ি,
বাষ্পপোতে চোল্‌ছে ভেসে সাত সাগরের বুক ফেড়ে'!
সৈন্য-বুঝাই বাষ্পযানে পণ্য পুণ্য ন্যায় কেড়ে'!

টেমস্ নদীর নিম্নে সুড়ঙ্গ কোরলো কলির দেবতারা!
মেঘের মেয়ে বিদ্যুতেরে বানায় দাসী আজ তা'রা!
লক্ষ যোজন সুদূর থেকে বে-তারে কয় সবকে ডেকে,
কাটুলে সুয়েজ খাল সুবিশাল; মেরুর খোঁজে যায় মারা!
আট বছরে আল্‌স্ পাহাড় কোর্‌লো ছ্যাঁদা আস্কারা!

সাঁড়ার সেতু গোড়লো তারাই 'পদ্মা' বেঁধে শৃঙ্খলে!
শৈলশিরে দার্জ্জিলিঙে স্বর্গ রচে কৌশলে!
সিন্ধুনদে বাঁধ বেঁধে আজ কোরলো একি অপূর্ব্ব কাজ
আজ মরুতে বন্যা বহায়, ফসল ফলায় সেই জলে!
হিমালয়ের উচ্চ চুড়ায় চোড়তে মরণ পায় দলে!

এখন একটু সম্‌ঝে ত্যাখো! মত্ত তা'রা শক্তিতে!
আমরা অলস ঘোর তামসিক, দেবতাকে ধাই ঘুষ দিতে!
"ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি!"
প্রার্থনাতে পরম পটু, নৃত্য করি ভক্তিতে!
তৃপ্ত আছি প্রাক্তনতার পোক্ত অনুরক্তিতে!

নজীর হাজির করার মোহ আজ পেয়েছে জাৎটাকে!
আর্য্যামির তাই দিচ্ছি প্রমাণ ফক্কিকামর হাঁক্ ডাকে!
পুষ্পক রথ! চিড়িয়া-গাড়ী! ছিল রাবণ রাজার বাড়ী;
উর্ব্ব ঋষির উর্ব্বাগ্নি যা, বারুদ বলি আজ তাকে;
নালিকাস্ত্র বন্দুক হোয়ে ভাগায় শত্রু শঙ্কাকে!

সেই যুগে সেই শতঘ্নীকে কামানরূপে আজ দেখি!
তার যে গোলা গুড়ক ছিল, কোরতে প্রমাণ বই লেখি!
জলে স্থলে উচ্চ নভে লড়াই নাকি চোল্‌তো তবে!
উঠ্‌তো কেঁপে চৌদ্দ ভুবন; শক্তি ছিল কম সে কি?
জাৎটা হঠাৎ হোচ্ছে বৃহৎ শাস্ত্রীয় সেই সাক্ষ্যে কি?

তাড়িৎ বিজ্ঞান? সেও তো জানা! দেবতা কাঁদে সন্ত্রাসে!
বৈদ্যুতিকী শক্তি ছিল শক্তিশেল ও নাগপাশে!
অষ্টধাতুচক্র, ত্রিশূল বজ্রাঘাতে বাঁচায় দেউল,
জদয় তবু তার্ না সাড়া প্রাচীনতার উল্লাসে!
ছিল অনেক, কোন্‌টি এখন? বুক ফাটে তাই উচ্ছ্বাসে!

টি'কতে যদি চাও জগতে, মাতো জড়বিজ্ঞানে!
একসাথে আজ হওরে আকুল মনুষ্যত্বের সন্ধানে!
সাঁৎরে' সাগর উৎরে' শোষ নৈদলে ধাও দেশ বিদেশে,
উপ্‌ড়ে' পাহাড় ফেল্‌তে শেখো, উড়তে শেখো আস্‌মানে!
হয় তো তখন মোজ্‌বে অমর, ভুল্‌বে পামর সাম্-গানে।

জল্-পড়া আর তুক্-তাকের সব রাখো বাজে বুজরুকি!
দেহের মনের জ্ঞানের বলে চোল্‌তে শেখো বুক ঠুকি'!
জগৎ, প্রাণের চায় পরিচয়, সত্যমানে, মিথ্যাকে নয়;
ঝড় বাদলে হাল ছেড়ো না; সাম্‌নে চলো সব ঝুঁকি!
একটা মধুর মিলন্ আশায় হওরে সবাই উন্মুখী!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহ গীতিকা।

কঙ্ক ও লীলা।

কঙ্ক ব্রাহ্মণ পুত্র; ছয় মাস বয়সে মাতৃহীন হইয়া চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হন। পঞ্চ বর্ষ বয়সে প্রতিপালক চণ্ডালের ও তৎপরে তাহার স্ত্রীর ও মৃত্যু ঘটে। অসহায় শিশু শ্মশানে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে দুই দিন কাটায়। তৎপরে গর্গ নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যান। কঙ্ক তথায় ব্রাহ্মণের গরু চরাইতে লাগিল; এবং তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল।

কঙ্কের দশ বৎসর বয়সে গর্গের ব্রাহ্মণী লোকান্তর গমন করেন। লীলা নামে তাঁহার একটি দুহিতা ছিল উভয়েই মাতৃহীন বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাস জন্মিয়া গেল। কবির আপন ভাষায়—

ভাই বোন মত তবে দুহু করে বাস,
এক জনে কান্দে যখন অন্যে দেয় আশ।
কঙ্কেরে না দিয়া লীলা ভাত নাইরে খায়,
দুই জনে গলাগলি ঘুরিয়া বেড়ায়।
ধেনু চরাইতে রোদে কঙ্কে মানা করে,
কঙ্কের বিরহ লীলা সহিতে না পারে।
বাথান হইতে কঙ্ক ধেনু লইয়া আইসে,
আতের পাঙ্খা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে।

ক্রমে লীলা যৌবনে পদার্পণ করিল। কবি তাহার এইরূপ রূপ বর্ণন করিয়াছেন—

শাউনিয়া নদী যেমন কুলে কুলে পানি,
অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চম্পক বরণী।
ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা,
বৃক্ষ তলে গেলে লীলা বৃক্ষ ত'ল আলা।
নদীর ঘাটে গেলে লীলা জ্বলে নদীর পানি,
লীলারে দেখিয়া বান্ধে সাউধের তরণি।
পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়,
মৈলান হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়।
চাঁচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে,
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আভে ঘিরে।
উপরে যোড় ভুরু নীচে নয়ন তারা,
মধু লোভে পুষ্পে যেমন বৈশাছে ভমরা।
কাল কাজলে রাঙ্গা তার দুটি পাশে,
বর্ষা কাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে।
ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উড়ে,
সিন্দুর মাখিয়া কন্যা দিয়াছে অধরে।

সেকালের তুলনায় উপমাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে; এবং শেষের কয়েকটি উপমার সহিত স্বভাব বর্ণনার আশ্চর্য্য সম্মিলন রহিয়াছে। গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ সুন্দর বর্ণনা হইতে পারে, এই গাথাগুলি দেখিবার পূর্ব্বে তাহা মনেও করিতে পারি নাই।

বাল্যকালের ভালবাসা ক্রমে যৌবনের প্রণয়ে পরিণত হইল। লীলার মনেরভাব কবি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বৈস আমার কাছে,
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে।
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা,
বেড়্যা রাখব যুগল চরণ ছাড়্যা যাইবে কোথা?"
"নয়নের কাজল রে বন্ধু, আরে তুমি গলার মালা,
একাকিনী ঘরে কান্দে অভাগিনী লীলা।
না যাইও না যাইও বন্ধুরে, আরে, চরাইতে ধেনু,
আতপে শুকাইয়া গেছেরে, বন্ধু, তোমার সোনার তনু।"
"গোষ্ঠ হতে সুরভি ঐ আসিতেছে ফিরি,
ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী।
আইসাছে প্রাণের বন্ধুরে পাইয়া বহু ক্লেশ।
ঘামেতে ভিজি গেছে তোমার মাথার কেশ।"

এইরূপ আরো অনেক উক্তি আছে। সকলগুলিই গভীর ও ব্যাকুল অনুরাগের পরিচায়ক।

কিছু দিন পরে কঙ্ক এক মুসলমান ফকীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। ফকীর কঙ্ককে সত্যপীরের পাঁচালি লিখিতে আদেশ দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। গুরুর আজ্ঞায় কঙ্ক পাঁচালি লিখিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই সেই পাঁচালি বিলক্ষণ আদৃত হইয়া উঠিল। চারি দিকে কঙ্কের যশ ছড়াইয়া পড়িল; তাহার নাম কবি কঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। তখন আশ্রয় দাতা গর্গ তাহাকে ব্রাহ্মণ সমাজে তুলিয়া লইতে চাহিলেন। ইহাতে চারি দিকে ঘোর আপত্তি উত্থিত হইল, বহু লোক গর্গের বিপক্ষ হইয়া দাড়াইল। তাহারা রাষ্ট্র করিয়া দিল, কঙ্ক এক মুসলমান ফকীরের শিষ্য হইয়া বহু দিন হইতে মুসলমান হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে সে লীলার সহিত দূষিত প্রণয়ে আবদ্ধ। গর্গ এই কথা বিশ্বাস করিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন, এবং কঙ্কের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লীলার মুখে কঙ্ক ইহা জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। যাওয়ার সময়ে লীলাকে বলিয়া গেল—

"রাখিও পিতারে তব অতি যত্ন করে,
ভ্রম দূর হলে পিতার আসিব পুন ঘরে।"
"ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরামণশারী,
তাহারে ডাকিও রে লীলা কঙ্ক নাম ধরি।
নাহি মাতা নাহি পিতা নাহি বন্ধু ভাই,
যে দিকে কপালে নেয় তথি চলে যাই।
রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা নারী,
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি।
রইল রইল রইল রে লীলা পুষ্প তরু যত,
জল সেবন দিয়া পালিও অবিরত।
রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা,
আজি হইতে রইল পড়্যা তোমার মালা গাঁথা।
সুরভি পাটলী রইল রে লীলা প্রাণের দোসর
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর।

এইরূপ আরো অনেক কবিতায় কবির করুণ রস বর্ণনের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কঙ্কের প্রস্থানের পর লীলা পাগলিনী প্রায় হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কবির আপন ভাষায়—

এক স্থানে সাতবার করে বিচরণ,
কোথা কঙ্ক বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন।
মালতী বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা,
তোমরা কি দেইখাছ আমার কঙ্ক গেল কোথা?
পোষমানা পাখীগণে লীলা কান্দিয়া সুধায়।
তোমরা কি দেইখাছ কঙ্ক গিয়াছে কোথায়?
উড়িয়া ভ্রমর বইসে মালতী বকুলে,
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি অশ্রুজলে।

লীলা আপনিই কঙ্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া পলায়নের পরামর্শ দিয়াছে। আবার তাহারই উদ্দেশ্যে এখন ঘুরিয়া বেড়াতেছে। প্রেমের স্বভাবই এই। কবি এখানেও সৃষ্টি নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

এ দিকে লীলার পিতা গর্গ কঙ্কের অন্নে বিষ মিশাইয়া দিয়া কি উপায়ে লীলাকেও বধ করিবেন, এই চিন্তায় ঘুরিতেছিলেন, ইতঃমধ্যে সুরভী গাভী সেই বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। গর্গ আপন পাপ বাসনায় পাপ চিন্তায় পাগলের ন্যায় সারা রাত নানা স্থানে ঘুরিয়া প্রভাতে গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়াই সুরভির মৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ গোহত্যা দেখিয়া তাঁহার মনে তীব্র অনুতাপের উদয় হইল। পাপ বাসনা হইতে হঠাৎ কিরূপে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিতে পারে, তৎসম্বন্ধেও কবির লিপি কৌশল সামান্য নহে। নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

সারা রাতি অনিদ্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে,
প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনার ঘরে।
আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা,
চারি দিকে যেন প্রেত পিচাশের থানা।
পথ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিরিয়া,
ঝটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া।
চারি দিকে শূন্যময় মুধু হাহাকার,
এত বেলা হলো কেহ না খোলে দুয়ার।
মালতী মল্লিকা পড়ে ঝড়িয়া ভূতলে,
ভ্রমর উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে।
নাহি খায় পুষ্পমধু না দেয় ঝঙ্কার,
বিপদ ভাবিয়া মুনি দেখে অন্ধকার।
পুষনীয়া পাখী যত নীরব খাঁচায়,
নাহি ডাকে কঙ্কে তারা না ডাকে লীলায়।
আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিলা তখন,
কাল বিষে সুরভি যে ত্যজিছে জীবন।
হাম্বা রবে মা মা বলি ডাকিছে পাটলী,
গর্গের পাষাণ প্রাণ আজি গেল গলি।
কাতরে মায়ের কাছে হাম্বা রবে ধায়
কভু বা আসিয়া গর্গের চরণে লুটায়।

গর্গ কান্দিতে কান্দিতে দেবতার মন্দিরে ধন্না দিয়া বসিলেন। দুই দিন পরে দৈববাণী হইল—তুমি আপন কন্যাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ আশ্রিত ব্যক্তির হত্যার জন্য অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়াছ, সেই বিষে সুরভির মৃত্যু হয়াছে। গর্গ তখন কঙ্ক ও লীলাকে নির্দোষ জানিয়া অনুতাপে দগ্ধ প্রায় হইতে লাগিলেন। অন্য দিকে তাঁহারই দোষে গোহত্যা হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, সেই পাপের শাস্তির ভয়েও অস্থির হইয়া উঠিলেন। অধিক বিলম্ব না করিয়া তিনি দুইজন শিষ্যকে কঙ্কের অনুসন্ধান জন্য প্রেরণ করলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া দিলেন—

আর কইও আরও কইও জানায়ে মিনতি,
সন্দেহ ঘুচেছে মোর কঙ্কধর প্রতি।
আরও কইও, আরও কইও পোষনীয়া পাখী,
ক্ষীর সর নাহি খায় তোমারে না দেখি।
আন্ধাইরে ঢাকি হইছে চান্দের বাগান,
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্মশান।
ইত্যাদি।

শিষ্য দুইজন চলিয়া গেল। বাড়ীতে লীলা শোকে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। এখানে লীলার খেদ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

আহা কঙ্ক কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায়;
তোমার মালঞ্চ ফুল বাসি হইয়া যায়।

"পুবেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও,
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখা নি গো পাও।
এমন আন্ধার নাইরে, তোমার আলো নাহি পশে,
যাওয়া আসা ঠাকুর তোমার আছে সর্ব্ব দেশে।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও,
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।"
"শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি মাল্লাগণ,
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ।
পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও তরণী বাহিয়া,
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া।"
"শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা,
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা।
তুমি জান কঙ্ক লীলার ভালবাসা বাসি,
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।
কত দেশে যাওরে নদী বহিয়া উজান,
কোথাওনি শুনিতে পাও, নদী সেই বাঁশীর গান।
মরবার কালে দেখ্যা যাইবাম সেই যুগল চরণ,
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুঃখের বিবরণ।"
"শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ,
তিলেকে বেড়াইতে পার এতিন ভুবন।
খুঁজিয়া দেখিও পিয়া আছে কোন্ স্থানে,
মরিবে অভাগী লীলা বলো তার কানে।"
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন,
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন।
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি,
কোন্ দেশে উইড়্যা গেল মোর পিঞ্জরের পাখী।
এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা,
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা।

এই সকল কবিতা চণ্ডীদাসের অথবা এই শ্রেণীর অন্য কোন কবির রচনা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই শোক গাথার মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর স্বভাব বর্ণনা মিশ্রিত রহিয়াছে। যথা,—

"হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে,
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে।
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরু লতা উঠিল বাঁচিয়া।
শুকনা নদী ভর্য়া উঠে কূলে কূলে পানি,
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণি।
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়,
আমার বন্ধুর তারা লাগাল নি পায়!"
"কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন,
ময়ুর ময়ুরী নাচে ধরিয়া পেখম।
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার,
শতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার।
মেঘ ডাকে গুড় গুড় চমকে চপলা,
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা।

প্রেরিত দুইজন শিষ্য অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া আসিল। কোথাও কঙ্কের সন্ধান পাইল না। শোকাকুল গর্গ তাহাদিগকে আবার পাঠাইলেন; আবার ফিরিয়া আসিল। লীলার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে খাঁচা ভাঙ্গিয়া গেল, পাখী উড়িয়া গিয়া অনন্তের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লীলার দেহ শ্মশানে, এমন সময়ে কঙ্ক আসিয়া উপস্থিত। গর্গ হাহাকার করিতে করিতে তাহারে জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক বিলাপ পরিতাপের পর সেই শোকার্ত্ত অনুতাপ দগ্ধ ব্রাহ্মণ কঙ্ক ও শিষ্যগণকে লইয়া নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। নিম্নে গর্গের বিলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা শেষ করিলাম।

উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও,
আমি অভাগায় ডাকি আঁখি মেলে চাও।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কেবা মোরে দিবে অন্ন পানি,
বিউনি বাতাসে কেবা জুড়াইবে প্রাণী।
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাড়ী,
পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী।
আর একবার মাগো চাও মেলি আঁখি,
নয়ন ভরিয়া তোমার জন্ম শোধ দেখি।

করুণ রস বর্ণনে অন্যত্র যেরূপ, এখানেও কবির সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

আজিমার গঙ্গাযাত্রা

সে বার ছিলো বুধাষ্টমী যোগ। গ্রাম উজাড় ক'রে বুড়োবুড়ীরা সব চ'লেছে গঙ্গাস্নানে। আজিমা বল্লেন—ভাই, আমাকে নিয়ে চল্, গঙ্গা নেয়ে আসি!

আমি বল্লাম—তুমি যাবে কী ক'রে ছোটো মেয়ে দুটোকে ফেলে? দু'মাস হয়নি তাদের মা মরেছে; তুমি গেলে আমি কি সব দিক সাম্লাতে পার্‌বো?

"তাতেই তো যেতে চাই, যারা ছিলো কোলের, তারাই যদি চ'লে গেলো; তবে আর কি সুখে সংসারে থাকা। আশীর্ব্বাদ করি আবার সংসার ক'রে সুখে থাকো; একশ বছর পরমাই হ'ক, নাতি নাৎবৌর মুখ দেখো। আমাকে আর কেনো জড়িয়ে রাখিস্। আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে; আমি তো গঙ্গা মুখো পা করে আছি। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, স্বস্থানে গিয়ে বাকী কটা দিন বাস করি। তোরা ছাড়িস্ নি, তাই। তা ভাই আমার এ ইচ্ছাটায় বাধা দিস নে। আমি তিন সত্যি ক'রে বল্‌ছি, আজ শুক্রবার, ফিরে শুক্রবারে আস্‌বোই আস্‌বো। আমি কাউকে যেতে বলি নে, একটা লোক আমার সঙ্গে দিলেই হবে।"

কী করি, রামকিষণ তেওয়ারি ও নব খানসামাকে সঙ্গে দেবার মৎলব কর্‌লাম। তেওয়ারিকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—তেওয়ারি, তোম্ কর্ত্তামাইকো কল্‌কাত্তামে গঙ্গা নাইতে লে যেতে পারো গে?

"হুজুর, কেঁও নেই সেকেঙ্গে। হুজুর লোক্‌কো হুকুম হোনেসে তেওয়ারি কোই কাম্‌মে ডর্‌তা? কল্‌কাত্তা তো মেরা ইস্তামাল হায়। হুজুরকা দাদা খানেকা আগাড়ি চার বরষ কল্‌কাত্তামে ছাতু বাব্‌কা বাড়ী"—

বেগতিক দেখে তেওয়ারীর কথা শেষ না হতেই বল্‌লাম—আচ্ছা, আবি এখন যাও! কাল সবেরামে গাড়ীমে বুঝ্‌তে পার্‌লে তো? যেতে হোগা।

তেওয়ারি যো হুকুম ব'লে লম্বা সেলাম ক'রে চ'লে গেলো।

২

আজিমার যাত্রার আয়োজন লেগে গেলো। বুড়ী সারারাত নিজেও ঘুমালো না, কাউকে ঘুমাতেও দিলো না।—ও বিন্নি, ও হীরু, আমার সব গুছিয়ে দে—না! আমি কি একলা অতো পারি। এরা সব গেলো কোথা?

একখানা কাপড় ভাঁজ করে, আমার খোলে; ট্রাঙ্কে রাখে, আবার নামায়; আর বিড়্‌বিড় ক'রে বকে—দূর ছাই, নামাবলীখানা রাখ্‌তে আবার ভুলে গেলুম।

সারারাত জেগে রাত্রি শেষে একটু চোখ বুজেছি, আর অম্নি এসে বুড়ী ডাকাডাকি আরম্ভ করেছে।—ওরে, তোরা সব ওঠ না! কী ঘুম বাবু, সারারাত ঘুমুচ্ছে তবু হুঁস নেই!

আঃ, কী আপদ! তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, সবে চার্‌টে বেজেছে। আটটায় গাড়ী, এখনো চার ঘণ্টা বাকী। বাকী রাতটুকু ব'সে হাই তুলে, তুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেলো।

সকাল ছটা না হতেই রামকিষণ তেওয়ারি নিতাই খানসামা সরকার গোবিন্দ চক্রবর্ত্তিকে সঙ্গে দিয়ে বুড়ীকে রওনা ক'রে দেওয়া গেলো। আমি গেলাম ষ্টেশন অবধি গাড়ীতে তুলে দিতে। সারা রাস্তা আজিমা উপদেশ দিতে দিতে চল্লেন—ওরে, তোরা সব সাবধানে থাকিস! দেখিস, মেয়ে দুটোর যেনো হীনস্থিন্ না হয়। ঠাকুর ঘরে ঠিক সময়ে যেনো পিদীম দেয়; সন্ধ্যা ব'য়ে না যায়। তুলসী গাছটায় জল দেওয়াবি! তুমি কিন্তু বাবু রোজ রোজ নেয়ো না! রোজ নাওয়া তোমার সয় না। ঠাকুরকে ব'লে দেবে ভাত যেনো নরম ক'রে রাঁধে। বড়ো মেয়েটার শক্ত ভাত সয় না। খুকীটাকে দুধ খাওয়াবার সময় তুমি নিজে কাছে থেকো।

আমি বল্লাম—আজিমা, তুমি কি জন্মশোধ চল্লে? একেবারে যে উইল ক'রে যাচ্ছো!

—আর ভাই, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! তাই যেনো হয়। মা কালীগঙ্গা কি আমার কপালে তা লিখেছেন। ইচ্ছে করে—পারিনে কেবল তোদের মায়া কাটাতে। নৈলে এখন আর আমার কি! আমি তো গঙ্গা মুখো পা ক'রেই আছি।

টিকিট ক'রে বুড়ীকে তো গাড়ীতে তুলে দেওয়া গেলো। আমি ট্রেণের হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে; গাড়ী যতক্ষণ না ছাড়্‌লো আজিমার সেই এক কথা—ওরে, তোরা সব সাবধানে থাকিস!

গাড়ী ছাড়লো; আজিমা মুখ বাড়িয়ে ব'ললেন—ওরে, তোরা সব—

আর কিছু শোনা গেলো না। যতক্ষণ দেখা যায় দেখলাম আজিমা মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কি ব'লছেন।

৩

বুধবার গঙ্গা নেয়েই আজিমার গঙ্গা ভক্তি ফুরিয়ে গেলো। গোঁ ধরলেন—ওরে, আমার বাড়ী নিয়ে চল! আমি স্বপন দেখেছি, মেয়ে ছুটো কাঁদছে।

সরকার বল্লো—কর্ত্তামা, বাবু ব'লে দিয়েছিলেন আপনার যতো দিন ইচ্ছা থাকবেন; আমরা সেই বন্দোবস্ত করেই এসেছি।

"ওরে এসেছিলাম তো থাকবো ব'লে, আমি কি থাকতে পারি, স্বপন দেখেছি যে। একবার গিয়ে দেখেশুনে, তখন আবার আসবো।

সরকার আর কী করে; পর দিন আজিমাকে নিয়ে, রওনা হ'লো। শিয়ালদা ষ্টেশনে টিকিট ক'রে বুড়ীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে, সরকার ও রামকিষণ তেওয়ারি গাড়ী ছাড়তে দেরি আছে মনে ক'রে, ধাঁ ক'রে একটা জিনিস কিনে আনতে বেরিয়ে গেলো। এসে দেখে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দৌড়ে গাড়ী ধরতে গেলো, ষ্টেশনের লোকেরা এই—এই ক'রে ছুটে এসে হাত ধ'রে টেনে রাখলো।

আজিমা এ সব কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি গাড়ীতে উঠেই সবার নাড়ীনক্ষত্রের খবর নিতে লাগলেন।

"তুমি কোথায় যাবে গো? তোমার সঙ্গে যিনি কথা বল্লেন তিনি কি তোমার সোয়ামী?" "এটি তোমার ছেলে নাকি? আহা খাসা ছেলেটি!" "তোমার ছেলে পুলে কি মা? হয় নি? আ-হা-হা, আর ছেলে হবে না গো! আগে মায়ের বুক জুড়ে যায় তাদের আর ছেলে হয় না।"

হাঁ মা চুলগুলো এমন ক'রে রেখেছো, বাঁধতেও পারো নি, এসো বিনুনী ক'রে দি!

এই ব'লে আজিমা চুল বাঁধতে ব'সে গেলেন। ঘণ্টা আদেকের মধ্যেই তিনি সবাইকে আপনার করে তুল্লেন। গাড়ী গোয়ালন্দে এসে লাগলো। যার যার লোক এসে মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে গেলে। আজিমার লোক আর আসে না। আজিমা বড়ো ভাবনায় পড়লেন। যা'কে দেখেন তাকেই বলেন "ওগো সরকারকে ডেকে দাও তো! রামকিষণকে দেখেছো?

মুটেরা এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—মাল আছে?

"ও গো বাছা মাল থাকবে কি, গোবিন্দ সরকারকে খুঁজে পাচ্ছি নে! দেখ তো! নিতাই গেলো কোথা! রামকিষণকেও দেখছি না।"

মুটে বেটা গাড়ীর এধার থেকে ওধার ঘুরে এসে বল্লো—গোবিসিং তো মিলবে না করে।

"আরে গোবিসিং নয়, গোবিন্দ সরকার।"

"ও আগে যইবে করে হোবে। চলিয়ে না পৌঁছা দেই! আবি টীমার ছোড়ে গা!"

"তাই চল বাছা! কী মুস্কিলেই পড়া গেলো। এই—এই আমার বাক্সো নে।"

মুটে আগে আগে বাক্সো নিয়ে চল্লো। বুড়ী বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। ষ্টিমারের জেঠীর কাছে আসতেই টিকিট চেকার টিকিট চাইলেন। আজিমা বল্লেন—বাবা আমার সব হারিয়ে গেছে। সরকারকেও পাচ্ছি না, নিতাইকেও পাচ্ছি না।

চেকার তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

আজিমা ষ্টীমারে এসে দেখেন, গাড়ীর সেই সব লোকেরা ষ্টীমারে বসে। আজিমা ব'ল্লেন—ও মা, তোমরা সব এসে পড়েছো! আমার সব হারিয়ে গেছে। সরকারকেও পাচ্ছি না, নিতাইও নেই।

তখন তাঁদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীকে ডেকে সব কথা খুলে ব'ল্লেন, তিনি শুনে ব'ল্লেন—তা হ'লে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন! আমরা নারাণগঞ্জ যাচ্ছি, সেখান থেকে আপনার বাড়ীতে চিঠি লিখে দেবো, তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

তা'ই হ'ল। আজিমা তাঁদের সঙ্গেই গলেন।

৪

এ দিকে হ'ল কি, গোবিন্দ সরকার ট্রেণ ফেল ক'রে ময়মনসিংহের বাসায় এক টেলিগ্রাম করে দিলো—Grand Mother gone (আজিমা গেলেন)।

টেলিগ্রাম পেয়ে তো বাড়ীতে কান্নাকাটি প'ড়ে গেলো।

সকলেই আপসোস ক'রতে লাগলেন—এতোকালের বুড়ীটা ছিলো, গেলো! কী পুণ্যই করে ছিলো; যা বলে গেছিলো তাই হলো। গঙ্গামুখো পা করেই ছিলো বটে।

আক্ষেপ রইলো, শেষ কালে বুড়ী আমার হাতের আগুনটা পেলো না। কি করি, চাতুর্থিক শ্রাদ্ধ করতে কল্‌কাতার রওনা হলাম। স্মারবাগীশ বল্লেন—তীর্থমৃত্যু যখন হয়েছে শ্রাদ্ধটা গঙ্গাতীরে করাই কর্ত্তব্য।

এদিকে আজিমা তো তাঁদের সঙ্গে নারাণগঞ্জে এলেন। তাঁরা বল্লেন—আমাদের বাসায় থাক্‌বেন চলুন! আজ চিঠি দিলে তাঁরা কালই এসে নিয়ে যাবেন।

আজিমা গোঁ ধর্‌লেন—ওগো না, ওসব কিছুই করতে হ'বে না। তোমরা আমার গাড়ীতে তুলে দাও, ময়মন্‌সিং গেলেই আমি সব ঠিক ক'রে নিতে পারবো।

তাঁরা আর কি করেন; আজিমাকে ময়মনসিংএর গাড়ীতে তুলে দিলেন। গার্ড সাহেবকে ব'লে দিলেন—এঁর টিকিট এঁর সঙ্গের লোকের কাছে রয়েগেছে; তাঁরা ট্রেণ ধর্‌তে পারে নি। ইনি ময়মন্‌সিং নাম্‌বেন, আপনি কাইণ্ডলি এঁর একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।

"বন্দোবস্ত আর কি আমাকে একখানা গাড়ী ক'রে দিলেই আমি যেতে পারবো।"

গার্ড বেজায় মদ খেয়েছিলেন; জড়ানো আওয়াজে ভেরিওয়েল ব'লে চ'লে গেলেন।

গাড়ী যথা সময়ে ময়মন্‌সিং এসে লাগ্‌লো। ময়মনসিংহের যাত্রীরা সব নেমে গেলো। আজিমা বসেই রইলেন। মুটেরা এসে বল্লো—চলিয়ে আপকো বাকস্ লিইয়ে যাই!

"ওরে গার্ড সাহেবকে ডেকে দে তো! সে আমার গাড়ী ঠিক ক'রে দেবে।"

"আরে গার্ড সাহেব কেয়া গাড়ী ঠিক করেগা। চলিয়ে; হাম লোক গাড়ীপর উঠা দেই!"

আজিমা মুটের সঙ্গে চল্লেন। গেটের কাছে আস্‌তেই টিকিট কলেক্টার টিকিট চাইলেন, আজিমা বল্লেন - ওগো আমি হারিয়ে গেছি।

সবাই হেসে উঠ্‌লো। তাঁরা তাঁকে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন—কি হয়েছে?

"হ'বে আর কি, আমার সব হারিয়ে গেছে। আমিও হারিয়ে গেছি, আমার লোকজন সব হারিয়ে গেছে।"

"তুমি যাবে কোথায়?"

"যাবো আর কোন চুলোয়, গেছিলুম গঙ্গা নাইতে। এতো বড়ো যোগটা গেলো, তাই হীরুকে বল্লুম, ওরে আমার-"

"যাক্, কল্‌কাতা থেকে আসছে, তা' হ'লো—নারাণগঞ্জ নয়, কল্‌কাতার ভাড়া ধর্‌তে হবে। ইন্‌টার ক্লাস; তা হ'লে সাড়ে সাত টাকা ভাড়া দিতে হবে যে!"

"ওগো ভাড়া তো দেবো বল্‌ছি। আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও, একজন লোক সঙ্গে দাও, পাই কড়া অবধি হিসেব ক'রে তোমাদের ভাড়া চুকিয়ে দেবো। ভাড়া কি দেবো না?"

"বাসা কোথায়?"

"চৌধুরীদের বাসা।"

"সেখানে তোমার কে আছে।"

"হীরেন আমার নাতি।"

"ও, আপনি হীরেন বাবুর বাড়ীর! বসুন এখানে! আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

এদিকে হ'য়েছে কি এদের সব ময়মনসিংএর বাসায় রেখে আমি কল্‌কাতায় যাবো ব'লে বাড়ীতে গেছি বন্দোবস্ত করতে। বাসায় বিনোদ কাকা, বিন্দী ঝি আর রূপো চাকর আছে। খালি বাসা; খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যার পরেই তারা দোর বন্ধ ক'রেছে। বিনোদ কাকা কিছু ভয়তরাসে; তিনি রাত না হ'তেই মশারি টাঙিয়ে শুয়ে প'ড়েছেন। মেয়ে দুটো ঘুমাচ্ছে। রূপো তামাক সাজছে। ঝি ব'লছে—রূপদা' দেখো দেখো, খুকী ঘুমের ঘোরে কেমন হাসছে!

রূপো বল্লো—বুড়ী বড়ো বাস্‌না ক'র্‌তো কিনা, মরেও মায়া কাটাতে পারে নি। তাই ঘুমের মধ্যে খেলা করে।

কাকার সবে তন্দ্রা আস্‌ছিলো। বল্লেন—বলিস্ কিরে! মরা মানুষ খেলা করে?

"হাঁ গো কর্ত্তা বাবু, আমি ভালো ভালো লোকের কাছে শুনেছি, মরা মানুষ স্বপন দেখাতে আসে।"

"তবে কি বুড়ী এসেছে?"

"ওরে দোর খোল আমি এইচি।"

সর্ব্বনাশ! এ যে আজিমার গলা! বিনোদ কাকা তো তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে মশারি জড়িয়ে রূপোকে আঁকড়ে ধ'রে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন, রূপো ফাঁপরে প'ড়ে গেলুম গেলুম ক'রে চেঁচাচ্ছে আর কাকার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে। এ রকমে তাদের ধস্তাধস্তি চলছে। ঝি উঠে দাঁড়ায়ে কাঁপছে। আজিমা বারবার দোর ঠেলছেন "ওরে দোর খুলে দেনা, কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?"

ঝি সাহস ক'রে জানালাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখে, আজিমাই বটে। রাস্তার মোড়ে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। সঙ্গে দুজন কনেষ্টবল। ভূতে কি গাড়ী ক'রে আসে? ভূতের গাড়ী থাকতে পারে কিন্তু ভূতের সঙ্গে পাহারাওয়ালা থাক্‌বে কেনো! পুলিশরা তো ভূতের পেছনে লাগে না।

ঝি সাহস ক'রে দরজা খুলে দিলো। আজিমা ঘরে ঢুকে পড়লেন।

আমি কলকাতায় যাবো ব'লে সন্ধ্যার গাড়ীতে ময়মনসিং এসে পৌঁছেছি। গাড়ীথেকে নেমেই দেখি, রামকিষণ ও রূপো দাঁড়িয়ে।—কি রে?

সব কথা শোন্‌লাম। বাসায় এসে দেখি, আজিমা ছোটো মেয়েটাকে কোলে ক'রে ব'সে মালা জপছেন। প্রণাম ক'রে বল্লাম—আজিমা, তুমি নাকি মরেছিলে?

"ওরে ম'র্‌বই যদি তবে এলুম কি করে। তোদের জ্বালায় কি মর্‌বার যো আছে!

ঝিন্দী ঝি মাঝে মাঝে বলে—আজিমার গঙ্গা যাত্রা কবে? আজিমা মারমুখো হয়ে বল্লেন—তোর সাত গুষ্টির গঙ্গা যাত্রা হোক!

শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্ত।

আশ্চর্য্য জীব বা মানব দেহ।

জীব দেহকে পরম কারুণিক বিশ্বকর্ম্মার এক অপূর্ব্ব যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের কোন যন্ত্রেরই উপমা হইতে পারে না, ইহা আপনা হইতেই বর্দ্ধিত হয়, ইহা সংস্কার করিতে অন্য কোন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নাই, ইহা আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং ইহার কল কব্জায় তৈল প্রদান করিতেও অপরের প্রয়োজন হয় না, বর্ত্তমান সময়েও দেহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। হয়তঃ ২।৩ হাজার বৎসর পরে মানব এই দেহ যন্ত্রের অনেক তথ্য পরিজ্ঞাত হইবে।

দেহ যন্ত্রের কার্য্য একমাত্র হৃদপিণ্ডরূপ Pump দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জলের কলেরও তুলনা হইতে পারে না। জলের কলে যেরূপ সহরে জল পরিচালিত হইয়া থাকে সেইরূপ এই হৃদ্‌পিণ্ড বহু শত মাইল ব্যাপি নলের ভিতর দিয়া দেহ মধ্যে রক্ত পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশ নলের এরূপ এক গতি আছে যে উহা দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত পরিচালনার (Pumping) সহায়তা হয়। ইহার ভিতর এরূপ সুচারু valves এবং stop-cocks বিন্যস্ত আছে যে তাহা দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তের উপরে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া প্রশমিত করিয়া দেয় এবং তাহা না হইলে আমাদের শরীরের যাবতীয় রক্ত পাদদেশে সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের তিনটী অতি জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের কার্য্য একমাত্র চক্ষু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা নিকটস্থ বস্তু অবলোকনে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়া থাকে, দূরস্থ দ্রব্য দেখিতে উহা Telescope এর কার্য্য করে এবং চক্ষের ভিতরে আলো প্রবেশ করিবার সময়ে উহা ফটগ্রাফের কেমেরার কার্য্য করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের নির্ম্মিত Camera shutter আমাদের নয়নাভ্যন্তরস্থ স্বতঃ কার্য্যকারী Iris এর অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

আমাদের স্নায়ু মণ্ডল জটিল টেলিগ্রাফের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, অগণিত স্নায়ু বা টেলিগ্রাফের তার দেহের সর্ব্বস্থল হইতে মস্তিষ্ক গিয়াছে এবং অন্য এক প্রশস্ত তার মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফের হেড্ আফিস মস্তিষ্ক কিন্তু ভিন্ন ২ স্থানে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য দেহের অন্যত্র বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র আফিস বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত যে সকল ধমনী দেহ

হইতে গিয়াছে তাহা দ্বারা দেহের সমস্ত খবর মস্তিকে আনিয়া দেয় এবং মস্তিষ্ক হইতে দেহে যে ধমনীর জাল বিস্তৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা মস্তিষ্কের হুকুম সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া থাকে এই জটিল Telegram system এর জন্য কোন লাইন ম্যান Telegraph master এর প্রয়োজন নাই, একমাত্র দেহই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পদ নিয়াও আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের একখানা কাচ অক্ষত ভাবে পরিষ্কার রাখিতে সক্ষম হই না, কিন্তু পরম কারুণিকের নির্ম্মিত আমাদের দেহের অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ, কিন্তু যাহাই কেন বলি না, স্ফটিক স্বচ্ছ অক্ষিগোলক স্বয়ং পচন নিবারক শক্তি সম্পন্ন নেত্রবারি দ্বারা এবং অক্ষিপল্লবের পলক দ্বারা আজীবন রক্ষিত ও পরিষ্কৃত থাকে। এবং ঐ নয়ন বিধৌত বারিবিন্দু অধিকাংশ নাসারন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া যায়।

আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দেহ মধ্যে স্বত কার্য্যকারী বহু যন্ত্রের সমাবেশ আছে। আমরা একটী কক্ষে তাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সমাবেশ করিয়াও হয়রান হইয়া পড়ি কিন্তু এই দেহ যন্ত্রে তাপ উৎপাদন ও বিকিরণে ভগবানের এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে তুষার শুভ্র গিরিশৃঙ্গ কিম্বা অত্যুষ্ণ মরুভূমে যেখানেই যাই দেহের তাপের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

ডাঃ ডরসির (Dr. Dorsey) মতে মানব দেহে ২৫০০০০০০০০০০০০০০০ (অর্থাৎ ২৫ কোটিকে ১০ কোটি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা হয়) ডিম্ব কোষ বা cell আছে। প্রত্যেক কোষ আদি কোষ হইতে উদ্ভূত, প্রতি কোষই স্বাধীন জীবের মত কার্য্য করিয়া থাকে, রক্ত প্রবাহ হইতে নিজ ইচ্ছা মত পরিত্যক্ত জিনিষ রক্তে ছাড়িয়া দেয়, অন্য কোষ নির্ম্মাণ করে এবং অবশেষে নিজের নিয়োজিত কার্য্য সাধনা করিয়া জীবলীলার অবসান করে। অস্থি নির্ম্মাণকারী কোষ সমূহ শিশুদেহে সচ্ছিদ্র অস্থি বর্দ্ধিত করে এবং উহাদের মধ্যে এক জাতীয় কোষ অস্থির ছিদ্রের পার্শ্ব ভক্ষণ করিয়া মজ্জা থাকিবার স্থান প্রসারিত করিয়া দেয়।

শরীরাভ্যন্তরে যখন কোন বিষ বা শত্রু প্রবেশ করে তখন তাহার গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য গ্রন্থি সকল সমস্ত হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধে পরাস্ত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, দেহাভ্যন্তরে কোন স্থানে উত্তেজনা উপস্থিত হইলে শত্রুকে গ্রাস করিবার জন্য অসংখ্য শ্বেত রক্ত কণিকা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত ছুটিয়া আসে। বস্তুতঃ পক্ষে দেহ যে নিজ শক্তি দ্বারা নিজকে রক্ষা করে তাহাকেই প্রাকৃতিক আরোগ্য (Nature's cure) বলা হইয়া থাকে। এই প্রকৃতিকে সাহায্য করাই মূল চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কখন ২ বিনা চিকিৎসায় কিম্বা কুচিকিৎসায়ও রোগ আরোগ্য হয় তাহার মূলে ও প্রকৃতি অথবা দেহাভ্যন্তরে রক্ষিত ভগবৎ শক্তি।

ভগবান এই আশ্চর্য্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বতনিয়ন্ত্রিত কল কব্জার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এবং তাহা দ্বারাই ইহার নষ্ট উদ্ধার বা সংস্কার হইয়া থাকে এবং রোগের সহিত সংগ্রামের কার্য্য চলিয়া থাকে।

যদি ভগবানের প্রতি আমাদের বিন্দু মাত্রও শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের কর্ত্তব্য এই দেহ রক্ষা করিবার জন্য ভগবৎ নিয়ম প্রতিপালন করা। অন্য কথায় বলিতে গেলে শরীর পালনের বিধি মানিয়া চলা। তাহা হইলেই মানব সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে এবং অবশেষে নিদ্রার মত অক্লেশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে।

এই ভগবৎ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই মানব নানারূপ জটিল ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

সংগ্রহ।

স্যর রোনাল্ড রসের

ভারতভ্রমণ

স্যর রোনাল্ড রস সেদিন কলিকাতায় একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ১০ কোটি লোক সেই রোগে ভুগিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত—এই প্রদেশই ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রধান বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা দেশেই প্রায় ৩।৬

লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে মরে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে ভুগিয়া জীবন্মৃত, অকর্ম্মণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় ৭০ বৎসর হইল ম্যালেরিয়া বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালীজাতিকে এইভাবে ধ্বংস করিতেছে। নদীমাতৃক বাঙ্গলার সোণার পল্লীগুলি শ্মশান হইয়া যাইতেছে, অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

স্যর রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া-জীবাণু আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তরকারী আবিষ্কার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গলা দেশে কলিকাতা সহরের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারের সুযোগ লইয়া ইস্মালিয়া, পানামা, পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়াছে। কিন্তু যে দেশে বসিয়া তিনি এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে দেশ এখনও ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। এখনও সে দেশে প্রতিবৎসর ৫।৬ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়াতে মরে এবং এই ভাবে চলিলে আর একশতাব্দীর মধ্যে সে দেশের অধিবাসিগণ যে ভূপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মালয় রাজ্যের ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কার্য্য পরিদর্শন-পূর্ব্বক রেঙ্গুন হইয়া বিগত ৩রা জানুয়ারী স্যর রস কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশের ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতার জেনারেল হাঁসপাতালে একটি নূতন প্রস্তরদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে; বিগত ৭ই জানুয়ারী বাঙ্গলা শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন কর্ত্তৃক এই দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। বিগত ১০ই তারিখে স্যর রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার আবিষ্কার সম্বন্ধে এম্পায়ার থিয়েটার গৃহে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। আবার তিনি কলিকাতার ট্রপিকেল মেডিসিন ও হাইজিন্ স্কুলে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কর্ম্মবীরের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং সম্মানার্থ উক্ত ট্রপিকেল স্কুলে ম্যালেরিয়া-গবেষণার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। স্যর রোনাল্ড রসের সহিত ম্যালেরিয়া-সমস্যা যে ভাবে জড়িত, তাহাতে উক্ত সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা যথাযোগ্য বটে। তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতার জেনারেল হাঁসপাতালের এক নিভৃত ল্যাবরেটরিকক্ষে যখন মশক-তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তখন কেহই ভাবে নাই যে, তাঁহারই গবেষণা আজ লক্ষ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা করিবে। তাঁহারই পূর্ব্বে ডাঃ ল্যাভেরাণ (Laveran) ম্যালেরিয়ার বীজাণুর সন্ধান পান এবং অন্যান্য মনীষীগণ ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে ঐ রোগের বীজ—আদ্যপ্রাণিগুলার জীবনচক্র—নির্দ্ধারিত করেন। তাহার পর স্যর পেট্রিক ম্যান্সন অনুমান করেন যে, মশকগুলাই ম্যালেরিয়ার বীজ রোগীর দেহ হইতে সুস্থ মানবের দেহে সংক্রামিত করে; কিন্তু স্যর রোনাল্ড রস এই অনুমানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করেন। তিনি প্রথমে দেখেন যে, মশকদেহেও বীজাণুর জীবন-চক্রের একটা পর্য্যায় অভিনীত হয়। তিনি বিশেষ করিয়া কয়েকটা জাতির মশকেই এই পর্য্যায় লক্ষ্য করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জেনারেল হাঁসপাতালে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করিয়া দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করা যাইবে, কি করিয়া মশককুলের ধ্বংসসাধন সম্ভবপর প্রভৃতি সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই উদ্যমে অনুপ্রাণিত হইয়া নানা দেশের বিজ্ঞানবিদ্গণ ম্যালেরিয়া-নিবারণ চেষ্টায় তৎপর হইলেন। কত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। যে সকল জলাশয়ে মশক অণ্ড প্রসব করে এবং তাহা হইতে পর পর শূককীট ও মূককীট বাহির হইয়া পরে পূর্ণাঙ্গ মশকের উদ্ভব হয়, সেই সকল জলাশয়ে কেরোসিন প্রভৃতি তৈল এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ ছড়াইয়া শূককীটগুলাকে মারিবার ব্যবস্থা হইল; কত খানা, ডোবা পুড়াইয়া এবং মাটির তলা দিয়া সহর অঞ্চলের জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া মশকের অণ্ডপ্রসবের সুযোগ নষ্ট করা হইল, নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ধূমে পূর্ণাঙ্গ মশকগুলার উচ্ছেদসাধনের ব্যবস্থা হইল, মৎস্যাদি শূককীটভুক্ কত জলচর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল; ফড়িং, মাকড়শা, বাদুড় প্রভৃতি কত জীবের পূর্ণাঙ্গ মশকভুক্ স্বভাব আবিষ্কৃত হইল। এমন কি, মানবের অগম্য বন-জঙ্গলেও মশককুলের ধ্বংশের জন্য

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষবর্গ এরোপ্লান আরোহণে প্যারিস গ্রীন্ ছড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। রসের ম্যালেরিয়া-নিবারণপ্রথা অবলম্বন করিয়াই কর্ণেল গর্গাস কুবার (cuba) ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মার্কিণবাসীগণ যখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ম্যালেরিয়ার পীড়নে পানামা খাল কাটাইতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন, পানামা অঞ্চল যখন ম্যালেরিয়ার তাড়নে প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন, তখন কর্ণেল গর্গাস স্যর রোনাল্ড রসের নীতি অবলম্বন করিয়াই পানামার ম্যালেরিয়া নিবারণ করিয়া উক্ত খাল কাটাইতে পারিয়াছিলেন। সেই জন শূন্য পানামা আজ মার্কিণের স্যানিটোরিয়াম বলিলেও চলে। স্যর রোনল্ড রস উষ্ণপ্রধান দেশের ব্যাধিতত্ত্বের এক নূতন যুগের অবতারণ করিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই খানেই থামিয়া গেল না; তাঁহার গবেষণার ধারায় বৈজ্ঞানিক দল কেমন করিয়া Sleeping Sickness সংক্রামিত করে তাহা আবিষ্কার করিলেন; sand-fly কেমন করিয়া সুস্থ দেহে কালাজ্বর সংক্রামিত করে তাহাও আবিষ্কৃত হইল। তাঁহারই আদর্শে আজ বৈজ্ঞানিক মহল নানা রোগের কারণ নির্দ্দেশে বদ্ধপরিকর। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য সুধীসমাজ এই একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসেবীকে নোবেল প্রাইজ দিয়া সম্মানিত করেন। স্বনামে পুরুষো ধন্য, স্যর রোনাল্ড রসের গবেষণাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। (প্রকৃতি)

পৃথিবীর জন্ম।

যখন বর্ণবীক্ষণের পরীক্ষায় জানা গেল আকাশে যথার্থই বাষ্পময় নীহারিকা বর্ত্তমান আছে এবং ফটোগ্রাফির সাক্ষ্য ও তাহা সমর্থন করিল তখন জ্যোতির্ব্বিদগণ আবার লাপলাসের নীহারিকাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সুবিখ্যাত গণিত শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত লর্ড কেল্‌ভিন্ (জন্ম ১৮২৪ মৃত্যু ১৯০৪) নীহারিকার উপাদান সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া একটী গুরুতর নূতন আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি গণিত সাহায্যে দেখাইলেন যে ভূবায়ু হইতে নীহারিকার বাষ্পীয় উপাদান দশ লক্ষ গুণ লঘুতর হইবার সম্ভাবনা। আমাদের পৃথিবীর এক বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া যে পরিমাণ বায়ু অবস্থিত সেই পরিমাণ বায়ু নীহারিকা দেহের দশ লক্ষ মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আমরা যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি উহার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ হাল্‌কা বায়ু যে কিরূপ লঘু হইবে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আদিম নীহারিকা হইতে সৌর জগতের গ্রহাদির উৎপত্তি হইতে বহু লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন নীহারিকার উপাদানের ন্যায় লঘু বাষ্পরাশি শীতল আকাশে লক্ষ বৎসরও দূরের কথা সহস্র বৎসরও জ্বলন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। এই বাষ্পরাশির তাপ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আকাশে বিকীর্ণ হইয়া নীহারিকার দেহ একবারে শীতল হইয়া যাইবার কথা। সুতরাং জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে গ্রহ সকলের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি লাপলাস যে ভাবে মূল নীহারিকা হইতে গ্রহ সকলের উপাদান বলয়াকারে (ring উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঘূর্ণায়মান নীহারিকার বহির্ভাগের উপাদান এই ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা, আর এই ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইলেও তাহা আবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তুলাকার গ্রহে পরিণত হইতে পারে না। শনিগ্রহের বলয় আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তুলে পরিণত হইতে পারে নাই। নভোমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত বহু লক্ষ নীহারিকা আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু উহাদের একটীও বলয়াকার নহে। এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিকগণ লাপলাসের নীহারীকাবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

লাপলাসের নীহারিকাবাদের উপরোক্ত ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিয়া সার লর্ম্যাণ লকিয়ার প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ অনেক গবেষণার পর সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃ শাস্ত্রে উল্কাবাদ (meteoritic theory) নামে প্রচলিত। ইঁহাদের মতে উল্কা সমষ্টি হইতে সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশে কোটি কোটি উল্কা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। প্রতিদিন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সহস্র সহস্র উল্কা পৃথিবীতে পতিত হইতেছে তখন দেখিয়া মনে হয় যেন তারাগুলি ছুটাছুটি করিতেছে।

উল্কাদের প্রায় সকল গুলিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বায়ুর সহিত সংঘর্ষণে জলিয়া উঠে এবং পরিশেষে ভস্মে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। বহু বৎসর পর পাথরের ন্যায় কঠিন দুই একটা উল্কা পিণ্ড পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে অগণিত উল্কা পিণ্ডসমূহ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পরস্পরের আকর্ষণে অনেকগুলি উল্কা পিণ্ড একত্রিত হইয়াছিল। ঐ সকল উল্কা পিণ্ড ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে (orbit) ভ্রমণ করিত। উহাদের কক্ষও সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। উল্কা পিণ্ডসমূহ নিজ নিজ কক্ষে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিবার সময় পরস্পর মধ্যে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণ হইত। সেই সংঘর্ষণের ফলে উল্কারাশি ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া জলন্ত বাষ্পে পরিণত হইয়াছিল। ভূবায়ুর সহিত সংঘর্ষণ হইয়া যে উল্কা পিণ্ড সকল জলিয়া উঠে উহা আমরা প্রায়ই রাত্রিকালে প্রত্যক্ষ করি। বহু সংখ্যক উল্কার বাষ্পীয় উপাদান পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমে উহাদের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইরূপ কোটি কোটি উল্কার বাষ্পীয় উপাদান মিলিত হইয়া সৌর জগতের এক একটী জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। উল্কা সমষ্টির দেহ উপাদান মিলিত হইয়া যে সকল বাষ্পময় বর্ত্তুল সৃষ্টি হইয়াছিল উহাদের মধ্যে যেটী আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা কেন্দ্র অধিকার করিল ইহাই আমাদের সূর্য্য। কেন্দ্রস্থ সেই সুবৃহৎ বর্ত্তুল অর্থাৎ সূর্য্যের আকর্ষণে ধৃত হইয়া অন্যান্য বাষ্প গোলকগুলি বিভিন্ন কক্ষে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। শেষোক্ত বাষ্প গোলকগুলি এক একটী গ্রহে পরিণত হইয়াছে।

লাপলাসের উল্লিখিত অতি সূক্ষ্ম বাষ্পময় নীহারিকা অনন্ত আকাশের শৈত্য প্রভাবে দীর্ঘ কাল উত্তপ্ত থাকিতে পারে না বলিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ যে আপত্তি করিয়াছিলেন, উল্কাবাদ সম্বন্ধে সেই আপত্তি হইতে পারে না। নর্ম্মেন লকিয়ার (Lockyer) চেম্বারলেন T. C chamberlain প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন নীহারিকা সকল জলন্ত বাষ্পময় পদার্থ নহে। উহারা শীতল আলোক হীন উল্কা পিণ্ডের সমষ্টি মাত্র। নীহারিকা মধ্যস্থিত উল্কা পিণ্ডগুলি অবিশ্রান্ত পরস্পর সংঘর্ষণজনিত তাপে গলিয়া উত্তপ্ত বাষ্পরাশিতে পরিণত হয়। এই জন্য নীহারিকা সকলকে প্রদীপ্ত বাষ্পময় দেখায়। কোটি কোটি উল্কার বাষ্পময় উপাদান মিলিত হইয়া নীহারিকার সুবিশাল দেহে নূতন নূতন নক্ষত্র রাজির সৃষ্টি হইতেছে।

আকাশে কত গুলি নীহারিকা আছে উহাদের আকৃতি স্ক্রু (screw) মত কুণ্ডলীকৃত। ইহাদিগকে spiral N.buila বলে। এইরূপ কুণ্ডলাকৃত পাঁচলক্ষ নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই শ্রেণীর নীহারিকাগুলি পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় উহাদের স্থানে স্থানে কঠিন পদার্থ বর্ত্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এই গুলি উল্কা পিণ্ড হওয়ারই সম্ভব।

উল্কাবাদের অনুকূলে এই স্থানে আর একটী কথা বলা যাইতে পারে। কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার কেন্দ্র ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমধিক উজ্জল দেখায়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন পরস্পর সংঘর্ষণের ফলে উল্কা পিণ্ডগুলি কেন্দ্রের নিকটে একত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। উল্কা পিণ্ডসমূহ যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই উহাদের গতি অধিক হইবে। যেমন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ সকলের গতি দূরবর্ত্তী গ্রহ সকলের গতি অপেক্ষা অধিক। সুতরাং কেন্দ্রের নিকটেই উল্কা পিণ্ডসমূহের পরস্পরের সহিত সর্ব্বাপেক্ষ প্রবল সংঘর্ষণ হওয়ায় তথায় অত্যাধিক তাপের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম উল্কারাশি হইতে নীহারিকার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং নীহারিকার বাষ্প জমাট বাঁধিয়া সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকলের জন্ম হইয়াছে।

লাপলাসের নীহারিকাবাদ অনুসারে প্রথমে নেপচুনের জন্ম এবং তৎপরে ক্রমশঃ নিকটতর গ্রহের জন্ম হইয়াছিল। উল্কাবাদীরা বলেন সৌর জগতের কোনগ্রহের কখন উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যেমন দূরতম গ্রহ পূর্ব্বে জন্মিতে পারে তেমন নিকটতম গ্রহেরও সর্ব্বাগ্রে উৎপত্তি হওয়ার কোন বাধা নাই। হয়ত সকল গ্রহই এক সময়ে জন্মিয়াছিল।

অগণিত উল্কারাশি হইতে নীহারিকা সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল উল্কা রাশি কোথা হইতে আসিল? এই সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালী বীর।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল, শারীরিক শ্রমে অপটু ইত্যাদি অপযশ এতদিন বাঙ্গালী অবনত মস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী পালোয়ান গোবর সে অপযশ দূরীকরণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি গত ছয় বৎসর-কাল যুক্তরাজ্য ও কানাডা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়াতে জগদ্বিখ্যাত বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়া দেশ বিদেশে বাঙ্গালীর সবলতার

প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন। শারীরিক শক্তি ও সাহসের অভাবে বাঙ্গালী জাতিকে বহু শ্রমায়াস কার্য্য হইতে বিরত রাখা হইয়া থাকে, সুযোগ ও চেষ্টা দ্বারা বাঙ্গালী যে এক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ নহেন, গোবর তাহা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছেন।

গোবর পালোয়ানের নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ ডাক নাম গোবর। যতীন্দ্রচরণ ১৮৯২ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবু রামচরণ গুহ হোর মিলার কোম্পানীর মুৎসুদ্দি. তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ অম্বুবাবু নামে পরিচিত। অম্বুবাবু সেকালে প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন এবং তাঁহার অন্যতম পুত্র, গোবরের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুই গোবরের শিক্ষা গুরু। গোবরের বয়স এখন মাত্র ৩৫ বৎসর। এই বয়সেই তিনি অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছেন। আজ সমগ্র জগৎ এই বাঙ্গালী যুবকের শক্তি সামর্থের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

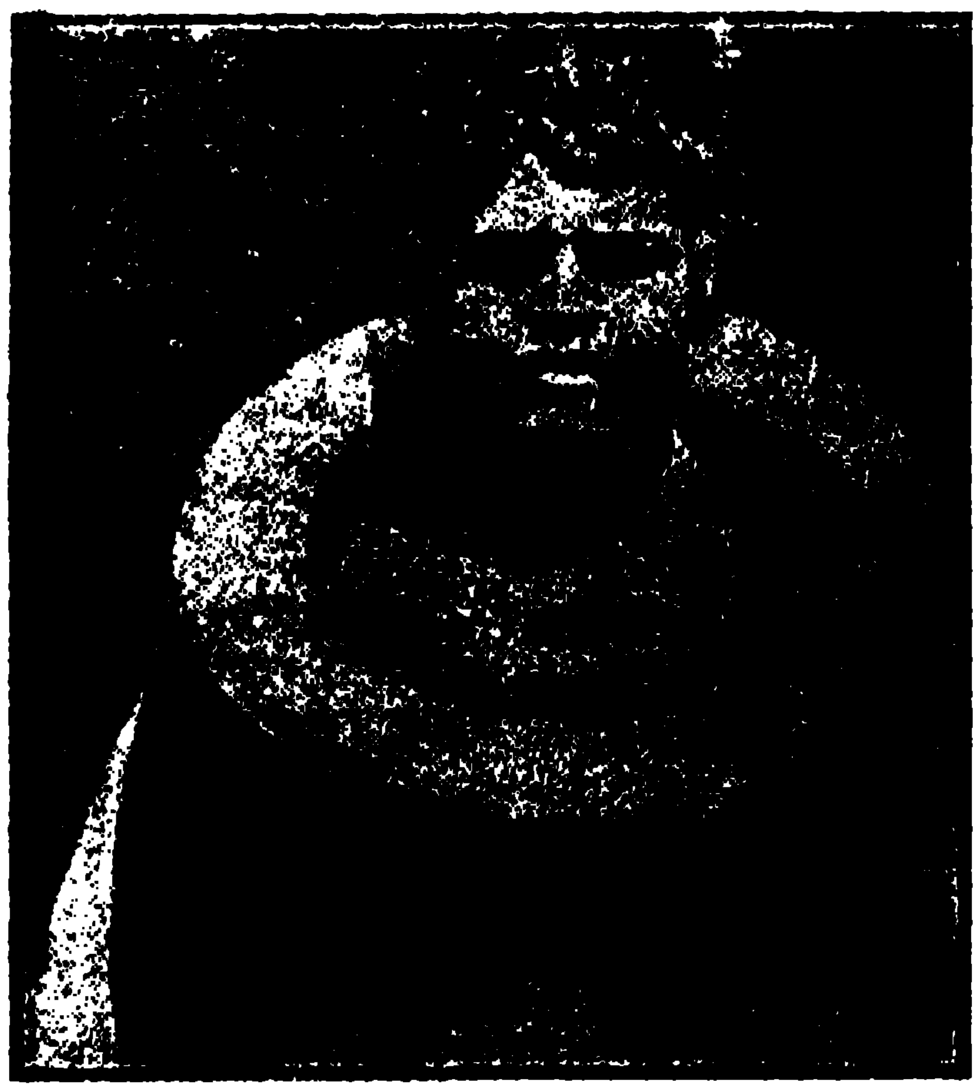

প্রস্তর বলয় স্কন্ধে গোবর।

গোবরের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, বুক ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, গলা ১৮॥০ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি, ওজন তিন মন। তাঁহার দুই জোড়া মুগুর আছে এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫ সের; আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন একমন দশ সের। তিনি যখন খোলা শরীরে এই দ্বিতীয় জোড়া মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন তখন তাঁহার দৈত্যের মত প্রকাণ্ডকায় চেহারা দেখিয়া সেকালের দৈত্যদের কথা মনে উদয় হয়। তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালীর সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর

বিদেশ ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় নিম্ন লিখিতরূপ আহার করিতেন। "তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আকনি; ৪০০ বাদাম ও এক ছটাক ছোট এলাচ, দেড় সের বেদানার রস; এক টাকার সোণার পাত ও ৮ আনার রূপার পাত, বাদাম ও মসলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই ও এক সের দুধ এবং প্রত্যহ এক টাকার ফল।" খাদ্যের পরিমাণ শুনিয়া নহে, খাদ্যের মূল্যের কথা ভাবিয়া যে সকল চিন্তাশীল মস্তিষ্ক বৃথা আলোড়িত হইবে তাহাদের অবগতির জন্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে গোবরের পিতামহ গোবরের উদর পালনের পক্ষে প্রচুর অপেক্ষাও অনেক বেশী সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গোবর সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর।

মিঃ গুহ তাঁহার উপার্জ্জিত শিক্ষা বাঙ্গালী জাতিতে সংক্রামিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে কলিকাতাতে একটী ব্যায়ামাগার ও শারীরিক শিক্ষা প্রদর্শনী স্থাপন করিতেছেন।

আমরা আশা করি বাঙ্গালী যুবক দলে দলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া এইটীকে জয়যুক্ত করিবেন।

সৌরভের পঞ্চদশ বর্ষ।

সৌরভ পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; ইহা ময়মনসিংহবাসীর গৌরবের বিষয়। সাহিত্যিক কেদারনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সৌরভের ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। সৌরভ তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনার সামগ্রী। নিষ্কাম সাহিত্যিকের স্মৃতি চিহ্ন যাহাতে স্থায়ী হয়, আশা করি কেদারনাথের গুণমুগ্ধ অথবা তাঁহার দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষার্থে সাধ্যানুসারে তাঁহার অন্যতম স্মৃতি "সৌরভ"কে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন। ময়মনসিংহবাসী সাহিত্যিকমাত্রের নিকটই আজিকার দিনে এই কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করান বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকার সমস্যা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে অভিভূত করিতেছে। সাহিত্যই ব্যক্তি এবং ব্যষ্টির ভিতর ভাবের প্লাবন আনয়ন করে। সুতরাং যুগ পরিবর্ত্তনের সময় সাহিত্যিকের দায় গুরুতর। একদিকে প্লাবনের স্রোতকে নিরাপদ ভাবে প্রবেশ করিতে দিয়া উল্লিখিত ক্ষেত্র সমুদয়কে প্রাণবন্ত করিবার আবশ্যকতা যেমন অনুভূত হইতেছে—অপরদিকে প্লাবনের অবাধবেগে সংস্কারের সম্পূর্ণ লোপ হওয়ারও আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে। নিজ দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া সৌরভের লেখকগণ ইহার কলেবর পুষ্ট করিবেন—এবং অচিরে সাহিত্য জগতে "সৌরভ" তাহার জন্মদাতার বাঞ্ছিত স্থান অধিকার করুক, ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গ সাহিত্য রত্নভাণ্ডারে ময়মনসিংহের দান তুচ্ছ নহে। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এই স্থানে সাহিত্য জগতে সমভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সমাজের অন্তরস্থিত ভাবসম্পদের পরিচয় দেওয়া এবং প্রসার করা যদি মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ময়মনসিংহের সাহিত্য সম্পদের প্রধান পরিচয় সৌরভের ভিতর দিয়াই সম্ভবপর হইয়াছে। বহু অজ্ঞাত লুপ্তপ্রায় গীতিকাব্য, ইতিহাস এবং সাহিত্যিককে জনসমাজে প্রথম পরিচিত করিয়া দিয়া সৌরভ যে কেবলমাত্র ময়মনসিংহের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য এই কারণে সৌরভের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। সুতরাং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তব্য বোধে সৌরভের উন্নতি সাধন করিয়া নিজ দায়িত্ব বোধের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা সৌরভের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। সাহিত্যক্ষেত্রে সৌরভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ময়মনসিংহবাসীর মুখোজ্জ্বল করুক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

(মহারাজা) শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
(সুসঙ্গ)

প্রবাদের আবাদ।

যে আফিং খায়—গাঁজায় তার মৌতাত হয় না। চাষার নাকি কর্পূরের গন্ধে বমি আসে। আমারও প্রবাদের কাঁটা বন থেকে বেরুবার ইচ্ছা হচ্ছে না। আজ ৩ বছর ধরে ত অনেক জঙ্গলই আবাদ করলাম—কিন্তু চন্দন এখনো পাই নাই—তবে কথায় বলে "সবুরে মেওয়া ফলে।" তাই দাদা মহাশয়ের পাখী ধরার অনুসন্ধিৎসার সহায়তার জন্য আবাদে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি—দেখা যাক কি হয়।

"যাদৃশী ভাবনাযস্ত"। আবার এমন সব ধুরন্ধর সৎগৃহস্থ আছেন যাঁরা এই প্রবাদের জঙ্গল আবাদ দেখে, পাট, সরিষা, বেগুণের চাষ কর্ত্তে চাচ্ছেন। ভদ্র লোকের দরবারে এসব পেঁয়ে চাষার আসন থাকবার কথা নয়, কিন্তু সাধও করে, পেটও পোড়ে!

প্রবাদে রস আছে। নিংড়ে নিতে পারলে খুবই বিশ্রী লাগে না সত্যি, কিন্তু না দেখে আনাড়ি'র মত খেতে গেলে মাছির হুল ফুটান অসম্ভব নয়।

এখন ভূমিকা রেখে আসল কাজে নামা যাক্।

১। ওলাউঠার নাড়ী, পণ্ডিতের দাঁড়ী
জঙ্গলের গাই এ তিনের বিশ্বাস নাই।

(তখন দেশে জঙ্গল ছিল, গরু জঙ্গলে গেলে প্রায়ই বাঘের মুখ হইতে ফিরিত না)।

২। টেঙ্গরে টুঙ্গরের বাস।

টেঙ্গর অর্থাৎ উচুঁ টিলাময় জায়গার লোক নাকি খুব ধড়িবাজ হয়।

৩। হাতী মলেও লাখ্ টাকা।

৪। শক্ত মাটিতে বিড়াল হাগে না।
গরম ভাতে বিড়াল ভোঁতা।
শক্তের ভক্ত নরমের যম।

এই তিনটীই এক অর্থ জ্ঞাপন করে।

৫। বাঁশ, বামুন, বালক
তিনই মাটীর নাশক।

৬। শুক্না মাছের নায় বিড়াল কাঁণ্ডারী

৭। ঠেক্লে বাঘে ঘাস খায়।

৮। গাঁয় আধা খাঁয় আধা
মরণের মায় একলাই আধা।

৯। রান্ধে বেটীও চুল বান্ধে।

প্রকৃতপক্ষে যে কাজ করিতে জানে, সামান্য অজুহাতে সে বসিয়া থাকে না।

১০। আঁতে তিত দাঁতে নুন্
পেটের ভরে তিন কোণ
কানে কচু নাইয়ে তেল,
তার বাড়ী বৈদ্ না গেল।

১১। থাক্ ভিক্ষা, কুত্তা সামাল।

১২। আবাগার লগ্গনে
চান্ গেছে দক্ষিণে।

১৩। মোটে মায় রান্ধে না
তপ্তা আর পান্তা।

১৪। নুন্ মরিচ দিয়া ভাত খাই
বিলাইরে কাঁচকলা দেখাই।

১৫। যার হাতে খাই নাই সে বড় রান্ধুনী
যারে কখন দেখি নাই সে বড় সুন্দরী।

১৬। কামায় সাধু
উড়ায় মাধু।

অর্থাৎ যে রোজগার করে, সে ভোগ করে না, অপরে তাহা অজস্র ব্যয় করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

১৭। কাণে কলম থইয়া
দেশ মরি বিচারিয়া।

১৮। হাতী যদি খাদে পড়ে
চামচড়ায় লাথি মারে।

১৯। না মারব জামাই, সেকাইট লইয়া কুদে।

২০। কথায় বার্ত্তায় সুপারিশ
মাঠা নেস্ ত ছালা আনিস্।

২১। ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ যার
বাজারের ভাও জান কি?

২২। খাসীর তেল বাড়ে
থন্কারের আয় বাড়ে।

২৩। ঘোড়া চিনি কাণে, দাতা চিনি দানে,
মানুষ চিনি হালে, মণি চিনি জলে।
পান্তা ভাতে ঘি
বাপের বাড়ীর ঝি।

২৫। বন্ধুরে যে সন্দ করে
সে সকলের আগে মরে।

২৬। মামা, ভাগ্নে, জামাই, শালা,
আর পোষ্য পুত
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন
এই পাঁচটী ভুত।

২৭। ঘা শুকায়, কথা শুকায় না।

২৮। ভাঙ্গা কাচ, ভাঙ্গা মাটীর বাসন, আর ভাঙ্গা মন, জোড়া লাগে না।

২৯। মুখের কথা ধনুর তীর, বাইর হইলেই শেষ।

৩০। মরদের বাৎ, হাতীর দাঁত।

৩১। সোণা থইয়া অঞ্চলে গির।

৩২। যেচে মান আর কেঁদে ভালবাসা।

৩৩। লাউগড় দিয়া কুমড়া কাটে।

৩৪। ঢেকি ঘরেরও বারান্দা
চাকরের ও শ্বশুর বাড়ী।

৩৫। অমঙ্গলকে না ডাক্‌লেও আসে।

৩৬। জামাতা, জঠর, জায়া, জলাশয় ও জাতবেদ (অগ্নি) এদের ভরণ দুঃসাধ্য।

৩৭। বাঁচার লাগি খায়
তার বাড়ী বৈদ্য না যায়।
খাবার লাগি বাঁচে
বৈদ্য ঘুরে পাছে পাছে।
অর্থ—পেটুকের রোগ ছাড়ে না।

৩৮। তাস, তামাক, পাশা,
তিনই কর্ম্মনাশা।

৩৯। পথে চল দেখে কড়ি লবে টুঁকে।

৪০। পর হস্তে ধন, পরের নায় গমন।

৪১। নদী, নারী, অস্ত্রধারী
এ তিনে না বিশ্বাস করি।

৪২। সৎকাজে শতেক বাধা।

৪৩। আহার, নিদ্রা, ভয়,
যত বাড়াও ততই হয়।

৪৪। তেঁতুল, তাল, কুল
বাস্ত করে নির্ম্মূল।

৪৫। ঘোল, কুল, কলা,
তিনে ভাঙ্গে গলা।

৪৬। সকল ঘর লেপিয়া দুয়ারে কালী।
অর্থ—সুন্দরভাবে কাজ শেষ করিয়া শেষে অল্পের জন্য নষ্ট করা।

৪৭। শিখ্‌ছিলে কোন্ খানে,
ঠেক্‌ছিলাম যেখানে।

৪৮। যাহা বায়ান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।
অর্থ—অল্পের জন্য কিছু যায় আসে না।

৪৯। শ'টাকা ঋণ, এক টাকার ঘি কিন্।

৫০। চাচা, আপন বাঁচা।

৫১। যত মুস্কিল তত আছান।

৫২। যেমন ঘোড়ামুখা দেবতা
তেমন, মাষ কলাই আধার।
অর্থ—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

৫৩। হাতের থাইক্যা আম বড়।

৫৪। খেতের লাগি দিলাম বেড়া
বেড়ায় খাইল খেত।

৫৫। বুকে থাইয়া মুখে মারে।

৫৬। খানার মধ্যে পাণি
আপনার মধ্যে নানী।

৫৭। লেঙ্গেও ঠেং মেলে।

৫৮। কোন্ না সুয়াদের রাঁড়ী
শাগ আবার আদা।

৫৯। ঠেলার না—শা- মাদার।

৬০। পেঁয়াজ পয়জার দুই।

৬১। নতুন সাধু ফোঁটা দিল
ধুইয়া যায় মুখ ধোয়া জলে।

৬২। চৈতের গীত বৈশাখে।

৬৩। কীর্ত্তন ছাড়াইয়া দশা।

৬৪। পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।

৬৫। ধানের মধ্যে খামা,
কুটুম্বের মধ্যে মামা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহের গৌরব।

এবারে বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচন এবং মন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারের অবসান হইয়াছে। ময়মনসিংহের সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ

বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী

মাননীয় হাজি এ, কে, এ, এ, গজনবী!

বারিষ্টার মিঃ হাজি এ, কে, গজনবী মহোদয় অন্যতম মন্ত্রী মনোনীত হইয়াছেন মাননীয় সভাপতি, এবং একজন মন্ত্রী এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের একজিকিউটিব কাউন্সিলের সদস্য মাননীয় নবাব নবাব আলি চৌধুরী সকলেই এজেলার অধিবাসী। অন্য কোন জেলায়ই [illegible] জন অধিবাসী এইরূপ উচ্চ রাজপদ অলঙ্কৃত করেন নাই। ইহা ময়মনসিংহের গৌরব।

শিলঙ।

হে শি॰ঙ তোমারে প্রণমি বার বার
ক্ষমা কোরো মোদের সবার
অপরাধ ; চিনি নাই আমরা তোমারে।
আলস্য-লালসে
রূপে গন্ধে রসে
ভুঞ্জিয়াছি ভোগ তব বিশাল বিসারে ;
জানিতে চাহিনি তব
গূঢ় প্রকৃতির নব নব
মর্ম্মকথা ; কোন্ মন্ত্র নিঃশব্দ বিরাজে
তব হিয়া মাঝে
শ্যামারণ্য পরিবৃত পর্ব্বত অন্তরে
কোন্ সত্য স্বপ্রকাশ মানব-ইন্দ্রিয় অগোচরে
করিতেছে ধরণী ধারণ,
জানিনি রহস্য তার অচেতন
মোরা কয় জন।
বনপথে তৃণাস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তরে
নিরবধি করি বিচরণ তৃষিত অন্তরে
পাইনি খুঁজিয়া তোমা—"পাইন"-গুণ্ঠন
ঢাকিয়া রেখেছে কোথা অনবদ্য-অমর-প্রতিমা
কোথা সে মহিমা !
আভাস নেহারি যার বর্ণে বর্ণে
সন্ধ্যার গলিত স্বর্ণে
তব শীর্ষ-চূড়ে ;—
স্পর্শ যার ভাসি আসে
"পাইনের" মদির নিশ্বাসে
গোপন বারতা কোন্ বহি—অন্তরের চিন্তামণিপুরে !
অনাহত ধ্বনি যার অব্যক্ত গভীর
গম্ভীর বিপুল স্বরে
"সপ্ত ঝরে"
প্রচারিছে রাত্রিদিন ; ভাষা তার
নাহি ফোটাবার ;
কবিতা নীরব লেখা,—মূঢ় লেখা কল্পনা কবির !

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,
শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ।

সাহিত্য সংবাদ।

এবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজে এক সারস্বত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সিটি স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিশ্ববীণা বাহির হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

ঢাকা হইতে "পূরবী" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা আগামী নববর্ষে বাহির হইবে। আমরা সহযোগীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আমাদের গৌরব চিত্রশিল্পী শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের চিত্র এলবাম ৪র্থ খণ্ড বাহির হইয়াছে। আমরা এই সংখ্যার মুখপত্রে তাহার একখানা চিত্র প্রদান করিলাম।

কবিভূষণ মহেশচন্দ্রের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া বাহির হইয়াছে।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ৪র্থ কবিতা-পুস্তক "রামপ্রসু" বাহির হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

মিলনাশ্রু।

দখিণ হাওয়ায়
ভরল আমার মরম তল !
মিলনেরি অশ্রু-বারি,
বকুলতলে কুসুমদল !
এসেছে আজ্ প্রাণ-বঁধু বঁধু নয় সে ফুলের মধু ;
ফাগুন রাতে নয়ন পাতে
ফলছে সোণা, মুক্তাফল !
দখিণ হাওয়ায়
ভরল আমার মরমতল !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

কেশরঞ্জন তৈল

= কারণ =

কে—শ—র—ঞ্জ—ন = মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন = রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন = মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহর করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেসে—সম্পা... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh -Reg. No. C 745.

যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ছাঁচে পড়িতে চান

তাঁহাদের জন্য

লিখিত হইল।

প্রথম চিত্র—কিশোরগঞ্জ পরামাণিকদিগের বিপুল বৈভবের উত্থান পতনের ইতিহাস।

দ্বিতীয় চিত্র—সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস।

তৃতীয় চিত্র—মসনদ আলি দেওয়ান ইশাখার ইতিহাস

ইহার পাতায় পাতায় হাফটোন ছবি।

মূল্য ৸৹ আনা ভিঃ পিতে এক টাকা মাত্র। সৌরভ কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ।

পঞ্চদশ বর্ষ। ফাল্গুন—১৩৩৩ ২য় সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও

সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র স্থল।

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরে[illegible] মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] ময়মনসিংহ। [illegible] দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

[illegible]

ডাক্তার অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গমী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাগু, বাঘা, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৻০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৻০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৷০ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।ন

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়!

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ

পায়ানী রোড, পোঃ ক্যেডেল রোড, বোম্বে, ন

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"[illegible]"

[illegible]—[illegible] আনা, [illegible] আনা,

ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫॥০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার

স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

প্রতিষ্ঠিত

হোমিওপ্যাথিক প্রচার কার্য্যালয়।

১৬নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা এবং পাটুয়াটুলী—ঢাকা।

সুলভে প্রথম শ্রেণীর ঔষধ, যাবতীয় হোমিও গ্রন্থকারের, গ্রন্থরাজি, শিশি, কর্ক, সুগার অবমিল্ক, গ্লোবিউল্স অস্ত্র ও ডাক্তারী যন্ত্রাদি, এবং ঔষধের বাক্স পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

শুধু একটীবার পরীক্ষা করুন। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার

শ্রী[illegible]

সূচী।

রামায়ণে সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ	৺কেদারনাথ মজুমদার ...	২৫
প্রবাদের আবাদ	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	২৯
যৌবনের গান (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	৩০
পল্লী নিবাসী ও সহর প্রবাসী ...	শ্রীমতী মালতীমালা তত্ত্বদীপিকা ...	
মৈমনসিংহ গীতিকা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী এম.এ,	৩৩
পৃথিবীর জন্ম	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল	৩৬
কাশী যাত্রা	... ...	৩৯
বেদান্তের অধ্যাস	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ	৪৫
পুরাণো আঁধার (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী ...	৪৭
সমালোচনা	... ...	৪৮

যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ছাঁচে পড়িতে চান

তাঁহাদের জন্য

কালের ডায়রী

লিখিত হইল।

প্রথম চিত্র—কিশোরগঞ্জ পরামাণিকদিগের বিপুল বৈভবের উত্থান পতনের ইতিহাস।

দ্বিতীয় চিত্র—সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস।

তৃতীয় চিত্র—মসনদ আলি দেওয়ান ঈশাখার ইতিহাস।

ইহার পাতায় পাতায় হাফটোন ছবি।

মূল্য ৸৹ আনা ভিঃ পিতে এক টাকা মাত্র। সৌরভ কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঙ্কলন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান!

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর-পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডান-হাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিস্মার্কের তিনটি বোমা", রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"...প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রাজী! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র!! "সংবাদ-কোষ" বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সৎ-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ!!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা" ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি!

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দেড়গুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্‌ কলিকাতা।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত

বিশ্ব-বীণা

সভা সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে গীত হইবার উপযোগী বিবিধ সঙ্গীত, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির জন্য নানারকমের রচনা মুসলমান বালকদের উপযোগী কবিতা ও গান, মহিলা সভায়, হিন্দু সভায় ও ব্রাহ্মণ সভায় পঠনার্থ ওজস্বিনী কবিতা, হিন্দুসমাজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের উপকারার্থ রচিত কবিতাসমষ্টি এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক সমাজের বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নারী এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

TO LET.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি
মাননীয় সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।

সৌরভ প্রেস—ময়মনসিংহ।

কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩৩৩। } ২য় সংখ্যা।

রামায়ণে সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক আচার ব্যবহার সমাজ ভেদে ও দেশের বিভাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপই প্রায় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি এমত আছে, যাহা ধনী নির্ধন সকলেরই আচরণীয়, আবার কতকগুলিতে ধনীরই অধিকার, দরিদ্রের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণের চিত্র, রাজপরিবারেরই চিত্র, সুতরাং তাহাতে রাজকীয় আচার আচরণের কথাই বেশী; কচিৎ কদাচিৎ নাগরিকদিগের ও মুনি ঋষিদের কথায় সাধারণ জীবনের কথাও বিবৃত হইয়াছে। আমরা যতদূর সম্ভব উভয়বিধ সমাজের আচার আচরণের কথাই নিম্নে আলোচনা করিলাম।

কর্ম্মী ও আদর্শ জনগণের নিদ্রাভঙ্গে যে সময় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে রাজা রাজারাও নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতেন। পাছে ঠিক সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, এজন্য নিদ্রাভঙ্গ করিবার বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিধারী বন্দী (বন্দনাকারী) সূত, মাগধ, স্তুতিপাঠক পাণিবাদক ও গায়কগণ রাজভবনে সমাগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিত। ইহার উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপর্য্যুপরি দুন্দুভি ধ্বনি হইতে থাকিত। দুন্দুভি শব্দে বৃক্ষকুলায়ে নিদ্রিত পক্ষী এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিকুলও জাগ্রত হইত। নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হইত।[১]

রাজ অন্তঃপুরে স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্নান কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত তাহারা স্নানের জল আনয়ন করিয়া যথারীতি স্নানার্থীর স্নান কার্য্যের সহায়তা করিত। বস্ত্র রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিচারক বা পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিত। এইরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজা রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

রাজকুমারগণও ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শুচি ও সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিতেন এবং অগ্নিহোত্র সমাধান ও গুরুজনদিগের পদবন্দনা করিতেন।[৩]

অগ্নিহোত্র সমাধান তখন কেবল রাজপুত্রদিগের নয়— প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই বোধ হয় মুক্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।[৪] সুতরাং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া আচরিত হইত। যে গৃহে হোমাগ্নি রক্ষিত হইত না সে গৃহ অপবিত্র অশুচি বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইত। অগ্নির নৈতিক প্রয়োজনীয়তা হেতুই যে অগ্নি রক্ষার এইরূপ সামাজিক বিধান ছিল তাহা অনুমান করা অসমীচীন নহে।

জ্যেষ্ঠদিগকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রণাম করিতে হইত। লক্ষ্মণ সীতাকে প্রতিদিন প্রণাম করিতেন।[৫] সাক্ষাৎ কালেও জ্যেষ্ঠের পাদ বন্দনা বিধি ছিল। গুরুজনের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক

১। অযোধ্যা ৬৫ সর্গ।

৩। আদিকা ২৯ সর্গ।

৪। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমের নাম অগ্নিহোত্র নারায়ণ উপনিষদ বলেন প্রতিদিন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে গৃহস্থের মুক্তি— ইহাই নাকি বেদার্থবিদেরা বলিয়া থাকেন। নারায়ণ ৭৭। ৮,১ শ্রুতি।

৫। কিষ্কিন্ধ্যাকা ৬ সর্গ।

কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইত। রাম দশরথকে এইরূপে প্রণাম করিতেন।৬

গুরুব্যক্তি কোন বস্তু প্রদান করিলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল। হনুমান রামের প্রদত্ত অঙ্গুরি এইরূপে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন।৭

গুরুজন স্নেহের পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তক৮ আঘ্রাণ করিতেন। রাজা দশরথ এইরূপে রামকে গ্রহণ করিতেন। পুত্রের প্রবাস গমন কালে মাতা পুত্রের মস্তকে অক্ষত৯ প্রদান করিতেন এবং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন ও মন্ত্রৌষধি প্রদান করিয়া হস্তে বিশল্য করণী বাঁধিয়া দিতেন। রাম বনে গমন কালে কৌশল্যা এই অনুষ্ঠানগুলি করিয়াছিলেন। এগুলি বোধ হয় রক্ষা কবচ বলিয়া গণ্য।

প্রণামের নানাপ্রকার রীতিই প্রচলিত ছিল। গুরুজনকে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিধি ছিল। সাধারণ জনগণ অসাধারণ জনকে মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্ত স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিত। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত ব্যক্তি দুই হস্ত যুক্ত করিয়া তাহা মাথায় বদ্ধ রাখিয়া সম্মান দেখাইতেন বিভীষণ এইরূপে বদ্ধাঞ্জলি মস্তকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতাকে সম্মান অভিবাদন জানাইয়াছিলেন।১০ অনুচরেরা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। হনুমান রামকে এরূপেও প্রণাম করিতেন।১১ উচ্চ সভাসদ বা কর্ম্মচারীগণও দূরে বাহন রাখিয়া পদব্রজে রাজসভায় আসিয়া রাজার পাদ বন্দনা করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন।১২ অতিথি বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণনীয় হইতেন। এমন কি দেবতার সহিত অতিথির তুলনা হইত। সমাগত অতিথি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকে সসম্মানে পাদ্য অর্ঘ্য দানে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার বিধান ছিল। উচ্চ নীচ জ্ঞান অতিথির সহিত ছিল না।

করমর্দ্দন প্রথাটিকে আমরা বর্ত্তমানে ইয়ুরোপীয় বৈদেশিক প্রথা বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা বৈদেশিক প্রথা নহে। প্রাচীন ভারতে এই প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাম সুগ্রীব এইরূপে করমর্দ্দন করিয়াই আত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন। রাম সম্ভাষণে সুগ্রীব বলিতেছেন :—

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥১১।৪।৫

এই আমি হস্ত প্রসারণ করিলাম, যদি আমার সহিত মিত্রতা করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে। তবে আপনার হস্ত দ্বারা আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া অক্ষয় প্রীতি বন্ধন করুন।১৩

বশিষ্ঠের সহিত রামের সাক্ষাতে রাম কুলগুরুকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ হইতে পারে সন্দেহ থাকিলেও তাহা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। বৃদ্ধ বশিষ্ঠকে রাম অগ্রসর হইয়া যাইয়া রথ হইতে নামাইয়াছিলেন।

পরিগৃহ্যথ রথাৎ স্বয়ম্। ৭।২।৫

এই কথায় টীকাকারগণ হস্ত ধারণাই ব্যাখ্যা করেন। দশরথও রামকে হস্ত ধরিয়াই গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। যথা "গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সম্বন্ধে প্রিয়মাত্মজম। ৩৪।২।৩

শুধু রামায়ণে নহে, বৈদিক সাহিত্যেও এই প্রথার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-আর্ত্তভাগ-সংবাদ হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকর্ত্তা আর্ত্তভাগকে বলিতেছেন—

* সোম্য হস্ত মার্ত্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি। ৩।২।১৩

অর্থাৎ যদি এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাও, আমার হস্তে তোমার হস্ত অর্পণ কর চল নির্জ্জনে যাই ; জনাকীর্ণ স্থানে এ সকল কথার আলোচনা হইতে পারে না।

এইরূপ ভাব হইতেই যে পরে করমর্দ্দন প্রথার সৃষ্টি

৬। অযোধ্যাকাণ্ড ৩ সর্গ। ৭। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৪ সর্গ।
৮। বালকাণ্ড ২২ সর্গ। ৯। অযোধ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ।
অক্ষত অর্থে ধান্য-যব, ইত্যাদি। পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কেবল অক্ষতই ব্যবহৃত হইত। যে প্রদেশে যে শস্য প্রধান সেই প্রদেশে সেই শস্যই অক্ষত নামে পরিচিত ছিল। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে ধান্য এবং দূর্ব্বার প্রভাব হেতু বোধ হয় বঙ্গজননীরা ধান্যের সহিত দূর্ব্বা যুক্ত করিয়া স্নেহাস্পদদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।
১০। লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ। ১১। সুন্দরকাণ্ড ৩৮ সর্গ।
১২। লঙ্কাকাণ্ড ১১ সর্গ ও কিষ্কিন্ধ্যা ৩১ সর্গ।

হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোলাকুলি বা আলিঙ্গন প্রথাও সুপ্রাচীন। সাক্ষাৎও আলিঙ্গন, অঞ্জলি বন্ধন ইত্যাদি দ্বারা সম্মান করা হইত। কনিষ্ঠকে কেবল আলিঙ্গন দ্বারাই প্রীতি প্রদর্শন করা হইত।

রাজা রাজপুত্র অথবা তেমনতর কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুরী প্রবেশে রাজপুরী হইতে শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনিত হইত। ঋষ্যশৃঙ্গ সহ দশরথ অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে এইরূপ অভ্যর্থনা ধ্বনি হইয়াছিল।[১৪] বনবাস হইতে রাম প্রত্যাগমন করিলেও এইরূপ মঙ্গল ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে গৃহীত হইয়াছিল।[১৫] এইরূপ প্রথা বর্ত্তমান সময়েও রাজধানী সমূহে আচরিত হইয়া থাকে।

জন্মস্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান করিবার রীতিও সে কালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি প্রদক্ষিণের কথা আমরা ৩য় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। হনুমান রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া কথা বলিতেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌশল্যার একস্থানের আক্ষেপ উক্তিতে রাম লক্ষ্মণ কবে আসিয়া পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া হৃষ্ট মনে পুরীতে প্রবেশ করিবে তাহার উল্লেখ আছে;[১৬] ইহা সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মুনি ঋষিদিগকে অভ্যর্থনা করা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার রীতি একটু পৃথক ছিল। রাজা ও ঋষি সাক্ষাৎ হইলে সে সময়ে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও রাজনীতি এই উভয় চর্চ্চাই হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভরত ও ভরদ্বাজের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটাই এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাত্রা করিয়া পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভরত আশ্রমের নিকট উপনীত হইয়াই পরিধান বস্ত্র ও অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পবিত্র ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া ও উত্তরীয়রূপে গ্রহণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবা মাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরত ভরদ্বাজের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভরদ্বাজও উভয়কে পাদ্য অর্ঘ এবং বিবিধ ফল প্রদানপূর্ব্বক গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজধানী, সৈন্য সামন্ত, ধনাগার, বান্ধব, মন্ত্রী ইত্যাদি বিষয়ই ভরদ্বাজের জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল। প্রতি জিজ্ঞাসায় ভরতের পক্ষে—ঋষির তপ সাধন, শরীর, অগ্নি, শিষ্য, আশ্রম ও বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির অভয় অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল।[১৭]

ঋষিরা রাজদর্শনে আশীর্ব্বাদ করিতেন কিন্তু সাধারণ লোক রাজদর্শনে শ্রদ্ধার সহিত উপঢৌকন প্রদান করিত। নিষাদরাজ গুহ ভরতের আগমনে তাঁহাকে প্রচুর মৎস মাংস ও মধু উপঢৌকন প্রদান করিয়া সৎকার করিয়াছিলেন।[১৮] কোথাও গমন কালে সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে করিয়া যাইবার রীতি। ভরতের নদী উত্তরণ কালে সর্ব্বাগ্রে গুরু পুরোহিত তারপর রাজকীয় মহিলা বা, অতঃপর রাজমন্ত্রীদিগের পত্নীরা গমন করিয়াছিলেন।[১৯] ইয়ুরোপের বর্ত্তমান প্রথা স্বামীর সম্মানের সমান অধিকারী স্ত্রী।

প্রাচীন ভারতে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান সংসারের সকলের চেয়ে উপরে ছিল। জাম্ববানের মুখের একটী কথায়ও তাহা প্রমাণিত হবে। জাম্ববান অঙ্গদকে বলিতেছেন "আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদের কলত্র তুল্য। সুতরাং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের প্রতিপালন করিতে হইবে।

"ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামীভাবে ব্যবস্থিতঃ।

স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেষা পরন্তপঃ॥ ২৩। ৪। ৬৫

স্ত্রী গৃহকর্ত্রী হইলেও সমাজের নৈতিক বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য স্ত্রীকে ধর্ম্মপ্রভাবে স্বামীর অধীন ও অনুবর্ত্তিনী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল স্বামী যদি কোন কারণেও ক্ষমা চাহিত তবে স্ত্রীর তাহাতে পাপ স্পর্শ করিত। রামকে বনে পাঠাইয়া দশরথ কৌশল্যার নিকট বাস্তবিকই অপরাধী হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দশরথ নিজে সেই ত্রুটী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন

১৪। বাল কাণ্ড ১১ সর্গ। ১৫। লঙ্কাকাণ্ড ১২৯ সর্গ।
১৬। অযোধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ।
১৭। অযোধ্যাকাণ্ড ৯০ সর্গ। ১৮। অযোধ্যাকাণ্ড ৮৪ সর্গ।
১৯। অযোধ্যাকাণ্ড ৮৯ সর্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

তখন কৌশল্যা স্বামীর অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ধারণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—মহারাজ আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে আমার নিশ্চয় সর্ব্বনাশ হইবে। কারণ ইহলোক ও পরলোকে শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে এরূপে প্রসন্ন করিতে চান সে কুলস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।[২০]

কুসংস্কার সকল সমাজেই অল্প বিস্তর আছে। সুপ্রাচীন যুগেও ছিল। রামায়ণে বহু আচরণের সহিত নানারূপ সংস্কার জড়িত দেখা যায়। সংস্কার যে স্থলে অর্থযুক্ত সে স্থলে সংস্কারকে লোকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করে না। তাহা যখন অর্থহীন হয়, তখন তাহা সমাজের কুসংস্কার বা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়।

এখন স্ত্রীলোকেরা বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়া থাকে। অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও বক্ষের চাপা দুঃখ ব্যক্ত করাই যে এই স্থানদ্বয়ে করাঘাতের উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু রামায়ণের যুগে উদরে করাঘাত করিয়া রোদনের রীতি ছিল। সূর্পণখা উদরে করাঘাত বিলাপ করিয়াছিল।[২১] সূর্পণখার এই রীতিকে উদর সর্ব্বস্ব রাক্ষসী রীতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু সীতাকেও যখন এই রীতি অবলম্বনে বিলাপ করিতে দেখা যায় তখন তৎকালীন সমাজের অর্থহীন মুদ্রাদোষ ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে।[২২] সীতা এক স্থলে বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়াও রোদন করিয়াছেন। ইহাকে অধৈর্য্য প্রকাশ চিহ্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শপথ করিবারও এইরূপ নানা কুসংস্কারজনক বিধান ছিল। বালী সুগ্রীবকে পাদ স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন।[২৩] হনুমান মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, দর্দ্দুর পর্ব্বতের নাম ও ফল মূলের উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল।[২৪] বোধ হয় এগুলি তাহার প্রিয় বাসস্থান ও প্রিয় খাদ্য বলিয়াই—শপথ করিয়াছিল। কৈকেয়ীও ভরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন।[২৫] প্রিয় বস্তু ও প্রিয় জনের নামে শপথ করিবার কুসংস্কার এখন পর্য্যন্তও ভারতীয় সমাজে প্রচলিত আছে। অগ্নি সাক্ষি করিয়াও শপথ তখন প্রচলিত ছিল—সুগ্রীব রামের সহিত এইরূপে অগ্নি সাক্ষি করিয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন।[২৬]

অপবিত্র অবস্থায় শয়ন শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত। দৈত্যমাতা দিতি এইরূপে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শয়নের জন্য দিকও নির্দিষ্ট ছিল—দিতি শয়ন করিতে দিক ভ্রমও করিয়াছিলেন।[২৭] বর্ত্তমান সময় হিন্দুর পক্ষে উত্তর ও পশ্চিম শিয়র নিষিদ্ধ। রামায়ণে নিষিদ্ধ দিক নির্দ্দেশ নাই।

আমরা বিপদে আশ্রয়স্থলে তুচ্ছ তৃণ খণ্ডের উল্লেখ করি। কিন্তু তৃণ খণ্ডও যে নীতি ধর্ম্মের প্রভাবে এক সময় আশ্রয়ের পদার্থরূপে গণ্য ছিল রামায়ণে তাহার উল্লেখ আছে। রাবণ যখন নিঃসহায়া সীতার সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তখন জানকী রাবণ ও তাঁহার নিজের দূরত্বের মধ্যে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

সা তথোক্তাতু বৈদেহি নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত॥১।৩।৫৬

নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ আশ্রয়ের ন্যায় অনেক বিপদেই তৃণ আশ্রয় ছিল বলিয়া দেখা যায়। এই সংস্কারটীকে সেকালের একটী নৈতিক বিধি বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কামুকের বা প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট নীতির মূল্য কি?

যাত্রাকালে দক্ষিণ পদ অগ্রে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে যে বাম পদ অগ্রে স্পর্শ করাইতে হয় তাহার রীতি এখন নাই। হনুমান প্রথম বামপদ অর্পণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সংস্কারের যুক্তি পণ্ডিতেরা বলেন শত্রুপুরীতে বাম পদ অর্পণই শত্রু জয়ের নিদান।

২০। অযোধ্যাকাণ্ড।
২১। করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ। অরণ্যকাণ্ড+২১ সর্গ।
২২। ইতি লক্ষ্মণ মাক্রন্দ্য সীতা শোক সমন্বিতা। পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘানহ॥ আরণ্য ৪৫ সর্গ।
২৩। কিষ্কিন্ধ্যাকা ৩৯ সর্গ।
২৪। সুন্দরাকাণ্ড ৩৬ সর্গ।
২৫। অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ। ২৬। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫ সর্গ।
২৭। বালকাণ্ড ৪৬ সর্গ।

চক্রেহত পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং সন্তুমূর্দ্ধনি।

প্রবিষ্টঃ সত্বসম্পন্নোনিশায়াং মারুতাত্মজঃ॥ ৩। ৫। ৪

লৌকিক আমোদ প্রমোদ বা নীতি বিরুদ্ধ কোন খেলা ধূলার কথা রামায়ণে এক রকম নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পুরাণ কীর্ত্তন [২৮] ও গীত-নাটক [২৯] ইত্যাদির আমোদ প্রমোদের আভাস রামায়ণে পাওয়া যায়। অক্ষ ক্রীড়ার কোন চিত্র রামায়ণে থাকিলেও দৃষ্টান্তের স্থলে অক্ষ ক্রীড়া দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব হ য়ার কথা আছে। এক স্থানে রূপক ছলে আছে—হনুমান রাবণের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বর্ণস্তম্ভোপ দীপ-শিখা মত্ত ধূর্ত্তের কপট পাশাক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে।

অন্যত্র—হনুমানের গমন বেগে বৃক্ষ সকল অক্ষ ক্রীড়া নির্জ্জিব বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গেল। বাস্তবিক পক্ষেই দ্যূতক্রীড়া সমাজের একটী আদিম ব্যাধি। ঋক্‌বেদে দ্যূত ক্রীড়ার উল্লেখ না থাকিলেও "গর্ত্তা" শব্দ ঋক্ বেদে আছে। [৩০] নিরুক্তে গর্ত্তা অর্থে দ্যূত ক্রীড়ার স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিক্ষিপ্ত বস্ত্রাভরণা ধূর্ত্তা ইব পরাজিতা। ১৫। ৫। ১৪

এই সকল উক্তি বিষয়ের অস্তিত্ব প্রকাশক। তবে তাহা যে সমাজ-ঘৃণ্য ছিল, খেলোয়ার শব্দের 'ধূর্ত্ত' প্রতি শব্দই তাহার প্রমাণ।

বড়িশ দ্বারা মৎস শিকার একটী সুপ্রাচীন রীতি। রামায়ণে এই প্রথার চিত্র না থাকিলেও রূপক ছলে এক স্থানে তাহার উল্লেখ আছে।

উপসংহারে একটী বিসদৃশ কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা গেল।

অযোধ্যার অন্তঃপুর পরিচারিকাদিগের উল্লেখের স্থলে কুব্জা, বামন ইত্যাদি কুৎসিতাঙ্গী নারীদিগের অবস্থানের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। [৩১] এ গুলির নৈতিক আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকেরা স্নান ও গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিবার চিত্র এবং প্রস্তাব যে আছে, [৩২] তাহা অস্বীকার করা যায় কি? গ্রন্থান্তরে তাহার বিচার আলোচনা করা যাইবে।

আমরা পুণ্যভূমি অযোধ্যায় যাইয়া সীতা, কৌশল্যা প্রভৃতি আর্য্য মহিলাদিগের রন্ধনশালা ও রন্ধনের কাল্পনিক আসবাবপত্র দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু রামায়ণে প্রায় কোন স্থলেই রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাগণ যে রন্ধন করিতেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না। কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

যস্তচাহার সময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ।

অহমপূর্ব্বাঃ পচন্তি স্ম প্রশস্তং পানভোজনং॥ ৯৬।২।১২

অর্থ কুণ্ডলধারী সূদগণ (পাচক) যাহার আহারের নিমিত্ত আমি রাঁধিব আমি রাঁধিব বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রশস্ত ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য সকল রন্ধন করিত (এখন কেমন করিয়া সেই রাম ··· বন্য ভোজ্য ভোজন করিবে।)

কিন্তু মহিলাগণ যে একেবারেই রন্ধন কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না তাহা নহে। সীতা বনে যে নিজ হস্তে রন্ধন করিতেন রামায়ণের একস্থলে তাহার আভাস আছে।

দণ্ডকারণ্যে ব্রাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি মনে করিয়া সীতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—এই রন্ধন করা অন্ন আপনার জন্য রক্ষিত আছে আপনি ভোজন করুন। (আরণ্য ১৩—১৬ শ্লোক।)

সাধারণ পরিবারে যে স্ত্রীলোকেরাই রন্ধনাগারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত রাজপরিবারের দৃষ্টান্ত ধরিয়া তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

৺কেদারনাথ মজুমদার।

প্রবাদের আবাদ।

জঙ্গলে যখন ঢুকেছি তখন কবে যে বাহির হইব তাহার ঠিক নাই। আজ এই পর্য্যন্ত আবাদ করিয়া বিদায় হইলাম। ইতি—

৬৬। আঁক খেত থাকতে সেলামালি নাই।

৬৭। আদেখ্‌লীর দেখন
পুঁটি মাছের লেখন।

২৮। অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গ। এখানে বৈদিক পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৯। নাটকের উল্লেখ রামায়ণে বহু স্থানে আছে; রামায়ণের সভ্যতা গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনা হইবে। ৩০। ঋগ্বেদ ১।১২৩।৭। ৩১। অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

৩২। অযোধ্যাকাণ্ড ৯১ সর্গ ও লঙ্কাকাণ্ড ১২২ সর্গ।

৬৮। বামনের পাতে লবণ নাই ধোপার পাতে চিনি।

৬৯। কামাইরা আগুন, চামাইরা টান।

৭০। আপড়া বামুন, শূদ্রের দেড়া :

৭১। ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন।

৭২। গরু, জরু, ঘোড়া, এক একটা ঘাড় মোচড়া।

৭৩। জল, গোলাপ জুয়াচুরী, তিন লইয়া ডাক্তারী।

৭৪। নিম নিসুন্দা যে থান
বেরাম নাই সে থান।

৭৫। ভাত দেইখ্যা দিবে ঘি, জামাই দেইখ্যা দিবে ঝি।

৭৬। মাছের মধ্যে রুই,
শাকের মধ্যে পুঁই।

৭৭। দুঃখে যদি হাঁড়িনী শাপে,
ছাড়াইতে পারে না বামুনের বাপে।

৭৮। শত মারি ভবেৎ বৈদ্য
সহস্র মারি চিকিৎসক।

৭৯। যে দেশের যে ভাও,
উবুৎ হইয়া নাও বাও।

৮০। বেহায়া কয় রাজ্জাই আমার।

৮১। চুত্‌ড়াগরের আম গোপীনাথের।

৮২। চোরের নাজির (উস্তাদ)

৮৩। আমতলারই আম মাজা (দর)

৮৪। কীলের চোটে ভূত পলায়।

৮৫। পাং মরলেও রেথ্‌ যায় না।

৮৬। ভাং খায় ভবানন্দ কড়ি গণে নিধি।

৮৭। কপাল্যার কপাল,
বার কাণি ক্ষেত, তের কাণি পাথাল।

৮৮। লঙ্কায় যে যায় সেই রাক্ষস হয়।

৮৯। ভাত খাইতে দাঁত পড়ে।

৯০। নাপিত দেখলে কুশি বাড়ে।

৯১। শুনছিলাম না গাইনের গীত।

৯২। বেটা যেমুন রোমের পাখা।

৯৩। যা বুঝছ তা না—খেসারী কালাইর ডাইল।

৯৪। সৎকাজে শতেক বাধা।

৯৫। ছোট ছোট বান্দরের বড় বড় পেট,
লঙ্কায় যাইতে মাথা করে হেট।

৯৬। যার লাঠী, তার মাটী।

৯৭। ফকির থাইক্যা দরগা উচা।

৯৮। মোটে গোদার মাউগ নাই পুতের কিরা কাড়ে।

৯৯। এই বর্ষের এই কথা, ঘটে দাও ফুল বেলপাতা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যৌবনের গান

(১)

আজ ফাগুনে হাল্‌কা হাওয়ায়
গেল মনের খিল খুলে'!
মৌমাছিরা লুঠ্‌ছে মধু,
গাচ্ছে কোকিল সব ভুলে'!
সে সুর বাজে বুকের তারে,
কি সুখ জাগে বোল্‌বো কারে!
ইচ্ছা করে নোতুন কোরে
সাজাই প্রিয়ায় বন্‌-ফুলে!

(২)

আমরা সবুজ, নিত্যই নোতুন
চির-চপল সংসারে;
সদাই আকুল, দেই না আমোল
মহাকালের শঙ্কারে।
ফুলের মতো নীরব হাসি
হাস্‌তে শুধুই ভালোবাসি,
পুলক দিয়ে দূর করি সব
মনের জরা অন্ধকারে।

(৩)

কুণ্ঠা রেখে এসো প্রিয়া,
আর রোয়ো না কুণ্ঠিত!
এই জীবনের অভিযানে
হই না যেন লাঞ্ছিত!
ভবিষ্যতে যা হয় হবে,
চিন্তাতে তার মুসড়ে রবে?
বর্ত্তমানের সুযোগ থেকে
মিছাই রবে বঞ্চিত?

(৪)

জীবন যৌবন সাচ্চা বটে,
স্মরণ রেখো, সুন্দরী!
এই দুনিয়ায় আর যা কিছু
দুদিন বাদেই যায় ঝরি'!
আর থেকো না কামড়ে মাটি,
বিকাশ পাওয়া ধর্ম্ম খাঁটি,
আমরা চির-চলার পথে
চল্‌বো কেবল গুঞ্জরি'!

(৫)

পঙ্গু পুরুষ নারীই শুধু
চলার কথায় জিব্‌ কাটে!
তাই তো তারা আজ পড়েছে
নানান্‌ রকম ঝঞ্ঝাটে।
একটা কিছুর কৌতূহলে
দিন যামিনী জগৎ চলে,
মানুষ কেন চল্‌বে না, সই,
সেই দুঃখে আজ বুক ফাটে!

(৬)

অচল জাতির অচল মনে
জাগে নানান্‌ ভয় ভীতি;
শাস্ত্র সমাজ বাঁধ্‌তে তারে
ভোলে প্রাণের সম্প্রীতি।
শাসন করে সবাই তারে,
শাস্ত্র শোনায় 'তাইরে নারে',
এবার প্রিয়া, ভুল্‌তে হবে
মন্‌-গড়া সব বদ্‌রীতি।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

"পল্লী-নিবাসী ও সহর-প্রবাসী।"

আজকাল আমাদের পল্লীর আবাস অতিশয় নিন্দনীয়, অতি ঘৃণার্হ, মান সম্মান উহার ধারেও ঘেঁস্‌তে ঘৃণা করে। লক্ষ্মী দেবী স্বভাবে পুষ্ট হয়ে যেন অন্যথের ন্যায় নিন্দনীয় লজ্জা যন্ত্রণা বশে একেবারে তাকে ত্যাগ করতে ইচ্ছে করেন না। তাই আজও প্রবাসীর চক্ষে হেয় হলেও তারা নিশ্চিন্তে পেটে চাট্টা ভাত দিতে পারে আর কষ্টে সৃষ্টে মহাত্মা গান্ধীর আদেশটী মাথায় নিয়ে দুই একখানা পরিধেয় বস্ত্রও তৈয়ার করে নেয়। কিন্তু এটা প্রবাসীদের শিক্ষা কিনা, তাই ইহার অস্তিত্ব বড় কম। প্রবাসীর হুজুগে পল্লীবাসীও মেতে উঠে কাজ করে, আবার প্রবাসী যখন চুপ করে, তখন পল্লীবাসীও বলে "গুরুদেব: যখন সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ করেছেন তখন আমরা, আর কেন বৃথা খেটে মরব!" এই অজ্ঞানতাই মানুষের অধঃপতনের প্রধান কারণ নইলে ভগবতী সরস্বতীর অনুকম্পা কম থাকিলেও জগদীশ্বরী লক্ষ্মী মায়ের সেধে দেওয়া ধন পল্লীবাসীর প্রচুর পরিমাণেই ঘটে। তথায় কল্পিত মান সম্মান বড় একটা নাই। আর যা আছে তাতেও ধনের বা আভিজাত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আমরা মূর্খ লোক তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীও নয় ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য্যবাদীও নয় তারা ধনের বড় ধার ধারে না বাহুল্য ব্যয়ও বড় একটা করে না যা'তে লোকে বড় লোক বলে, এ ধারণাটা তাদের আদৌ নাই, আছে শুধু বাঁধা বাঁধা পিতৃ পিতামহের আমলের বারে মেসে তের পার্ব্বণ, আর সেই উপলক্ষে নিজ ক্ষেত্রোত্থিত কিছু শস্য ব্যয় করে গ্রামের দু'দশ জনকে ডেকে এনে খেতে দেওয়া প্রবাসীর মতে অপমান করা বা কষ্ট দেওয়া; মোটা ভাত, শাক, মাছ দিয়ে তৃপ্তির আশা করা ঘৃণার কথা, লজ্জার কথা! বামনের চাঁদ ধরা বই আর কিছুই নয়। কেননা সেখানে কোর্ম্মা, কাটলেট্‌ প্রভৃতি সুস্বাদু জিনিষ ব্যয় বাহুল্য বশতঃ বড় একটা দেখা যায় না। পল্লীবাসী পুকুরের মাছ ধরে, ক্ষেত্রের ডাল, চাইল দিয়ে কোন রকমে বিনা ব্যয়ে অথবা যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে পরম সুখানুভব করতে প্রয়াস পায় পল্লীর মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ নিয়ে, এত মাথা ঘামায় যে মোটেই অবকাশ পায় না। তাঁরা নিজেই হাজার হাজার লোকের রান্না করবে জল তুলবে মশলা করবে এঁটো ফেলবে একটীতেও পরের সাহায্য চাইবে না; এটাই তাঁরা মস্ত একটা আমোদ ও আত্ম প্রসাদভাবে এবং এই আমোদেই জীবনটাকে সার্থক করে নেয়; আর মোরা সব পরের হাতে তুলে দিয়েছি!

জননী জাতির যাহা চির আকাঙ্ক্ষিত চির অভিপ্সিত সেই স্নেহ ও সেবা জিনিষটীও যদি পরের হাতে তুলে দিই তবে আমাদের রইল কি? এই হলো পল্লীর মেয়ের প্রাণের কথা।

আজকাল সহর প্রবাসী বাবুদের মুখে শুনা যায় স্বরাজ স্বাধীনতা! ওটা কি? ও কথাটার অর্থও সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না, তাই আমরা স্বরাজ স্বাধীনতার বড় একটা ধার ধারিনে; আমরা বলি স্বরাজ স্বাধীনতা ঘরের জিনিষ ওটা ভগবদ প্রদত্ত প্রত্যেক জীবের ভিতরকার অমূল্য রতন; ইহা কেউ কাউকে দিতে পারে না। বিবেক যেমন ভিতরের জিনিষ স্বরাজ স্বাধীনতাও সেই শ্রেণীর একটা জিনিষ। পল্লীবাসীর স্বরাজ সাধনা যতদূর আয়ত্ত প্রবাসী বিলাসীদিগের শতাংশের একাংশও নয়; মোটরকার, সাইকেল, চা, চুরট প্রভৃতি বিদেশীয় বিলাস দ্রব্যের অধীন প্রবাসীগণই। ইহার জন্ম এই দরিদ্র প্রপীড়িত দেশ হইতে শত কোটী টাকা অম্লানবদনে প্রতি বর্ষে বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত হইতেছে আমাদের পল্লীবাসীর দুঃখ কে বুঝিতেছে? আমরা প্রজার জাতি প্রজাই থাকিব, দেশী রাজার প্রজাই হই আর বিদেশী রাজার প্রজাই হই প্রজাই থাকিব। তবে কথা—ভিতরের জিনিষ প্রয়োগ করা—যেরূপ ভক্তের অধীন ভগবান প্রজার অধীন রাজা তবে খাঁটী প্রজা হওয়া চাই খাঁটী ভক্ত চাই, আমরা প্রজা হতে মোটেই শিক্ষা করি নাই। দোষ দিই রাজার। সত্যি হতে পারে রাজা ভিন্ন জাতি, বিদেশীয় নিজ নিজ জাতির টান থাকিতে পারে এবং থাকাও স্বাভাবিক। ইহা দেখে ঈর্ষা করলেই কি স্বরাজ হাতে উঠে বসবে? না নিজের পায় ভর করে দাঁড়াতে শিখলে স্বরাজ আপনি পরাজিত হয়ে করতল-গত হয়ে পড়বে? বড়ই দুঃখ আমাদের বিলাসী ধন-কুবেরগণ দেশবাসীর সুখ দুঃখের কথা মুখেই বলেন অথবা আমরা বুঝি না তাই নাকি ভ্রান্ত বিশ্বাসানুবর্ত্তী হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। যাই হউক কাজ কর্ম্মে তাঁহারা আমাদের প্রকৃত সাহায্য মোটেই করেন না। আমাদের সুখবর কাহ্নগুলিকে ঘৃণা করে পশ্চাৎপদ করে দেন। আমরা দশ টাকা মণ চাউল খাইতে পাই না, সেদিন স্বাধীন ত্রিপুরায় ৫৲ টাকা মণ চাউল দেখে বড়ই ব্যথা লাগিল কান্না আসিল, হায়! আজ যদি জমিদারবর্গ তাঁহাদের স্ব স্ব জমিদারীর অন্তর্গত কাঞ্চনখণ্ড ঝিক চাড়ার বিনিময়ে বহিষ্কৃত হইতে না দিতেন, তবে কি আর নিজ গৃহলক্ষ্মী পরকে দিয়ে হাহাকার করতে হ'ত? মূর্খ কৃষক-কুল পরের হাতে অর্থলোভে গৃহলক্ষ্মী ত্যাগ করে; দোষ দেন জমিদারবর্গকে? তাঁদের দোষ এই, তাঁরা যদি ঐ দ্রব্যে দুষ্ট ব্যবসায়ীদিগের হাত স্পর্শ করতে না দিতেন তবে কি আর দেশে এরূপ দুর্ভিক্ষ থাকিত? এই যে এবার লোকে নিঃসন্দেহে ধারণা করিয়াছিল যে, দুই তিন মণ চাউল এক মণ পাটের টাকায় পাইবে এই আশায় সমস্ত ক্ষেত্রে পাট বপন করিয়াছে, ধার করিয়া ক্ষেত্রের খরচ চালাইয়াছে, চাউল ক্রয় করিয়া খাইয়াছে; আশা এক মণ ত্রিশ টাকা, ধার দিতে কয় মণ পাট লাগিবে? দেশীয় ধনকুবেরগণ যদি দেশের প্রতি সত্যি দয়াবান হইতেন তবে তাঁরা নিশ্চয়ই দেশবাসীর এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ ক্রন্দনে স্থির থাকিতে পারিতেন না। হায়! শরীরের রক্ত জল করে মূর্খ কৃষককুল আপন পেটে ভাত না দিয়ে রাত্র নাই, দিন নাই, রোদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই অবিশ্রান্ত ক্ষেত্রে খাটিয়াছে, আর আজ সেই কৃষককুল মাথায় হাত দিয়ে কাঁদিতেছে! আর বলিতেছে হায়! দুর্ভাগ্য! ধার করিয়া ক্ষেত্রের খরচ চালাইয়াছি লাভ ত দূরের কথা ধারের টাকা যে দিতে পারিলাম না! ধারের দায় বাড়ী ঘর সব গেল, কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কি খাইব, এই ভাবিয়া কত লোক পাগল! নিরাশ্রয় স্ত্রী পুত্রের হৃদয়ভেদী কান্না মাত্র সার হইল তবু আমাদের প্রবাসী বিলাসী ধনকুবেরদের মন টলিল না তাঁরা শুধু দোষ দিবেন রাজার পরাধীনতার! আর তাঁরা যদি একটু সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও দেশীয় পণ্যগুলি ক্রয় করে রাখেন দুষ্ট ব্যবসায়ীর হাত স্পর্শ করতে না দেন, তবে যে দুদিন পর বিশ্বশক্তির আশীর্ব্বাদে তাঁরা কত বড় হয়ে যেতে পারেন সেটা মোটেই ভাবেন না! ভাবেন শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থ, তাই বলি এঁদের হাতে স্বরাজ নাম ধেয়ে কোন একটা জিনিষ আসিলেও আমাদের কোন একটা আসে যায় না, কেন না তাঁরা সক্ষম হয়েও আমাদের কোন দুঃখ দূর করবার নয়। তাই আমাদের ধারণা নিজ স্বরাজ নিজে রক্ষা না করিলে পরের স্বরাজে কিছু আসে যায় না।

প্রবাসীর মুখে আবার একটা রব শুনা যায় স্ত্রী-স্বাধীনতা, আমরা আবাসী মনে করি, সেও একটা ফাঁকি— আমাদের ক্ষুদ্র রাজত্বের রাজগিরি হতে ছিনাইয়া নিয়া বাহিরের বিশ্ব রাজত্ব নামধের কোন একটা পরাণুচীকিষুতা শক্ষা দেওয়া। আমরা যে ক্ষুদ্র রাজত্বই প্রতিপালন করতে ভুলতে বসেছি আমরা আবার কি করে বৃহৎ রাজত্বের দাবী করব? আগে ভগবদ্ প্রদত্ত ক্ষুদ্র রাজত্ব প্রতিপালনে পরাঙ্মুখী না হয়ে যথাযথ প্রতিপালন করতে শিক্ষা করি তা হলে বিশ্ব রাজত্বও আপনি দ্বার খুলে বসে থাকবে। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সকলেই ক্ষুদ্র রাজ্যেরই রাণী ছিলেন; কিন্তু যেম্নি বহিরাজ্যে দরকার পরত অম্নি মুক্তদ্বারে দৌড়ে গিয়ে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হতেন, কেন না তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যেই বহিরাজ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। তাঁরা রাজনন্দিনী হয়ে রাজ কুলবধূ হয়েও একাধারে দেব সেবা, অতিথি সেবা, শশ্রূ সেবা, পতি সেবা, পুত্র কন্যা প্রতিপালন, দাস দাসী প্রতিপালন প্রভৃতি দ্বারা উচ্চান্তঃকরণের উচ্চাভিলাষ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আবার যখন বহির্জগতে দরকার দেখিয়াছেন তখন বহির্জগতে কাজ করিয়াছেন কিন্তু আমাদের ন্যায় রন্ধন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পতি সেবা পুত্র কন্যা প্রতিপালন ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বাতাসে ঘুড়িয়া বেড়াইলেই সার্থক জীবন মনে করেন নাই। আমরা পল্লীবাসীগণ তাঁহাদেরই অনুসরণ পছন্দ করি। আমরা অঋণী অবিলাসী অপ্রবাসী হইয়া দিনান্তে শাকান্ন ভোজনকেই পরম সুখের মূল মনে করি; ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির তাহাই বলিয়াছেন।

প্রবাসী তোমরা বিলাসিতাহীন গ্রাম্য সুখের কথা শুনিয়া হয় ত হাসিবে। তোমরা হাসিও না তোমরা পল্লীবাসীর সুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তোমরা পল্লীর টাকা নিয়ে সহরে বাস কর পল্লীর অর্থ বিত্ত, সুখ শান্তি, সাহিত্য শিল্প সবই তোমরা সহরের দিকে টানিয়া আনিয়াছ, পল্লীবাসীর ভাগ্যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, মহামারী, অকাল মৃত্যু, বিরোধ, বিদ্বেষ রাখিয়া দিয়াছ তোমরা রাগ করিও না তোমাদের মত মনীষী ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পল্লীনিবাসে আবাস বাঁধিলে তাহা স্বর্গপুরীর সঙ্গে তুলনা হইত। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির এই নাম সার্থক হইত। আজ সাহিত্য সম্মিলন দেশের পল্লী রক্ষা করুন দেশের অভাব অভিযোগ দূর করিতে সচেষ্ট হউন।*

শ্রীমালতীমালা ভদ্র দ্বীপিকা।

মৈমনসিংহ গীতিকা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করিয়া ময়মনসিংহবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে যে সকল ঐতিহাসিক মন্তব্য বা শব্দের অর্থ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। ময়মনসিংহবাসীর সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষা সর্ব্বত্র তাঁহার সহজবোধ্য হইবে না তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। আমরা ইতিপূর্ব্বে মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ও শব্দগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে তাঁহার নিকট এক চিঠি দিয়াছিলাম। কোনরূপ বাহাদুরী নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, ভবিষ্যতে যখন মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হইবে তখন সেন মহাশয় আমাদের কথাগুলি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার কর্ণধার আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করাটাও তাঁহার পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়াছেন। তাই বাধ্য হইয়া সাময়িক পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। †

---

* কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

† আমরা জানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল, মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে গীতিকার বহু সংখ্যক শব্দার্থে এবং ঐতিহাসিক ভুল প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেন মহাশয় তাঁহার চিঠিরও কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত বোধ করেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা ময়মনসিংহ জেলাকে "মৈমনসিংহ" বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক "মমিন সাহ" হইতে মমিন সাহী এবং অতঃপর ময়মনসিংহ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এ জেলার কোন লোকই মৈমনসিংহ বলেন না। সুতরাং পুস্তকের নাম "ময়মনসিংহ গীতিকা" লেখাই সঙ্গত ছিল। এই প্রবন্ধে যে সকল ভুল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও অনেক ভুল রহিয়াছে।

সৌরভ সম্পাদক।

সেন মহাশয় মৈমনসিংহ ব্যালাডের ভূমিকায় ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "The nick name given to this part of the country by the Brahmins of the Renaissance is "baju" which is derived from the word barjita (prohibited) আবার উক্ত ভূমিকার ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন Bajudesh or the forbidden tracts. ইতিহাস কিন্তু তাহা বলে না। আমরা আইন আকবরীতে দেখিতে পাই যে ময়মনসিংহ জিলাকেই সরকার বাজুহা বলা হইত। (টোডরমল্লের ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের রেন্টরোল ও গোল্ড উইনের আইন আকবরীর ৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ব্লক ম্যান ও তৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The name Bajuha is the plural of Persian word Baju, an arm a wing ; as all the Mahals on this Sarkar have the word Baju after their names." পার্শী বাজু শব্দের মানে বাহু। এ দেশে এখনও মেয়েরা বাহুতে যে অলঙ্কার পরিয়া থাকেন তাহার নাম বাজু প্রচলিত আছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার ময়মনসিংহের ইতিহাসে ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও এই ১৯ সরকারের অধীন ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগ অনুসারে সরকার বাজুহায় নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ তাহাই হুসেন সাহের সময় নছরতসাহি প্রদেশ নামে কথিত হইত এবং বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনকালে জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত হইতেছে। টোডরমল্ল ৩২টী মহাল লইয়া সরকার বাজুহায় গঠিত করেন।" যেমন বেসরিয়া বাজু, পুখুরিয়া বাজু, সোণাযুটী বাজু ইত্যাদি।

গীতিকার ভূমিকার ৭ পৃষ্ঠায় সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "১৪৯১ অব্দে সেরপুরে গড়জরিপার রাজা দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ শাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার করেন।" এই ১৪৯১ অব্দ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। ফিরোজ সাহের রাজত্বকাল ১৪৮৬—১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ। আমরা ১৩৩০ সনের চৈত্র মাসের পত্রিকাতে নব আবিষ্কৃত মুদ্রাদি দ্বারা ভুল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গীতিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু "খেত খোলা"র অর্থ করিয়াছেন "ক্ষেত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।" এ দেশে গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত স্থানকে খোলা বা খলা বলে। যেমন ধোপারা বাড়ীর যে স্থানে কাপড় কাচে সে স্থানকে ধোপাখলা বলে। ৬০ পৃষ্ঠায় খলা ও খোলা একই শব্দ। সংস্কৃত খোল মানে নিম্নভূমি সংস্কৃত খল্লিকা মানে তাওয়া বা চাটু। সুতরাং খেতখলা মানে বিস্তৃত ক্ষেত্র।

শিস্তায় ভরা ৫৭ পৃঃ। আমাদের মনে হয় শিস্তায় স্থানে ক্ষীস্তায় হইবে। এখনও এ দেশে পিঠার মধ্যে যে ঘন ক্ষীর পুর দেওয়া হয় তাকে ক্ষীস্তা বলে। এই ক্ষীস্তা শব্দ কোন কোন জেলায় ক্ষীরসারূপে উচ্চারিত হয়; এই ক্ষীরসা আবার সংস্কৃত ক্ষীরসার অথবা ক্ষীর-শস্য (ক্ষীর ও নারিকেল-শস্য) শব্দের অপভ্রংশ।

চই ৫৮ পৃঃ। দীনেশবাবু বলেন—একরূপ ঝাল শাক্। কিন্তু এখানে চইএর অর্থ তা নয়। ইহা এক জাতীয় পিঠা। এ দেশে এখনও ইহার খুব প্রচলন আছে। ইহা পশ্চিম বঙ্গের চসী পিঠার অনুরূপ। ওড়িয়া ভাষায় চিতউ পিঠা। শ্রাবণ-অমাবস্যাকে ওড়িয়াতে বলে চিতা-অমাবস্যা ও মরাঠীতে বলে পিঠোরী—এই দিন আশু ধান্যের পিঠালি দ্বারা আল্পনা চিত্র করা হয় বলিয়া ঐ আশুকা (আশ্কে) পিঠার নাম হইয়াছে চিতা। চিতারই নামান্তর চিত ও চই গীতিকায় আছে। ফরিদপুরে চিতই পিঠা।

পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্র পুলি।
পোরা চই খাইল কত রসে ঢল ঢলি॥

এখানে কি চইএর অর্থ শাক বুঝায়?

৬৩ পৃঃ উত্তম সাইলের চাউলে পিটালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল আগে তিন আবা দিয়া॥

দীনেশবাবু 'আবা'র অর্থ করিয়াছেন—
ঠোঁটে ঠোঁটে হাত দিয়া আঘাত করিয়া আবা, আবা শব্দ করা। খুব সম্ভব এই আবা শব্দ সংস্কৃত আহ্বান শব্দের অপভ্রংশ। নূতন পিষ্টককে আহ্বান করিয়া স্থাপনের তিনটি ও চক্রাকার আসন চিহ্নকে আবা বলে।

বউগড়া ৬৭ পৃঃ। গীতিকার অর্থ বউটিকে। কিন্তু এ দেশে নূতন বধূকে গৃহে বরণ করিয়া নেওয়ার অনুষ্ঠানকে বউগড়া বলে। এবং এই অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২ দ্রষ্টব্য।

ঝাণ্ডাগারি ৭৩ পৃঃ। গীতিকার অর্থ বংশ দণ্ড পুতিয়া। ঝাণ্ডা অর্থ নিশান। তবে বংশ দণ্ডেই স্বভাবতঃ নিশান টাঙ্গান হইয়া থাকে।

ফুইদ ৭৬ পৃঃ। গীতিকার অর্থ (স্ফুট) প্রকাশ। জিজ্ঞাসা করাকে এ দেশে ফুইদ বা হুইদ বলে। বোধ হয় স্ফূর্ত্ত শব্দ হইতে ইহা আসিয়াছে। এখনও বহু স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বরাতে ৮১ পৃঃ। গীতিকার অর্থ—সম্মুখে। ইহা বারাতে হইবে। অর্থ নিকটে। এখনও এ শব্দ সব সময় কথিত হয়। যেমন তার বারাত যাও। অর্থ—তার নিকটে যাও। বর্ত্তী শব্দের অপভ্রংশ ?

সুস্থরে ১০৩ পৃঃ। গীতিকার অর্থ নিশ্চয়। (বোধ হয় ইহা নিশ্চয়)। কিন্তু ইহা সুস্থিরে হইবে এবং ইহার অর্থ হইবে নিশ্চিন্তে। এখন ও এই শব্দ বহুল প্রচলিত।

তুইন ১১৩ পৃঃ। গীতিকার অর্থ তুমি না। এ দেশে তুমি শব্দ আদরে তুই, তুইনরূপে ব্যবহৃত হয়। "কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই" এখানে আমাদের অর্থই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

থুরি ১১৬ পৃঃ। গীতিকার অর্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বিশেষ। এ দেশে কুড়ি (বিশ) অর্থে থুরি ব্যবহৃত হয়।

কাছলা ১২৩ পৃঃ। গীতিকার অর্থ গামছা। প্রকৃত অর্থ মাটীর বড় হাঁড়ী। "কাছলা ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর" দীনেশবাবু কিরূপে কাছলার অর্থ গামছা করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

ভেদা ১২৮ পৃঃ। গীতিকার অর্থ ঠেলা। এ দেশে পায়ের তলা দ্বারা লাথি দেওয়াকে ভেদা বলে।

উষ্টা ১২৮ পৃঃ। গীতিকার অর্থ চড়। এ দেশে পায়ের আঙ্গুল দিয়া লাথি দেওয়াকে উষ্টা বলে।

কারুয়া ১৪৯ পৃঃ। ইহার অর্থ কারুকার্য্য শোভিত চান্দোয়া হইবে না। প্রকৃত অর্থ লাল মোটা কাপড় যাহা দ্বারা তোষক, বালিস প্রভৃতির খোল প্রস্তুত হয়। এ দেশে এইরূপ কাপড়কে কারুয়া বা খারুয়া বলে। ক্ষার দিয়া কাপড় রং করা হয় বলিয়া নাম ক্ষারুয়া বা খারুয়া। "খ" উচ্চারণে কোমল হইয়া কারুয়া।

বিলাত ১৫৮ পৃঃ। গীতিকার অর্থ দেশী বিদেশী। আমাদের দেশে অধীনস্থ লোকদিগকে বিলাত বলে। কিন্তু এই শব্দের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। যেমন চন্দ্র নাপিতের বিলাত, হরকিশোর ধোপীর বিলাত। যে সব লোককে চন্দ্র নাপিত কামায় বা যে সব লোকের কাপড় হরকিশোর ধোপী ধোয় সেই সব লোকই উক্ত ধোপী বা নাপিতের বিলাত নামে কথিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে এই অর্থে যজমান শব্দ ব্যবহৃত হয়।

চুপা ১৬০ পৃঃ। এক জাতীয় অলঙ্কার। ঠিক্ একটি ফুলের মত। তার মধ্যে বহু ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। আজকাল নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা যায়।

ছিকর ১৮৪ পৃঃ। গীতিকার অর্থ শিকর। কিন্তু ছিকর অর্থ পোড়ামাটী। এ দেশে কুম্ভকারেরা মাটী পোড়াইয়া এক রকম জিনিষ তৈয়ার করে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা ইহা খুবই খাইয়া থাকেন। যে কোন হাটে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গে ইহার নাম পাতখোলা।

হালি ধান ১৮৬ পৃঃ। গীতিকার অর্থ শালি ধান্য, অথবা হালের দ্বারা যে ধান্য উৎপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু হালি ধানের অর্থ বীজ ধান। যে ধান ক্ষেত্রে বপন করিবার জন্য কৃষকেরা আলদা করিয়া রাখে। কোন কোন স্থানে ইহাকে আলি ধানও বলে।

উগাইয়া ২২৮ পৃঃ। গীতিকার অর্থ শোধ করিবার জন্য। কিন্তু এ দেশে ইহার অর্থ উমুল করিয়া।

ছিটাছড়া ৩১৫পৃঃ। গীতিকার অর্থ জলের ছিটা। ছিটা ছিটাজলের হইতে পারে। কিন্তু এ দেশে ছড়া বলিলে গোবর ছড়াই বুঝায়। খাবার স্থান করিবার পূর্ব্বে একটু গোবর ছড়া দেওয়াই এ দেশের প্রথা।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই দীনেশ বাবুর অখ্যাতি প্রকাশ করা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে যদি তিনি আমাদের মন্তব্যগুলি একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। এ গীতিকা প্রচার করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। যাহাতে এ পুস্তকটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

শ্রীসুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, M. A. M. R. A. S.
অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ (ময়মনসিংহ)।

———

পৃথিবীর জন্ম।

অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় দুই একটী নক্ষত্র যেন খসিয়া পড়িতেছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়ই এইরূপ নক্ষত্র খসিয়া পড়িতে দেখা যায়। বাস্তবিক এই গুলি নক্ষত্র নহে। এক একটী নক্ষত্র অতি প্রকাণ্ড। সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। এক একটী নক্ষত্রও সূর্য্যের ন্যায়ই বৃহৎ। সুতরাং এরূপ বৃহৎ নক্ষত্র যদি খসিয়া পৃথিবীর উপর পড়িত তবে পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

যে জন প্রাণী শূন্য হইয়া যাইত সে বিষয় কোন সন্দেহই নাই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আবরণ আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

আমাদের পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। উল্কাসমূহও নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কোটি কোটি উল্কার দল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর কক্ষ উল্কার কক্ষকে ছেদ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে অগণিত উল্কা দলের মধ্য দিয়া কতকটা স্থান অতিক্রম করিতে হয়। পৃথিবী যখন উল্কার পথ অতিক্রম করিয়া যায় তখন উল্কার দল ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তখন আর উহারা যাইতে পারে না। উল্কার পথ অতিশয় বিস্তৃত এবং

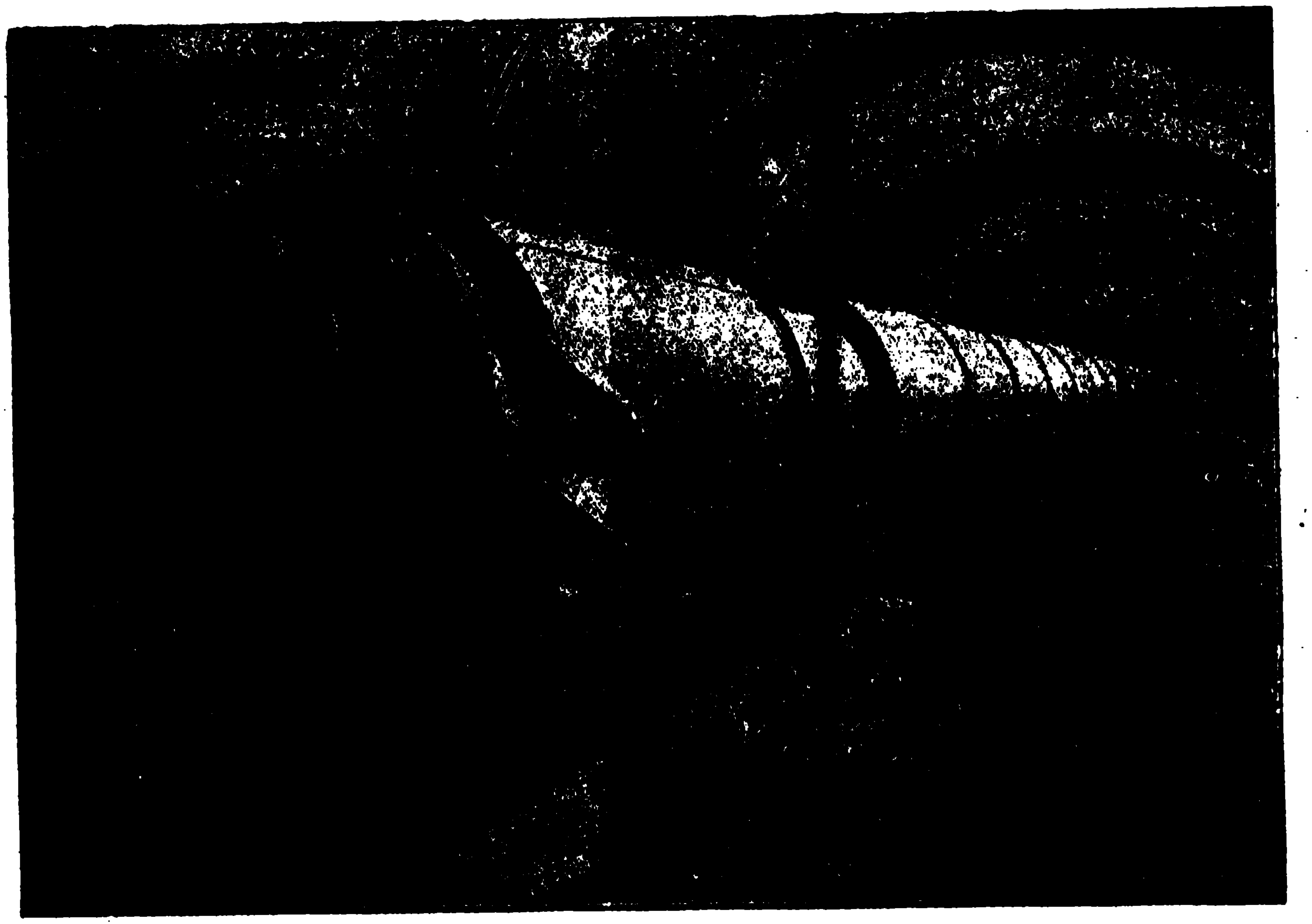

আমেরিকার সুবিখ্যাত লিক্ মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ। ইহাই এখন জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ।
ইহার বস্তুর কাচটী (Object glass) প্রস্তুত করিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রাত্রিকালে হাউই বাজীর মত আকাশ হইতে যে কতগুলি জ্যোতিষ খসিয়া পড়িতে দেখিতে পাই এই গুলিকে উল্কা বলে। উল্কাগুলি আলোকহীন কঠিন পদার্থ। প্রতিদিন ছোট বড় হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন সারা বৎসরে গড়ে পনর হাজার কোটি উল্কাপাত হয়। এতগুলি উল্কাপিণ্ড যদি [illegible] মত আসিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়িত তবে এতদিন পৃথিবী

অসংখ্য উল্কা, অসংখ্য দলে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাই সর্ব্বদাই পৃথিবীর বায়ুজালে উল্কা ধরা পড়িতেছে।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড উল্কা দল অতিক্রম করিয়া যায় এই জন্য সেই সময়ে অনেক উল্কা ধরা পড়ে। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের আবরণ। এই আবরণ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত আছে। উল্কাগুলি যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে [illegible]

হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মাইল গতিতে বায়ুমণ্ডলে ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে তখন বায়ুর সহিত প্রবল সংঘর্ষণ হয় তাহাতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উল্কা-পিণ্ডগুলি উত্তপ্ত হয়। উত্তাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে উল্কাপিণ্ডগুলি জ্বলন্ত বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। তখনই আমরা পৃথিবী হইতে উল্কাপাত প্রত্যক্ষ করি। ভূবায়ুর সহিত সংঘর্ষণ জনিত তাপে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন উল্কা-পিণ্ডগুলি বাষ্প হইয়া পড়ে এবং অবশেষে ধূলিকণার ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হয়। দৈবাৎ দুই একটা লোহার ন্যায় কঠিন বৃহৎ উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে বায়ুর দুর্ভেদ্য আবরণ আছে বলিয়াই উল্কার উতপাৎ হইতে জনপ্রাণী রক্ষা পাইতেছে।

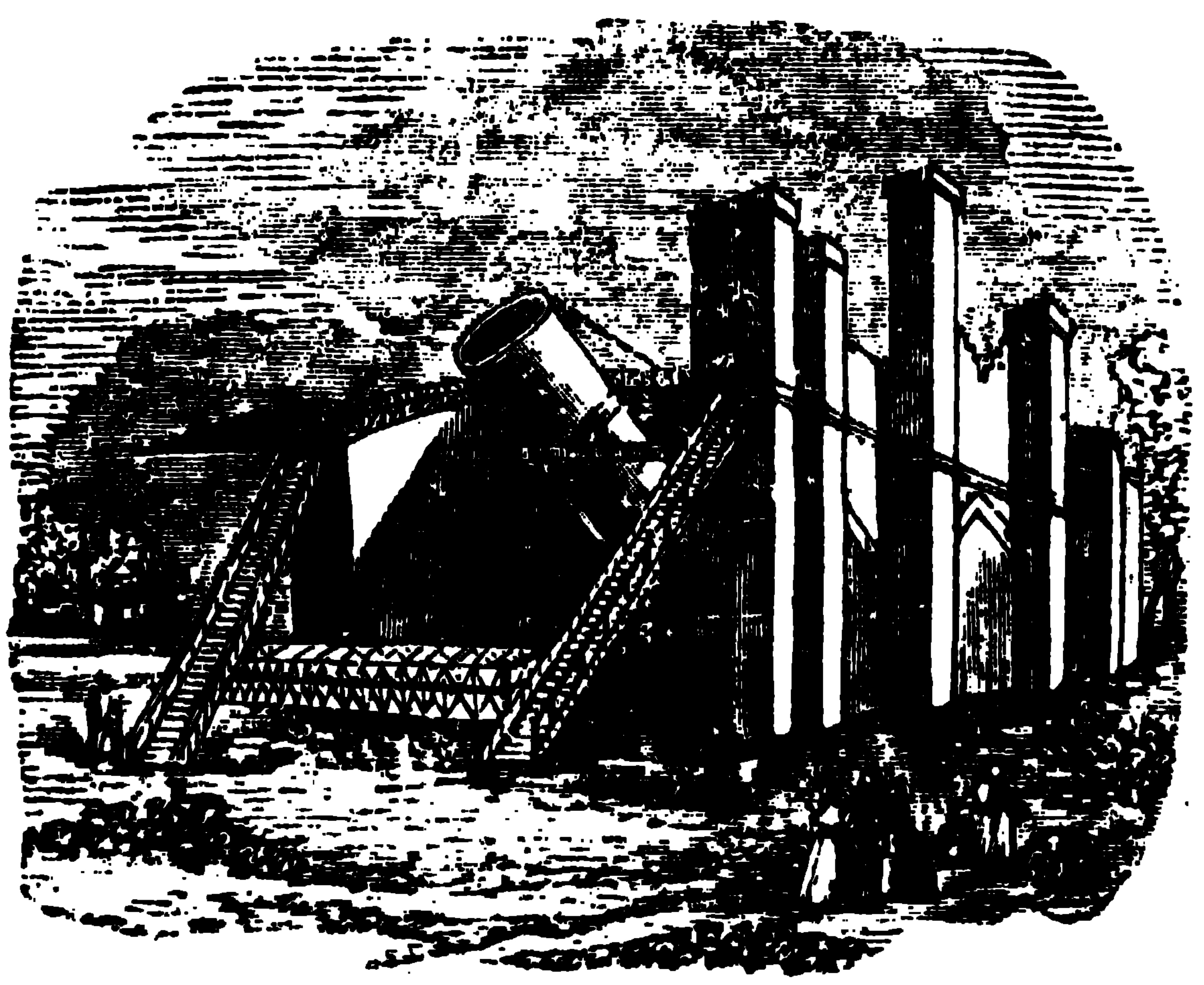

লর্ড রসের সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রথম নীহারিকা (Nebula) আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

উল্কাগুলি কি এবং উহারা কোথা হইতে আসিল ? এই সম্বন্ধে সে কালের জ্যোতির্বিদ্‌গণ নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি হইতে এই গুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন পৃথিবীর শৈশবকালে উহার পৃষ্ঠে অনেক বড় বড় আগ্নেয়গিরি ছিল ঐ আগ্নেয়গিরি হইতে বহু সংখ্যক প্রস্তররাশি এককালে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চন্দ্র অথবা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর সকল এখন উল্কারূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। বাস্তবিক ইহার কোন মতই যুক্তি সঙ্গত নহে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ নূতন আবিষ্কৃত কতগুলি তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া উল্কা সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন উল্কাগুলি মৃত নক্ষত্র-রাজির ধ্বংসাবশিষ্ট।

ফটোগ্রাফীর সাহায্যে আকাশের যে মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে একশত ষাট কোটি নক্ষত্রের চিত্র উঠিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন আকাশের এই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্যতীত আরও কতগুলি নক্ষত্র আছে উহারা আলোকহীন অনেক মৃত নক্ষত্র। উহাদের সংখ্যা উজ্জ্বল নক্ষত্রের সংখ্যা হইতে অধিক। এই সকল মৃত নক্ষত্রও এককালে উজ্জ্বল ছিল। কোটি কোটি বৎসর তাপ বিকিরণ করিয়া উহারা একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল মৃত নক্ষত্রও গতিশীল। উহাদের মৃত দগ্ধপিণ্ড সকল মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন হইয়া আকাশে ছুটাছুটি করিতেছে। রেলপথে এবং বড় বড় সহরে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও প্রায়ই গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। সুতরাং আকাশের কোটি কোটি গতিশীল নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হওয়াও খুবই স্বাভাবিক।

সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ গুণ বড়। এক একটী নক্ষত্র ক্ষীণ আলোক বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও উহারা সূর্য্যের ন্যায়ই বৃহৎ। এইরূপ বৃহৎ দুইটী নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হইলে যে কিরূপ ভীষণ ব্যাপার হইবে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। দুইটী নক্ষত্র আকাশের দুই বিপরীত দিকে হইতে পরস্পরের আকর্ষণে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বেগে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। হয় ত শত বৎসর ব্যাপিয়া উহারা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল হঠাৎ একদিন ভীষণ সংঘর্ষণ হইল।

দুইটী মৃত নক্ষত্রের যদি মুখামুখী সংঘর্ষণ হয় তবে সেই সংঘর্ষণে যে ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইবে তাহাতেই উভয় নক্ষত্রই একবারে নীহারিকা বা বাষ্পরাশিতে পরিণত হইয়া যাইবে। দুইটী স্থির পদার্থেরই ঠিক সোজাসুজি সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু নক্ষত্রের ন্যায়ই গতিশীল পদার্থের ঈদৃশ সংঘর্ষণ হইতে পারে না। দুইটী মৃত নক্ষত্র যখন পরস্পরের আকর্ষণের অধীন হইয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন উহাদের পাশাপাশিভাবে সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ঐরূপ সংঘর্ষণের ফলে দুইটী নক্ষত্রের পার্শ্বের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

হইবে। কালক্রমে মৃত নক্ষত্রের বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি জমাট বাঁধিয়া বহু সংখ্যক উল্কারাশির সৃষ্টি করিবে। সেই উল্কারাশি আবার পরস্পরের সংঘর্ষণে বাষ্পে পরিণত হইয়া নূতন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করিবে। আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন প্রলয়ের পর জগতের ধ্বংস হয়। ধ্বংসের পর আবার নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। আধুনিক জোতির্ব্বিদগণও এই সত্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। আমেরিকার সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত লাওয়েল (Lowell) লিখিয়াছেন "So far as thought may peer into the past the epic of our solar system began with a great catastrope. Two suns met. What had been

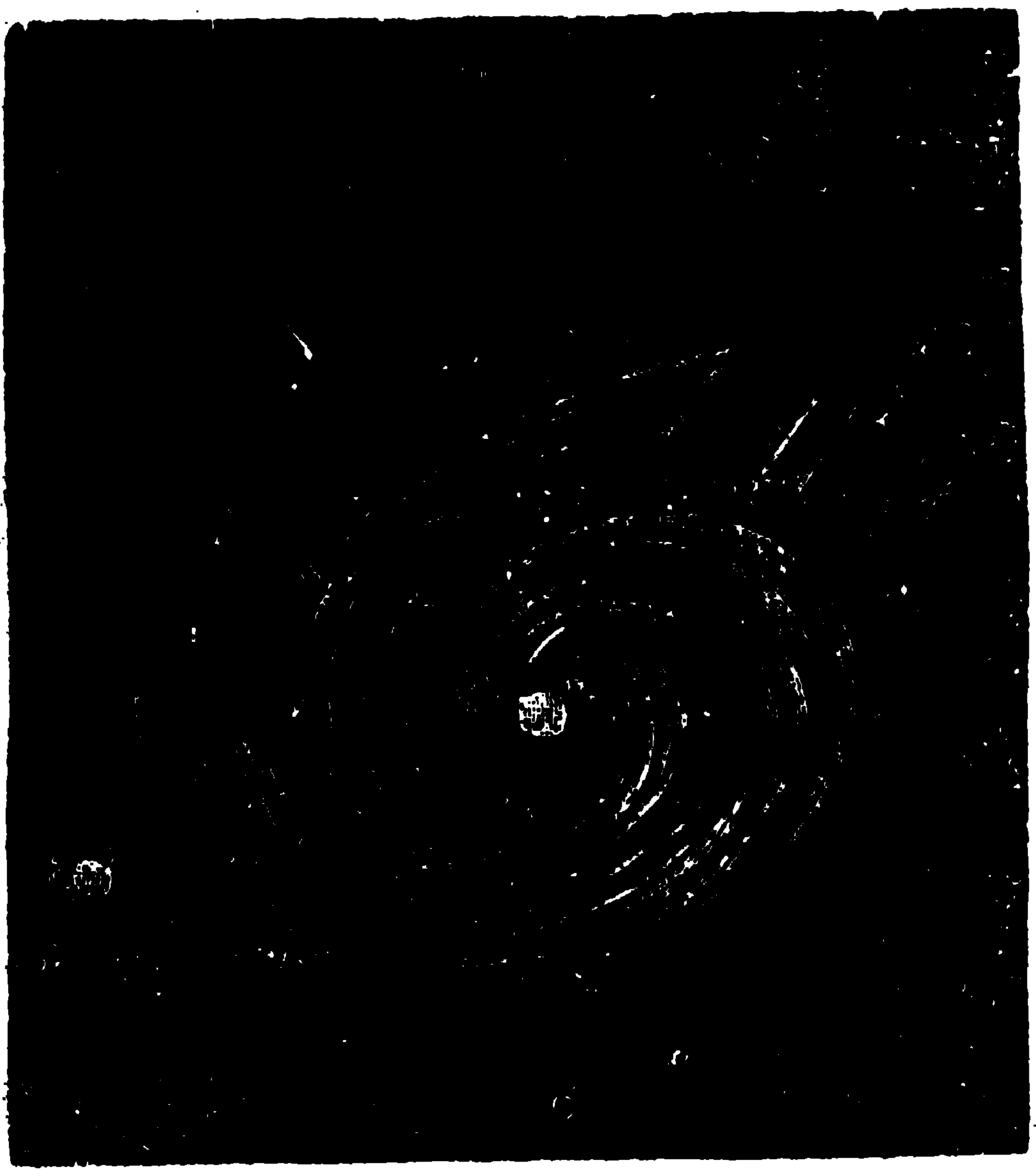

নীহারিকার বাষ্পরাশি হইতে সৌরজগতের গ্রহ সকলের উৎপত্তি হইতেছে।

ceased, what was to be, arose. Fatal to both progenitors, the event dated a stupendous cosmic birth.——Mars as the abode of life অতীতের স্তর ভেদ করিয়া যতদূর আমাদের জ্ঞান দৃষ্টি অগ্রসর হয় তাহাতে এই ধারণা জন্মে যে ভীষণ প্রলয় হইতেই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বিপরীত দিক হইতে আগত দুইটী সূর্য্যের পরস্পর সংঘর্ষণ হইল। যাহা ছিল তাহার ধ্বংস হইল। উভয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে নূতন জগতের সৃষ্টি হইল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে দুইটী মৃত নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ দ্বারাই সৌরজগতের চন্দ্র সূর্য্য পৃথিব্যাদি জ্যোতিষ্ক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষণ-বাদ (collision theory) উল্কাবাদেরই (metoritic theory) নামান্তর মাত্র। দুইটী মৃত নক্ষত্রের পরস্পর সংঘর্ষণে উহাদের দেহের উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই বিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে উল্কার সৃষ্টি হইয়াছিল। বহু সংখ্যক উল্কারাশির সংঘর্ষণে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে সেই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকলের জন্ম হইয়াছে।

সময় সময় দুই একটী উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত কতগুলি উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে উহাদের দেহ এক সময়ে ভীষণ চাপে পড়িয়াছিল। তাঁহারা বলেন দুইটী মৃত নক্ষত্রের সংঘর্ষণই সেই চাপের কারণ। উল্কাপিণ্ডগুলিকে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ২৬টী বিভিন্ন উপাদানে উহাদের দেহ গঠিত। এই ২৬টী উপাদানের মধ্যে সকলগুলিই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে; একটীও নূতন নহে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, উল্কাগুলি যে উপাদানে গঠিত পৃথিবীও সেই উপাদানেই গঠিত। সুতরাং উল্কাদেহের উপাদানেই সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকলের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। *

বৈজ্ঞানিকগণ আরও একটী আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ সকলের উপাদান গড়ে অধিক ভারী আর দূরবর্ত্তী গ্রহ সকলের উপাদান অপেক্ষাকৃত হালকা।

নিম্নে আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

বুধের	আঃ গুরুত্ব	৩·৫	বৃহস্পতির	আঃ গুরুত্ব	১·৪
শুক্র	„	৫·১	শনি	„	·৭
পৃথিবী	„	৫·৫	ইউরেনাস	„	১·১
মঙ্গল	„	৩·৭	নেপচুন	„	১·৮
গড়ে উহাদের গুরুত্ব		৪·৪৫	গড়ে উহাদের গুরুত্ব		১·২৫

*"Twenty six known elements have been found to occur in them, and not one element that is new. They thus betary a constitution

সূর্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ সকলের গুরুত্ব দূরবর্ত্তী গ্রহ সকলের গুরুত্বের প্রায় ৪ গুণ। ইহাতে কাহারও ধারণা হইতে পারে যে বৃহস্পতি এখনও অতিশয় উত্তপ্ত রহিয়াছে; উত্তাপহেতু উহার অণুপরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন থাকায় বৃহস্পতির আয়তন বৃহৎ হইয়াছে। এই জন্য উহার ঘনত্ব কম। কিন্তু ইউরেনাস ও নেপচুন তত উত্তপ্ত নহে সুতরাং ঐ হেতু উহাদের গুরুত্ব কম হইবার কোনই কারণ নাই। আরও জানা গিয়াছে যে বৃহস্পতি হইতে শনিতে হাইড্রোজেন বাষ্পের পরিমাণ অধিক, শনি হইতে ইউরেনাসে অধিক এবং ইউরেনাস হইতে নেপচুনে অধিক। ইহা হইতে জ্যোতি-

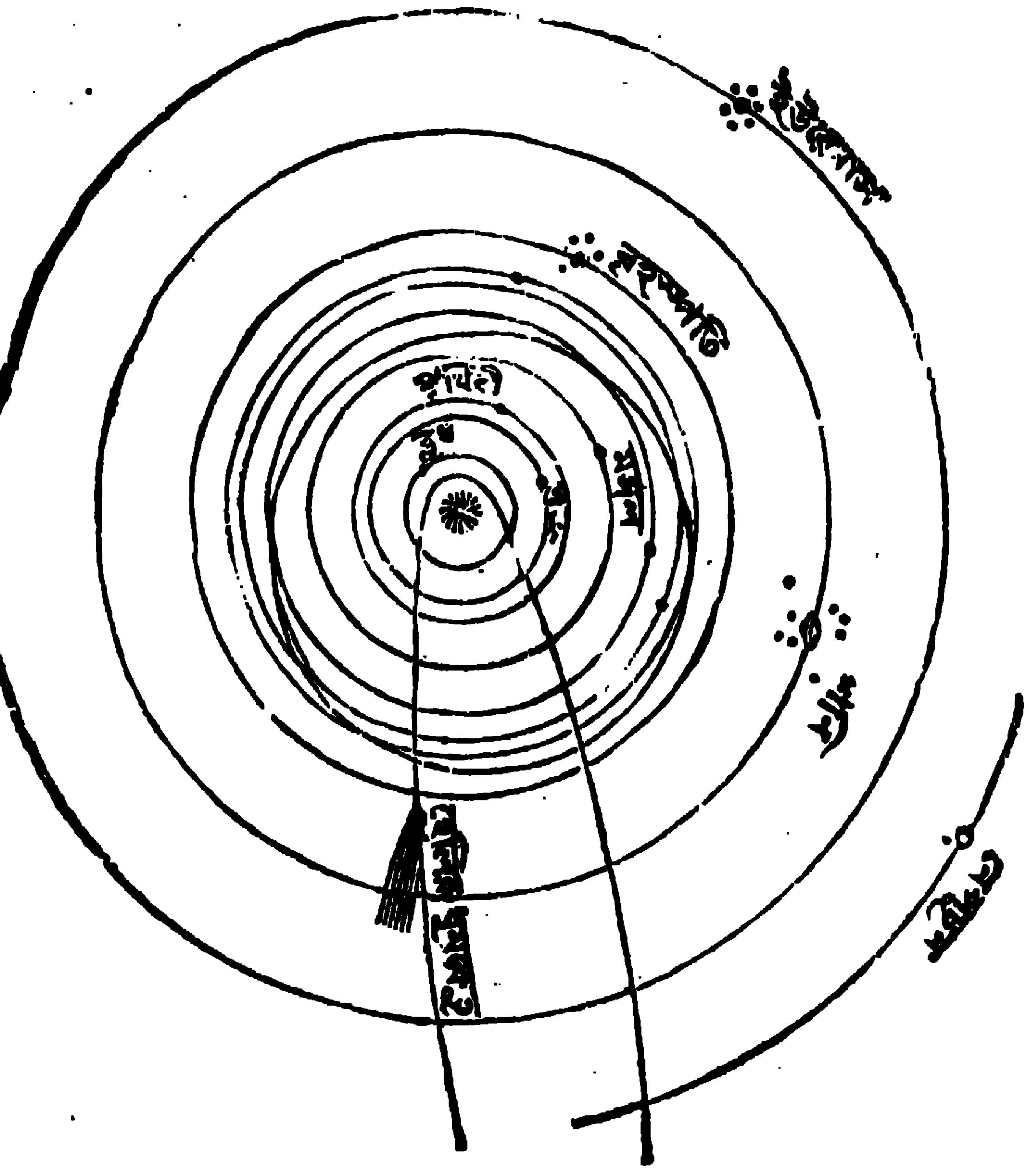

সৌরজগতের বর্ত্তমান অবস্থা।

র্ব্বিদগণ বলেন যে দুইটী মৃত নক্ষত্রের যখন সংঘর্ষণ হইয়াছিল তখন উহাদের দেহের অভ্যন্তর ভাগের ভারী উপাদান সকল নিকটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বহির্ভাগের হাল্‌কা উপাদান সকল দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য গ্রহ সকলের উপাদানের গুরুত্বের এইরূপ পার্থক্য হইয়াছে।*

চন্দ্র পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব (৩·৩) এত অধিক।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে ধারণা হয় যে মৃত সূর্য্য বা নক্ষত্রের সংঘর্ষণ হইতেই সৌর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র এবং বুধ, শুক্র, পৃথিব্যাদি গ্রহসকল একই সময়ে একই উপাদানে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং মহাপ্রলয় হইতেই সৌরজগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

কাশী যাত্রা।

"কি হলোরে আজ! বলি আজ কি গরম জলটল পাব না, নাকি? না! রোজ রোজ এমন করে হল্লা করা আমার কুলাইয়া উঠিবে না। ওগো তুমি উঠিয়া দেখিতে পার কি, নীচে কি হলো? আমি যে এ কনকনে শীতটায় আর নীচে নামিতে পারি না!" স্ত্রী আসিয়া স্বামীর নিকট দাঁড়াইয়া এই কথা কয়টী বলিলেন। স্বামী বেচারা ভোরের শীত অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া ছেকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত মুনিবের কার্য্যে তৎপরতা দেখাইতেছিলেন তিনি বলিলেন "তুমি পার না, আমি পারিব কেমন করিয়া বলিয়াই তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীর এ বেয়াদাপ স্ত্রীর নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি পারিবে না, উনি পারিবেন না তো ঝি ঠাকুর তাড়াইলে কেন? বসিয়া রায় লিখিলেই যদি খাওয়া দাওয়া, আফিসে যাওয়ার কাজ হয় লিখ, এই আমিও গায়ে লেপ মুড়িয়া শুইলাম।"

স্ত্রী শশিমুখী হাতের নূতন সোণার চুড়ির রিনিঝিনি রব তুলিয়া যাইয়া খট্টাঙ্গে উঠিলেন। তাহার মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল—

---

cognate to the Earth's—Lowell, Mars as the abode of life.

*"Neptune the outermost, Uranus the next, then Saturn and Jupiter, come in that order from several successive layers of the pristine body, while the innermost planets come from parts of its deeper down. The major planets were of the skin of the dismembered body, we of its lower flesh."

—Lowell.

স্বামী বেচারা অনুপায় দেখিয়া বিরক্তির সহিত চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া মাকে বলিলেন "বিরক্তই করলে তোমরা—ওগো মা, আজ কি সারাদিন ঘুমাইবেই ; না খাওয়া দাওয়া আফিস আদালতও আছে ? ওঁরা কতক্ষণ উঠে হল্লা করছে শুনছ না ? রোজ রোজ এম্নি ধারা কত সহ্য করব বল ! সেই তো ঘুম ভাঙ্গিতেই হয়, তা একটু সকালে উঠে ওঁর মুখ ধোয়ার জলটা গরম করে দিয়ে, রান্নাটা চড়িয়ে দিলেই তো, সবদিক রক্ষা হয় ; একথা কতদিন বুঝাতে হবে। দেখ্‌চ যখন উনি পারেন না, আমারও আফিস আদালত আছে ; ঠাকুর চাকুরও নেই ছেলেদেরও স্কুল কলেজ আছে—তখন একটু বুঝ্‌তে হয়।

বৃদ্ধা মা ততক্ষণে কেটলি করিয়া গরম জল লইয়া ছেলের পশ্চাতে পশ্চাতে উপরে আসিলেন। তারপর যথাস্থানে গরম জলের কেটলি রাখিয়া একখানা ছোট চৌকি রাখিলেন, টুথ পাউডার, ব্রাস ইত্যাদি রাখিয়া বধুকে জাগিয়া জানাইলেন।

"গরম জল হয়েছে বউ মা" আজ কি রান্না হইবে, কই কিছুইতো দেখি না !"

"এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলে আর কি আয়োজন উদ্যোগ দেখবে তুমি ?" রোজ রোজ তোমার সঙ্গে আমি দিক্ কত্তে পারবো না ; এই ঠাণ্ডাটা লাগিয়ে আমার বুক পিঠ মেরে দিলে ; তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, আজ আমি আর উঠতে পারবো না।" বধু লেপ আরো টানিয়া লইয়া আটিয়া সাটিয়া শুইলেন।

বৃদ্ধার শ্রবণ শক্তি হ্রস্ব। সুতরাং পুত্র বধুর কথাগুলি পুত্রকে উচ্চৈস্বরে শুনাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতে পুত্র অগ্রসর হইলেন। এরূপই নিত্যকার ব্যবস্থা। পুত্র বলিলেন—"এত বিলম্বে উঠলে কি সময় মত কোন কাজ হতে পারে ? ভোরে উঠে তোমাকে বাইরে থেকে ডেকে ডেকে ওর ঠাণ্ডা লেগে বুকে পিঠে ব্যথা হয়েছে। সুতরাং ওর ফল ভোগ তোমাকেই করতে হবে। মাছ, তরকারী কেটে নিয়ে সব তোমাকেই গুছিয়ে নিতে হবে ; বুঝলে। এত বিলম্ব হলো কেন ?

বৃদ্ধা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সকল কথা বুঝিলেন—তারপর বলিলেন আমি তো কখন উঠেছি, উঠে কাঠ কেটে কয়লা ধরিয়ে জল গরম করে—উপরের সিড়ির দরজা বন্ধ দেখে বসে আছি—

গৃহিণী লেপ মুড়ি দিয়া শাশুড়ীর কৈফিয়ত শুনিতে-ছিলেন—কৈফিয়ত শুনিয়া মুখ লেপের ভিতর হইতে বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কেন হাতে জোর ছিল না, কপাটে ধাক্কা দিতে—না খাও না ? পিণ্ডি তুলিবার বেলা তো এক বেলাতেই সাড়ে চার জনের খোরাক। "কাণের মাথা খাওয়া হইতেছে বলে কি হাতেও জোর নেই ..."

ভাল কথা না শুনিলেও মন্দ কথা শুনিবার শক্তি শ্রবণ-শক্তিলুপ্ত বৃদ্ধাদের খুব প্রবল থাকে। তাঁহাদের কানে মন্দ কথা একটী প্রবেশ করিলেই তাহা দ্বারা তাঁহারা বক্তার উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া নিতে পারেন। পুত্র বধুর শেষ কথাটার আভাস পাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন—কাণের মাথা একদিন সবাইকেই খেতে হয় তাই নিয়ে এত গাল মন্দের কি কথা আছে। আমার কানের মাথা খেয়েছি তা যখন তোমাদের জানা আছে বেশতো ভোরে উঠে দরজাটা খুলে রাখলেই তো হয়—আর আমি কি চিরদিনই তোমার সংসারে দাসীপনা করে পারি মা, এখন ছেড়ে দাও আমাকে—আর কত—আমারও ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে। বাবা আমাকে আর এই শেষ দশায় কত খাটাবে—আমাকে কাশী পাঠায়ে দাও সেখানে আমি ভিক্ষা করে খাবো ... ...

"তা হলে তো আপদ শান্তি হতো ... রোজ রোজ আর কত বরদাস্ত হয়।" পুত্রবধু খট্টাঙ্গ হইতে শয়নে থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন।

"যাও যাও, এখন যা হয় চারটা করে কর্ম্মে দাও গিয়ে, পেটে দিয়ে আফিসে যাই ! চা হয়েছে কি—আন দেখি—তাড়াতাড়ি।" বেলা হলো এর পর এখন আমাদের চা ! ওরে ভোঁদা চাপরাশী এলেই বাজারে পাঠাস্ ..." পুত্র মাকে প্রথমে সান্ত্বনা বাক্যে কর্ম্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়া পুত্র ভোদাকে বাজারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া, লেপ মুড়িত স্ত্রীকে বলিলেন—"যাও এখন উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা টা খেয়ে ফেল। সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে নিয়েই আধ ঘণ্টা উপর নীচ দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। রান্না হবে কখন ? আফিসের বেলা যে হয় হয়।"

স্ত্রীর নিকট স্বামীর এরূপ ত্রুটী প্রদর্শন রূপ ন্যাকামী মোটেই প্রীতিপদ বোধ হইল না। তিনি স্বামীকে দুটা কড়া কথা শুনাইয়া পুনরায় লেপ টানিয়া সটান হইয়া শুইলেন।

২

জয়রামপুরের বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামে পাটোয়ারিগিরি করিয়া বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করিতেন। অবস্থা বিশেষ কিছু না থাকিলেও চাটুয্যা এ দিয়েই নিজ গৃহস্থালী বজায় রাখিয়া পুত্র রামগতিকে প্রথমে গ্রামে, মাঝে মহকুমায় ও শেষে রাজধানী কলিকাতা রাখিয়া শিক্ষার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পড়াইয়া লায়েখ করিয়া আনিয়া স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত করিয়া দেহত্যাগ করেন। রামগতি এম-এ, বি-এল এর প্রথমে স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইয়া শেষটায় বাঁধা খাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আলা সদর আমিনের মেয়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সঙ্গে এক গোহালে ঘানি টানিতে লাগিলেন।

গর্ভধারিণী শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা স্বামীর হাতে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পুত্রের রোজগার খাইবার উচ্চ আশায় এবং রঙ্গিন নেসায় ভরপুর হইয়া জীবনকে চিরস্থায়ী করিবার প্রত্যাশায় থাকেন সাধারণতঃ তাহাদের অদৃষ্টে যাহা হয় রামগতির জননীরও তাহাই হইয়াছে। দেশ প্রথা এবং অদৃষ্ট দোষ কেহ এড়াইতে পারে না। তৎপর মুন্সেফ নামক জীবেরা সাধারণতঃই একটু কৃপণ স্বভাবও হইয়া থাকেন। এ সকলের ফলে পাটোয়ারী গৃহিণীকে অতীত স্মৃতি ও সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মুন্সেফ পুত্রের ঠাকুর চাকরের কাজ হইতে মুন্সেফ গৃহিণীর মুখ ধোয়া জল টানার ও চা যোগানের কাজ পর্য্যন্ত করিতে হয়। এবং সময় সময় পুত্র ও পুত্রবধুর ··· ··· না আর বলিব না।

মোট কথা মায়ের বেয়াদপিতে পুত্রকে অনেক দিনই সুধু আলু ভাতে দিন কাটাইতে হয়। যদিও এ ব্যবস্থা রামগতি বাবুর নিকট মোটেই অপ্রীতিকর ছিল না।

প্রায়ই যেমন হয় আজও তেমন হইল। আলু ভাতে পেট পুরিয়া গুরু গম্ভীর ঢেকুর তুলিয়া রামগতি আফিসে চলিয়া গেলেন। চাপরাশী বাবুর বাজার করে, খায় না, সে বাজার করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আফিসের সময় আসিয়া বাবুর পূর্ব্বেই বাক্সটা বহন করিয়া লইয়া গেল।

পুত্র ও পৌত্রেরা আলু ভাতে তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আর মাছ কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া পুত্রবধুর ভোজন তৃপ্তির অনুষ্ঠানের কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। তাহা ওবেলার জন্য গোছাইয়া রাখিয়া বধুর অন্ন ও আলুসিদ্ধ শাক ও তরকারী পরিবেশন করিয়া উপরে নিয়া যথারীতি রাখিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। আহারে এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা মুন্সেফ সহ্য করেন তাঁহার নিজ কার্পণ্য দোষে—কিন্তু মুন্সেফ পত্নীর তাহা সহ্য হইবে কেন?

ফলে তিনি স্নান প্রসাধন পারিপাট্য শেষ করিয়া আসিয়া তাহার জন্য এইরূপ অকিঞ্চিতকর মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা দেখিয়া ক্রোধের আতিশয্যে ক্ষিপ্রপদ তাড়নায় তাহা ঘরময় ছড়াইয়া দিলেন।

এইরূপ অব্যবস্থাপকের মুণ্ডপাত করিবার উদ্দেশে উচ্চ চীৎকারে উপর নীচ প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং পদভরে সিঁড়িপথ কম্পিত করিয়া তাহার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন—"হাঁ গা কোথায় গেলেন কর্ত্তা—এইরূপেই দিন চলবে নাকি? বলি পিণ্ডি আলু ভাতে সাভার হয় বলে রাজোরই ওরূপ ধারা চলবে নাকি? মাছগুলা গেল কোথায়, বেড়ালের পেটে—কি নিজের পেটে গেল—

স্নানের কোঠায় আসিয়া উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে বৃদ্ধার কর্ণে এই শেষ কথাটীই প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা সে কালের লোক। কথায় তিনিও পঞ্চমুখ, আর বধু মাতার অর্গল শূন্য মুখের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য পঞ্চ মুখ না হইলে অন্য উপায় কি? যোগং যোগোন যোজয়েৎ!

বৃদ্ধা বিতৃষ্ণার সহিত বলিলেন "ছি ছি নেহাত ইতর বউ ঝির মত কথা বলছ কেন বউ! ছেলেতে নাতিতে মাছ খেলে না, সময় হলো না, রেখেছি তাই, বিকেলটায় হবে? ঐ দেখ গিয়ে হাঁড়িতে। ওরা খেলে না আর তুমি খেতে চাও এমন জিহ্বার গলায় দড়ি—বউ ঝির কেন জিহ্বা, আর ইতরের মত কথাবার্ত্তা···

শাশুড়ীর কথায় বধু তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি আমি ইতর ঘরের মেয়ে, আর তিনি ভদ্র ঘরের বিধবা—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আচ্ছা দেখি আজ খিণ্ডি আসে কোথা থেকে? আসুক বাড়ী আজ ঝাঁটাপেটা করে না বাহির করিতো আমি মনিগোপাল মুখুর্য্যের মেয়েই

নই। আজ হয় এ বাড়ীতে তুমি থাকবে, নয় আমি থাকব। এই বলে যাচ্চি। হাড়ি ভরা পিণ্ডি তোলে তোলে সাহস বেড়ে গেছে … … এখন ভাতে না মারলে আর হবে না … …

শাশুড়ী যাহা শুনিলেন, তাহারই উত্তর দিলেন—আহা হাঁ তাই কর গো তাই কর, এ বাড়ী থেকে বুড়ীকে তাড়াতে পারলে তোমার ও মুখ উজ্জল হবে, আমারও হাড় বাঁচবে। হাড়ি ভরা ভাত খাই, সে তো আর তোমার বাবার খাই না, আর তাই বা হপ্তায়ে ক'দিন পেটে যায়! দাও ছেড়ে দাও—এ নরক ছেড়ে বেড় হতে পেলে—না খেয়েও স্বর্গলাভ হবে।

বধু গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমার বাবা না হলে এ চাঁদ মুখ শুখিয়ে যেত। উনুনে হাড়ি উঠতো না, আবার আমার বাবার খান না! জাঁক আছে! আবার বাপ মা তুলে গালি।

শেষ কথা বলিতে বলিতে শশিমুখীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কথায় কথায় পিতামাতার বড়াই যেমন স্বাধীনা গর্ব্বিতা গৃহিনীদের মুখে লাগিয়াই থাকে, পিতামাতার তুলনাসূচক অবজ্ঞার আভাসেও সেইরূপ তাহাদের মর্ম্মে আঘাত করিয়া থাকে। পিতার নামের সহিত অবজ্ঞার-ভাব জড়িত থাকায় শশিমুখী ক্রন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শাশুড়ীর মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা এগুলি নিত্যকার উপদ্রব ভাবিয়া আপন মনে বক্‌বক্ করিতে করিতে স্নান আহ্নিক শেষ করিলেন।

তিনি বুঝিয়াছিলেন সেদিনকার জন্য তাঁহার আহারের ব্যবস্থা বাতিল হইবে। ঘরে যাইয়া আতব চাউলের হাঁড়ি শূন্য দেখিয়া সত্যিকার মত তাহা বুঝিলেন এবং এক ঘটি জল গলাধঃ করিয়াই তৃপ্তির পন্থা দেখিলেন।

৩

হাকিম বাবুরা ছুটায় টিফিন খান। রামগতি বাবুরও টিফিনের ব্যবস্থা আছে। লুচি মোহন ভোগ তাহার সহ্য হয় না। তাঁহার প্রিয় টিফিন বাঁধা আছে অর্দ্ধ পয়সার ২টী বিচিযুক্ত এটে কলা, এক পয়সার চিড়া ও সামান্য একটু দধি। চিপিটকগুলি টিফিন কেরিয়ারের একটা কাপে ভিজান থাকে, আর একটায় থাকে কলা ও গুড় আর একটাতে থাকে দধি। এইগুলির উপকারিতা তিনি খুব জানেন। সুতরাং এগুলি তাঁহার নিকট অমৃত। হঠাৎ কোন্ দিন যদি ব্যতিক্রম হয় এবং সে ব্যতিক্রমে খরচের মাত্রা বৃদ্ধি না হয় তবে আপত্তির কোন কারণ থাকে না, খরচ বৃদ্ধি হইলে শরীরের পিত্তও কুপিত হইয়া উঠে। প্রাণের ভিতরে অসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

শশিমুখীর নিজের পরিবেশিত অন্ন রাগের মাথায় ছড়াইয়া ফেলিয়া তাহা পুনরায় গলাধঃকরণে প্রবৃত্ত হইলেন না, তিনি সেদিনকার টিফিনের সামগ্রীগুলিই নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়া কোন কারণে উদরের চাহিদা নিবৃত্তি করিলেন। তারপর ছুটায় চাপরসী আসিলে তাহা দ্বারা জল খাবারের আনাইয়া তাহারও কিছু নিজে খাইলেন কিছু কেরিয়ারে পুরিয়া আফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

রামগতি বাবু প্রাইভেট রুমে টিফিন করিতে যাইয়া পিত্ত কুপিত হইয়া উঠিল। একি এ! তিন পয়সার স্থলে আট পয়সা! উকিলের কূটতর্কের মীমাংসায় মাথা ঘামাইয়া আসিয়া রাজসিক ভোগ! তিনি তাহা বিরক্তির সহিত ঠেলিয়া রাখিয়া চাপরাসীর দ্বারা তখনই এক পয়সার বুট ভাজা আনাইলেন এবং তাহা ধীরে ধীরে চর্ব্বন করিতে করিতে বিচার্য্য নথিটার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। আর মাঝে মাঝে তাহার মনে গুরুতরভাবে পীড়া দিতে লাগিল আট পয়সার জল খাবারের বৃথা ব্যয়ের কথা।

৪

মুন্সেফ বাবুর মাথায় আজ আট পয়সার অপব্যয়ের চিন্তাই বেশী করিয়া হইতেছিল। তিনি যতই গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, ততই তাহার সে বিষয়ের চিন্তা মনকে আলোড়ন করিয়া তুলিতেছিল বেশী করিয়া। অতি সামান্য ঘটনা যে মানুষের মনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া অঘটন ঘটাইয়া তুলে কৃপণের জীবনে তাহা নিত্যই পরীক্ষিত হয়।

আফিসের পর বাসায় আসিয়া কাপড় না ছাড়িয়াই রামগতি শশিমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ আবার এ পয়সাগুলি বৃথা ব্যয় করিলে কেন?"

শশিমুখী নথ নাড়া দিয়া স্বামীকে কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন—"আমি না খেয়ে উপুস করে তোমার সংসারে থাকতে পারবো না, হয় আমাকে ঠাকুর চাকর রেখে দাও, নয় নিজের সংসার বুঝে নাও—আমি আর তিলার্দ্ধ এ নরককুণ্ডে আধ পেট খেয়ে থাকতে পারিনে।"

এতে আট পয়সা অন্যায় ব্যয়, তার উপর আবার মাসে পঁচিশ টাকা উপরি ব্যয়ের প্রস্তাব শুনিয়া রামগতিবাবুর মাথা গরম হইয়া গেল। তিনি ঠাকুর চাকর রাখিয়া পঁচিশ টাকা মন্ন খোরাকী ব্যয় বৃদ্ধি করার চেয়ে আট পয়সার কৈফিয়তের দায় হইতে গৃহিণীকে মুক্তি দিয়া নিজে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ওতো নিত্যকার কথা, হয়েছে কি? কেন আধ পেট খেলে সে সকল বল্লে তো বুঝতে পারি?

স্বামীর সোহাগের কথায় স্ত্রীর গোমটা করা বুকের বোঝা জল হইয়া চক্ষের পাতা বাহিয়া ঝড়িয়া পড়িল। শশিমুখী স্বামীর নিকট বৃদ্ধার স্পর্দ্ধার কথা, তাহার বাপ মা তুলিয়া গালাগালির কথা, ইতর লোকের বউ ঝি বলার কথা এবং শেষে পরিবেশনের ত্রুটীর কথা বলিয়া কেঁদে সারা হইলেন।

রামগতি বাবু জুতা কাপড় ছাড়িয়া স্ত্রীকে আপাততঃ সান্ত্বনা করিবার জন্ম মাকে শাসন করার উদ্দেশে ডাকিলেন—হাঁ মা, তোমার কি আক্কেল গা? তুমি যা মুখে আসে তাই ওকে বলবে? বুড়া হতেছ না দিন দিন পাগল হতেছ। ... ...

বৃদ্ধা পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"এরূপ করে নাই দিয়েই তো বাবা তুমি বউটাকে বেপরোয়া করিয়া তুলিলে ... মায়ের মুখে নিজের দোষ কীর্ত্তনের আভাস পাইয়া রামগতি বাবু হাকিমের মেজাজে বলিলেন—"মুখে মুখে তর্ক করো না। তুমি বড় বেয়াদপ! চুপ কর। যদি নীরবে থাকতে পার থাক নতুবা দুর করে দেব। দিন রাত ঝগড়া ঝাটী—যেন ইতর লোকের পরিবার। পাড়া প্রতিবাসীরা কি বলে দেখ দেখি? তুমি একজন মুন্সেফ হাকিমের মা তো—না সেই আদমকালের পাটোয়ারী বাড়ীর লোক? ফের আমি এরূপ ইতরের মত কথা শুনব, জিহ্বা কেটে দিব।

মাতাকে প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়া রামগতি বাবু দৌড়িয়া উপরে উঠিলেন।

মাতা বলিতে লাগিলেন—"দে বাবা আমাকে দূর করেই দে, ভিক্ষা করিয়াই আমি কাশী যাইব। মহামায়া অন্নপূর্ণার দ্বারে আমি যেমন করিয়া হয় পেট পালিতে পারিব, আমার হাড় জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। তোদেরও আর এই বুড়ির জন্ত কেলেঙ্কার শুনতে হবে না ... ...

স্বামীর শাসনে শশিমুখীর চক্ষু জল শুখাইয়াছিল। তিনি শাশুড়ীর কথায় বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—বিড়াল যাবে কাশীধাম তো ... ...

৫

ডিপুটী যোগেন্দ্র বাবুর কোর্ট আজ লোকারণ্য। মুন্সেফ রামগতি বাবুর মানহানীর মোকদ্দমার শুনানি শুনিবার ও চিত্র দেখিবার জন্ত সহরের লোক সহর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে।

লোকের ভিড় দেখিয়া ডিপুটী বাবু পেস্কারকে বলিলেন—রামগতি বাবুকে খবর দিন দুটায় মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। আসামীকে ডাকিয়া উপস্থিত রাখুন—।" পেস্কার বাবু আদেশ তামিল করিলেন। চাপরাসী সজনী বাবু আসামী হাজির, সজনী বাবু আসামী হাজির! কই "সজনী ... ..."

তিন ডাকের মাথায় চিত্রশিল্পী চৌধুরী নামধারী ভদ্র যুবক আসিয়া চাপরাসীর করতলগত হইলেন। চাপরাসী ভদ্র বেশী যুবক দেখিয়া তাহার শরীর স্পর্শ করা প্রয়োজন মনে করিল না। আসামী চাপরাসী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিয়া আসামীর বাক্সে দণ্ডায়মান হইলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হইল। পেস্কার দাঁড়াইয়া দর্শকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনারা এখন চলিয়া যান এই মোকদ্দমা ২॥ টায় আরম্ভ হইবে।" তারপর চাপরাসীকে আদেশ করিলেন- লোক বাহির করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দাও।

চাপরাসী হুকুম তামিল করিতে উদ্যত দেখিয়া কেহ কেহ চাচা ডাকিয়া আপন সম্মান বাঁচাইলেন। কেহ অনিচ্ছায় ধাক্কা খাইল। আসামী যুগকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগ শিশুর ন্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হাকিম যোগেন্দ্র বাবু কয়েকখানা চিরকুট লিখিয়া চাপরাসীর হাতে দিয়া সেদিনকার পুলিস চালানী মোকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ত আসামী আসিয়া সজনী চৌধুরীকে আসামীর বাক্স হইতে স্থান চ্যুত করিয়া দিল।

সজনীকান্ত যুক্ত করে ঈষৎ হাস্ত মুখে পেস্কারকে বলিলেন—"আমার প্রতি আদেশ? পেস্কার বলিলেন—"আপনার মোকদ্দমা উঠিবে দুটায়; উপস্থিত থাকুন।"

দুটায় ডিপুটী বাবু টিফিনের জন্ত গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সেখানে সবজজ বসন্ত বাবু, মুন্সেফ

নীরোদ বাবু, সিনিয়ার ডিপুটী কালী বাবু ও বেণী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রামগতি বাবুকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

ডিপুটী যোগেন বাবু আজ বড় রকমেরই টিফিনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রামগতি বাবু—আসিলে সকলে জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজ সভায় বক্তৃতা এবং মনের কথা পাশ্চাত্য সভ্যতার রেওয়াজ। সে ব্যবস্থাই চলিল। যোগেন্দ্র বাবু ইঙ্গিত করিলে সমবেত সভ্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপ সবজজ বসন্ত বাবু রামগতি বাবুকে বলিলেন—রামগতি বাবু তুমি আর লোক হাসাইও না, এই মোকদ্দমা অদ্যই আপোষ করিয়া ফেল, এ অত্যন্ত কেলেঙ্কারীর কথা। তোমার কোন লাভ হইবে, সুধু জাত যাইবে।

নীরোদ বাবু জাত যাইবে কি ; জাত কি আর আছে। সহরময় ঢি ঢি রব—আমরা মুখ দেখাতে পারি না। ঐ আসামী যদি আমাদিগকে সাক্ষী মান্য করে, আমরা কি বলিব? আমরা কি বলিব—এরূপ কথা শুনি নাই?"

রামগতিবাবু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল "আমি কি মাকে মেরেছি আপনি শুনেছেন, বটি দিয়ে তার জিহ্ব কাটতে চেয়েছি—এই ছবিতে যে রকম করে এঁকেছে এরকম করে মায়ের বুকে চড়ে বসে বটি আন—জিহ্বা কাটি এরূপ বলেছি—আপনি শুনেছেন?

নীরোদ বাবু—"লোকে তাই বলে বটে! যা রটে তা বটে! যাক্ ওরূপ সোয়াল জবাবে কারো সম্মান এগুবে না। আপনি আমাদের Serviceএর কলঙ্ক করবেন না।"

বৃদ্ধ কালী বাবু তিন বেলা মার চরণামৃত পান করেন, তিনি দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন—রামগতি তুমি বয়সে আমার পুত্রের সমান—ব্যবহার তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে মা, গর্ভধারিণী, জননী—তুমি তাঁর বুকের উপর নাই উঠে বস—অপ্রিয় কথাটী তো বলেছ স্বীকার কর—নতুবা দেশশুদ্ধ লোক তোমার নামে আজ ঢি ঢি করে বেড়াবে কেন? তুমি মোকদ্দমা ছেড়ে দিয়ে মা-জননীর পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চাও। তারপর প্রতিদিন ত্রিবেলায় মাতৃচরণামৃত পান করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। বাস্।

কালী বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন আমি যাই হে যোগেন্ আমাকে এখন ট্রেজারির নোট খুলতে হবে, কেশ দেখ্তে হবে, তুমি বল্লে এসে পঞ্চাইতি কল্লম; রামগতি যদি না শুনে আমরা তবে কি কত্তে পারি? মা-জননী তাঁর প্রতি অবমাননা, রামগতি এতো বাবা তোমার নরকেও স্থান হবে না।"

কালী বাবু চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধ কালী বাবুর কথায় রামগতির বিবেক যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাহাকে ফাঁদে পতিত বুঝিয়া বেণী বাবু বলিলেন—লজ্জার কথা রামগতি বাবু, এ নিয়ে কি আবার লোক হাসাতে হয়। তুমি তোমার মার নিকট ক্ষমা না চাও, আমরা তোমাকে এক ঘরে করব; আমাদের দশ জনের চাঁদাতে তোমার মাকে কাশীধামে পাঠাব—আমাদের বাড়ীর মেয়েরা বলছে, তিনি নাকি কাশী যাইতে পাগল। এই বয়সে তাঁর কি তোমার বাড়ীর ঠাকুর চাকরের স্থান জুড়িয়ে বসিয়ে থাকবার সময় সেম্ সেম্—

এতক্ষণে বিচারক যোগেন বাবু তাঁহার নিজ মন্তব্য বলিলেন—রামগতি বাবু, আমি আপনার এ অপ্রীতিকর মোকদ্দমা কখনই করিব না জানিবেন। কেন না আপনি আমার বন্ধু স্থানীয় লোক; ম্যাজিষ্ট্রেট আমার হাতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেছেন কি করি; আমি শেষ চেষ্টা আমাদের সার্ব্বিসের সব প্রাচীন বহুদর্শীদের পঞ্চাইতরূপে ডেকে দেখলাম—বিষয়টা ঘরাও মীমাংসা—সুধু মোকদ্দমার মীমাংসা নয় এই মাতৃ যজ্ঞেরও শেষ মীমাংসা হয় কি না? তা যদি না হয়, আমি নিরুপায়। আমি file ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফেরত পাঠাব। ফৌজদারীতে আপনার মোকদ্দমার কোন বিচার হবে না। আমার উপদেশ, আপনি মোকদ্দমা আজই ছেড়ে দিন, শুধু তাহাই নহে—আপনার মাকে প্রবীণ মুরব্বি কালী বাবুর উক্তি অনুসারে সম্মান করিয়া ৺কাশীধামে প্রেরণ করুন। আর যা বাজারে শুনেছি বড়ই পেথেটিক। মাতৃ যজ্ঞের এ ছবি এঁকে শিল্পী যে বেশী 'অতিশয়' উক্তি করেছেন—আমারতো তা মনে হয় না।

শিল্পী সজনী চৌধুরী মাতৃ যজ্ঞের যে বিদ্রূপাত্মক ছবি অঙ্কিত করিয়া রামগতি বাবু মোকদ্দমার আসামী হইয়াছেন, সেই ছবিখানা সেই গুপ্ত কামরায় (Private room) লটকান ছিল। ছবিখানাতে একটী ভদ্রলোক তাঁর মাকে

ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া তাঁর বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া স্ত্রীকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকিতেছেন "গিন্নি আন দেখি বটিখানা, যে জিহ্বায় তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলা হইয়াছে—সেই জিহ্বা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করি।" ছবির উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা "মাতৃ যজ্ঞ

এ যজ্ঞের আহুতি মান　　দক্ষিণা অপমান।"

যোগেন বাবু ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন আমার মনে হয়—ছবির শ্লেষগুলি খুব ঠিক।

সবজজ বসন্ত বাবুও উঠিয়া বলিলেন—যাই, আমারও ইচ্ছা রামগতি বাবু তাঁহার মাকে আর এখানে যেন না রাখেন, ৺কাশীধামেই পাঠাইয়া দেন। দশ পনর টাকা মাসে হলেই বেশ চলবে।

যোগেন বাবু বসন্ত বাবুর অনুকূল মত পাইয়া বলিলেন—আজ আর মোকদ্দমা হইল না। আপনি আজই যদি আপনার মায়ের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে কাশী পাঠাবার বন্দোবস্ত না করেন—আমরা আপনার মুখ দর্শন করব না। আপনার মোকদ্দমার file Magistrateকে দিয়া District Judge এর নিকট আমাদের অদ্যকার সমবেত পঞ্চায়েৎ মণ্ডলীর মত সহ পাঠাইব। আপনাকে স্পষ্ট কথা বলিলাম।

আপনি শিক্ষিত এম, এ, বি, এল,। আপনার নিকট সমাজ কত প্রত্যাশা করে আর আপনি সমাজকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় জননীকে নির্দ্দয় পশুর অধম ব্যবহার করিতেছেন আর আমরা মুখ বন্ধ করে চিত্র পুত্তলিকার মত নির্ব্বিকারে তাহ দেখিয়া যাইব, কখনই হইবে না।

নীরোদ বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা।"

যোগেন বাবু বলিলেন—"আমি আসামীকে প্রয়োজন মত হাজির হইতে আদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিব। আপনাকে প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া অপমাননা করিব না। আপনি এই পঞ্চায়েতি মত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করুন। মাকে অতি সত্বর কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। রামগতি বাবু মাথা হেঁট করিয়া বসন্ত বাবু ও নীরোদ বাবুর অনুসরণ করিলেন।

রামগতি বাবু বাসায় আসিয়া মায়ের চরণে পড়াইয়া পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তারপর নিজেই মাকে লইয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

বেদান্তের অধ্যাস।

অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব, চিৎ-স্বভাব আত্মা এবং জড় স্বভাব অনাত্মাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। অতএব এই দুই বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের একত্বজ্ঞান বা একত্র অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব হয়? যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে; এইরূপ যাহা অনাত্মা—অহঙ্কারাদি জড় পদার্থ—তাহা আত্মা নহে বা যাহা আত্মা তাহাও অনাত্মা নহে। তবে দুয়ের মিলন হয় কি প্রকারে?

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্যই উত্তর বলিতেছেন; অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে অত্যন্ত বিলক্ষণ আত্মার অনাত্মবর্গ হইতে পার্থক্যবোধ না থাকা প্রযুক্ত অনাত্মাতে আত্ম ব্যবহার ও আত্মাতে অনাত্ম ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্যমিথ্যা উভয় জড়িত, সুতরাং অধ্যাস-মূলক। অধ্যাস মানে আরোপ। যে যাহা নহে তাহাতে তাহার জ্ঞানরূপ ব্যবহারই অধ্যাস।" "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিলক্ষণো ব্যবহারঃ।" পরমার্থিক এক ভিন্ন দুই নাই, ব্যবহারকালেই অবিদ্যামূলক দ্বৈতভাণ হয়। এই অধ্যাস-পদার্থকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকায় যে কয়েক পঙক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণে অধ্যাস ভাষ নামে পরিচিত। অধ্যাসের প্রথম লক্ষণ "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" পরত্র পরস্মিন্ অযোগ্যাধিকরণে শুক্তিকাদৌ পূর্ব্বদৃষ্টস্য হট্টাদিদৃষ্টস্য রজতাদেঃ অবভাসঃ অধ্যাসঃ স্মৃতিরূপঃ স্মৃতিজ্ঞানবৎ। হাট বাজারে পূর্ব্বে রজত দেখিয়াছি, পরে একদিন শুক্তিতে (ঝিনুকে) শুভ্র চাকচিক্য দেখিয়া তাহাতে রজতরূপ যে ভ্রম তাহাই অধ্যাস। অসন্নিহিত রজতের স্মৃতিটি থাকা চাই। পরমার্থত সৎপদার্থ যে শুক্তিকা তাহাতে অনির্ব্বচনীয় রজতের আরোপ হয়। ইহাই অধ্যাসের সাধারণ লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—"তং কেচিদন্যত্রান্য ধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি।" কেহ কেহ বলেন এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্ম্ম বিশেষ প্রতীত হওয়াই অধ্যাস। অন্তর্ধর্ম্ম জ্ঞানধর্ম্ম রজতত্ব জ্ঞানাকারস্তি যাবৎ—অন্যত্র বাহ্যে ধর্ম্মিণি অধ্যাসঃ।

পূর্ব্বে যে আমি রজত দেখিয়াছি সেই রজত সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই পরবর্ত্তী বাহ্যপদার্থ শুক্তিতে জ্ঞানস্বরূপে অধ্যস্ত হইতেছে। এই মতটি সৌত্রান্তিক বৌদ্ধদের। বৌদ্ধদর্শনাবলম্বীদের মধ্যে চারিটি প্রধান মত দৃষ্ট হয়। ১। সৌত্রান্তিক ২। বৈভাষিক ৩। যোগাচার ও ৪। মাধ্যমিক।

অধ্যাসের তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—"কেচিত্তু যত্র যদধ্যাস তদ্বিবেকাগ্রহণ-নিবন্ধনো ভ্রম ইতি" অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্য প্রতীতির অভাব থাকে—তৎকারণে ঐরূপ ভ্রম বা মিথ্যাপ্রত্যয় জন্মে। এই মতটি মীমাংসকদের।

চতুর্থ অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পন মাচক্ষতে।" অন্যে বলেন, যাহাতে অধ্যাস হয় তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। এই মতটি মাধ্যমিক মতাবলম্বী শূন্যবাদী বৌদ্ধদের।

মোটের উপর কথা এই—"এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্য ধর্ম্মের অবভাস" এইরূপই অধ্যাসের লক্ষণ দাঁড়ায়। আমরা সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাই যে বাস্তবিক প্রসিদ্ধ যে সত্যবস্তু রজত ও সর্প প্রভৃতি, ইহাদের অনুভবজনিত সংস্কারাদির অধীন হইয়া সেই সেই বস্তুর (অর্থাৎ রজত ও সর্পাদির) অধিষ্ঠান শুক্তি ও রজ্জু প্রভৃতিতে উহাদের উভয়ের অগ্রহ (অননুভব) হেতু শুক্তিতে "এই রজত" (ইদং রজতম্) রজ্জুতে "এই সর্প" (অয়ং সর্পঃ ইত্যাদি-রূপে আরোপ—অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ব্রহ্মাত্মৈকত্বপক্ষে (অদ্বৈতবাদে), ব্যবহার-কালে যে সমস্ত বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয় কিন্তু পরমার্থতঃ যাহাদের সত্তা নাই তেমন যে অহঙ্কারাদি অনাত্মবর্গ ইহাদের অভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রমাজনিত সংস্কারাদির অভাবহেতু কি প্রকারে নিত্য সত্য ব্রহ্মে অসত্য জড়বর্গের (অহঙ্কারাদ্য-নাত্মবর্গের ও জগতের) আরোপ সম্ভবপর হয় ?

অত্যন্ত অসৎ বিষয়ের অবস্থিতি বা অনুভূতি কিছুই সম্ভবপর নহে। প্রসিদ্ধ পূর্ব্বানুভূত বিষয়েরই অনুভব হইয়া থাকে। অতএব বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে বস্তুতঃ [illegible]পক্ষের (জগতের) অভাব বশতঃ আরোপের [illegible] অর্থাৎ ব্রহ্মে জগতের আরোপ [illegible] না। তবে কি প্রকারে সৎপদার্থে অসতের অধ্যাস বলা হয়।

এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যদিও এই প্রকার অধ্যাস বা আরোপ বাস্তবিক অযুক্ত বটে তথাপি অতি অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানীগণ নিয়তই এই প্রকার অনুভব করিয়া থাকে যে আমি মনুষ্য, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শিশু, আমি জন্মিয়াছি, আমি অন্ধ, আমি কর্ত্তা ভোক্তা, আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি। মিথ্যা অবিদ্যা-উপাদানহেতু অসত্য দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম্মাদির (জড়তা-অনিত্যতা প্রভৃতির) সত্যস্বরূপ পরমাত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইলেও তাহাতে আরোপ (অধ্যাস) অনুভূত হইতেছে। সেইরূপ অনাত্মবর্গ যে দেহাদি তাহাতে আত্মা ও আত্মধর্ম্মের তাদাত্ম্যরূপে (অভেদরূপে) আরোপ বা অধ্যাস অনুভূত হয়।

আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট সত্য ও মিথ্যা বস্তু—আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃতপক্ষে অভেদ-জ্ঞান অধ্যাস ব্যতীত কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ মিতি মন্যতে।" অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ প্রভৃতি জ্ঞান অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন মানুষ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে পরমাত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই, অবিদ্যা বশতঃ উহার আরোপ হয়। সেই অবিদ্যা অনাদি। বীজাঙ্কুরবৎ সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে। অবিদ্যা অনাদি হইলেও অমৃতা নহে, জ্ঞানমাত্র নাশ্যা। জ্ঞানের উদয় হইলেই অজ্ঞানের ধ্বংস হয় অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ হয়। তখনই মুক্তি, তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম আনন্দরূপ, বিজ্ঞানঘন, অখণ্ডৈকরস।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবিশিষ্ট সম্মুখবর্ত্তী বস্তুতেই অধ্যাস হয় এরূপ নিয়ম নাই; কারণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর রূপরহিত যে আকাশ তাহাতেও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তল-মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। আকাশের তল আছে, আকাশ মলিন বর্ণ, ঐ যে আকাশ দেখা যাইতেছে এইরূপ প্রতিপন্ন করে।

আত্মা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও "অহং" এইরূপে অন্তঃকরণের বিষয় হইতেছে। অতএব আত্মা যখন বিষয়ী হইলেও একান্ত অবিষয় নহে। [illegible] (বিষয়ের) অধ্যাস মধ্যে "অহং" এইরূপ [illegible]

অধ্যাস হয়, আর অহং দেহাদির ঐক্যরূপে, এবং "মম" এই-রূপে সংসর্গের অধ্যাস হইয়া থাকে। "অহং" এই অধ্যাসে চিদাত্মা প্রকাশিত হয়। তাহা না হইলে যে কোনও বস্তুর প্রতীতিতেই হইতে পারে না; জগতের অন্ধকারময়ত্ব অপ্রকাশত্ব হইয়া পড়ে।

নির্গুণ ব্রহ্মে কোনও ধর্ম্মেরই সম্ভবপর হয় না ইহা বলা উচিত নহে, কারণ, ব্রহ্মের অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত ধর্ম্ম হইতে পারে। ব্রহ্মের আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব এই ধর্ম্মগুলি আছে। এই সকল ধর্ম্ম চৈতন্য হইতে অপৃথক হইলেও পৃথকের ন্যায় প্রকাশ পায়। অবিদ্যার লীলাখেলায় ভুলিয়া, বিলাস লালসায় মজিয়া আমরা ভগবান হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। এত নিকটে ভগবান তবু তাঁহার সন্ধান পাইতেছি না। পৃথিবীর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ—পরমানন্দ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু মরণ ধর্ম্ম নিরানন্দময় বিষয় বাসনাতে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কবে আমাদের সর্প-ভ্রান্তি দূরে যাইবে প্রকৃত রজ্জু-জ্ঞান হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সাংখ্যতীর্থ।

পুরোণো আঁধার *

আজ প্রতীচীর গগন গায়ে মোহের আঁধার ঘুট্‌ঘুটে!
সেই আঁধারে যাচ্ছে ঢেকে প্রাচীর আলো ফুটফুটে।
"সজাগ মোরা"—ভাবছে যারা, তারাই বেশী আত্মহারা;
নাস্তানাবুদ হয়না কারণ - চেঁচায় জোরে সব জুটে
নাস্তিকতার মস্ত চূড়া আকাশ গায়ে তাই উঠে।

তাসের প্রাসাদ গড়ছে তারাই ফাঁকির ফানুস চোখ ধাঁধে!
লজ্জা ঘৃণা মজ্জাতে নাই পড়ছে এরা তার ফাঁদে।
তাতেই এদের আত্মপ্রসাদ, জানেনা কি ঘট্‌ছে প্রমাদ,
যত্নে পোষা অধঃপতন ছেড়ে দিতেও প্রাণ কাঁদে,
অনুকরণ প্রিয় জাতি ডুবছে ক্রমে ভীম খাদে।

আর্য্য বলে বড়াই করা দোষের এমন কার্য্য কি?
জাতীয়তা ছাড়লে পতন—নয়তা অনিবার্য্য কি?
তারাই যদি আর্য্য হয়, অনার্য্য আর কারেই কয়,
ভোগ লালসার যূপে বলি দিচ্ছে না সব রাজ্য কি?
মানুষ মারার মাপ কাঠিতে (তাদের) সভ্যতা নয় ধার্য্য কি?

(তারা) আকাশ পাতাল জরিপ করেই বাহবাটা নিচ্ছে যে,
মন বুদ্ধির অগোচরের জরিপ এরা কচ্ছে যে;
হচ্ছে অবাক্ ডুবতে দেখে, মকর পোতে সাগর বুকে;
(এরা) বিশ্ব সাগর—বুকে ডুবে, অমূল রতন তুলছে যে,
পণ্য কেড়ে নেয়না এরা পুণ্য দিতে চায় যেচে।

টেমস্ নদীর তলায় সুরঙ্গ, সিন্ধু নদে বাঁধ বাঁধা,
খাল কাটা আর পাহাড় কাটায় লাগিয়ে দেছে ঘোর ধাঁধা;
দেখ্‌লে খোকা কলের পুতুল, ভাবে যেমন রত্ন অতুল,
এ সব দেখে ভুলছে যারা, তারাও তেমনি ঠিক হাঁদা
ভাঙ্গিলে পুতুল খোকার মতন করবে তারাও সার কাঁদা।

পাশব মহাশক্তিতে যে মত্ত তারা মন্দ কি?
মানুষকে ঘুষ দেওয়ার চেয়ে দেবতাকে ঘুষ মন্দ কি?
রূপং দেহি শুনে হেন, তোমরা সবাই চট্‌ছ কেন?
"স্বরাজ দেহি" কথার চেয়ে মন্দ সেটার ছন্দ কি?
ভণ্ডকতার চেয়ে মন্দ প্রাক্তনতার গন্ধ কি?

নজীর হাজির কচ্ছি বটে হারছি তবু মামলাতে,
কারণ যারা হাকিম তারা, দৃষ্টি হায় "কামলাতে",
বিজাতীয় নেশার "ফিভার", বাড়িয়ে দেছে বিষম "লিভার",
আবোল তাবোল বক্‌ছে যে তাই পারছে না আর সাম্‌লাতে
জাতটা বৃহৎ হতো—পারলে আপন ঘাটি আগ্‌লাতে।

হৃদয় সাড়া দেবে কিসে প্রাচীনতার উল্লাসে,
বিলাস মোহের নাগপাশে ঐ উল্লাসের যে মূল নাশে।
সাগর পারের শিক্ষা নবীন, পরিয়ে দেছে চসমাজহীন;
সেইটে ফেলে ছুটলে পরে সনাতনের উল্লাসে;
চাইবে না তো দিতে তখন প্রাচীনতায় দূর বাসে।

* [illegible] প্রসাদের মাঘ সংখ্যায় গৌরবে প্রকাশিত "নোতুন আলোর [illegible]"

জড় বিজ্ঞানে যেতে কেমন টিঁকে গেছে জারমাণী,
মনুষ্যত্বের পরিচয়ে "ভন"ও গেছে হার মানি,
উৎরে সাগর উপড়ে পাহাড়, ত্রেতা যুগের বীর অবতার
করেছিল লঙ্কাকাণ্ড—হোক্‌না যতই কেরদানী ;
কবি ! তোমার গড় করি ; সেই দলে যেতে ডর মানি।

উড়িয়ে দিতে চাইছ যে সব, বলছ যে সব বুজরুকি,
চল্‌বা খোল দেখ্‌ব খাঁটী, বল্‌তে পারি বুক ঠুকি ;
"জগৎ প্রাণের চায় পরিচয়, সত্য মানে মিথ্যাকে নয়",
নিয়ে আছ সত্য ছেড়ে মিথ্যা যে ভাই সবটুকুই,
বুঝ্‌বে কথা বলছি খাঁটী, বুকের মাঝে দাও উঁকি।

জড় বিজ্ঞানের চরম সীমায় উঠেছে আজ যেই জাতি,
জান কবি ! কিসের তৃষ্ণায়, যাচ্ছে ফেটে তার ছাতি ?
আমাদের এই তপোবনে জলতো যে দীপ সংগোপনে,
তারই তরে আকুল তারা খুঁজছে জ্ঞানের সেই বাতি !
নিষ্প্রভ যে তাহার কাছে জড় বিজ্ঞানের সব ভাতি।

তুমি যাকে বল্‌ছ আলো দেখছি আমি আঁধার তা !
দেখ্‌ছি সেথায় জ্যোতির সাগর ; আঁধার তুমি বলছো যা !
কবি ! তোমার 'নোতুন' আলো তোমার কাছেই থাকুক ভালো
পুরাণো যে আঁধার ছিল দাও ফিরিয়ে আমায় তা।
সেই আঁধারেই লুকিয়ে আছে আমার হৃদয় দেবতা।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যালশাস্ত্রী।

সমালোচনা।

শতদল—(বার্ষিক সাহিত্য পত্র) ঢাকা হল ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

'শতদল' চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ঢাকা হলের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের রচনা সম্ভারে ইহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মত সুসাহিত্যিক ব্যক্তি যাহার মন্ত্রণা পরিষদের পুরোভাগে বিদ্যমান সেই সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে কি প্রকার সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা ইহার রচনাগুলি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। "সংযম ও প্রকাশ", "আধুনিক জীবনের ধারা ও আদর্শ" ও "মগধের ঐশ্বর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা। এই রচনাগুলি যে কোন সাহিত্য পত্রে স্থান লাভ করিলে তাহার গৌরব বর্দ্ধিত হইত সন্দেহ নাই। আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ঢাকা হলেরই কতিপয় ছাত্র পদব্রজে শিলং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন—সেই বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী কষ্ট সহিষ্ণুতা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার একটা অপবাদ আছে। তরুণদের মধ্যে ইহার উল্লেখ দেখিলে আশার সঞ্চার হয়। বিতর্ক সভা, সাহিত্য সমিতি, ক্রীড়া ও ব্যায়ামাগার, নাট্য সম্মিলন, লাইব্রেরী, কমন রুম ও সমাজ সেবা প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের বার্ষিক সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে।

সমাজ সেবা প্রসঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন এবং হলে ও হলের বাহিরেও রোগীর সেবার উল্লেখ আছে। সেবা দ্বারাই মানব মনোবৃত্তির পরিস্ফুটনের সুযোগ পায়। এই বিষয়ে ছাত্রগণের ঐকান্তিকতা দর্শনে সকলের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের পরিচায়ক। তরুণদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি। পরিশেষে আমরা ইহার ভূমিকা লেখক ডাঃ ঘোষের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি—"নূতন যুগের আদর্শ হবে, কেমন করে নূতন জ্ঞান ও কলার সৃষ্টি করা যেতে পারে তার শিক্ষা দেওয়া। তার এক প্রধান আদর্শ হবে জাতি এবং দেশের মঙ্গলের জন্য ছাত্রদের শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করা ও ফুটিয়ে তোলা। শতদল ঢাকা হল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মুখপত্র। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠান যতই ব্যাপক ও দৃঢ় হইয়া উঠিবে ততই শতদলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।" ইহার মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ পট মনোরম হইয়াছে।

সাহিত্য সংবাদ।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্তের কবিতা পুস্তক 'মন্দাকিনী' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মুখপত্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর চিত্র প্রদত্ত হইল।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্তি করে আসছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে—মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি **সুরমা** ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী ?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"মিল্ক অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দুর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলব্ধ বিলাসভোগ। বড় শিশি ১৲ মাঝারি ৸৹ ছোট—৷৷৹ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখবে। রুমালে একটু ঢাল্‌লে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৸৹ আনা, ছোট—৷৷৹ আনা।

এস্‌, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌,

১৯।২ লোয়ার-চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Shourabh—Reg. No. C 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

মৈমনসিংহের বিবরণ ১৲

ময়মনসিংহের ইতিহাস ১॥০

ঢাকার বিবরণ ১॥০

সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ॥০

সাময়িক সাহিত্য ৩৲

রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)

চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ।৵০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷০

লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲

ব্রতকথা ৷০

শৈব্যা ।৵০

মহরম ॥০

কালের প্রহরী (সচিত্র) ॥০

রংকথা (যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। চৈত্র—১৩৩৩ ৩য় সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

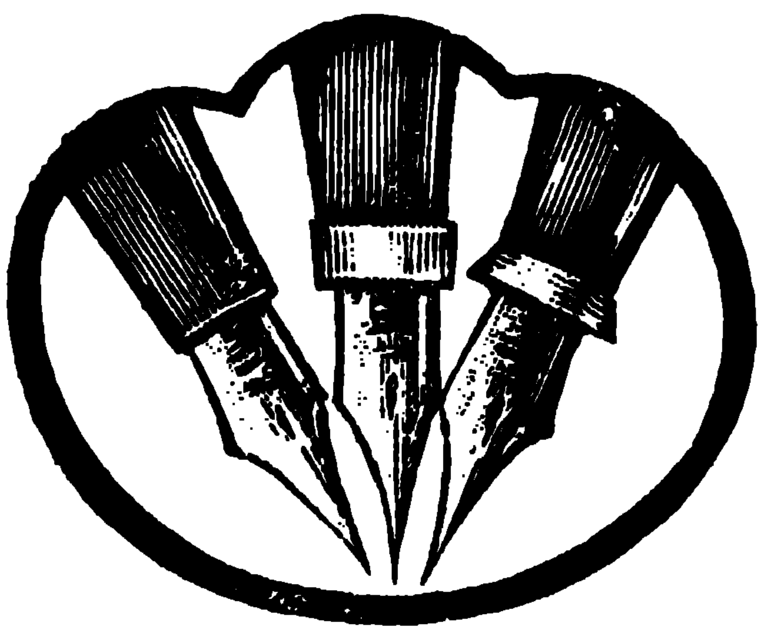

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও

সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র ষ্টল।

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

[illegible] বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম [illegible]

ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস্ সকল জ্বরের মহৌষধ ১৶০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফুলুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৶ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।ন

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশ৵ দেওয়া হয়!

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

সায়ানী রোড্ পোঃ কোডেল রোড্ বোম্বে, নং ১৪

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউয়াসাপুর" বোম্বে।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—।৶০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সংজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিরা বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার

স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত

হোমিওপ্যাথিক প্রচার কার্য্যালয়।

১৬নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা এবং পাটুয়াটুলী—ঢাকা।

সুলভে প্রথম শ্রেণীর ঔষধ, যাবতীয় হোমিও গ্রন্থকারের, গ্রন্থরাজি, শিশি, কর্ক, সুগার অবমিল্ক, গ্লোবিউল্স অস্ত্র ও ডাক্তারী যন্ত্রাদি, এবং ঔষধের বাক্স পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

শুধু একটীবার পরীক্ষা করুন। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার

শ্রীপীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী [illegible]

সূচী।

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবিদ্যা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি-এল	৪৯
মৈমনসিংহ গীতিকা	শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত মজুমদার	৫৬
অপহৃতা (গল্প)	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৭
অশোক তরুর প্রতি (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬১
টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ	৬১
তোরা ব্রহ্মচর্য্য কর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	৬৪
প্রামাণিকের কীর্ত্তি		৬৫
বউ কথা কও	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী	৭০
সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ, বি-এল	
সমালোচনা		৭২

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম্

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনী সকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন। যদি আপনার পিতৃপুরুষের কার্য্যকলাপ বজায় রাখিতে চান, তবে এ সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না।

তাঁহাদের জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত

বিশ্ব-বীণা

সভা সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে গীত হইবার উপযোগী বিবিধ সঙ্গীত, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির জন্য নানারকমের রচনা মুসলমান বালকদের উপযোগী কবিতা ও গান, মহিলা সভায়, হিন্দু সভায় ও ব্রাহ্মণ সভায় পঠনার্থ ওজস্বিনী কবিতা, হিন্দুসমাজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের উপকারার্থ রচিত কবিতাসমষ্টি এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক সমাজের বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নারী এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতিতে প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান!

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর-পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডান-হাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিস্মার্কের তিনটি বোমা", রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"...প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রাজী! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গচিত্র!! "সংবাদ-কোষ" বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সৎ-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ!!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা" ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি!

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দেড়গুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

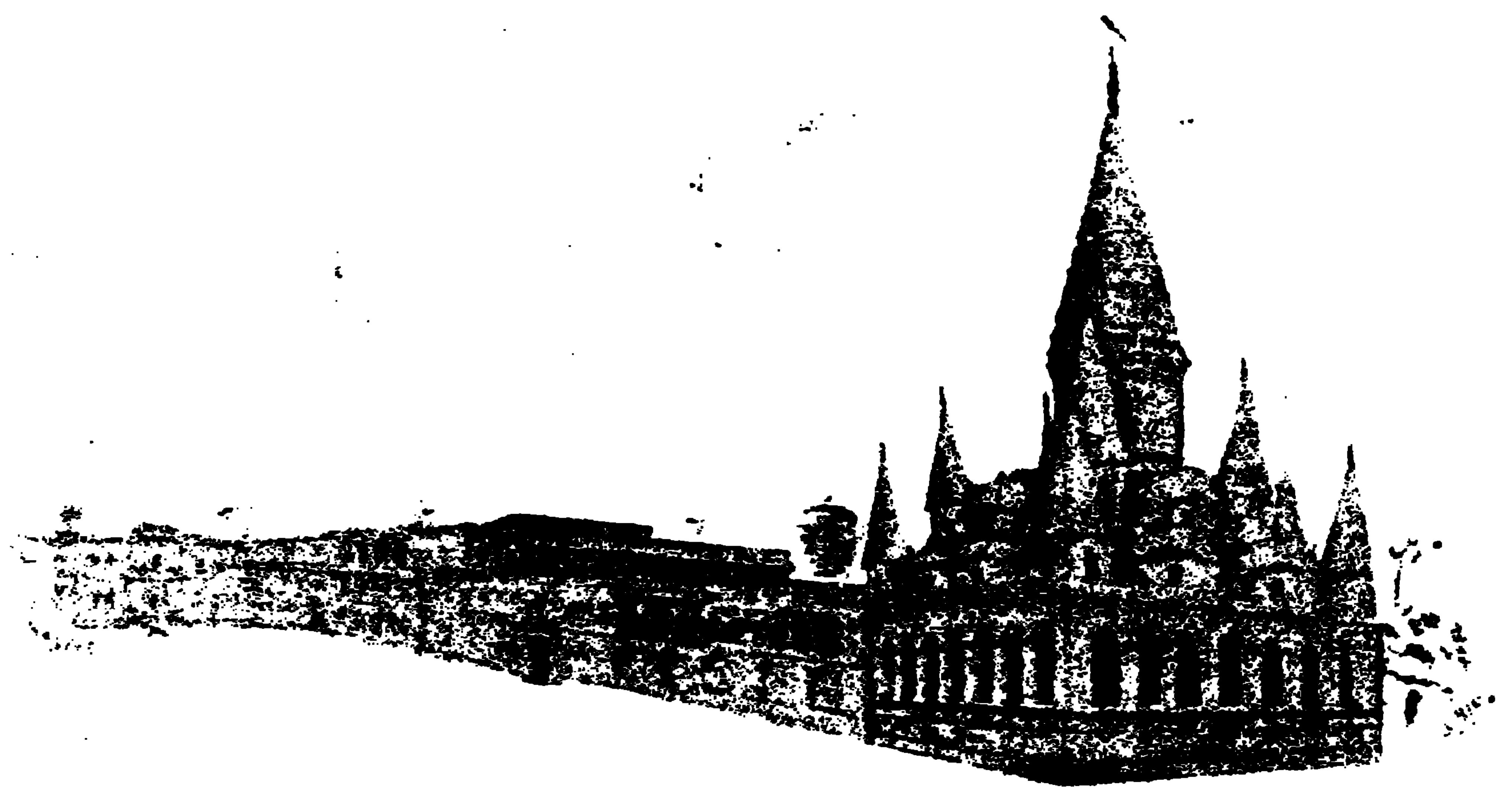

একুশরত্ন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩৩৩। ৩য় সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবিদ্যা। *

দুই শত বৎসর আগে বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন এদেশে প্রবেশলাভ করিল, তখন বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টায় হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের গৃহকলহ অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; এবং সেই সময় হইতেই শাক্ত ও বৈষ্ণব, শৈব ও গানপত, ভক্ত ও জ্ঞানী,—সকলেই এক হিন্দু নামের মধ্যে একটা একত্ব অনুভব করিতে লাগিল। তার ফলে, বিভিন্ন ধর্ম্মমত দার্শনিক বাদ, সম্প্রদায়গত বিভেদ, বর্ণ ও জাতিতে কলহ, প্রভৃতির অনেকটা তিরোভাব ঘটিয়া গেল; এবং আমাদের মনে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল যে, আমরা সমাজের যে যেখানে আছি, চিরকালই যে সেইখানেই ছিলাম এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ কখনও করি নাই; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সকলেই যে যার স্থান সহজেই মানিয়া লইয়া আসিতেছিল; ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়ের উপর অন্যায় অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে নাই, আর ক্ষত্রিয়ও কখনই ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নাই; সাংখ্য কখনও বেদান্তের সঙ্গে মূলতঃ বিভেদ স্বীকার করে নাই; এবং শৈব ও গানপতেরা ও মূলতঃ একই পথের পথিক। বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থা প্রভৃতি একই চিন্তা স্রোতের বিভিন্ন শাখামাত্র,—অধিকারী ভেদে প্রযোজ্য, কিন্তু সকলেরই চরম লক্ষ্য এক। যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার ভিন্ন স্তরের অধিকারীর জন্য চার্ব্বাক দর্শনও প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ঋষিরা পুরাণের প্রবক্তা, তাঁহারাই আবার তন্ত্রাদিরও প্রণেতা; এবং যাঁরা শৈব মত প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার বৈষ্ণব মতেরও দ্রষ্টা ছিলেন। শিক্ষার্থীকে যেমন শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়, সাধককেও তেমনি এই সব বিভিন্ন পন্থার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। যে ছাত্র যে শ্রেণীর উপযুক্ত তাহাকে যেমন সেই শ্রেণীতেই পাঠ আরম্ভ করিতে হয়, তেমনি যে সাধক যে বিদ্যা বা যে মার্গের অধিকারী, তাহাকেও সেই খানেই আরম্ভ করিতে হইবে। একই সিঁড়ির ভিন্ন ভিন্ন ধাপের মধ্যে যেমন কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, তেমনই সাংখ্য-বেদান্ত, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মধ্যেও আপাততঃ যাহাই হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোনও কলহ নাই।

এমনই একটা ধারণা আমাদের অনেকের মনে যে না আছে, তা নয়। মনে হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বেও হিন্দু সভ্যতাকে আর একটা সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমানদের শাসন হাজার কঠোর হইয়া থাকিলেও—মুসলমানদের শাসন ঠিক কঠোরই ছিল তাহা বলি না, তথাপি তাহাদের শাসনকে হাজার কঠোর মনে করিলেও—সভ্যতা হিসাবে তাদের সভ্যতা হিন্দু সভ্যতাকে তেমন ভাবে বেষ্টন করিয়া ফেলিতে পারে নাই। মুসলমান শাসনের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দু তাহার সম্প্রদায়গত বিভেদ,

* গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য, বিভিন্ন মতবাদের পরস্পর বিরোধ, এক ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে আর এক ধর্ম্মমতের অভিযান—এ সমস্তই বজায় রাখিয়াছিল। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অনুসরণীয়, একই পথের দুইটী অংশ—এবং একটীকে অতিক্রম করিয়া আর একটীতে পদার্পণ করিতে হইবে—এমন একটা বিশ্বাস সকলেই তখন করিতেন না।

অবশ্যই এরূপ একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও যে না হইয়াছিল, তা নয়; বিশেষতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে এইরূপ পরম্পরাশ্রয়ী অনেকেই মনে করিতেন। কিন্তু তেমনই আবার, এমন লোকও ছিলেন,—যেমন শঙ্কর যাঁহারা এ দুয়ের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন না। এখন যেমন আমরা এ সমস্তকেই একই হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একে অন্যের আশ্রিত মনে করি এবং ইস্কুলে এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার মত একটীর ভিতর দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া অপরটীতে পদার্পণ করিতে হইবে বলিয়া মনে করি,—তেমন একটা সাধারণ বিশ্বাস আগে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

চৈতন্যের সময়েও দেখা যায় জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে গভীর বিরোধ বর্ত্তমান ছিল। মুকুন্দ দত্ত যখন চৈতন্য ঠাকুরকে সার্ব্বভৌমের গৃহে নিয়া গেলেন, তখন একবার জ্ঞান-পন্থী সার্ব্বভৌম ও ভক্তি-পন্থী চৈতন্য শিষ্যদের মধ্যে এই উভয় পথের কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাই নিয়া বিতণ্ডা হইয়াছিল।

"সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী আকৃতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইঁহার উপর॥
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব ভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এঁহো হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥"

সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল এবং তার মধ্যে বড় ছোটও ছিল একথা এখানে স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই ভক্তিমার্গের পথিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছাড় আরও মুক্তির পথ ছিল; সেটা ছিল জ্ঞানের পথ—দার্শনিকের পথ। সার্ব্বভৌম চৈতন্যের সন্ন্যাস রক্ষা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কহিতেছেন:—

"নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব।"

চৈতন্যের শিষ্যেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

"শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিদ্বদনুভব ঈশ্বর লক্ষণে॥
ভট্টাচার্য্য কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধ অনুমানে?
অনুমান প্রমাণে নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।"

—ইত্যাদি

সম্প্রদায়গত বিরোধ তখনও বেশ স্পষ্ট ছিল; এবং জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতিকে তখন ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অধিকারীর অনুসর্ত্তব্য একই পথের বিভিন্নরূপ মনে করিতে আরম্ভ করা হয় নাই। এখন যেমন সহজেই আমরা হিন্দুর সাগর-তুল্য বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর একটী মাত্র পথের রেখা দেখিতে চাই, তেমনটী আগে সম্ভবপর ছিল না।

যে জন্যেই হউক, এবং যে সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই হউক, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদ সমূহের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য যদি ভুলিয়া যাইতে চাই, তবে তাহার নৈতিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহাকে ভ্রান্তই মনে করিতে হইবে। জীবনের বিভিন্ন স্তরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সম্ভবপর হইলেও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে তেমন একটা সমন্বয়, কল্পনার বন্যা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও, সম্ভব হয় না। এ দর্শনের কিছু এবং ও দর্শনের কিছু নিয়া একটা তৃতীয় প্রকারের দর্শন সৃষ্টি করা যাইতে পারে; কিন্তু সেটা প্রথমোক্ত দুইটীর মধ্যে সমন্বয় নয়। জড়-প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, সাংখ্য ও বেদান্তের আপোষ সম্ভবে না। আর, বেদান্ত যদি তাহাই করে, তবে তাহার নিজের সত্তা বর্ত্তমান থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ যদি বলেন যে, সাংখ্য সাধন-

পথের একটী সোপান, সেইটী পার হইয়া বেদান্তে পা দিতে হয়, তাহা হইলে, তিনি এমন এক কথা বলেন যাহা সাংখ্যও স্বীকার করিবে না, বেদান্তও মানিবে না। কোনও দর্শনই একথা বলে না যে সে সাধককে কতকদূর মাত্র অগ্রসর করিয়া দিবে, তারপর অন্য দর্শনের পালা। বরং প্রত্যেক দর্শনই বলে যে, তার পথই একমাত্র পথ এবং সেই পথেই চরম গন্তব্যস্থানে উপনীত হওয়া যায়; অন্য দর্শনের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি চৈতন্যের সময়েও—৫০০ শত বৎসর আগেও লোপ পায় নাই। তারও আগে পরস্পরের পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্তই সর্ব্বপ্রধান। এই দুইটীই মুক্তির পথ বলিয়া বিঘোষিত হইয়া আসিয়াছে; অথচ, কখনও একে অন্যের সহায়ক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যের বহু পুরুষ-বাদ এবং জড় প্রকৃতি হইতে জগতের উদ্ভব—এই দুইটী প্রধান কথার বিরুদ্ধে বেদান্ত আপ্রাণ চেষ্টায় যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এ কথা কখনও বলেন নাই যে, নিম্ন স্তরের অধিকারী গোড়ায় জড় প্রকৃতির উপাসনা করিয়া ক্রমশঃ অদ্বৈতবাদে উন্নীত হইয়া অন্তিমে মুক্তির অধিকারী হইবে। সুতরাং এই দুইটী দর্শন যে বিভিন্ন পন্থা এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পন্থা,—সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

বেদান্তের উৎপত্তি উপনিষদে; তারপর সূত্র, এবং তারপর শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক প্রভৃতি টীকাকারগণ পরে, বিদ্যারণ্য, ধর্ম্মরাজা ধ্বরীন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি। মোটামুটি বৈদান্তিকদিগকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা অযৌক্তিক না হইলেও ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত হইবে না, যে, শঙ্কর ও রামানুজ, কিংবা শঙ্কর ও মাধবাচার্য্যের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রহিয়াছে।

বেদান্ত কখনও সাংখ্যের মত লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সাংখ্যের উৎপত্তি ঠিক শ্রুতিতে না হইলেও সেখানেও সাংখ্য মতের অনুমোদক বাক্যের একেবারে অভাব নাই। বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং" (৪।১০), 'তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ।' (১।৪) ইত্যাদি উক্তি সাংখ্য মতের পরিপোষক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল শ্রুতিবাক্যের এই অর্থ বৈদান্তিকেরা স্বীকার করেন না। আর এটাও সত্য যে, এখানে ওখানে দুই চারটী বাক্য সাংখ্য মতের সহায়ক হইলেও মোটের উপর বেদান্ত বৈদান্তিক মতই প্রচার করে।

কিন্তু ঠিক শ্রুতির ভিতর সাংখ্যের উৎপত্তি না হইলেও মনে হয় উহা হিন্দুর জীবনে ও মনে বেদান্তের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিবাদ এবং গুণত্রয় বিভাগ অতি বড় বৈদান্তিক গ্রন্থ ভগবদ্গীতাও একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই। আর পুরাণে, রামায়ণ, মহাভারতে এই সাংখ্য মত এত বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, আর কোনও দার্শনিক মতই তার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

"অহং পুমান্ ত্বং প্রকৃতি র্নাহং স্রষ্টা ত্বয়া বিনা।
যথা নাহং কুলালস্থ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা।"

সংস্কৃত ও বাংলা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে এই উক্তি অনুসারেই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণ ও রাধা সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। এটা অন্ততঃ ঠিক যে, সাংখ্য পুরুষ প্রকৃতির ধারণা দ্বারা যে ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে, বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণ-রাধার ধারণা দ্বারাও তাহাই করিয়াছে। আর বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণ রাধার মধ্যে যে প্রেমের অভিনয় কল্পনা করিয়াছেন, সাংখ্যকারদের কাছে তাহাও অজ্ঞাত নহে। যথা, ঈশ্বর কৃষ্ণ—

"রঙ্গস্থ দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে যথা নর্ত্তকী নৃত্যাৎ।
পুরুষস্থ তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥ ৫৯
নানাবিধৈ রুপায়ৈরু পকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যা গুণস্থ যতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি॥ ৬০

এখানে প্রকৃতিকে নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের চিত্তাকর্ষণে নিযুক্তা বলা হইয়াছে; আর, তাহার পুরুষপ্রীতি রাধিকার অহৈতুক প্রেমেরই মত।

সাংখ্যের লোকপ্রিয়তার প্রমাণ এই খানেই শেষ হইল না। তাহার পুরুষ বহুত্ববাদের উপর কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত; এবং তাহার গুণত্রয় বিভাগের উপর শাস্ত্রাগত বিবেক প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত যোগ প্রক্রিয়াই যে সাংখ্যের উপর নিহিত, সে কথা না বলিলেও চলে।

তন্ত্রে শক্তি বা মহামায়ার যে ধারণা পাওয়া যায়, তাহার সহিত সাংখ্যের প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নাই, এমনও মনে হয় না। শৈবদের হর-গৌরী, অৰ্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতির কল্পনাও সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির সদৃশ। পুরাণের ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা সাংখ্যের গুণত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্র যে সাংখ্য দর্শনের উপর গঠিত তাহার প্রমাণ, চরক সংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে অগ্নিবেশের প্রশ্ন—"প্রকৃতিঃ কা বিকারাঃ কে কিং লিঙ্গং পুরুষস্য চ।" সুশ্রুতের শারীরস্থানে প্রথম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট দেখা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে সাংখ্য দর্শনের প্রভাব কত বেশী বিস্তৃত হইয়াছিল। সুশ্রুত লিখিতেছেন :—

"সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তং নাম। তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং অধিষ্ঠানং সমুদ্রইবৌদকানাং ভাবানাং। ২

তস্মাদ ব্যক্তাৎ মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লিঙ্গ এবাহঙ্কারঃ উৎপদ্যতে।" ইত্যাদি। ৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুশ্রুতও মানব দেহের উৎপত্তি এবং তাহার চিকিৎসা বিধান সাংখ্যের অব্যক্ত, মহান্ প্রভৃতির উপরই গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ইহার চেয়ে বেশী প্রমাণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। মনে হয়, ইহাতেও স্পষ্ট দেখা যাইবে, সাংখ্য হিন্দুর জীবনে কতখানি আধিপত্যলাভ করিয়াছিল। ঠিক লোকায়ত দর্শনের মত না হইলেও সাংখ্য যে লোকপ্রিয় ছিল সে বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সাংখ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বেদান্ত। বেদান্তও ইহা জানেন যে, সাংখ্যই তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তা না হইলে, সাংখ্যের বিরুদ্ধে এত যুক্তিজাল তিনি বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেন না। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে এই যে এতটা গভীর প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা হইতে স্বতঃই মনে এই একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই দুইটী দার্শনিক মত কি তবে পরস্পর-বিদ্বেষী দুইটী জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল?

সাংখ্য শ্রুতিসম্মত দর্শন নহে; এবং ইহার আস্তিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে। তথাপি এ কথা কেহই কুত্রাপি বলেন নাই, যে ইহা অব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে উৎপন্ন হইয়াছে। বরং কপিলকে আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানি; এবং শঙ্কর (বেদান্ত ভাষ্য ২।১।১) যদিও "অন্যস্য চ কপিলস্য সগর পুত্রাণাং প্রতপ্তু বাসুদেব নাম্ন স্মরণাৎ" বলিয়া সাংখ্যকারকে পৃথক করিয়া দিতেছেন, তথাপি ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, দুইজন কপিলই ঋষি। তা ছাড়া, পঞ্চশিখ প্রভৃতি অন্যান্য সাংখ্য মত প্রবর্ত্তকগণও প্রসিদ্ধ ঋষি। সুতরাং সাংখ্যকে অশ্রৌত মনে করিতে পারিলেও অব্রাহ্মণ মনে করা যায় না।

কিন্তু বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সে কথা তত সহজে বলা চলে না। বরং Garbe প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয় মনীষীগণ মনে করেন যে, উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তের একেবারে গোড়ায় ক্ষত্রপ্রভাব এত বেশী যে, উহাকে ব্রহ্মের বিদ্যা হিসাবে ব্রহ্মবিদ্যা বলা অসঙ্গত না হইলেও ব্রাহ্মণের-বিদ্যা উহা নয়। পরবর্ত্তী সময়ের সূত্রকার এবং টীকাকারগণ যদিও ব্রাহ্মণই ছিলেন, তথাপি যে শ্রুতির উপর বেদান্তের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেটা অব্রাহ্মণের সম্পত্তি—সেখানে উপদেষ্টা ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণেরা পরে—হয় ত বা দায়ে ঠেকিয়া—ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের পশুহিংসাময় যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ক্ষত্রিয়দের প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা হইতেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে; অসার বৈদিক উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্ত্তে সারবান্ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অবশ্যই, এই অভিমতের পক্ষে যে কিছু বলিবার নাই, এমন নয়। বৃহদারণ্যক এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদের অজাতশত্রু ও গার্গ্য বালাকির উপাখ্যান, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক-ধৃত প্রবাহন জৈবলি ও আরুণেয় শ্বেতকেতুর উপাখ্যান, প্রভৃতিতে দেখা যায়, ব্রহ্মবিদ্যায় অপটু ব্রাহ্মণ 'রাজন্য বন্ধু'র নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন।

তা ছাড়া, যোগবাশিষ্ট (মুমুক্ষু প্রকরণ) ব্রহ্মবিদ্যাকে 'রাজবিদ্যা' এবং 'রাজগুহ্য' বলিয়াছেন। রাজাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের বিদ্যা বলিয়া উহা রাজবিদ্যা; এবং তাঁহাদের দ্বারাই রক্ষণীয় বলিয়া উহাকে 'রাজগুহ্য' বলা হইয়াছে। রাজবিদ্যা শব্দের এই অর্থ সকলে গ্রহণ করেন নাই সত্য,

তথাপি যোগবাশিষ্ঠ যে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছেন, তাহা হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে হয় ত বা ব্রহ্মবিদ্যা আদিতে রাজাদেরই সম্পত্তি ছিল; এবং পরে ক্রমশঃ উহা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দাঁড়াইবে এই যে, ঠিক ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রাহ্মণদের বিদ্যা নয়; অথচ নিরীশ্বর, শ্রুতি দ্বারা অসিদ্ধ সাংখ্য দর্শন ব্রাহ্মণের সম্পত্তি এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়দের বিদ্যা নয়। স্থানান্তরে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সে সমস্ত যুক্তিতর্কের পুনরুক্তি করা এখানে সম্ভবপর নহে। তবে, মনে হয়, ইহা প্রমাণ করা মোটের উপর কঠিন নয় যে, যে সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যাকে ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব জিনিস মনে করিয়াছেন, সে সকল দ্বারা এই মাত্রই প্রমাণিত হয়, যে রাজন্যগণ ব্রহ্মবিদ্যার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সাংখ্য যেমন ব্রাহ্মণদের জিনিস, শ্রৌত ও যাজ্ঞিক ধর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, তেমনই ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যাও ব্রাহ্মণদেরই মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে হিন্দু সমাজ যেমন বিভক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও তেমনই নানাবিধ সম্প্রদায় ছিল। কুরু পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞবিধির বিরাট স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন; আর, প্রাচ্য দেশ কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বপ্রথম দিবালোক দর্শন করে। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা উপলক্ষে বিদেহরাজ জনকের উল্লেখ এত অধিক দৃষ্ট হয় যে, বিদেহের রাজসভায় যে প্রচুর ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। অবশ্যই রাজসভার আলোচনায়ই বিদ্যার প্রচার হয় না; রাজসভায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত তখনকার ব্রাহ্মণেরাও বিত্ত ও যশঃ অর্জ্জন করিতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় দিয়া অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। আবার বিচারে পরাজিত হইলে কি হইত—তাহা মহাভারতের বনপর্ব্বে অষ্টাবক্র জনক সংবাদে পাওয়া যায়। বিচারে জয়লাভ করিয়া অর্থ প্রাপ্তির আশায় জনকের সভায় অনেকেই যাইতেন।

> "গচ্ছাবো যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো
> বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রূয়তে তস্য যজ্ঞঃ।
> শ্রোষ্যাবোঽত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদম্
> অর্থশ্চাগ্র্যং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ॥"

ঋষি অষ্টাবক্রের পিতা কাহোরও এইরূপ অর্থপ্রাপ্তির আশায় সেখানে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট বিরূপ ছিল; তিনি বিচারে পরাস্ত হইয়া জলে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

> "উদ্দালকস্যৈবং ভার্য্যায়া বৈ কহোড়ঃ
> বিত্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ।
> স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য
> নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ॥"

কিছুকাল এইরূপে জলবাস করিবার পরে পুত্র অষ্টাবক্র তাঁহাকে সেই দশা হইতে মুক্ত করেন; সেও তাঁহার পরাজেতাকে ব্রহ্মবিদ্যার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিল।

বিদেহরাজের সভা যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার একটা বড় কেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু রাজদরবার কখনও অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হয় না, ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্রেরা সে বিদ্যালাভ করিতেন কোথায়?

বলা বাহুল্য, যে সকল ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে বিদেহরাজের সভায় ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিতে পাই, তাঁরাই যে গৃহে ছাত্রদিগকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, এটাও সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল কোথায়? Mac. Donell (Vedic Index) মনে করেন, ইঁহারা সব কুরু-পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণাবলীর বিচার এখানে করা সম্ভব নহে; তবে, সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, কুরু-পঞ্চাল দেশের রাজাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতে দেখা যায় না, অন্ততঃ বিদেহরাজ জনকের মত কিছুতেই নয়। বিদ্যান্বেষী এবং বিদ্যাদাতা ব্রাহ্মণ চিরকালই রাজার আশ্রয়ী;—"শাস্ত্রং বিজয়স্য পরম্পরয়ং।" সুতরাং বিদেহরাজ যদি ব্রহ্মবিদ্যার একজন প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া

থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণেরাও তাঁহারই আশ্রয়ে ছিলেন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হইবে না। অবশ্যই ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁরা নানা জায়গায়ই গমন করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে একাধিক জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর বিদেহের রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়াই ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং আলোচনা চলিত,—এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি। রাজা ছিলেন পৃষ্ঠ-পোষক, এবং অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাও ব্রাহ্মণের নিকটই প্রতিভাত হইয়াছিল—"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণম্ আজগাম।"

এই হইল ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি। তারপর দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইলে পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই বিদ্যাকে আবার নূতন জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে দেখিতে পাই। মালতী মাধবে ভবভূতি নিজেকে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন ;—"অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মনগরং নাম নগরং। তত্র কেচিৎ ··· ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।" —ইত্যাদি।

কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার পরিপূর্ণ বিকাশ এই সব সাহিত্যিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা হয় নাই ; সেটী হইয়াছিল—শঙ্কর প্রভৃতি গৃহত্যাগী যতিবৃন্দ দ্বারা। বলা বাহুল্য, সাগ্নিক না হইলেও ইঁহারাও ব্রাহ্মণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহা মোটের উপর ব্রাহ্মণদের সম্পত্তিই রহিয়া গিয়াছে ; হস্তান্তরিত হইবার অবকাশ কিংবা হেতু ইহার বিশেষ ঘটে নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে যথেষ্ট কলহ হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কলহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও ত ঢের হইয়াছে ; পুরাণে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহের কথা রহিয়াছে—বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণ। তারপর বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩য় অঃ)। শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না ঘটিয়াছিল! সে ত জনকরাজার সভায়। যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে বলিলেন—"তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তং চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি—ইতি ; তং হ ন মেনে শাকল্য তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাত"—ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক লগুড়াঘাত করিয়া শাকল্যকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। তবে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভায় কৃষ্ণ যদি আপনার পিস-তুতো ভাই শিশুপালকেই মারিয়া ফেলিতে পারিলেন, তাহা হইলে তর্কে উন্মত্ত এক ব্রাহ্মণের পক্ষে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করা কিছুই বিচিত্র নহে। যেমন করিয়াই হউক, শাকল্য সেথা প্রাণত্যাগ করিলেন। যাহা হউক ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও যে কলহ হইত তাহার তেমন প্রমাণ প্রয়োগেরই বা দরকার কি ? মানুষে মানুষে ঝগড়া হইতে পারিলে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও হইতে পারে। এবং ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে যে, যাজ্ঞিক কর্ম্মপটু ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রায়ই বিবাদে নিযুক্ত হইতেন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনেও তাহার উদাহরণ মিলে।

কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের সহিত ঠিক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ না হইলেও, ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারকেরাও ব্রাহ্মণই ছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম এবং দেবার্চ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে উপনিষদে দুই একটা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে সত্য ; এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ আর ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণ হয়ত ঠিক একও ছিলেন না ; তথাপি ইহা বলা ঠিক হইবে না যে, ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ক্ষত্রিয়দের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরাও দ্বিজ, বেদে অধিকারী, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও অধিকারী ছিলেন ; এবং একজন ক্ষত্রিয় শাক্যসিংহ বিরাট বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন ; তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার সৃষ্টি এবং পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিস্তার ব্রাহ্মণদের দ্বারাই ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মৈমনসিংহ গীতিকা।

(সমালোচনা)

চন্দ্রাবতী—নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত।

চন্দ্রাবতী ব্রাহ্মণ কন্যা ; জয়ানন্দ তাহার সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ তনয়। উভয়ে প্রত্যহ প্রাতে বাগানে ফুল তুলিতে আসিত। এইরূপে ক্রমে তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রেমপত্র লিখিল। চন্দ্রা উত্তর করিল, আমার পিতা থাকিতে এ বিষয়ে আমার কোন হাত নাই। কুমারী ইহা লিখিল বটে ; কিন্তু মনে মনে দেবতার

নিকট প্রার্থনা করিল, জন্মে জন্মে যেন জয়ানন্দই তাহার বর হয়। কবির ভাষায়—

তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া,
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া।
বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে রক্তজবা সারি,
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি।
বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মল্লিকা মালতী,
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি।

এই কয়েকটি কবিতায় চন্দ্রাবতীর হৃদয়ের প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু লজ্জাশীলতা বশতঃ তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই, এই লজ্জায় তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে।

ইহার পর বিবাহের প্রস্তাব হইয়া দিন ধার্য্য হইল। চন্দ্রার পিত্রালয়ে বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, কেবল বরপক্ষ আসার অপেক্ষা, এমন সময়ে হঠাৎ সংবাদ আসিল, জয়ানন্দ কোন মুসলমান রূপসীর প্রণয়ে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। বাড়াময় ক্রন্দনের রোল উঠিল। কবির আপন ভাষায়—

শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন,
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন।
না কান্দে না কান্দে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী
নাহি সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুণে,
জানিতে না দেয় কন্যা জলা বয়ে মনে।
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
পাতেতে রাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায়।
ত্রিকালে শয়শয্যা বহে চক্ষের পানি,
বালিশ ভিজিয়া ভিজে বেতের বিছানি।
শৈশবের যত কথা আর ফুল তোলা,
নদী কূলেতে গিয়া করে জলখেলা।
সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে,
ঘুমাইলে দেখে কন্যা তাহারে স্বপনে।

বিশুদ্ধ প্রেমের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণনা আর কি হইতে পারে? যে কোন কাব্যের যে কোন কবিতার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

এই ঘটনার পর নানাস্থান হইতে চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু কুমারী আর বিবাহে সম্মত হইল না। কবির ভাষায়—

চন্দ্রাবতী বলে পিতা মম বাক্য ধর,
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবড়।
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি,
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি।
অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে
শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।

প্রণয়ে নিরাশ হইয়া চিরকুমারী থাকার বৃত্তান্ত উপন্যাসে দুই একটা দেখা যায়। পাঠক, এ কথা মনে রাখিবেন, ইহা উপন্যাস নহে, সত্য ঘটনা। চন্দ্রাবতী ইহার পর শিব পূজা করিয়া ও রামায়ণ লিখিয়া সময় কাটাইতেন। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা রামায়ণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এখানে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমরা এখন সংস্কৃত ও ইংরাজি, উভয় ভাষা শিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছি। কিন্তু চন্দ্রাবতীর পিতা বংশী দাসের মত প্রশস্তমনা লোক একালে কেহ আছে কি? তিনি যেরূপ প্রশান্ত মনে কন্যাকে চিরকুমারী থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এখন কোন পিতা সেরূপ সাহস করিবেন কি? দীনেশ বাবু বলেন, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব বর্ত্তমান ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাস্ত্রীয় বন্ধন এ অঞ্চলে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। এই সকল গাথা পাঠেও জানা যায়, জলের ঘাটে ও পুষ্পোদ্যানে কুমারীগণের সহিত যুবকগণের দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিত এবং তাহাদের প্রণয়পত্রের আদান প্রদান রীতিও তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। আরও জানা যায় যে দশমবর্ষ বয়সে কন্যার বিবাহ না দিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হয়, এ বিশ্বাস তৎকালে এ অঞ্চলে প্রবেশলাভ করে নাই। নানা বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা বালিকাদের মনোবৃত্তি নিচয়ের সম্যক বিকাশ হইতে পারিত। এইরূপ স্বাধীন থাকা ভাল কি মন্দ, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না, এইমাত্র বলিতেছি যে এই সকল কারণে বালিকাদের মানসিক বল এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল এবং সে কারণেই চন্দ্রাবতী চিরকৌমার্য্য ব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে এইরূপ চিরকুমারী

থাকার কথা স্বপ্নেরও অগোচর; ব্রাহ্ম সমাজে যে দুই একটি দেখা যায়, তাহা চন্দ্রাবতীর ঠিক অনুরূপ ঘটনায় নহে।

কিছুদিন পরেই জয়ানন্দ অনুতপ্ত হইয়া চন্দ্রাকে লিখিল—

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই,
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই।
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল,
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল।
জানিয়া ফুলের মালা কাল সাপ গলে,
মরণে ডাকিয়া আমি অন্যাছি অকালে।
তুলসী জানিয়া আমি পূজিলাম শেওরা,
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পশরা।
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়,
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায়।
একবার দেখিব তোমায় জন্মশোধ দেখা,
একবার দেখিব তোমার নয়ন ভঙ্গী বাঁকা।
একবার শুনিব তোমার মধুর-রস-বাণী,
নয়ন জলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুখানি।
না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া,
পুণ্য মুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা।

এখানে ভালবাসা মিশ্রিত তীব্র অনুতাপ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পত্র পড়িয়া চন্দ্রাবতীর হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। কিন্তু পিতার নিষেধ বশতঃ জয়ানন্দের সহিত দেখা করিল না; শিব মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিল। জয়ানন্দ আবার আসিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল—

দ্বার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে সুধাই,
জীবনের শেষ তোমায় একবার দেখ্যা যাই।
আর না দেখিব তোমায় নয়ন চাহিয়া,
দোষ ক্ষমা কর কন্যা শেষ বিদায় দিয়া।

চন্দ্রাবতী ধ্যানে বসিয়াছিল; কোন উত্তর করিল না, দ্বারও খুলিল না। নিরাশ যুবক উত্তর না পাইয়া কপাটে লিখিল—

শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের সাথী,
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত
বিদায় মাগি চন্দ্রবতী জনমের মত।

এই কয়েকটি কবিতায় এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্ধৃত আর চারিটি পঙক্তিতে করুণরস সুন্দররূপে ফুটান হইয়াছে এবং যুবকের অনুতাপ মিশ্রিত শোকের উচ্ছ্বাসও সুব্যক্ত হইয়াছে।

ধ্যান ভঙ্গের পর চন্দ্রাবতী বাহির হইয়াই জয়ানন্দের লেখা দেখিতে পাইল। মন্দির অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া স্নান করিবার অভিপ্রায়ে ও শোকাকুল চিত্তে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, জল মধ্যে জয়ানন্দের মৃত দেহ ভাসিতেছে। মনের উদ্দাম বাসনা সংযত করিতে না পারিলে যে দশা হয়, কবি এখানে তাহা অতি সুন্দররূপেই দেখাইয়াছেন। তৎপর চন্দ্রাবতীর মনের অবস্থা বিশেষ বর্ণন করিতে চেষ্টা না করিয়া কবি অতি সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দরই হইয়াছে।

আঁখির পলক নাই মুখে নাই সে বাণী,
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী!
স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান চান্দে গায়,
নিজের অন্তরের দুক্ষ পরকে বুঝান দায়।

গ্রাম্য ভাষায় হইলেও স্থানে স্থানে স্বভাব বর্ণন অতি সুন্দর হইয়াছে। যথা,—

আস্তে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা,
প্রভাতে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা।

চন্দ্রাবতীর চরিত্রের সমালোচনা করা একরূপ অসম্ভব। যে স্বর্গীয় প্রেমের ভাব তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহার প্রভাবে সেই প্রণয়ের পাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, ও চিরকুমারী থাকার ভাব তাহার মনে উদিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র প্রেমের মহানভাব লিখিয়া বর্ণনা করিতে পারা মনুষ্য শক্তির অতীত। যে দেশে চন্দ্রাবতীর ন্যায় নারীর জন্ম হইয়াছে, সেই দেশ ধন্য, এবং সে দেশের ভবিষ্যৎ কিছুতেই নৈরাশ্যজনক নহে।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

অপহৃতা

আজ মহিম বাবুর মেয়ের বিবাহ। কিন্তু বিবাহ উৎসবের কোন জাঁক্‌-জমক্ এ বাড়ীতে লক্ষিত হইতেছে না। মাতৃহীনা কন্যা মালতীলতা অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে বসিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিতেছে। মহিমবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও বিধবা ভগ্নী বিবাহকার্য্যে ব্যস্ত, মালতীর সংবাদ লইবার তাহাদের সময় কোথায়?

মালতীর আজ নিজকে একান্ত অসহায় মনে হইতেছে; এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। পিতা যে এরূপ হৃদয়হীন হইয়া একজন বৃদ্ধ, মদ্যপ ও হাঁপানী রোগীর হাতে তাহাকে সমর্পণ করিবেন তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই।

পাড়াগাঁয়ে তাহাদের বাড়ী, কিন্তু মালতী সহরে মামাবাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে, এবং সমবয়স্কা মেয়েদের মত সেও মনে মনে কত নভেল গড়িয়াছে। তাহার সমস্ত কল্পনার যে এরূপ বীভৎস পরিণতি হইবে তাহা ভাবিয়া, বিশেষতঃ আজ তার মা বাঁচিয়া থাকিলে কখনই পিতা এরূপ সম্বন্ধ করিতে সাহসী হইতেন না চিন্তা করিয়া মায়ের শোক আজ মালতীকে অধীর করিয়া তুলিল। নয়নের জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, নূতন বরের মূর্ত্তি তাহার নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেই মালতী শিহরিয়া উঠিল। একান্ত নিরুপায় হইয়া সে আত্মহত্যা দ্বারা এই অসহ্য যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, তিন চারি দিন পূর্ব্বে সে তাহার মামাত বোন্ সুশীলার নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইয়া পত্র দিয়াছে। সুশীলা মালতীকে খুব ভালবাসিত। মালতী ভাবিল হয়ত সুশীলা পত্র পাইয়া তাহার স্বামী দ্বারা কোন উপায় করিতে পারিবে; কিন্তু পরক্ষণেই সে নিরাশ হইল, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আজ রাত্রেই বিবাহ; আর কোন্ সময়ে উপায় হইবে? বিশেষতঃ এই পাড়াগাঁয়ে যান-বাহনের অভাবে তারানাথ হয়ত আসিতেই চাহিবে না। আবার মালতী হতাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তবে কি যমরাজ ভিন্ন তাহার অন্য কেহ আশ্রয় নাই? মদ্যপ, বৃদ্ধ হাঁপানী রোগীর হস্তে সে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবে না—তাহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

সন্ধ্যার সময় তারানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহিম বাবু খুব খুসী হইলেন এবং তাহার যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন। এত বড় ধনাঢ্য কুটুম্ব বিনা নিমন্ত্রণে তাহার মত দরিদ্রের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। তারানাথ প্রণাম করিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই উত্তেজিতভাবে বলিল "মালতীর এই বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া যায় না কি? এইরূপ একটা বুড়ার সঙ্গে মালতীর মত সুন্দরী ও গুণবতী মেয়ের বিয়ে কিছুতেই সাজে না।" তারানাথের এই উত্তেজনায় মহিমবাবু হাস্য করিলেন। তারানাথ সমস্ত পথ মালতীর পত্রের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ছিল।

মহিমবাবুর হাসিতে তারানাথের রাগ হইল, সে একটু তীক্ষ্ণভাবে বলিল "মালতীর একটী ভাল বর আমি ঠিক ক'রে দিব, আপনি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিন্।"

মহিমবাবু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বিরক্তি গোপন করিয়া বলিলেন, "বাবাজী, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছ, একটু ঠাণ্ডা হও। আজ রাত দশটায় বিয়ের লগ্ন, এখন কি এ সব ভাব্‌বার সময় আছে?"

মহিমবাবুর কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বর পক্ষের শোভাযাত্রার তুমুল বাদ্যধ্বনি কর্ণগোচর হইল। মহিম-বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বর পক্ষের অভ্যর্থনার জন্য ধাবিত হইলেন। অন্তঃপুরের মেয়েরাও সকলে বর দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অগ্রসর হইল। তারানাথ সুযোগ পাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মালতীর সহিত দেখা করিল এবং তাহাকে আশ্বাস দিল। এই সুযোগে তাহাদের মধ্যে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শ শেষ করিয়া বাহির হইতেই মহিমবাবুর সহিত তারানাথের আবার দেখা হইল।

তারানাথের কথায় মহিমবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, "কোথাকার এক ছোক্‌রা তাঁকে উপদেশ দিতে এসেছে! তার কন্যার কিসে ভাল হ'বে তা কি সে জানে না? বরের বয়স একটু বেশী, তাতে কি ক্ষতি? ঐ যে হরি খুড়ো বাট্ বছরে বিয়ে করে ছিল—সে ত ৫।৭টী ছেলেপেলে রেখে মরেছে! সবই মেয়ের কপাল!!! আর বলতে কি—এই বর তেমন বুড়াই বা কি? মস্ত লোক, সংসারে অভি-

ভাবক নেই, এখন শ্বশুরই অভিভাবক হ'বে। মালতী যদি একটু চালাক হয় তবে চাই কি নুরজাহানের মত রাজত্ব করতে পারবে।” মহিমবাবু মনে মনে এরূপ বলিতেছিলেন।

তারানাথ মহিমবাবুকে গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে তাহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল—

“পিসে মশাই, আপনি রাগ করবেন না, আমি আপনার পায়ে পড়ি; এ বিয়ে ভেঙ্গে দিন! আমি বিয়ের ভার নিলুম সমস্ত খরচ আমি দিব। মালতীর সর্ব্বনাশ করবেন না।” মহিমবাবু তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বরপক্ষের একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, বরের মাতুল-সম্পর্ক, পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মহিমবাবু তারানাথের বাড়াবাড়িতে ক্রুদ্ধ হইয়া উগ্রভাবে বলিলেন—“দেখ, আমাকে তুমি ছেলে মানুষ পেয়েছ? একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে কথা দিয়ে বিয়ের সমস্ত আয়োজন ক'রে বিনা কারণে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিব!! একি ছেলেখেলা?”

তারানাথ—“হাঁপানী রোগীর হাতে, একটা বুড়া মাতালের হাতে মালতীকে বলি দিচ্ছেন!! এতে আপনার একটুও কষ্ট হয় না?”

এবার প্রৌঢ় ভদ্রলোক থাকিতে পারিলেন না, বরপক্ষের সনাতন রীতি অনুসারে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—“সাবধান! এরূপ কথা আর বলবেন না! মুখ সামলে কথা বলবেন!!”

মহিমবাবুও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “তারানাথ, তোমাকে ত আমি নিমন্ত্রণ করিনি, তুমি কেন অনাহূত হয়ে এসে আমার কুটুম্বকে অপমান কর্চ্ছ?” এই কথা বলিয়া মহিমবাবু কুটুম্ব সহ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

তারানাথ অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিল। যে কাজের ভার সে নিয়া আসিয়াছে তাহাতে কোন অপমানকে গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। সে চিন্তিতভাবে অন্তঃপুরে মালতীর নিকট গেল। তাহার সহিত দেখা করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তারানাথ বাহির হইয়া গেল। বরের আগমনের পর সকলেই ব্যস্ত—তাই তারানাথের গতিবিধি কেহই লক্ষ্য করিল না।

রাত্রি ৯টার সময় মহিমবাবু পুরোহিতকে তাড়া দিলেন, প্রাঙ্গণে বিবাহ-সভা সজ্জিত হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে যাইয়া মহিমবাবু বিধবা ভগ্নীকে কহিলেন “মালতীকে সাজাও, আর দেরী নাই।”

ভগ্নী কহিল—“মালতী কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয় তার কোন অসুখ হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে বারবার পায়খানায় যাচ্ছে।” মহিমবাবু কহিলেন “পেটের অসুখ! দেখি—হোমিওপ্যাথির বাক্সটায় ক্যাম্ফার আছে কি না? যত আ—পদ্ এক সময়ে!!”

মহিমবাবু একজনকে ক্যাম্ফার দেওয়ার হুকুম দিয়া বিবাহ-সভায় গেলেন। বিবাহ-সভা সুসজ্জিত; বরপক্ষের লোক ও অন্যান্য অভ্যাগতগণ আসীন। বর, পুরোহিত, কন্যাকর্ত্তা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। বিবাহ আরম্ভ হইল, প্রাথমিক মন্ত্রাদি পাঠের পর পুরোহিত উচ্চস্বরে বলিলেন “কন্যা আনয়ন করুন, মুখ-চণ্ডিকা করিতে হইবে।”

কয়েকজন লোক মহিমবাবুর ইঙ্গিতে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহারাও ফিরে না, কন্যাও আসে না—এদিকে শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হয়!! পুরোহিত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল “শীঘ্র কন্যা আনয়ন করুন! সর্ব্বকর্ম্মে এমন প্রাগল্ভ করিলে বিধিগর্হিত—”

পুরোহিতের কথা হঠাৎ থামিয়া গেল। অন্তঃপুর হইতে ভীষণ ক্রন্দনের রোল উঠিল। “কি হ'ল, কি হ'ল” বলিয়া বহু লোক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্ষীণদেহ বরের হাঁপানীর টান এত বৃদ্ধি হইল যে, মনে হইল তখনই বুঝি অন্তিম শ্বাস উপস্থিত!! মহিমবাবু আসন ত্যাগ করিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া গেলেন।

শেষবার পায়খানায় যাওয়ার পর মালতীকে আর পাওয়া যাইতেছে না। প্রায় এক ঘণ্টার উপরে তাহার খোঁজ নাই, বিমাতা ও পিসী নানাকাজে ব্যস্ত, ভাবিয়াছে মালতী এখনই ফিরিবে। কিন্তু মালতী আর ফিরিল না!!

এদিকে তারানাথেরও আর খোঁজ নাই। একটা বিশ্রী ইঙ্গিত সহ মালতীর অন্তর্দ্ধান বার্ত্তা বিদ্যুৎবেগে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে লোক বাহির হইল, সব রাস্তায়, সব দিকে ঝোপ, জঙ্গলে অনুসন্ধান করা হইল, কোথাও মালতীকে

পাওয়া গেল না। মহিমবাবু কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন "হায়! মালতী, তোর মনে এই ছিল? এমনি ক'রে আমার মুখে চুণকালী দিলি?"

পাড়াপ্রতিবেশী মহলে মেয়েরা মজলিস্ করিয়া এই রসাল ঘটনাকে বেশ পল্লবিত ও মুখরোচক করিয়া আস্বাদ করিতে লাগিল, ইহা তাহাদের বুভুক্ষিত রসনার বহু দিনের খোরাক সংগ্রহ করিয়া দিল।

(২)

এলাহাবাদে তারানাথের বন্ধু অনিল কলেজে প্রফেসরি করে, সে অবিবাহিত ও তাহাদের স্বঘর। তারানাথ মালতীকে লইয়া বরাবর এলাহাবাদে তাহার বাসায় উপস্থিত হইল। অনিলের বাসায় তাহার মা ও এক বড় বিধবা ভগ্নী শেফালী ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

শেফালী মালতীকে সাদরে গ্রহণ করিল। বহুকাল পরে ব্যথার ব্যথী পাইয়া মালতী পুঞ্জীভূত দুঃখের কাহিনী শেফালীকে জানাইল। শেফালীর প্রাণভরা অকৃত্রিম সমবেদনায় মালতীর হৃদয়-বেদনার অনেক উপশম হইল।

তিন্ চারি দিন পরে একদিন বৈকালে তারানাথের সহিত অনিলের এই বিষয় নিয়া আলোচনা হইতেছিল। তারানাথ বলিল "অনিল, মালতীকে গ্রহণ কর; নৈলে আর উপায় নেই। তোমার বিয়ে না করার ধনুক-ভাঙ্গা পণ আর থাকৃছে না। আমি জানি মালতী তোমার অযোগ্যা নয়।" অনিল সমস্ত শুনিয়া তারানাথের কার্য্য সে সমর্থন না করিয়া পারিল না। কিন্তু বিবাহ! এ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব!! তাহার চিরকালের সঙ্কল্প অতলজলে ডুবাইয়া দিতে হইবে!!! এ কিছুতেই হইতে পারে না!!

মালতী যোগ্যা কি অযোগ্যা এ প্রশ্ন তাহার আদৌ মনে হইল না, সে ভাবিতে লাগিল তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি, প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা তাহার উচ্চাশা—না, সে শৃঙ্খল পায়ে পড়িয়া অসার লোকের মত কেবল মেয়ে মানুষের মন যোগাইয়া এই অমূল্য মানব জনমটা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

অনিল প্রকাশ্যে কহিল, ভাই, মালতীর জন্ত আমার বিশেষ সমবেদনা আছে। কিন্তু আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে, মালতীর একটী ভাল বর খুঁজে দেওয়ার জন্ত আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কিন্তু মহিমবাবু তোমাকে সহজে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া ত আমার মনে হয় না। তিনি যদি মোকদ্দমা করেন তবে উপায় কি?

তারানাথ এ কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে আদৌ প্রবেশ করে নাই। পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—"মালতীকে রক্ষা করিতেই হইবে" তাই সে পরিণামের কথা আদৌ চিন্তা না করিয়া এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সেই পাড়াগাঁয়ে বিশ্রী পথে অন্ধকার রাত্রিতে মালতীকে পুরুষবেশে সজ্জিত করিয়া হাটাইয়া আনিতে তাহার বুক দুরুদুরু কাঁপিয়াছে; প্রতি মুহূর্ত্তে ধরা পড়িবার ভয়ে আতঙ্কে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বহু ক্লেশ ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যখন সে এলাহাবাদে বন্ধুর বাসায় পৌছিয়াছিল, তখন সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার কথায় তাহার নূতন ভাবনা উপস্থিত হইল। তাই ত, পিতার নিকট হইতে যুবতী কন্যা-হরণ—গুরুতর অপরাধ!! কিন্তু তাহার নিজের শাস্তি অপেক্ষা মালতীর লাঞ্ছনার কথা বেশী করিয়া পীড়া দিতে লাগিল।

"মালতী, লজ্জা কি? এ দিকে এস" বলিতে বলিতে শেফালী দুই রেকাবীতে জল খাবার নিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে মালতী মাথা নীচু করিয়া দুই হাতে দুই পেয়ালা চা নিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিল।"

শেফালী বলিল, "আজ দুপুরে মা, আমি ও মালতী বিন্ধ্যেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। মালতী সব দেখে শুনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেওয়ার ইচ্ছা কচ্ছে।"

এ কথায় অনিল ও তারানাথের ভারী কৌতুক বোধ হইল। তাহারা উভয়েই হাসি মুখে কৌতুকের ভাবে বলিল "তাই নাকি?" মালতী লজ্জায় শেফালীর পশ্চাতে মুখ লুকায়িত করিল।

অনিল বলিল—"মালতী শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী করবে না কি?"

শেফালী—"তা ভিন্ন ওর আর কি উপায় আছে?"

অনিল—কেন? মালতীর অভাব কি? তারানাথ ত দরিদ্র নয়!

শেফালী—"গরীব ধনীর কোন কথা হচ্ছে না। তারানাথ একটী নারীকে আত্মহত্যার মহাপাপ থেকে রক্ষা করেছে। এখন এই জীবনটাকে যাতে কোন সৎকার্য্যে লাগাতে পারে তার ব্যবস্থা কত্তে হ'বে। আর মেয়েরা যাতে মানুষ হয়, তাদের নিজের অধিকার পুরুষের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে সেই শিক্ষার ভার নিতে হ'বে। অনিল হাসিয়া বলিল—দিদি, তোমার চিরকালের পুরুষ-বিদ্বেষ! আমরা কি তোমাদের উপর কেবলই অত্যাচার করি?

শেফালী—"শুধু তুমি বা তারানাথকে নিয়ে ত সমাজ নয়। সমাজে চেয়ে দেখ ত একবার মেয়ে মানুষের কী দুর্দ্দশা!! আর আমি শুধু পুরুষের দোষই দেই না, মেয়েরাই কি মেয়েদের উপর কম অত্যাচার করে?" এই বলিয়া চায়ের পেয়ালার দিকে তাকাইয়া বলিল—"চা জুড়িয়ে গেল, তোমরা খাও।"

মালতী এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চায়ের কথা শুনিয়া অনিলের দিকে চাহিতেই চক্ষু নত করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তারানাথ চা খাইতে খাইতে বলিল—দিদি, মেয়ে মানুষের উপর আবার মেয়ে মানুষে কি ভাবে অত্যাচার করে?

শেফালী—"কেন? শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণার কথা কি তোমরা কিছু জান না?"

তারানাথ হাসি মুখে বলিল ও, তাই বুঝি, শাশুড়ী ননদের যন্ত্রণার দায় এড়াইবার জন্তই মালতী মাষ্টারী করিতে চায়?" এই বলিয়া মালতীর দিকে কৌতুক কটাক্ষ করিল। মালতী হাসিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই টেলিগ্রাফের পিয়ন বাহির হইতে ডাক দিয়া কহিল—"তারানাথবাবুকো একঠো টেলী হ্যায়।" তারানাথ বলিল বোধ হয় সুশী তার করেছে, আমি এখানে এসেই তাকে তারে সব জানিয়েছি।" এই বলিয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে যাইয়া টেলিগ্রাফ নিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "অনিল সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভয় করেছি তাই হয়েছে; সুশী লিখেছে, মহিমবাবু কেস্ করেছেন, আমাদের নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।" বলিয়াই তারানাথ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। অনিল টেলিগ্রাফের খামখানা তারানাথের হাত হইতে টানিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে পড়িতে লাগিল। মালতী কাঁদিয়া ফেলিল, অঞ্চলদ্বারা চোখের জল মুছিতে লাগিল।

শেফালী ইহাদের এই ভাব দেখিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" একটা যুবতী মেয়েকে বাপের কাছ থেকে বের করে "চুরি করে এনেছ! কেস্ হবে না? মহিমবাবু কি অর্ঘ্য দিয়ে মেয়ে চোরের পা পূজা করবেন না কি? সাত বছরের কম হবে বলে ত মনে হচ্ছে না।'

তারানাথ হতাশভাবে শেফালীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই মস্তক নত করিয়া হস্তদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। অনিল বলিল—"তাই ত দিদি, এখন কি করা যায়? মালতীকে কোর্টে নিয়ে যে বিশ্রী জেরা করবে, তা ভারী অসহ্য! আর, তারানাথের জেল—এ-ত ভাবতেই পারি না!! এই বলিয়া মালতীর দিকে চাহিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত ব্যথাভরা মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলের অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

শেফালী মালতীকে কাছে টানিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া অনিলের দিকে তাকাইয়া বলিল—এক কাজ কর্‌লে সব গোলমাল মিটে যায়! পার্‌বে তা কর্‌তে?

অনিল আবেগে ব্যস্ত হইয়া কহিল "খুব পার্‌বো, প্রাণ দিয়েও যদি এর প্রতীকার হয় তাই কর্‌বো! বল দেখি কি করা যায়!!

শেফালী অনিলের এই ব্যগ্রতায় ও উচ্ছ্বাসে কৌতুক অনুভব করিয়া একবার মালতীর দিকে ও একবার অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল—প্রাণ দিয়েই এর প্রতীকার কর্‌তে হ'বে তা ঠিক্। এই বলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল মা বলেন মালতীর মতন একটী বৌ পেলে তিনি বেঁচে যান। এ কয়দিন মালতীর সেবা ও যত্ন পেয়ে মার মুখে মালতীর প্রশংসা আর ধরে না। অনিল! মালতীর মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু ভাই, প্রাণ দিয়ে তুমি ঠক্‌বে না, বিনিময়ে যে কোমল প্রাণটী পাবে তুমি, তাতে তোমার এই শুক্‌নো জীবনটী নিশ্চয় মধুতে ভরে উঠবে। এ আমি দিব্বি করেই বল্‌তে পারি।

শেফালীর কথায় অনিল হতভম্ব হইয়া গেল। সে মোটেই এ জন্ম প্রস্তুত ছিল না। মালতীর দিকে চাহিয়া সে লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়া সে নির্ব্বাক্ ও নতমুখ হইয়া রহিল।

শেফালী বলিতে লাগিল—"এতে সব দিক্ রক্ষা হবে, তারানাথও অব্যাহতি পাবে, মালতীরও কোন লাঞ্ছনা হবে না আমরাও সকলে সুখী হ'ব। অনিল! মায়ের অশ্রু কি কোন দিনই শুকাইতে দিবে না? বলিতে ২ শেফালীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং নয়নকোণ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শেফালীর কথা ও অশ্রু মালতীর সাশ্রু করুণ দৃষ্টি ও তারানাথের বিপদ অনিলকে উন্মনা করিয়া তুলিল। মালতীর শিক্ষয়িত্রী হইবার ইচ্ছার মধ্যে কত বড় বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা বুঝিয়া অনিল অধীর হইয়া উঠিল। মালতীর দিকে চাহিয়া অনিল দেখিল সে কাঁদিতেছে!

অনিল আর নিজকে গোপন করিল না। আস্তে আস্তে বলিল "যদি তোমরা সকলেই খুসী হও তবে তাই হউক" বলিয়া সে একখানি বই লইয়া গম্ভীরভাবে পড়িবার ব্যর্থপ্রয়াস করিতে লাগিল।

শেফালী মালতীকে বুকে করিয়া টানিতে টানিতে মায়ের কাছে গিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেই বাড়ীতে উলুধ্বনি পড়িল। এ দিকে তারানাথ অনিলকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুক অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল।

(৩)

টেলিগ্রাফ্ পাইয়া তারানাথের পিতা মহিমবাবুকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। অর্থ লোভী মহিমবাবুকে অর্থদ্বারা বাধ্য করিয়া ইতিপূর্ব্বেই মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। তিনি বিনা আপত্তিতে কন্যা-সম্প্রদান করিলেন।

অনিলের মা বৌ কোলে করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তারানাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তারানাথ মালতীর দিকে সকৌতুক কটাক্ষ করিয়া হাসিমুখে বলিল—শাশুড়ী ও ননদের জ্বালা ভুগিবার জন্ম ভগবান তোমাকে একটীও বাদ দেন নাই। কথা শুনিয়া অনিলের মা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মালতী সলাজ মধুর মুখখানা শাশুড়ীর বুকে সংলগ্ন করিয়া রাখিল।

শেফালী মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"এরূপ চুরি করিয়া একেবারে বিনা শাস্তিতে কেহ পরিত্রাণ পায় নাই" এই বলিয়া একখানা বড় থালা নানারকমের মিঠাই দিয়া পূর্ণ করিয়া তারানাথের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"সব খেতে হ'বে—এই শাস্তি! তারানাথ মৃদুহাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অশোক তরুর প্রতি

থরে থরে তরুশিরে ফুটিয়াছে অশোক-মঞ্জরী।
মধুমাসে মধুময় সবি আজি মধুরে মধুর!
চতুর্দ্দিকে এত শোভা! চিত্ত তবু বড়ই আতুর!
আত্মপর সকলের শোকে দুঃখে শুধু কেঁদে মরি!
অশোকাষ্টমীতে তব কলিযুক্ত জল পান করি',
এবার, হে তরুবর, সর্ব্বশোক করি যেন দুর!
কমে' যেন যায় মম জীবনের পুঞ্জীভূত ধুর!
নববর্ষে মহানন্দে শোক দুঃখ যাব কি পাসরি'!

শুনিয়াছি, হে অশোক, পুষ্প তব "হরোভীষ্ট" অতি!
নিশীথে তাঁহার কাছে কোরো মোর দুঃখ নিবেদন!
কৃপা যদি লভি কভু, কোনো কষ্টে টলিব না আর!
ভুলাইয়া দাও, তরু, অতীতের শোক দুঃখ ক্ষতি!
রঙীন্ ভবিষ্য সদা মাতাইয়া রাখুক্ জীবন!
নতুবা করো হে মোরে শোকে সুখে মহা নির্ব্বিকার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

টাঙ্গাইল মহকুমা খুব অনেক দিনের নহে, কিন্তু যে সকল স্থান লইয়া এই মহকুমার সৃষ্টি, তাহা প্রাচীন। বড়বাজু ও পুখরিয়া পরগণার নাম, আইন আকবরীতে আছে। আকবরের সরকার বাজুহার মধ্যে বড়বাজুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজু ছিল। আটীয়া ও কাগমারীর নাম অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন হইলেও বড় অল্প দিনের নহে। আটীয়া পরগণার প্রতিষ্ঠাতা সইদ খান্‌পন্নি, আকবরের নিকট হইতে

জায়গীর ও মনসব পাইয়াছিলেন। তাঁহার আটীয়ার মসজিদ, জাঁহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১০১৮ হিজরীতে নির্ম্মিত হয়। ইহার ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯১৩ হিজরীতে আটীয়ার সিদ্ধতাপস শাহান্‌শা বাবা কাশ্মীরী পরলোকে গমন করেন। কাগমারী পরগণার প্রতিষ্ঠাতা পীর শাহজামাল, শাহান্‌শা বাবা কাশ্মীরীর ভাগিনেয়; মাতুল ও ভাগিনেয় সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

আকবর ও জাঁহাঙ্গীরের সময়ে টাঙ্গাইলের "ভড়" প্রদেশ অর্থাৎ বিল অঞ্চল, সমৃদ্ধ ও লোক-বহুল হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই এ মহকুমার রক্ত মৃত্তিকা পাহাড় বা "টেঙ্গর" প্রদেশ লোকপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল। সেই সমৃদ্ধির নিদর্শন, এখনও কিছু কিছু আছে। উহার ইতিহাস এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গড়ারণ্যের অগণিত দীর্ঘিকা, ও ক্রোশব্যাপী বিধ্বস্ত নগরীর ইষ্টক স্তূপের মধ্যে কত পাল, সেন, দত্ত, হোড়, চন্দ্র, ও বর্ম্ম নৃপতির ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের কাহিনী প্রোথিত রহিয়াছে, আজিও তাহার নির্ণয় হয় নাই। কোন্ ভাগ্যবান্ স্বদেশ-ভক্ত সাধক, তাহার উদ্ধার করিবেন, কাল তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

পাল, সেন, চন্দ্র ও বর্ম্ম রাজগণের সময়ে এই ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির দক্ষিণ সীমা, "সহরে ঢাকা" পর্য্যন্ত। তৎপরে সমতট বা বঙ্গ। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্ব সীমা দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ, লৌহিত্য সাগরে মিশিয়াছিল। সে লৌহিত্য সাগর এখন নাই। "হাওরে" ও বিলে আপনার শেষ চিহ্ন রাখিয়া উহা স্থলে পরিণত হইয়াছে। যে শ্রীবিক্রমপুর নগরে স্কান্ধাবার স্থাপন করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা "ভগবন্তং বিষ্ণু ভট্টারকং" বা "বুদ্ধ:ভট্টারকমুদ্দিশ্য"—ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে এই মহকুমারই রক্ত মৃত্তিকা প্রদেশে সে কালের ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, ইহা দৃঢ়ভাবে অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছে। যে কাম্বোজাক্রমণে বরেন্দ্র ভূমির পালরাজা, বিনষ্ট হইয়াছিল, খুব সম্ভব সেই কারণেই এ মহকুমার রক্তমৃত্তিক প্রদেশের "শ্রীবিক্রমপুর" ও অন্যান্য সমৃদ্ধ নগর ও বিধ্বস্ত হয় এবং এই সকল স্থানের অধিবাসীরা দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিয়া আধুনিক বিক্রমপুর পরগণায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রাচীন বিক্রমপুরের নামেই যে, এ পরগণার নামকরণ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। টেঙ্গর প্রদেশের অধিবাসী কোচ, মান্দাই প্রভৃতি জাতি, সেই বিজেতা কম্বোজদিগের অন্বয়-জাত হইতে পারে।

কাম্বোজাক্রমণে এই মহকুমার প্রাচীন বাসভূমির পুরাতন যে সকল অধিবাসীরা দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যান, পরে আকবর ও জাঁহাঙ্গীরের রাজত্বে এ দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদেরই অধস্তন বংশধরেরা চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, ফতে-আবাদ ও বরেন্দ্রভূমি হইতে এ মহকুমার "ভড়" প্রদেশে আসিয়া বসতি করিতে থাকেন। কাজেই এ মহকুমার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতি ভদ্র মুসলমানদিগের বসতি, চারি পাঁচ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কিন্তু সুখের বিষয়, ইঁহাদের বসতির সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রদেশে সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা চারি শত বৎসরের ও অধিক প্রাচীন কবি "জগন্নাথ বিজয়" রচয়িতা মুকুন্দ ভারতীকে এ মহকুমায় পাইতেছি। অন্ধ-কবি ভবানীপ্রসাদ, কেবল টাঙ্গাইলের নহে, সমগ্র বাঙ্গালার গৌরব। হরিদত্তের "কালিকা-পুরাণ," তত্ত্ব ব্যাখ্যার হিসাবে এক অপূর্ব্ব বস্তু। টাঙ্গাইল, আপনার পুরাতন শব্দ সম্পুটের এই সকল রত্ন, সাহিত্যের প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিয়া এখনও গৌরবের দাবী করিতে পারে।

যজ্ঞ বিরোধী বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবে বৈদিক উপাসনা পদ্ধতি বিলুপ্ত বা লুপ্ত-প্রায় হইলে, হিন্দুর উপাসনা-স্রোত পঞ্চধারায় বিভক্ত হয়। সেই পঞ্চধারা—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য। ইহার মধ্যে সৌর ও গাণপত্য পদ্ধতি বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠা পায় নাই। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে "বিঘ্ন-নাশায় গণেশায়"—বলিয়া গন্ধপুষ্প দিলেও বাঙ্গালী গণ-পতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই এবং "জবা-কুসুম সঙ্কাশ" বলিয়া সূর্য্যকে নিত্য প্রণাম করিলেও সৌরমত গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব—এই তিন ধারাই প্রবল ছিল এবং এখন ও আছে। এই তিন মত ব্যতীত আরও একটি মতবাদের স্রোত বাঙ্গালায় প্রবাহিত ছিল। উহা বৌদ্ধ মত। এই মতবাদ, কখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণবের খাতে প্রবাহিত হইয়াছে,

কখন ও বা স্ব-রূপে ব্যক্ত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্র ধারায় চলিয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালা এই চারি মতের সাধনা-উপাসনার কথায় আপনার সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত-ভাণ্ডারে এই চারি শ্রেণীর সাহিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে যখন মুসলমানেরা এ দেশে আসিলেন, তাঁহাদের ঋষি-তপস্বী পীর মুরসিদেরা আপনাদের ভজন সাধনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টায় আর একবিধ সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। নাম দিতে হইলে উহাকে আমরা "দরবেশী" সাহিত্য বলিতে পারি।

শুদ্ধ-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৌদ্ধ, শৈব-বৌদ্ধ, বৈষ্ণব-বৌদ্ধ ও দরবেশ—ইহারা সকলেই যোগী; কেহ বা কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, কেহ বা ভোগের জন্য সিদ্ধি-প্রয়াসী। মূলতত্বে ইহাদের বিশেষ প্রভেদ নাই, সাধনপথে ও প্রভেদ অল্প। ত্যাগী আর ভোগী ইহাদের দুইটি ধারা। বৈষ্ণবের ভাষায়—শুষ্ক ভজন, আর রসের সাধন। নাথ যোগীরা ত্যাগী; সহজিয়া বা বাউলেরা ভোগী; দরবেশেরা মধ্যপথাবলম্বী। ইঁহাদের সকলের সাহিত্যের সাধারণ নাম দিতে হইলে উহা "যোগ সাহিত্য" বলা যাইতে পারে। এ হিসাবে প্রাচীন সাহিত্য আমরা চারি ভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারি:—(১) শাক্ত সাহিত্য, (২) শৈব সাহিত্য, (৩) বৈষ্ণব সাহিত্য, (৪) যোগ সাহিত্য।

(১) শাক্ত সাহিত্য।

শক্তি বা চণ্ডীর বিবিধরূপের উৎপত্তি এবং তাহার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের বিবরণ—শাক্ত সাহিত্যের বর্ণনার বিষয়। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা, শক্তির দুই প্রসিদ্ধ রূপ। এই দুইরূপে শক্তি, বাঙ্গালার গন্ধবণিক্‌দিগের মণ্ডপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের ভয় ও ভক্তির পূজা আদায় করিয়া লইয়াছেন। রাঢ়ে "মঙ্গলচণ্ডীর গীতে জাগরণ"—খুবই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। গুরু কবি কঙ্কণ ও শিষ্য কবি কঙ্কণ প্রভৃতিরা মঙ্গলচণ্ডীর বড় বড় পাঁচালী রচনা করিয়া মৃদঙ্গ-মন্দিরার তালে তালে চামর দোলাইয়া রাঢ়ীয়জনের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালের দেশে মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, ক্ষুদ্র ব্রতকথার আকারেই রহিয়া গিয়াছিল। গৃহস্থ বধূর পূজায় শেষে, এই ব্রতকথা বা পাঁচালী পঠিত হইত এবং এখন ও হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রকায় পাঁচালী রচয়িতার নাম নাই। কিন্তু ইহা যে এই মহকুমারই সম্পদ্, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার আরম্ভ এইরূপ:—

"আদি দেব নারায়ণ শঙ্কর চরণ।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করহ স্মরণ॥
মঙ্গলচণ্ডীর পদে কোটী নমস্কার।
মহামায়ারূপে দেবী ধরিলেন সংসার॥"

শেষ ভাগে—

"মহাসুখে বঞ্চে সাধু আপন নগরে।
কোনই বিপদ নাই চণ্ডিকার বরে॥"

বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডীর কথা, কোন পুরাণে বা উপপুরাণে আছে কি না, একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের একটি শ্লোকে ব্যাধ কালকেতুকে ছলনা করিবার জন্য ভগবতীর স্বর্ণ গোধিকা-রূপ ধারণের কথা দেখিতে পাইয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণকেই এই ব্রতকথার মূল বলিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পাঁচালীখানিতে দেবীপুরাণের দোহাই দেওয়া হইয়াছে।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা "শারদা-চরিত"কে, আমরা ঠিক্ আমাদের বলিয়া লইতে পারি কি না সন্দেহ। মাধব, গুপ্তবৃন্দাবনে আসিয়া আমাদের হইয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার বংশধর গোস্বামীরা ময়মনসিংহের যশোদলের গোঁসাই। কিন্তু মাধব নিজে, যেখানে—"ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল"—সেই সপ্তগ্রামের নিবাসী ছিলেন। ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃঃ অঃ) মাধব, "শারদা-চরিত" বা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। এই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন—সপ্তগ্রামে কি গুপ্তবৃন্দাবনে সে কথা, নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই। তিনি রচনার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন রাঢ়ে—বঙ্গে মোগল—পাঠানের উপদ্রব ছিল। পাঠান, তখনও বাঙ্গালার আশা একবারে ছাড়ে নাই এবং মোগলও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে অত্যাচারে দামুন্যার কবিকে রত্নাম্বু নদের তীর ছাড়িয়া "আড়রা"র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, বোধহয় সেই অত্যাচারের জন্যই মাধবাচার্য্য পূর্ব্বদেশবাসী হইয়াছিলেন। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল, আড়রায়

রচিত হয়, এ নজীরে মাধবের শারদা-চরিত গুপ্তবৃন্দাবনে রচিত হওয়া সম্ভব। সেই সময়ে গুপ্তবৃন্দাবনের নিকটে "সহরে সন্তোষ," "গড় গোবিন্দপুর" প্রভৃতি সেকালের জনপূর্ণ নগর ছিল। সুতরাং মাধবের আশ্রয় ও উৎসাহদাতা শ্রোতার অভাব হয় নাই।

মাধবাচার্য্য জীবিকার জন্য চণ্ডীমঙ্গল গান করিতেন কিন্তু নিজে ছিলেন—রসিক বৈষ্ণব! চণ্ডীর গীত গাইতে গাইতে অবসর পাইলেই মাধব ধূয়া ধরিতে:—

"কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া।
নবকোটী চান্দ ফেলাই ওমুখ নিছিয়া॥
বনে থাকে, বনফুল দিয়া গাঁথ হার।
গোপ ঘরে ননী খাও গরিমা তোমার॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ বাঁশীতে দেও শাণ।
গোপালের ঘরে মণি, গোপালের পরাণ॥"

শাক্ত সাহিত্যের এক নূতনরূপ এই মহকুমাতেই প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল। উহা মার্কণ্ডের চণ্ডীর পাঁচালী। এই পাঁচালী রচনা করিয়া জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কাঠালিয়া গ্রামে বৈদ্য-জাতিতে কর বংশে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই বংশ কাঠালিয়ায় এখনও আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ভবানী-প্রসাদের এই "দুর্গামঙ্গল" মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কিছু পরিচয় না দিলেও চলে।

ভবানীপ্রসাদের "দুর্গামঙ্গল" অপেক্ষা রূপনারায়ণ ঘোষের "দুর্গামঙ্গল" কি ভাষায়, কি ছন্দে, কি অলঙ্কার—সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। ইহাও মার্কণ্ডের চণ্ডীরই "ভাষা" বা "পাঁচালী।" রূপনারায়ণ, আদাজান গ্রামের নিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ ঘোষ, যশোহর হইতে এ দেশে আগমন করেন। আদাজানের ঘোষ বংশ এখন আড়রা ও অন্যান্য গ্রামে বাস করিতেছেন।

রূপনারায়ণ, সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে তাঁহার স্বকৃত দুইটি শ্লোক আছে। তাঁহার ভাষা অন্ধ কবির ভাষা অপেক্ষা পুরাতন। "কহন্তি", "করন্তি", "আলাপন্তি" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ, খুব প্রাচীন। ইহা রূপনারায়ণে আছে, অন্ধ কবিতে নাই। কর্ম্মকারকে "ক" ও "ত" অতি প্রাচীন প্রয়োগ। এইরূপ প্রয়োগ রূপনারায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। রূপনারায়ণ লিখিয়াছেন:—

(১) অতএব বলো তোমাক কি করিব স্তুতি।
(২) দেবীর চরিত্র কিছু কহিব তোমাত।

সর্ব্ব অর্থে "সগা", কেমন অর্থে "কমুন" দেখিলাম অর্থে "দেখিল"—রূপনারায়ণের প্রয়োগ।

রূপনারায়ণের সময়ে, বাঙ্গালা, "অপভাষা" বলিয়া পণ্ডিত সমাজে নিন্দিত ছিল। এই জন্য গ্রন্থারম্ভে তাঁহাকে সবিনয়ে বলিতে হইয়াছে:—

"তাহান্ চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা।
শ্লেষ না করিহ ভাই বলি অপভাষা॥
চণ্ডাল ভাণ্ডেতে যদি থাকে গঙ্গাজল।
তথাপি পবিত্র বড় জানিহ নিশ্চল॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

"তোরা ব্রহ্মচর্য্য কর।"

ব্রহ্মচর্য্য কর্‌না তোরা?
ব্রহ্মচর্য্য কর্।
ব্রহ্মচর্য্যে আস্‌বে শক্তি
সর্ব্ব দুঃখ হর।
বাড়্‌বে তোদের পরমায়ু, পুষ্ট হবে দেহ স্নায়ু,
অকাল মৃত্যু ব্যাধি পীড়ার
থাকবে নাকো ডর!
ব্রহ্মচর্য্য কর্‌না তোরা?
ব্রহ্মচর্য্য কর!
মোদের আদি পুরুষ যাঁরা, ব্রহ্মচারী বলে তারা
ছিলেন বলী, বিশাল বপু,
দীর্ঘজীবী নর,
আছিস্ তোরা মরার মত জীবন যেন কণ্ঠাগত
শক্তিশূন্য অকর্ম্মণ্য
এ জগতে জড়!
ব্রহ্মচর্য্য কর্‌না তোরা?
ব্রহ্মচর্য্য কর্।

ভেবে দেখ্না এ জগতে, কেবা এমন ধ্বংস পথে?
তোদের মত কাহার এমন জীর্ণ কলেবর?
শক্তি বল সবার আছে কি লাবণ্য দেহের মাঝে,?
ভগবান্ তাদের পাছে আছেন নিরন্তর।
ব্রহ্মচর্য্য কর্না তোরা?
ব্রহ্মচর্য্য কর্।
নগর, পল্লী, কানন বনে, সবাই মিলে ফুল্ল-মনে—
ব্রহ্মচর্য্য আলোচনার
"কুটীর" তোরা গড়!
দৈনিক, মাসিক, পত্রিকাতে, ব্রহ্মচার্য্য সার-কথাতে
ঢেলে দিয়ে সুধার ধারা
জীবন সফল কর।
মানুষ হলে আয়রে সবে, মহাব্রত নিতেই হবে
ব্রহ্মচর্য্য সাধনার ধন
বারেক চিন্তা কর।
জাগ্‌বে প্রাণ জাগ্‌বে ধর্ম্ম পারবি কর্ত্তে কঠোর কর্ম্ম
নারায়ণ তুষ্ট হয়ে দিবেন এসে বর!
সুখ শান্তি সবই পাবি
ব্রহ্মচর্য্য কর।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

প্রামাণিকের কীর্ত্তি।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের প্রামাণিক-দিগের সুবিশাল হর্ম্ম্যরাজি এক সময় পূর্ব্ববঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালের কঠোর নিষ্পেষণে সেই দেশবিশ্রুত কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখন ধরা বক্ষ হইতে একে একে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণদাস প্রামাণিক পৈত্রিক বাসস্থান বারপাড়া পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নরসুন্দা নদীর পশ্চিম তীরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রাচীন বাসগৃহ এখন বৃহৎ পাদপ শিকড়ে নিষ্পেষিত হইয়া অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কৃষ্ণদাস স্বীয় জীবনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। নাটোর ও রাজনগরের বাড়ীর অনুরূপ সৌধমালায় ভূষিত করিয়া স্বীয় বাসস্থানকে লক্ষ্মী-নারায়ণের পদে উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। পাছে আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার এই প্রবল বাসনা পূরণে বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেই জন্য ১১৬৫ বঙ্গাব্দে (১৭৫৯ খ্রীঃ) তিনি পুত্র নন্দকিশোরকে এক দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গৃহ প্রস্তুতের উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণদাসের কল্পনা তাঁহার দলিলে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই প্রাচীন দলিলের আলোক চিত্র প্রদত্ত হইল। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে দলিলের সঙ্গে একখানা বিশুদ্ধ পাঠও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

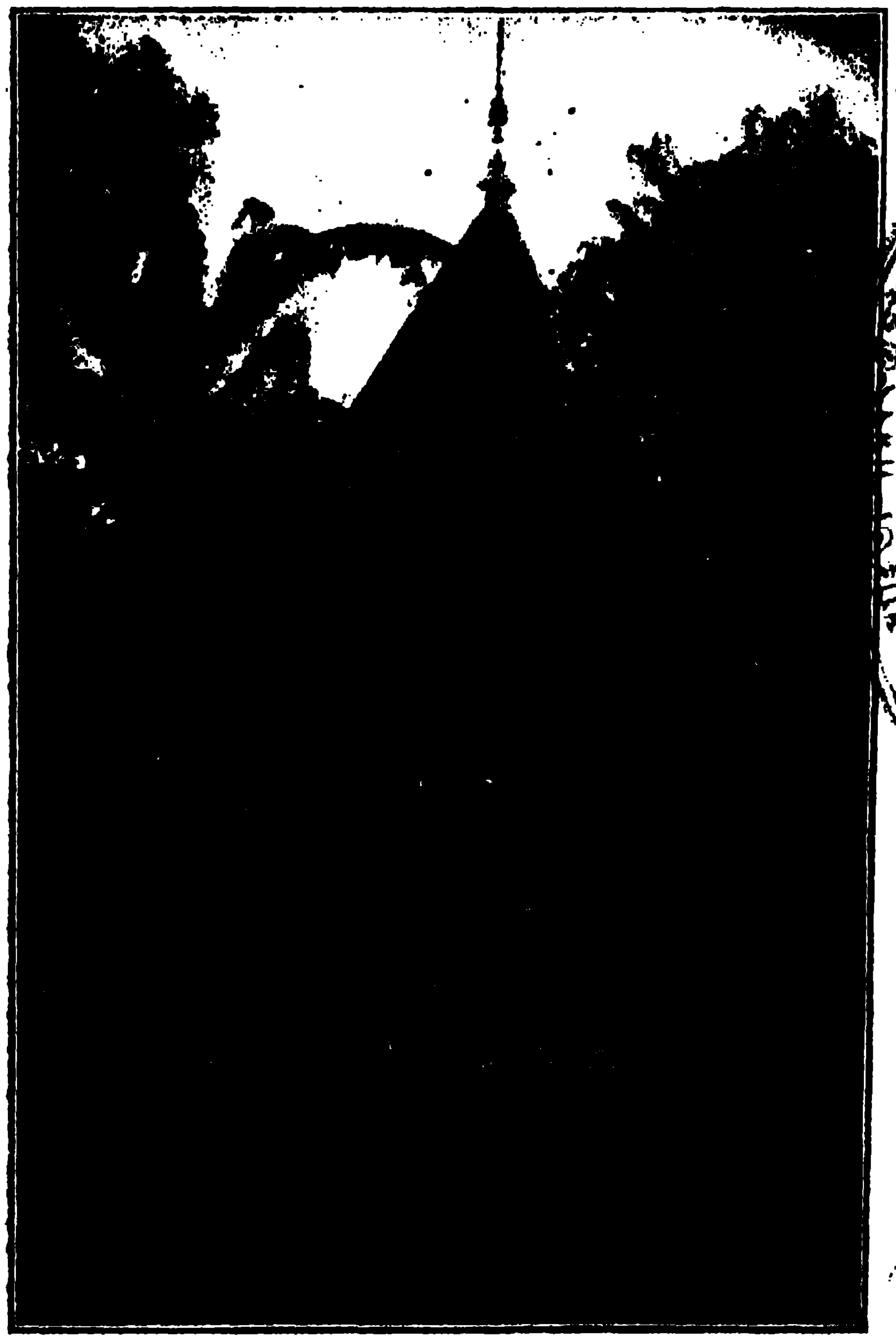

লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রাচীন মন্দির।

৭শ্রীহরি—

ইআদি কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীনন্দকিশোর দাস সুচরিতেষু—লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তুমি মদ? ৺লক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় কার্য্যেতে বৃত্ত আছ অতএব এক দেবালয় নির্ম্মাণ করার কারণ আমার তালুক

গলগলীয়া কাটাখালী দেবোত্তর করিয়া দেওা গেল গ্রাম মজকুরের মধ্যস্থলে এমত পুরী করিবে যাহাতে ৺সর্ব্বদা বাসস্থান ও গ্রীষ্মকালে জলটঙ্গী বসন্তকালের পুষ্পবাস ও বাগুলী ও তুলমঞ্চ আদি ও ৺দুর্গাপূজার স্থান ও ৺চতুর্দ্দশ কালীপূজার স্থান ও ৺মঙ্গলচণ্ডীর পূজার স্থান ও ৺কার্ত্তিক ও ৺বিধহরি প্রভৃতি কৌলিক নানা দেবতার স্থান ও ৺শিবালয় করিয়া তাহাতে শিব স্থাপন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সতর রত্নে ৺স্থাপিত করিয়া তুমি ও তোমার পুত্র পৌত্রাদি পুরুষানুক্রমে ৺সেবা করিতে রহ তালুক মজকুরের রাজস্ব সিমলিয়া নথ আটী সামিল আমি আদায় করিব তোমার স্থানে কখন তলপ হইবে না। ৺পুরী যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয়; ততদিন পর্য্যন্ত দরমা খরচ ৭৫০ সাড়ে সাত শত টাকা আমার সরকারে পাইবা। ইতি সন ১১৬৫ বাঙ্গালা তারিখ ১১ ফাল্গুণ"

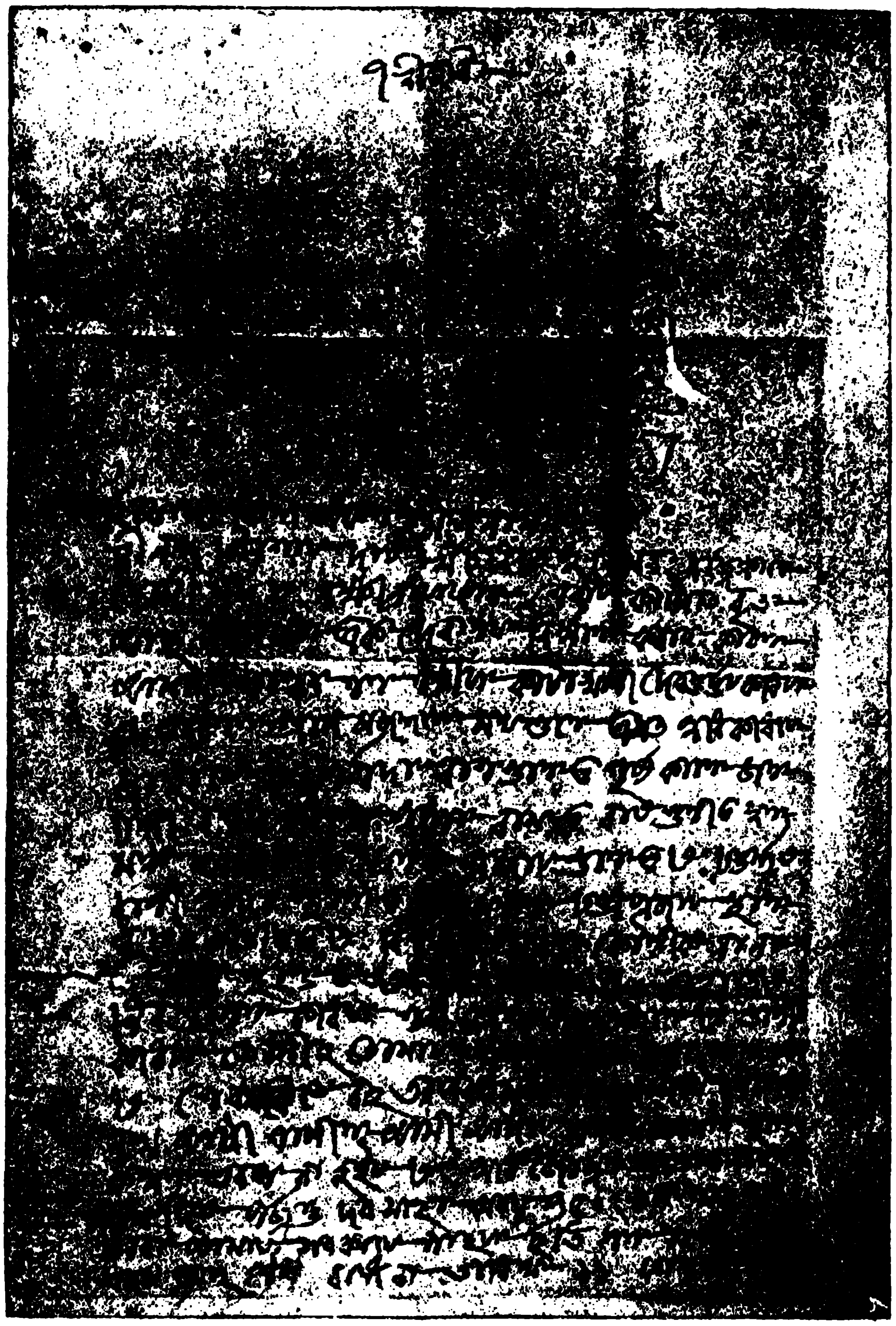

পুরী নির্ম্মাণের আদেশপত্র।

যথা সময়ে নন্দকিশোর পিতার উপদেশ অনুসারে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা লক্ষ্মীনারায়ণের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পিতৃসন্নিধানে আসিয়া নন্দকিশোর নাটোর ও রাজনগরের যে বিপুল ঐশ্বর্য্যের চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মানসনেত্রে অবিরাম ক্রীড়া করিতেছিল। তিনি তাহা অপেক্ষা মনোজ্ঞ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া পিতার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্ন করিলেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের পুরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির একুশরত্ন প্রস্তুত হয়। ইহার দেওয়ালের কারুকার্য্য এরূপ মসৃণ ছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া দর্পণের ন্যায় দর্শকের চিত্র প্রতিফলিত হইত। এরূপ কীর্ত্তি বাঙ্গালায় দুইটী নাই। যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এই একুশরত্ন অবস্থিত ছিল, তাহার পরিমাণ ফল ৯২১৬ বর্গ ফুট। নিদারুণ কালের হস্তে এই একুশরত্ন তুচ্ছ ধূলিকণা হইয়া ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে।

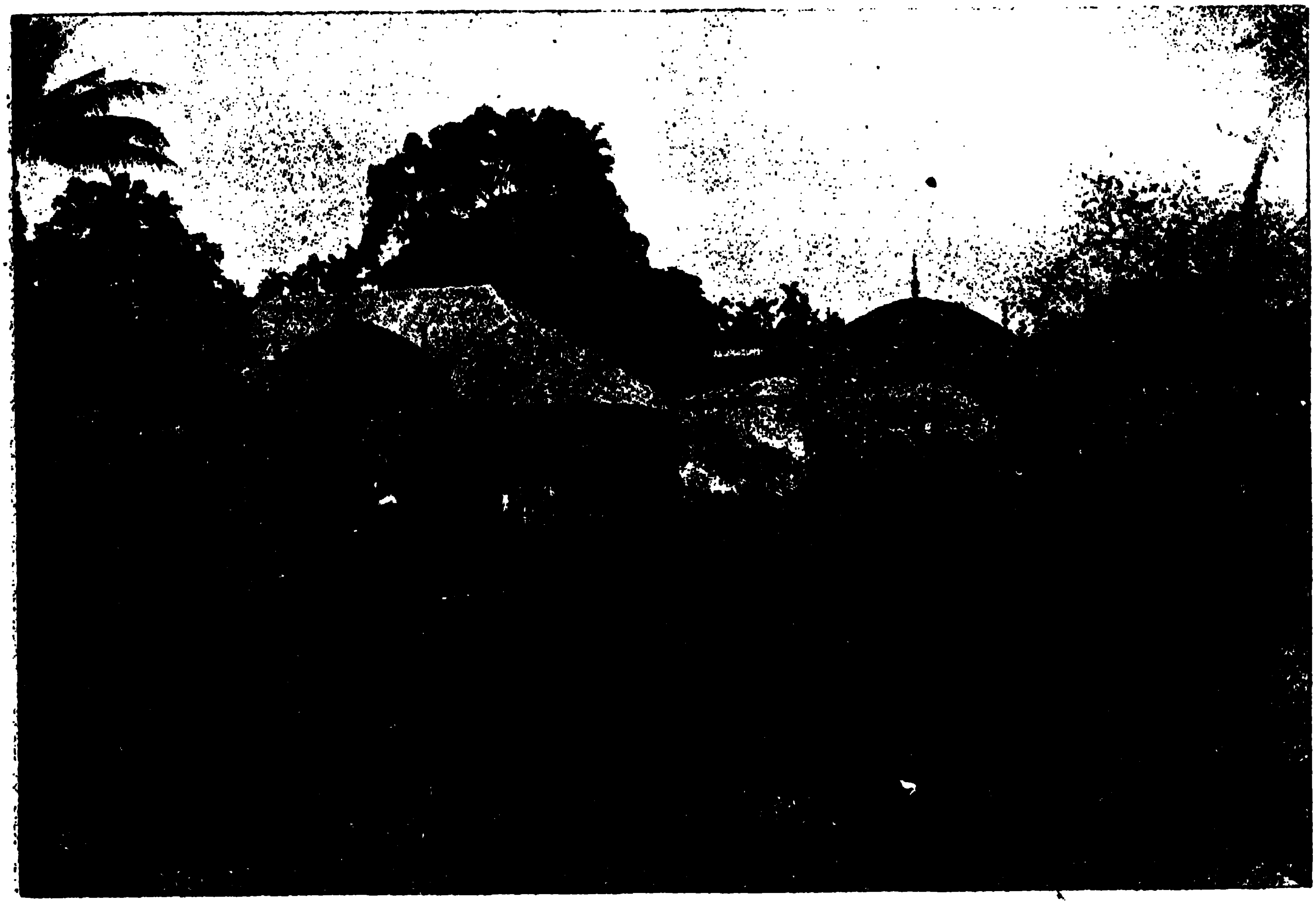

শিবমন্দির ও অতিথিশালা।

বাঙ্গালায় যখন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" তখন সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে নন্দকিশোর পুরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্বন্তরের সমস্ত বৎসর ব্যাপী তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সহস্র সহস্র শ্রমজীবিজীকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিলেন এবং তাহাদিগের দ্বার পুরীর চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা দোলমঞ্চ, জল বাস (জলটঙ্গী), গোল দালান, শিব মন্দির, রাস মণ্ডপ, একুশরত্ন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন। কৃষ্ণদাসের দলিলে সতর রত্নের উল্লেখ থাকিলেও নন্দকিশোর একুশরত্ন নির্ম্মাণ করাইলেন।

প্রথমে ১৮৯২ সনের ভূমিকম্পে একুশরত্নের আকাশস্পর্শি চূড়ার অনেকাংশ স্খলিত হয়, ইহার পর ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূকম্পে তাহা একবারে ধূলিসাৎ হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

চিত্রকর স্বর্গীয় রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় ১২৯০ সনে একুশরত্নের যে চিত্র তুলিয়াছিলেন, লুপ্ত কীর্ত্তির সেই অমূল্য চিত্রলেখা "সৌরভের" পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

জলটঙ্গী বা গ্রীষ্মাবাস সমন্বিত যে বিশাল পুষ্করিণী বাড়ীর পূর্ব্বদিকে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দৈর্ঘ্য ৫২৮

হাত, প্রস্থ ২৮২ হাত। তাহা এক দ্রোণ ভূমি অধিকার করিয়া আছে। জলটুঙ্গী ত্রিতল ছিল। ইহা পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে সে জলটুঙ্গী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সম্মুখের সেই বিশাল দীর্ঘিকার গর্ভ আগাছায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই দীর্ঘিকাবাস জলটুঙ্গী ভগ্নাবশেষ চিত্র এখনও বহু প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়া দেয়।

মহারাজ রামকৃষ্ণের দস্তখতি দানপত্র দেখাইয়া মোকদ্দমা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই মোকদ্দমায় তাঁহারা বহু পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর ঋণ হইয়া পরিবার মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল। আত্মকলহের পরিণাম যাহা হয়, এ পরিবারেও তাহাই হইল। ঋণের জন্য শেষে সম্পত্তি নীলাম হইতে আরম্ভ হইল।

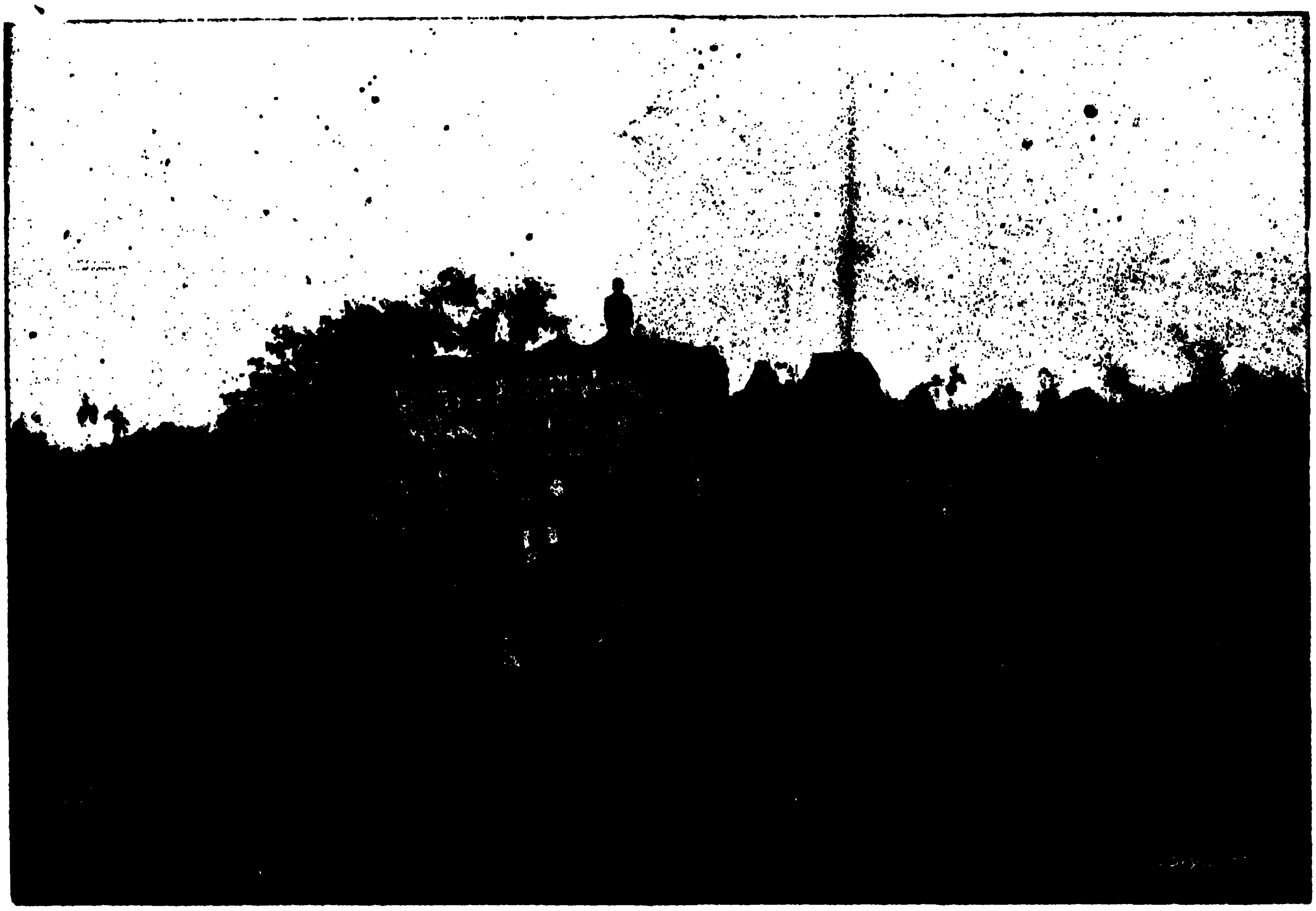

গ্রীষ্মাবাস বা জলটুঙ্গী (ভগ্নাবশেষ)।

বাড়ীর পশ্চিমে শিবালয়। সেই শিবালয়ের পশ্চিমেও দীর্ঘিকা। শিবালয়গুলি দোচালা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ। পুকুর ঘাটের দুইদিকে তিনটী করিয়া ঘর। ঠিক মধ্যস্থলে বাড়ীর সিংহদ্বার হইতে সোজা ঘাটে আসিবার পথ। এই শিবালয় এক সময়ে অতিথিশালার জন্যও ব্যবহৃত হইত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারী নীলাম হইয়া গেলে, আর্ম্মানী খাজে আরাতুন তাহা ক্রয় করেন। খাজে আরাতুনের সহিত লাখিরাজ লইয়া প্রামাণিকদিগের বহুদিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হয়। প্রামাণিকেরা

প্রামাণিকদিগের সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিন পুরুষ মাত্র ছিল। তিন পুরুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এতদঞ্চলের লোককে একটী প্রত্যক্ষ সত্য শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছে। আজ সেই সৌভাগ্যের কঙ্কাল চিত্র পাঠকের মনেও সেই সত্যকে জাগরিত করিতেছে সন্দেহ নাই। সেই এশ্বর্য্যসমন্বিত অগণিত সৌধশ্রেণীর স্থানে আজ অযত্নবর্দ্ধিত কণ্টকবন। সেই কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন ভগ্ন জীর্ণগৃহে আজও কৃষ্ণদাসের দুর্ভাগ্য বংশধর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া সেই চির সত্য প্রচার করিতেছে।

কৃষ্ণদাসের জীর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গনে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল।

প্রামাণিকের বিস্তৃত প্রাসাদ-পুরী পরিত্যক্ত শ্মশান পুরীতে, ঝুলনের সময়, ঝুলন মেলা হইয়া থাকে। এই ঝুলন মেলা পূর্ব্ববঙ্গে একটী প্রসিদ্ধ মেলা। ইহাতে বহুলক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমরা নিম্নে কৃষ্ণদাসের বংশাবলী প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কৃষ্ণদাস প্রামাণিক ১

- রামশঙ্কর
- অজ্ঞাত
- রামগঙ্গা
  - রামকেশব
    - রামলোচন
      - রোহিণীকুমার
        - অশ্বিনীকুমার
        - রুক্মিণীকুমার
    - বঙ্কবিহারী
      - ললিতবিহারী
- শোভারাম
- অজ্ঞাত
- নন্দকিশোর
  - নবকিশোর
    - কৃষ্ণকিশোর
      - তিন কন্যা
    - মোহনকিশোর
      - •
    - চন্দ্রকিশোর
      - •
    - রামকিশোর
      - •
    - হরকিশোর
      - তিন কন্যা
  - গৌরকিশোর
    - গোপীমোহন
      - হরিমোহন (পোষ্য)
        - প্যারীমোহন
- ব্রজকিশোর
  - •

বউ কথা কও।

ঐ যে পাখিটা বনের ধারে আমের ডালে বসিয়া করুণ সুরে কত কি মনের বেদনা তার প্রাণের বধূকে জানাইতেছে—তা, ও কাকে ডাকে? কে এই অভিমানিনী সুন্দরী, যে এমনি করিয়া ওকে কাঁদাইতেছে? দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিরত তার এই কান্না চলিয়াছে। যতক্ষণ আহারের চিন্তা ততক্ষণ যেন কতকটা বিরাম থাকে। কিন্তু যেই অবসর আসে অমনি সে অসহ্য বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া ডাকিতে থাকে—"বউ, কথা কও।"

বিশ্রামও তার নাই। যখন দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল বিদূরিত হইয়া রজনী সমাগমে সারাবিশ্ব এক মধুর শান্তরসে নিমজ্জিত হয়, আর কর্ম্মক্লান্ত জীব সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তার প্রিয়াবিরহশোক উদ্বেলিত হইয়া তাকে অধীর করিয়া তোলে। যখন সুশীতল মলয় সমীর পূর্ণবিকাসিত বেলী চামেলীর সুবাস মাখিয়া আসিয়া রজতশুভ্র–চন্দ্রিমাধৌত ধরাবক্ষে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা বর্ষণ করিতে থাকে, আর তার স্পর্শাবেশে বিহ্বল প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া এক সুখময় স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করে, তখন তা দেখিয়া এই পাখীও প্রিয়ালিঙ্গন আশায় আকুল হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করে—"বউ, কথা কও।" প্রকৃতির এমন যে সুধাময় শান্তভাব, এমন যে সুস্নিগ্ধ নীরবতা তাতেও সে তাকে ভুলিতে পারে না।

যথার্থ প্রেমিক এই পাখী। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া সে তার প্রাণের বউকে ডাকিতেছে। বধূ তার অভিমান করিয়া বসিয়া আছে। তাই এত সাধাসাধনা, এমন পরাণ-ঢালা প্রেমের আবেদন,—"বউ, কথা কও। বউ, কথা কও।" এমন অকৃত্রিম প্রেমের সাধনা কেউ কি কখনও করিয়াছে? অনাদিকাল হইতে তার এই সাধনা চলিয়া আসিয়াছে, আজও চলিতেছে। এত কাঁদা, এত সাধা, এত পায়ে ধরা, কাকুতি মিনতি, এমন ঐকান্তিক আত্ম-নিবেদন; তবু বধূর তার মন গলিল না; এমন কি একটিবার তার মুখের দিকে সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াও তার প্রেমের প্রতিদান দিল না। ইঃ কি দুর্জ্জয় মান! নিষ্ঠুর, এত নিষ্ঠুর সে! কিন্তু তবুত তার সাধনার বিরাম নাই।

পাখি! যদি তোর দয়িতাকে পাইতে চাস্, তবে আমার কথা শোন্। তোর অমন একরূপ সাধনায় তাকে মিলিবে না। সে বড় মানিনী, যত সাধিবি ততই তার মান বৃদ্ধি পাইবে। আর তুইত ডাকিতেও জানিস্ না। "বউ, কথা কও" অমন নীরস সম্ভাষণে কি রূপযৌবনাভিমানিনীর প্রাণ স্পর্শ করে? পাখি! তুই যা। একবার বাঁশরীর সাধ-সুরে "প্রাণময়ি আমার, প্রেমময়ি আমার" বলিয়া ডাক দেখি। একবার সকল আকাশ-বাতাস সুধাময় প্রাণমাতান স্বরলহরীতে পরিপূরিত করিয়া মুরলীর রবে গা দেখি—

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্"
আবার বল্ "দেহি পদপল্লবমুদারম্"

(জয়দেব)

এইত প্রকৃত প্রণয় সম্ভাষণ। এই আহ্বানে মান তার ভাঙ্গিবে—নিশ্চয়ই ভাঙ্গিবে। আর যদি তাতেও না হয় তবে সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া দিয়া একবার ঐ কোকিলার কুঞ্জে গিয়া প্রেমের সাধনা কর। দেখ্‌বি তখন বধূ তোর কিছুতেই মান করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সেই আসিয়া তোর পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিবে, আর বলিবে—

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
প্রিয়া (রাধা) বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে?
বঁধু, কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

(চণ্ডীদাস)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

সংগ্রহ।

অমরত্বের পথে।

উপনিষদের বাণী দ্বারা ভারতবাসীকে অমৃতের সন্তান বলিয়া প্রচার করিলেও গড় পরতা হিসাবে ভারতবর্ষের অধিবাসীর জীবন প্রদীপ যে ২২ বৎসরের অধিক জলিবে না তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীতে লিপিবদ্ধ করা

হইয়াছে। ২২ বৎসরের আয়ুকে আমরা জীবনের অন্তবিধ সত্য বলিয়া ধরিতে বাধ্য হইলেও, এই অল্পস্থায়ী জীবন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আয়ুর পরিধি নয়। ইউরোপের মাটীতে দিকে ২ মানুষের মনকে উন্মুক্ত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, মানুষের জীবনকালকে বাড়াইবার কল্পনা তাহা হইতে বাদ যায় নাই। যৌবনকে কায়েম করিয়া, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কিছুদিন যাবত ইউরোপে নানান্ গবেষণা চলিতেছে। এই সম্পর্কে এই নতুন জ্ঞানের পুরোহিত ডাঃ সার্জ্জ ভরোনফ্ অল্পদিন পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, এই নিঃস্রব নিঃসরণশীল গ্রন্থি প্রতিরোপণ করিবার যে প্রণালী, তাহা দ্বারা মানুষের জীবনকাল ১২৫ হইতে ১৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যায়। এবং এই সুদীর্ঘ ১৪০ বৎসরের মধ্যে মানুষের মানসিক ও শারীরিক বল বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এই দীর্ঘকালের পরে জরা যখন আসিবে, তাহা অকস্মাৎ আসিয়া অল্পকাল স্থায়ী হইয়া এবং অনধিক তিন মাসের মধ্যে প্রতিরোপিত গ্রন্থিগুলি কত দিন কার্য্যকরী থাকিবে, তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও, ইহা যে অনেক দিন স্থায়ী হইবে, তাহা সত্য। অনধিক সাত বৎসর পূর্ব্বে বানর হইতে মানুষে প্রথম গ্রন্থি সংযোজন করা হয়। এই সাত বৎসরের মধ্যে ডাঃ ভরোনফ্ সহস্রাধিক লোকের মধ্যে বানর গ্রন্থি প্রতিরোপণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকল গুলিই সবল হইয়াছে। একজন স্পেনীয় চিকিৎসক এই প্রতিরোপিত গ্রন্থি পুনরায় উন্মোচন করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা পূর্ণভাবে কার্য্যকরী আছে। ডাঃ ভরোনফ্ ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শরীরের বিশেষ ২ গ্রন্থিগুলির জরা প্রাপ্তির জন্যই মানুষকে জরাতে আক্রমণ করে, হার্ট, মস্তিষ্ক ও ফুসফুস শেষ পর্য্যন্ত চমৎকার কার্য্যকরী থাকে। যাহাদের গ্রন্থি আরোপণ করা হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মস্তিষ্কজীবী, তাহাদের সকলের মতে এই প্রণালী দ্বারা শুধু যে চিন্তা শক্তির উৎকর্ষতা লাভ হয়, তাহাই নহে, লুপ্ত স্মৃতিশক্তিরও পুনরুদ্ধার হয়। ডাক্তার ভরোনফ মনে করেন ডাক্তার ব্যানটিং ইন্সুলিন দ্বারা বহুমূত্র রোগে যে কার্য্য করিতেছেন, গ্রন্থি সংযোজন দ্বারা অনায়াসেই তাহা হইতে পারে। মেষের উপর এই প্রণালী প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে মেষ শাবক অধিকতর দীর্ঘজীবী, বলশালী ও রোমশ হয়। কিন্তু পৃথিবীর অগণ্য লোক সংখ্যার তুলনায়, বানরের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য বলিয়া ডাঃ ভরোনফ্ ভয় করেন যে, বানরের দুষ্প্রাপ্যতাই এই ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্য।

প্লিমাউথ সহরের এক প্রীতিভোজে আমেরিকান রাজদূত শ্রীযুক্ত অ্যালান্সন্ বি, হাফটন এক বক্তৃতায় বলেন, "আমরা যখন আমেরিকা ও বৃটেনের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয়ে আলোচনা করিতে বসি তখন ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও অন্যান্য কথা আমাদের মনে পড়ে। আমাদের ভাষা, গোত্র, ধরণধারণ এবং জীবনধারণের মাপকাঠি ও উদ্দেশ্য যে এক একথা বলাই বাহুল্য। এ রকম দুইটি প্রবল জাতির সৌহার্দ্দ্য মানুষের ইতিহাসে এক অভিনব জিনিস। ইহা হইতে ভবিষ্যতে অনেক আশা করা যায়।

বর্ত্তমানে দুনিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৬ ছয় ভাগ মাত্র আমেরিকাবাসী এবং জগতের শতকরা ৬ ছয় ভাগ জমাজমি মাত্র আমেরিকাবাসীর তাঁবে। এই শতকরা ৬ ছয় ভাগ লোক কিন্তু দুনিয়ার গমের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ সিকি চাহিদা মিটাইতেছে এবং গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্য শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ সরবরাহ করিতেছে। দুনিয়ার চাহিদার শতকরা ৩৮ ভাগ কয়লা আমেরিকার খনি হইতে উঠে। দুনিয়ার ৭০ সত্তর ভাগ পেট্রোলিয়াম (তেল) উৎপন্ন করে আমেরিকা। এ ছাড়া, শতকরা ৫৪ ভাগ তামা এবং শতকরা ৫০ ভাগ লোহা অর্থাৎ দুনিয়ার মোট উৎপন্ন লোহার অর্দ্ধেক আমেরিকার মাটিতে ফলে। দুনিয়ার ৬০ ভাগ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, দুনিয়ার ⅓ অংশ রেল সড়ক এবং ৫ ভাগের ৪ ভাগ মোটর গাড়ী এই আমেরিকা ভূখণ্ডে আমীদের বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব হ্রাস করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বরং ইহাই স্বাভাবিক।

আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখিতে পারেন যে, আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি, যেথানে শিল্প কারখানার প্রত্যেক কারিগরের গড়ে ১,২০০ পাউণ্ড মূলধন বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে খাটিতেছে। কাজে কাজেই ঐ ব্যক্তি ৪টি অশ্বশক্তির মালিক। এক অশ্বশক্তি ১০ জনের সমবেত শক্তির সমান বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, একজন শিল্পী তাঁহার উৎপাদনের কাজে কলকারখানার সাহায্য গ্রহণ করায় তাঁহার উৎপাদিকা-শক্তি ৪০ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের শিল্প-কারখানার ২ কোটি কারিগর বস্তুতঃ ৮০ কোটি লোকের কাজ করিতেছেন।

আমাদের দেশের ধনোৎপাদনের কাজ কি ভাবে চলিতেছে তাহা এইবার বলিব। উৎপাদন বিভাগে পুঁজি, পরিচালনা এবং শ্রম এই তিন জনের সাহায্যে কাজকর্ম্ম চলিতেছে। পুঁজিপতি, পরিচালক এবং শ্রমিক এই তিন শ্রেণীর লোকই যখন পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা পোষণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ লাগাইয়া রাখাই স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই যখন অনির্দ্দিষ্ট মুনাফা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন তখনই এইরূপ ধারণার সার্থকতা ছিল। আজকাল লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধনোৎপাদনের কাজে বিভিন্ন শক্তির সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের প্রয়োজন। আজকালকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক লোক তাঁর শক্তি ও অর্থ যেরূপ খাটাইয়া থাকেন, তার প্রতিদানও উপযুক্তরূপে তাঁহাকে দেওয়া হয়। ইহার ফলে আমেরিকায় সামান্য শ্রমিকও পুঁজিপতি হইতেছেন। এটা খুবই আশার কথা যে, শিল্প-জগতে এক নয়া বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

জাহাজে বিশ্ববিদ্যালয়।

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ গত ২রা জানুয়ারী আমেরিকা হইতে এস, এস রিণ্ডাম নামক একখানা জাহাজ আসিয়া বোম্বাই পৌছিয়াছে, ইহা আয়তনে এত বড় যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় আসবাবই ইহাতে আছে। ইহাতে ১৫ হইতে ২৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রী ৪৮৮ জন আছে। তন্মধ্যে বালিকা ৫৩ জন, প্রফেসর ৬৬ জন এবং ২৫৪ নাবিক আছে। কলেজ-গৃহ, লেবরেটরী, খেলার মাট, হষ্টেল প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। ইহারা বোম্বাইএ ছয় দিন থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দর্শন করিবে। বোম্বাইএ আসিবার পূর্ব্বে ইহারা চীন, শ্যাম সিঙ্গাপুর, লঙ্কা প্রভৃতি স্থানও ঘুরিয়া আসিয়াছে। ক্যানসাসের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ এইচ, এলেনও এই জাহাজে আছেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এই জাহাজখানি নিউইয়র্ক সহর হইতে যাত্রা করিয়াছে। ১২৫ দিনে ইহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার কথা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রীতিমত ক্লাস বসিয়া থাকে।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গ্রহপঞ্জিকা। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু সম্পাদিত। এই পঞ্জিকার একটি বিশেষত্ব আছে। ইহাতে জ্যোতিষবচন রাশিফল, বর্ষফল, বর্ষচক্র, লগ্নমান, শুভদিনের নির্ঘণ্ট বিস্তৃত দিন পঞ্জিকা, ক্রিয়া-কর্ম্মের ফর্দ্দ, সন্ধ্যাপূজাতর্পণবিধি, পোষ্টাফিস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, রেল, ডাইরেক্টরি প্রভৃতি বাজার প্রচলিত পঞ্জিকার ন্যায় সমস্তই আছে। অধিকন্তু—হরপার্ব্বতী সংবাদ প্রসঙ্গে ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অমূল্য। দেশবাসীর স্বাস্থ্য দিন দিন যেরূপ অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে কেবলমাত্র শান্তি স্বস্ত্যয়নের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বসু মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিবিধ চিত্র সংযোগে ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কথাগুলি পদ্যে রচিত হওয়ায় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছড়া ও প্রবাদবাক্যের মত আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে ধ্বনিত হইবে।

ইহা ব্যতীত ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল, এম্, এস্ লিখিত মানবের দশদশা, ডাঃ দিবাকর দে জি, বি, ভি, সি লিখিত গো চিকিৎসা, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব এল, এজি, লিখিত বীজ, স্বয়ং ডাঃ বসু মহাশয়ের ডান হাতের ব্যাপার, সজে মুষ্টিযোগ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বিষমার্কের তিনটি পেশা, ডাঃ কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই, এম্, এস, লিখিত শরীর চর্চ্চা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা, সচিত্র শিশুপালন প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমরা প্রতি গৃহে এই পঞ্জিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

=কারণ=

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্য্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেসে—সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh--Reg. No.C 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৷৹
ঢাকার বিবরণ	১৷৹
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস	৷৹
সাময়িক সাহিত্য	৩৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)	
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	।৶৹

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৸৹

লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।৹

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই)	১৲	মহরম	৷৹
ব্রতকথা	৸৹	কালের ডায়রী (সচিত্র)	৷৹
শৈব্যা	।৶৹	রংকথা	(যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। বৈশাখ— ১৩৩৪ ১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

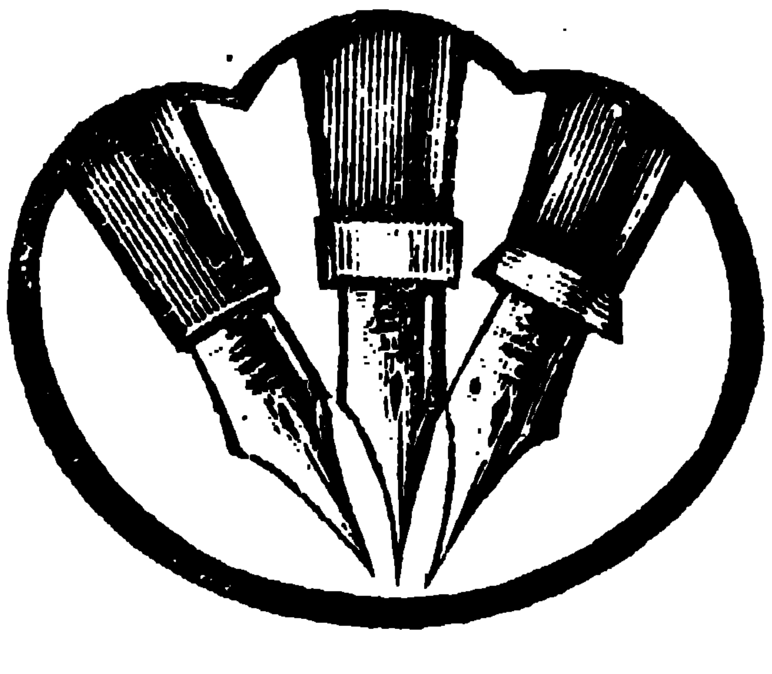

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও

সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র স্থল।

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

[illegible] বিখ্যাত খাঁটি ও অকৃত্রিম [illegible]

ডাক্তার অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘা, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বাঘরা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস্‌, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৷৵ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষায় উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—৷৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ৷৹ সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়!

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

[illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড বোম্বে, নং ১৪

[illegible]—"বাটলীওয়ালা" [illegible]।

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	...	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	„	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	„	...	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা	„	...	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা	„	...	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—৷৵০ আনা, হাসির হল্লা—৷৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধাবাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সত্বরে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাকেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত [illegible] (ঢাকা)

“দুর ছাই—”

শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩৩। | ৪র্থ সংখ্যা।

বঙ্গ জ্যোতিষে অয়ন বিকার।

অচিন্ত্যা ব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

বঙ্গ দেশে যে সকল পঞ্জিকা প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পঞ্জিকায় "জ্যোতিষ বচনার্থ" শীর্ষক অধ্যায়ে ব্যাখ্যা সহ কতকগুলি শ্লোক দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্লোকগুলির প্রকৃত উপকারিতা আছে। কেননা এগুলির সাহায্যে সাধারণ লোকেও দৈনন্দিন জ্যোতিষ সংক্রান্ত ব্যাপারে অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ফলে শুভদিন ও শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া লইতে তাহাদের বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না।

[illegible] পঞ্জিকার পরিচালক বা গ্রাহকবর্গকে উক্ত পঞ্জিকা [illegible] সত্য বলে ধরিতে পারা যায়। এইরূপে অনেক পঞ্জিকার [illegible] উক্ত পঞ্জিকা [illegible] সত্য ধরিয়া লইতে পারা যায়।

[illegible] পঞ্জিকা বা [illegible] গ্রাহক উক্ত পঞ্জিকা বা পঞ্জিকার সম্পাদক মহাশয় [illegible] দিয়া [illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible] পঞ্জিকার জ্যোতিষ বচনার্থ শীর্ষক [illegible] আমাদের যথেষ্ট [illegible] থাকে, [illegible] এই বচনগুলি [illegible] সময়ে [illegible] কোন্ গ্রন্থ হইতে [illegible]

যাহা হউক ফলিত জ্যোতিষে কোন ২ স্থলে ফল নির্ণয়ের যে নিয়ম বা formula শ্লোকের আকারে দেওয়া হইয়াছে। তাহার কোন কারণ বা ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন জ্যোতিষী মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে কষ্টকল্পিত ও কল্পনাপ্রসূত।

আমরা নিয়ে পঞ্জিকার একটী শ্লোক এই স্থলে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। শ্লোকটী এই ;—

[illegible] শুভ সূর্য্য [illegible] দশ লাভগঃ।
[illegible] দিনাৎপরং [illegible]

বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি শুভকর্ম্মের দিন নির্ণয়ে যে স্থলে রবি শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে সেই স্থলেই এই শ্লোকটীর প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্লোকটী কাহার রচিত এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত তাহার সম্বন্ধে সকল পঞ্জিকাকারই নীরব। এইরূপ আরও অনেক শ্লোক পঞ্জিকা সমূহের সাধারণ সম্পত্তি বটে।

এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ খুঁজিতে যাইয়া আমরা এ সম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা জ্যোতিষীর নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় [illegible] জ্যোতিষীদের প্রায় সকলেই চিঠির উত্তর না দিয়া নীরব রহিয়াছেন। প্রায় দুইখানা মাত্র চিঠির উত্তর আমরা [illegible] করিয়াছি।

[illegible]

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩৩। ৪র্থ সংখ্যা।

বঙ্গ জ্যোতিষে অয়ন বিকার।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

বঙ্গ দেশে যে সকল পঞ্জিকা প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পঞ্জিকায় "জ্যোতিষ বচনার্থ" শীর্ষক অধ্যায়ে ব্যাখ্যা সহ কতকগুলি শ্লোক দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্লোকগুলির প্রভূত উপকারিতা আছে। কেননা এগুলির সাহায্যে সাধারণ লোকেও দৈনন্দিন জ্যোতিষ সংক্রান্ত ব্যাপারে অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ফলে শুভদিন ও শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া লইতে তাহাদের বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না।

কোন পঞ্জিকার খরিদার বা গ্রাহকবর্গকে উক্ত পঞ্জিকা সন্নিবিষ্ট সত্য মনে করিতে পারা যায়। এইরূপে কোন পঞ্জিকার গ্রাহকবর্গকেও উক্ত পঞ্জিকা সন্নিবিষ্ট সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

[illegible] পঞ্জিকা বা পঞ্জিকার প্রণেতা উক্ত পঞ্জিকা বা পঞ্জিকার সম্পাদক মহাশয় যতদূর সম্ভব খাঁটি খবর দিয়া [illegible] জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। যদিও পঞ্জিকার জ্যোতিষ বচনার্থ শীর্ষক অধ্যায় পাঠেও আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি এই বচনগুলি [illegible] কোন্ সময়ে [illegible] বা কোন্ গ্রন্থ হইতে [illegible] হইয়াছে, পঞ্জিকাকার যদি তাহাও [illegible] দিয়া দিতেন [illegible] জ্ঞান [illegible] পথ আরও [illegible]

যাহা হউক ফলিত জ্যোতিষে কোন ২ স্থলে ফল নির্ণয়ের যে নিয়ম বা formula শ্লোকের আকারে দেওয়া হইয়াছে। তাহার কোন কারণ বা ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন জ্যোতিষী মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে কষ্টকল্পিত ও কল্পনাপ্রসূত।

আমরা নিম্নে পঞ্জিকার একটী শ্লোক এই স্থলে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। শ্লোকটী এই :—

জন্মরাশেঃ শুভ সূর্য্য ত্রিষষ্ঠ দশ লাভগঃ।
দ্বি-পঞ্চ-নবগোহপীষ্ট ত্রয়োদশ দিনাৎপরঃ॥

বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি শুভকর্ম্মের দিন নির্ণয়ে যে স্থলে রবি শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে সেই স্থলেই এই শ্লোকটীর প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্লোকটী কাহার রচিত এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত তাহার সম্বন্ধে সকল পঞ্জিকাকারই নীরব। এইরূপ আরও অনেক শ্লোক পঞ্জিকা সমূহের সাধারণ সম্পত্তি বটে।

এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ খুঁজিতে যাইয়া আমরা এ সম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা জ্যোতিষীর নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু [illegible] বিনা বাক্যব্যয়ে জ্যোতিষীদের প্রায় সকলেই চিঠির উত্তর না দিয়া নীরব রহিয়াছেন। প্রাপ্ত দুইখানা মাত্র চিঠির অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

[illegible] সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সহকারী সম্পাদক [illegible] চন্দ্রশেখর স্মৃতি সিদ্ধান্ত [illegible] তারিখে [illegible] হইতে লিখিয়াছেন [illegible]

"মান্যবরেষু

আপনার কার্ডখানা পাঠ করত: বিশেষ সুখী হইলাম। আপনার লিখিত শ্লোক বঙ্গীয় সংগৃহীত পুস্তকে দেখিতে পাই। প্রাচীন মুনি প্রণীত গ্রন্থে কোথাও দেখিতে পাই না। মুহূর্ত্ত চিন্তামণি নামক গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক; তাহাতেও ঐ শ্লোকের উল্লেখ নাই।

যাহা হউক ঐ শ্লোকের মূল কোথায় তাহা অন্বেষণের জন্য কলিকাতা জ্যোতিষ সমিতিতে লিখিলাম উত্তর পাইলে মহাশয়কে জানাইব।

ভবদীয়

শ্রীচন্দ্রশেখর মুকুল শর্ম্মণঃ।"

দিন বিচার চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত রায় মহাশয় গোবিন্দপুর হইতে লিখিয়াছেন।

"পোষ্ট্ বরেষু—

কয়েক দিন হইল মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি। নানা বিপদে এই পর্য্যন্ত উত্তর দিতে পারি নাই। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

রবি চন্দ্রাদি শুদ্ধির বচনগুলি, সাধারণে প্রচলিত আছে। তাহাই দিন বিচার চন্দ্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

এইগুলি, কোন্ গ্রন্থের বচন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমার পুস্তকে ঠিকানা দিতে পারি নাই। ইতিমধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। জ্ঞাতার্থে লিখিলাম। আর অধিক কি লিখিব। নিবেদন ইতি।

প্রবন্ধটী পঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া হইতে লিখিয়াছেন:—

"সবিনয় নিবেদন

পঞ্জিকার উদ্ধৃত জ্যোতিষ বচন প্রায়ই মুহূর্ত্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। মুহূর্ত্ত বিচারের বহুগ্রন্থ আছে। কোন বিশ্বাস কখন আরম্ভ তাহা বলিতে পারা যায় না। যবন জ্যোতিষীদিগের নিকট হইতেও কতকগুলি আসিয়াছে। অমুক তিথি অমুক নক্ষত্র শুভ এরকম বিশ্বাস বহু বহু পুরাতন। প্রত্যেক মানব জাতির এইরূপ বিশ্বাস আছে। আপনি রঘুনন্দন দেখিতে পারেন। ইতি।"

গুপ্তপ্রেস পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ:—"রবি জন্মরাশি হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ স্থান গত হইলে শুভ হয় এবং মাসের তের দিন পরে দ্বিতীয় পঞ্চম নবম স্থান গত রবি ও শুভ হয়"।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে জন্মরাশি হইতে তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থানে রবি থাকিলে কেন রবি শুভ হইবেন? অপর স্থানসমূহের দোষ কি? আর তের দিন পরে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম স্থানেরই বা গুণ বৃদ্ধি হইল কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়ত বলিবেন যে "শাস্ত্রের মত ঐ রূপই"। আবার অনেকে হয়ত বলিবেন যে "ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবাক্য, কখনও মিথ্যা হয় না। তাহারা চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলেই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কথা নিমিষে বলিয়া দিতে পারেন। আর বিশেষতঃ ঋষয়ো মন্ত্র দ্রষ্টারঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি" সকলে কিন্তু এই উত্তরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

যাহা হউক জ্যোতিষিক পরিভাষা মতে লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, ও একাদশ এই স্থান চতুষ্টয়কে উপচয় স্থান বলে। তদ্ব্যতীত স্থান সমূহ অনুপচয় নামে খ্যাত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোক মতে জন্মরাশি হইতে উপচয় স্থানস্থিত রবি জাতকের পক্ষে অনুকূল। কেন অনুকূল তাহার কারণ আমরা এখনও জ্ঞাত নহি। স্বীকার করিলাম যেন উপচয় স্থানস্থিত রবি জাতকের পক্ষে ইষ্টফলই প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই বা দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম স্থানস্থিত রবিও কেন ইষ্টফলপ্রদ হইবেন? আর মাসের তের দিন পরেই বা উক্ত পরবর্ত্তী স্থানত্রয়-দুষ্ট নির্গুণ বা দুর্গুণ রবির সুগুণ কিরূপে বর্দ্ধিত হইল? এই গুণ বাহুল্যের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

রত্নমালানামক গ্রন্থে বেধ রহিত রবি শুদ্ধির নিয়ম এইরূপ দেওয়া আছে:—

"লাভ-বিক্রম-খ শত্রু-স্থিতঃ শোভনো
নিগদিতো দিবাকরঃ।
খেচরৈঃ সুত-তপোব্যয়াম্বুপৈর্ব্যার্কি-ভিৰ্যদি
ন বিধ্যতে তদা" ॥

দিন বিচার চন্দ্রিকা এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ:—

জন্মরাশি হইতে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ৪র্থ ও দ্বাদশ স্থানে শনি ভিন্ন

অন্য গ্রহ কর্ত্তৃক যদি বিদ্ধ না হয়েন অর্থাৎ শনি ভিন্ন অন্য গ্রহ যদি না থাকেন তবেই জন্মরাশি হইতে যথাক্রমে ১১শ, ৩য়, ১০ম, ও ষষ্ঠ স্থানস্থিত রবি শুভ হইয়া থাকেন। বিদ্ধ হইলে গ্রহগণের শুভকারিতা শক্তি নষ্ট হয়"।

এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উপচয় স্থানস্থিত রবিই শুভপ্রদ। দ্বিতীয়, পঞ্চম, ও নবম স্থানের কোন উল্লেখ নাই। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "দ্বিপঞ্চনবগোঽপীষ্ট" এবং তাহাও দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বা অন্য কোন দিন নহে, "ত্রয়োদশ দিনাৎপরং" এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য কি?

আমাদের দেশে নিরয়ন গণনা প্রচলিত। কিন্তু ইংলণ্ড জর্ম্মণী, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ সায়ন গণনারই পক্ষপাতী। অস্মদ্দেশে কালক্রমে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের যুগ অতীত হইলে পর যখন অয়ন গতি আবিষ্কৃত, এবং তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল, তখনও ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত জ্যোতিষই আলোচিত হইত। কিন্তু বহুপরবর্ত্তী কালে নিরয়ণ ও সায়ন মত নিয়া আলোচনায় লোকের মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে অনেকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে নিরয়ন মত অনুসরণ করাই স্বভাবসিদ্ধ না সায়ন মতে গণনা করাই যুক্তি সঙ্গত। আর কোন মতে গণনা করিলেই বা গণিতাগত বাণী ফলের সঙ্গে প্রায়শঃ ঐক্য হইয়া থাকে?

আমাদের মনে হয় এই সন্দেহমূলক প্রশ্নটীর সম্পূর্ণ মীমাংসা না হওয়ায়, কেহ কেহ, "যবেশ্বরে" আংশিক রূপে ইহার সমাধান করিয়া লইয়া ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীতে এইরূপ চেষ্টা প্রসূত মীমাংসারই আভাষ সূচিত হইতেছে। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এই মীমাংসাটুকু গোজামিল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা নিম্নে আলোচ্য শ্লোকটীর বিশ্লেষণ করিয়া যে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইতেছি তাহা সুধীজনের সমক্ষে স্থাপন করিলাম। তাঁহারা ঐ ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া মতামত প্রকাশ করিলে আমাদের সংশয় সম্যক অপনোদিত হইতে পারে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে খ-গোল মিতির (Sperical Trigonometry) জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সমাকলন গণিত ও চলনকলন গণিতের (Integral and differential Calculus) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর গ্রহ-নক্ষত্রগণের সাধারণ গতিবিধির ও অল্পাধিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

একটী সুদীর্ঘ শলাকা পৃথিবীর মেরুদ্বয় ও কেন্দ্র বেধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। ইহাকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলে। এই মেরুদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় অবয়ব আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ আবর্ত্তন করার নাম পৃথিবীর আহ্নিক বা দৈনিক গতি। ইহাতে দিবা ও রাত্রি হয়।

পৃথিবীর এই মেরুদণ্ডটীকে অনবরত উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে খ-বর্ত্তুলকে আরও দুই বিন্দুতে বেধ করিয়া যাইবে। খ-গোলকের এই বিন্দুদ্বয়কে খগোল-মেরু বলা হইয়া থাকে।

আর পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্ত যে তলে অবস্থিত ঐ তলটী পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই সমান গোলার্দ্ধে বিভক্ত করিতেছে। এই তলটীকে চতুর্দ্দিকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিলে খ-গোলকটীকেও একটী বৃত্ত রেখায় উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই সম-গোলার্দ্ধে বিভক্ত করিবে। এই বৃত্তটীকে বিষুবদ্বৃত্ত (Celestial Equator) বলে।

সুতরাং যে শলাকা ভূ গোলকের মেরুদণ্ড সেই শলাকাই খ গোলকেরও মেরুদণ্ড। আর যে তলে ভূ-গোলকের নিরক্ষ বৃত্ত অবস্থিত সেই তলেই খ-গোলকের বিষুব্ বৃত্তও অবস্থিত। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে এই বৃত্ত দুইটীকে অভিন্ন-কেন্দ্র বৃত্ত বা Concentric Circle বলিতে পারা যায়।

রাশি চক্রের উপর দিয়া ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় রবি আকাশ মার্গে বিচরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং রবির দৈনিক গতি প্রায় ৩৬০/৩৬৫ = ১° অংশ বা ১ ডিগ্রী। প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্য নিশ্চল। পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ করার দরুণই রবির এই গতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে বৃত্তাকার পথে সূর্য্য আকাশ মার্গে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছেন তাহার নাম রবি মার্গ বা সূর্য্যের পথ। দ্বাদশ রাশি এই বৃত্তে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে রাশিচক্র ও বলে। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও এই চক্রে সুবিন্যস্ত বলিয়া ইহাকে ভ-চক্র বা নক্ষত্র চক্রও বলা হয়। এই বৃত্তটী কর্কট ও মকর

ক্রান্তিকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত আছে। আর এই চক্রের সাহায্যে রবির দৈনিক ক্রান্তি বা declination নির্ণয় করা হয় বলিয়া ইহাকে ক্রান্তি বৃত্তও বলে।

রব্যাদি খেচরগণ প্রত্যহ বিষুবদ্ বৃত্তের সমান্তরাল বৃত্তপথে আকাশে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়। এবং বৎসরের যে দুই দিন (৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন) সূর্য্য অনবরত বিষুবদ্ বৃত্তের উপর দিয়া দৃষ্টতঃ আকাশ পরিভ্রমণ করেন, সেই দুই দিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়।

প্রতি বৎসর সূর্য্য ছয় মাস বিষুবদ্ বৃত্তের উত্তরে ও ছয় মাস বিষুবদ্ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থান করিয়া কিরণ বিতরণ করেন। বিষুব রেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে রবির এই গমনাগমনের নাম অয়ন।

কর্কট ক্রান্তির উত্তরে বা মকর ক্রান্তির দক্ষিণে সূর্য্য কখনও যাইতে পারেন না। এই জন্য কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তিকে অয়নান্ত বৃত্ত বলা হইয়া থাকে।

খগোলকে বিষুবদ্ বৃত্ত ও ক্রান্তি বৃত্ত (রাশিচক্র) যে দুই বিন্দুতে তির্য্যক্‌ভাবে পরস্পর অবচ্ছেদ করিতেছে, তাহাদের নাম ক্রান্তিপাত বা সম্পাত বিন্দু। এই বিন্দুদ্বয়ের উপর দিয়া সূর্য্যের অয়ন বা গমনাগমন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অয়ন বিন্দুও বলা হইয়া থাকে। ইহারা স্থির নহে। অতি মৃদু গতিতে আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছে।

যে দিন সূর্য্য অয়ন বিন্দু অতিক্রম করিয়া বিষুব রেখার উত্তরে গমন করেন তাহাকে উত্তরায়ন সংক্রান্তি এবং ছয় মাস পরে যখন রবি আবার অপর অয়ন বিন্দু অতিক্রম করিয়া বিষুব রেখার দক্ষিণে গমন করেন তাহাকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলা উচিত। এই উভয় সংক্রান্তিকে ন্যায্যতঃই বিষুব সংক্রান্তি বলা হইয়া থাকে। প্রথমটী মহাবিষুব ও দ্বিতীয়টী জলবিষুব নামে পরিচিত। আর যে দিন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অবনী প্রদক্ষিণ করেন তাহাকে কর্কট সংক্রান্তি এবং যে দিন মকর ক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন তাহাকে মকর সংক্রান্তি বলা সঙ্গত। প্রাকৃতিক নিয়মে বিভক্ত করিলে বৎসরকে এইরূপে চারি প্রধান ঋতুতে বিভাগ করিতে পারা যায়। অবশ্য এই বিভাগ সায়ন মতে করা হইয়াছে। নিরয়ন মতে আমাদের পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় বলিয়া এই সংক্রান্তিগুলির স্থান পিছাইয়া গিয়াছে।

অয়ন বিন্দুদ্বয় যে গতিদ্বারা মেষ ও তুলার আদি বিন্দু হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইতেছে তাহার নাম অয়ন গতি। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক অয়ন গতি ৫৪ বিকলা।* মেষের বা তুলার আদি বিন্দু হইতে সম্পাতের দূরত্বকে অয়নাংশ বলে। যে বৎসর অয়নাংশ শূন্য ছিল অর্থাৎ মেষের আদি বিন্দুতে সম্পাত ছিল সেই বৎসর ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হইত। কারণ তখন সূর্য্য ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীতে কিরণ বর্ষণ করিতেন। এই দুই দিবস সূর্য্য আকাশমার্গে থাকিয়া যে বৃত্তাকার পথে দৃষ্টতঃ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন তাহা এবং বিষুবদ্ বৃত্ত পরস্পর হইতে অভিন্ন বা এক। যেমন ৪২১ শকাব্দের অয়নাংশ ছিল না। সুতরাং তখন ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইত। এই অয়নাংশ ক্রমে যত অংশ বৃদ্ধি পাইবে ৩০শে চৈত্রের বা ৩০শে আশ্বিনের তত দিন পূর্ব্বে দিবারাত্রি সমান হইবে। যেমন এই বৎসর অয়ন স্ফুট ২১। ২৪। ১৮ আছে। কলাদি বাদ দিয়া ২১। ০। ০ হয়। অতএব এক্ষণে মাস শেষ হওয়ার ২১ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ (৩০—২১) = ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইতেছে।

ইংরেজিতে ইহাকেই অয়নের পশ্চাৎ গতি ব Precession of the Equinox বলে। ইংরেজি পঞ্জিকাতে প্রতি বৎসরই পাতবিন্দুদ্বয়ের এই গতি সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। আমাদের মেষের আদি বিন্দু অচল এবং অয়ন বিন্দু সচল। ইংরেজি মতে মেষের আদি বিন্দুও যা অয়ন বিন্দুও তা এবং উভয়েই সচল। এই জন্য তাহাদের গণনাকে আমরা সায়ন গণনা এবং আমাদের গণনাকে নিরয়ন গণনা বলিয়া থাকি।

অয়নের পশ্চাদ্‌গতি নিবন্ধন আমাদের ঋতুগুলিও পিছাইয়া যাইতেছে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে যাইতে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে যখন আমরা মাঘ মাসে গ্রীষ্মাতিশয্যে একান্ত ক্লান্ত এবং শ্রাবণে শীত সমাগমে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িব।

* পাশ্চাত্য মতে অয়ন গতি প্রতি বর্ষে ৫০.২৬ বিকলা।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

২

হরিদত্তের কালিকাপুরাণ--আর একখানি শাক্তগ্রন্থ। এই গ্রন্থে শক্তির নানা জন্মের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দশাবতারও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব পাঁচালী।

কালিকাপুরাণ বৃহৎ গ্রন্থ। আমরা ইহার সম্পূর্ণ পুথি এখনও পাই নাই। এই গ্রন্থের প্রথমাবধি ১৭৮ পাতা পাওয়া গিয়াছে। এই ১৭৮ পাতার শ্লোক সাংখ্যা ৫৩৫০। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ কত বড় তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে কবি যে ভাবে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি দশ অবতার বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭৮ পাতায় মৎস্যাদি পাঁচ অবতার বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আরও পাঁচ অবতারের বর্ণনা, অপ্রাপ্ত অংশে আছে। কাজেই অপ্রাপ্ত অংশ, প্রাপ্ত অংশ হইতে ছোট হইবার কথা নহে। এ অনুমান সত্য হইলে কালিকাপুরাণ বিপুলায়তন গ্রন্থ।

পুথি লেখক তিনজন—কীর্ত্তিনারায়ণ বসু, রামনাথ বসু ও গৌরীচরণ বসু। তিনেরই নিবাস বৈষ্ণবপুর। গৌরীচরণের কিছু কিছু কবিত্ব-কণ্ডূতি ছিল। কোন কোন পাতায় তিনি—

"শ্রীকালিকাচরণে আশ।
গৌরীচরণ বসু দাস॥

লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কাব্য—সাহচর্য্যের ফল।

কেবল আকারেই কালিকাপুরাণ প্রকাণ্ড নহে। "মহত্বাং" ও ভারী বটে। হরিদত্ত মহাশয়, কেবল কবি ছিলেন না, পণ্ডিতও ছিলেন। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব, তিনি অতি সরল কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপাখ্যানের চমৎকারিত্বে এবং বর্ণনার মাধুর্য্যে তাঁহার গ্রন্থ, সর্ব্বত্র সুখ-পাঠ্য। উহা পাঠে ক্লান্তি আসে না, বিরক্তি জন্মে না। তবে প্রাচীন বাঙ্গালায় অনভ্যস্ত পাঠককে সমুদ্র স্নানে অনভ্যস্ত লোকের মত প্রথম কয়েকদিন লোণা জলের ঢেউ নাকে মুখে লইতে হইবে। তাহার পর অভ্যাস হইয়া গেলে সেই লোণা জলের তলে অনেক মণিমুক্তা দেখিতে পাইবেন।

ভাষা ও রচনা প্রণালী দেখিয়া হরিদত্তকে রূপনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যায়। হরিদত্ত, অনেক স্থলেই "সমা" (সবা) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, রূপনারায়ণে ও এরূপ প্রয়োগ আছে কিন্তু "সনাঞি" (সবাই) কেবল হরিদত্তে পাওয়া যায়, রূপনারায়ণে নাই। ক্রিয়াপদে "হ" কারের প্রয়োগ (করহ, পারহ, থাকহ) উভয় গ্রন্থেই আছে কিন্তু হরিদত্তের—"পারো, করো, গাউ, পাউ—প্রভৃতি রূপনারায়ণে নাই। টাঙ্গাইল মহকুমার প্রাকৃত জনের ব্যবহৃত নিম্নলিখিত বিশিষ্ট শব্দগুলি হরিদত্তের কালিকাপুরাণে যত্রতত্র, পাওয়া যায়:—

"লঘ্বী" ... প্রস্রাব।

হরিদত্ত, মূত্রত্যাগকে লঘ্বী ক্রিয়া তাং মলত্যাগকে গুর্ব্বী ক্রিয়া লিখিয়াছেন। এখনও টাঙ্গাইল মহকুমায় মূত্রত্যাগ অর্থে "লঘ্বী" শব্দের প্রয়োগ আছে।

"উভদ" ... ঊর্দ্ধমুখ।
"কোখ" ... উদর। কুক্ষি-শব্দজ।
"টীকর" ... উচ্চ ভূমি।
"চিরৎকার" ... চীৎকার।
"বাড়ি" ... আঘাত করা।
"কারণ কথা" ... প্রকৃত রহস্য।
"সম্ভাষণ" ... নমস্কার।
"ফুটি" ... অল্প কিছু তরল দ্রব্য। যেমন ফুটি দুধ, বা দুধ-ফুটি। জল ফুটি।

মেয়েলী গাথা—

কাণা দেও আরে ভাই।
ফুটি ফুটি জল দেও,
চিনার ভাত খাই।
আর ফুটি জল দেও,
ঝাপুড়ি খেলাই॥

টাঙ্গাইল মহকুমার প্রাকৃতের এইরূপ বহু শব্দই কালিকাপুরাণে আছে।

হরিদত্ত, জাতিতে কায়েস্থ ছিলেন। কালিকাপুরাণ রচনা করিয়া তিনি নিজেই উহা দল বাঁধিয়া গান করিতেন। বন্দনার পরে হরিদত্ত স্বীয় গায়ক ও বাদকদিগকে বলিয়াছেন—

"সাবহিত তাল যন্ত্র   দেবীপদ মূলমন্ত্র,
মন দিল পরম আনন্দে।

গাওরে গায়ান ভাই মনে কিছু চিন্তা নাই,
ভজ গুরু চরণারবিন্দে॥"

হরিদত্তের রচনার আদর্শ দেখাইবার জন্ত তদীয় "শিব-বন্দনা" হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল :—

"বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম যানে বাখানে
লোকে বলে পুরুষ প্রধান।
বামে বৈসেন গৌরী শিরে শোভে সুরেশ্বরী
তাঁহে মোর বহু পরণাম॥
বাহন বলদ গোটা কপালেত শশী ফোটা,
বাঘ ছাল অঙ্গের ভূষণ।
গলায় হাড়ের মাল মাথে শোভে জটাজাল,
চন্দ্র সূর্য্য অনল নঞান॥"

নিরাকার ধর্ম্মের বন্দনায় হরিদত্ত লিখিয়াছেন ঃ—

হস্তপদ নাহি যার নাহি চক্ষু কাণ।
নাসিকা অধর নাহি নাহি কর যান্॥
নৈরাকার ধর্ম্মপ্রভু, সাকার বিশেষ।
সকল শরীরে থাকে প্রভু হৃষীকেশ॥

ইহা শূন্য-মূর্ত্তি ধর্ম্ম ঠাকুরের ধ্যানের সহিত মিলে ! এ বন্দনা পড়িয়া মনে হয়, হরিদত্তের সময়ে ধর্ম্মের প্রভাব কিছু কিছু ছিল। তিনি আদিতে "নৈরাকার" হইলেও সে সময়ে "হৃষীকেশ" হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রামনাথ সেনের কালিকা-পুরাণ।

রামনাথ সেন, আর একখানি কালিকাপুরাণের রচয়িতা। এই গ্রন্থে কেবল শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। পত্র সংখ্যা ১২। গ্রন্থ শেষে লিখিত হইয়াছে :—"ইতি সমাপ্ত। সহস্কর শ্রীমদনমোহন গুহ দাষ কালীর চরণে আশ। সাকিন বাসাইল পরগণে আটীয়া হিস্তে ৶০ আনী জমিদার শ্রীযুত নছরালী খাঁ চৌধুরী ইজারাদার শ্রীভীমচরণ পোতদার। ই পুস্তক মোকাম বাসা ঘরে মাহে কার্ত্তিক রোজ সমবার বেলা তিতি প্রহর কালে সমপ্ত ইতি সন ১২৩৯ সন তারিখ ২১ কার্ত্তিক।

ই পুস্তক যে পুস্তক দেখিয়া নকল করিয়াছি সেহি পুস্তকে অনেক অশুর্দ্ধ ছিল তাহাতেই য়েহি পুস্তকে অনেক অশুর্দ্ধ হইয়াছে এবং ভুল বেশুর হইয়াছে। ইহাতে নকল নবিশের চুক নাহি জানিবেন ইতি।"

নকল নবিশের কৈফিয়ত পাওয়া গেল কিন্তু ইহা হইতে বুঝা গেল না, গ্রন্থ এই পর্য্যন্তই শেষ কি পূর্ব্বাপর আরও কিছু আছে।

কালিকামঙ্গল।

"কালিকামঙ্গল" নামে ভারতচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত একখানি গ্রন্থ এ মহকুমায় পাওয়া গিয়াছে। উহা বিদ্যাসুন্দরের "বাঙ্গাল"দেশের সংস্করণ। অথবা সংস্করণই বা বলি কেন, ইহার ভাব, ভাষা, ও আখ্যানবস্তু সবই বাঙ্গালের, কেবল ভণিতায় ভারত নাম। ইহার ভাষা এইরূপ :—

বীরসিংহ রাজকন্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে ধন্যা
গুণবতী যেন সরস্বতী।
ভাবে বিদ্যা মনে মন কি বলিব নিরূপণ
যেহেতু পুছেন নরপতি॥
শাস্ত্রের বিচার করি বোলে বিদ্যাসুন্দরী
পিতা মোর শুনহ বচন।
হেট মুখে বিদ্যা কয় শোন শোন মহাশয়
আছে যে বিধির নিরূপণ॥
ধর্ম্মনীতি শাস্ত্র মত বিচার করিলাম যত,
বিচার করিয়া কৈলাম সার।
প্রতিজ্ঞা করিলাম মনে পণ্ডিত সকল সনে
বিচারে যে জিনিবে আমার॥
শুন রাজা মহামতি বিদ্বান্ বরিব পতি
অবিদ্বানে নাহি প্রয়োজন।
দেখিলে শাস্ত্রের নীত শাস্ত্রে যার নাহি মিত,
সেহি অন্ধ থাকিতে লোচন॥
যার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান দেহমাত্র শূন্য প্রাণ
জীয়তে হি মরণ সমান।
অবিদ্বান মূঢ় জন, না বরিব কদাচন,
ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে বিধান॥
মূর্খ জীব যার পতি সে নারীর অধোগতি
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় পতিযোগে।
পতি পাপে হয় পাপ জীবনে না ঘুচে তাপ,
অন্তেতে নরক ভোগ ভোগে॥
প্রতিজ্ঞার কথা জানি পণ্ডিত সকলে আসি
লাজে রহে না কহে বচন।

কন্যার বচন শুনি   চিন্তাযুক্ত নৃপমণি
আসিয়া মিলিল ভট্টগণ ॥"

এ ভাষা যে, রায় গুণাকরের নহে, তাহা বলাই অধিক। কিন্তু কোন্ উদ্বাহু বামন বাঙ্গাল, ভারতচন্দ্রের প্রাংশুলভ্য যশের জন্য এমন করিয়া হাত বাড়াইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। "কবিত্ব ভারতচন্দ্রে বলে"—বলিয়াই সে বেচারা আসর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

শাক্ত সাহিত্যের আর এক ধারা—মনসার ভাসান বা মনসা-মঙ্গল। চণ্ডী, এ দেশে তেমন আড়ম্বর উপচারে পূজা না পাইলেও বিষহরির পূজা "দস্তুরি"ই প্রচলিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে চণ্ডী, রাঢ়ের এবং বিষহরি বঙ্গের বা পূর্ব্বদেশের দেবী। মনসার ভাসানের অধিকাংশ কবিই পূর্ব্বদেশীয়। কেবল ঘোর গ্রামের নারায়ণ বা ফুল্লশ্রীর বিজয়গুপ্ত নহে, মনসার ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া প্রায় সকলেই প্রাচ্য। কিন্তু এই সকল কীর্ত্তনীয়ার মধ্যে কে বা কাহারা টাঙ্গাইল মহকুমার নিবাসী, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। মনসা মঙ্গলের যে পুঁথি এখন এ মহকুমায় পঠিত ও গীত হয়, উহা নারায়ণ দেবের নামে পরিচিত! কিন্তু একা নরায়ণই উহার রচয়িতা নহেন। এ গ্রন্থে বংশীদাস আছেন, বল্লভ আছেন, যদুনাথ-জানকীনাথ আছেন, আরও অনেক আছেন। ইহার মধ্যে নারায়ণ ও বংশীদাস ব্যতীত অন্যের গাঁই-গোত্রের ঠিকানা পাওয়া যায় না। কাজেই কে আপন কে পর, বাছিয়া লইবার উপায় নাই।

ভাসান যাত্রা।

ভাসান যাত্রা নামে এক প্রকার গান, এ মহকুমায় এখনও প্রচলিত দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহার নাম "ভাসান গান" ছিল; "যাত্রা"টুকু নূতন যোগ। এ যোগের কারণ—"যাত্রা" নামটুকু দিলেই একটু সম্ভ্রম বাড়িবে। নহিলে আসল নাম—"ভাসান"। বেহুলা, মৃত স্বামীকে লইয়া ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছিলেন, এই জন্য মনসা-মঙ্গলের নয়টি পালার মধ্যে এই অংশের বর্ণনাত্মক পালার নাম—"ভাসান" বা "ভাসান পালা" ইহার পরে "জীয়ান পালা"। এইরূপে নয় পালাতে মনসা মঙ্গল সম্পূর্ণ হইয়াছে। নয় পালার মধ্যে এই "ভাসান" পালাই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় স্পর্শী, করুণ-রস-পূর্ণ। এই পালাতেই সতীর লাঞ্ছনা, সংযম, ত্যাগ ও প্রেমের চরম বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য "ভাসান" নামেই সমগ্র মনসা-মঙ্গল পরিচিত। গানের নামও সেই জন্য "ভাসান"। এ মহকুমার "ভাসান" যাত্রা কোন নিরক্ষর গ্রাম্য কবির রচিত। ইহাতে কথা ও গান দুইই আছে, অভাব কেবল কবিত্বের। তথাপি সতীর কাহিনী বলিয়াই ইহার শ্রোতার অভাব হয় না।

২। শৈব সাহিত্য।

দুইখানি "কাশীখণ্ড" এ মহকুমার শৈব সাহিত্য। একখানির প্রণেতা—দ্বিজ সৃষ্টিধর; অন্যখানির প্রণেতা—কেবল কৃষ্ণবসু।

সৃষ্টিধর, স্কন্দপুরাণের মূল কাশীখণ্ড ভাঙ্গিয়া "মহেশ মঙ্গল" নামে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। "মহেশ মঙ্গল" প্রকাণ্ড গ্রন্থ। একশত অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই একশত অধ্যায়, চৌদ্দ পালায় বিভক্ত। সপ্ত দিবানিশি ব্যাপিয়া এই চৌদ্দ পালা গান করা হইত। গ্রন্থ মধ্যে—"ইতি রবিবারের নিশাপালা", "ইতি সোমবারের দিবা পালা"—বলিয়া পালার নির্দ্দেশ আছে। সৃষ্টিধর, গান করিবার জন্য মহেশ মঙ্গল রচনা করেন। তিনি দল বাঁধিয়া নিজেই ইহা গান করিতেন। ভণিতার মধ্যে:—

"তেতাল্লিশ অধ্যাপূর্ণ   ইহাতে রজত স্বর্ণ,
গায়কেরে করিবে সম্মান।
মহেশ মঙ্গল শুনে   তারে তুষ্ট ত্রিলোচনে,
নায়কেরে করেন কল্যাণ॥"

রজতস্বর্ণ পুরস্কার প্রাপ্তির প্রার্থনা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়, মহেশ-মঙ্গল-পাঁচালী-গান তাঁহার জীবিকা ছিল; তিনি সখের গায়ক ছিলেন না। ভণিতাতে অনেক স্থলেই সৃষ্টিধর আপনাকে "নৌতুক কবি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে—"মহেশ মঙ্গল"ই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। "বক্তা গুরু শ্রীগঙ্গাচরণ পদ সেবি" সৃষ্টিধর এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ মধ্যে সৃষ্টিধরের পরিচয় এই:—

"গোত্রেতে কশ্যপ ঋষি   শিবভক্ত যেন শশী
আত্মারাম নামে দ্বিজবর॥
উমা শিব পরায়ণ   তাহার নন্দন হন
শ্রীরাম স্মরণ কর মন।
হর গৌরী পদসেবী   রচিল নৌতুন কবি
সৃষ্টিধর তাহার নন্দন॥"

কেবল কৃষ্ণ বসু, কেদারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থ, "কাশীখণ্ড" নামেই পরিচিত। ইহা কেবল পাঠের জন্যই রচিত হইয়াছিল, গানের জন্য নহে। কেবল পাঠের জন্য গ্রন্থরচনা, এ মহকুমায় এই প্রথম।

কেবলকৃষ্ণের কাশীখণ্ড ও বৃহৎ গ্রন্থ। অন্তে কাশী প্রাপ্তি এবং কাশীনাথের চরণ প্রাপ্তির আশায় কিরূপে যে সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ কেবল কৃষ্ণ, এই গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন, ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। কাশীখণ্ডের সমাপ্তি স্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"অশ্বরাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়।
শকের আখিরি পরে কহি নিরনয়॥"

ইহা হইতে জানা যায়, ১৭৩৭ সনে কাশীখণ্ড সমাপ্ত হয়।

কেবলকৃষ্ণ, নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন; লোকে তাঁহকে শূদ্র পণ্ডিত বলিত, সমাজে তাঁহার 'পাতি' চলিত। তথাপি কাশীখণ্ড ভাষা' করিতে যাইয়া তিনি গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের "শ্লোকার্থ" শিরে বন্দনা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাচীনেরা এমনই বিনয়ী ও সত্যবাক্ ছিলেন; এ কালের মত পরের বিদ্যায় আপনাকে বিদ্বান বলিয়া 'জাহির' করিবার প্রয়াস, সেকালের কাহারও ছিল না বরং অনেকেই পরের নামের মধ্যে আপনার কৃতিত্ব ডুবাইয়া দিতেন। 'কাশীখণ্ড' রচনা সম্বন্ধে কেবলকৃষ্ণের নিজের কথা এই :—

"ভট্টাচার্য্য গঙ্গাপ্রসাদের স্থিতিবাস।
ক্ষিতি মধ্যে রৌহা গ্রাম সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
পুরাণে জ্যোতিষে শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহীতে।
রাজসাহী মধ্যেতে গ্রাম সিন্দুরী চাকলাতে॥
তাহান্ শ্লোকার্থ শিরে বন্দি সাবহিতে।
কহিছে কেবলকৃষ্ণ বসু পয়ারেতে॥

রৌহা গ্রাম, টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তে মাণিকগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। এক সময়ে রৌহার পণ্ডিত ও রৌহার পঞ্জিকা এদেশে প্রামাণ্য ছিল। কিন্তু "তে হি দিবসা গতাঃ"— রৌহার আর সে দিন না।

৩। বৈষ্ণব সাহিত্য।

এ মহকুমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থ— "জগন্নাথ বিজয়"। আর এ মহকুমারই বা বলি কেন, ময়মনসিংহ জেলায় ইহা অপেক্ষা পুরাতন "মঙ্গল" বা "বিজয়" পাঁচালীর আর পাওয়া যায় নাই। মুকুন্দভারতী এই "বিজয়" পাঁচালী প্রণেতা। কিরূপে পুরীতে জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং রথযাত্রা কি, তাহাই এ গ্রন্থের বর্ণনার বিষয়।

মুকুন্দের সময়ে বাঙ্গালা পয়ারের অক্ষর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই ছন্দ, তখন কেবল সুর ও মিলের উপর গড়িয়া উঠিতেছিল, কাজেই এক চরণ বার অক্ষরের এবং অন্য চরণ বিশ অক্ষরের হইয়া গিয়াছে। মুকুন্দের পয়ারের নমুনা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

(১) চণ্ডিকা চরণ যুগ্ম বন্দো শিরে। (১২ অক্ষর)
যাহার মায়ায় স্থির নহে ব্রহ্মা হরি হরে॥ ১৬ অক্ষর
(২) ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনিয়া শ্রবণে। ১৪
পাঁচালীর প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে॥ ১৭
(৩) রাজা থুইয়া ব্রহ্মা আইলা সন্ধ্যা করিতে সত্বর। ১৮
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক ষাটি সহস্র বৎসর॥ ১৬
(৪) হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন কৈল দান। ১২
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ করে হাতে ত লইয়া দূর্ব্বাধান। ২০

এই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হয় নাই; সর্ব্বত্রই পয়ার এইরূপ। জগন্নাথ বিজয়ে ত্রিপদী ছন্দও আছে, তাহারও অক্ষর পরিমাণ, এই প্রকারই বিষম। ত্রিপদীর রচনা অল্প, পয়ারই বেশী। মুকুন্দ, পয়ারের নাম—"খর্ব্ব ছন্দ" এবং ত্রিপদীর নাম— "মালিনী লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালা কবিতার এই অবস্থা কখন ছিল, যদিও তাহার নির্দ্দেশ, নিশ্চিতভাবে করিবার উপায় নাই, তথাপি ইহা দৃঢ়ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, উহা চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙ্গালা পয়ারের অক্ষর পরিমিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদাবলীও মাত্রাক্ষর পরিমিত। মুকুন্দের অ-সমাক্ষর ভারতী, চণ্ডীদাসের পরিমিতাক্ষর বাণীতে পরিণত হইতে যে, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগন্নাথ বিজয়ের মত অ-মিতাক্ষর কেবল ময়নামতীর গানে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ময়নামতীর গান ও "জগন্নাথ বিজয়" একই সময়ের বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

মুকুন্দ, বিবাহে মঙ্গলাচরণের বর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

"গুয়া কলা নারিকেল রোপিল সারিসারি।"

মঙ্গলাচরণের জন্ম কদলী বৃক্ষ রোপণ প্রথা আজিও বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ রোপণ প্রথা যে কোন্ যুগে প্রচলিত ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। না থাকুক, বাঙ্গালার সেই অতি পুরাতন যুগেই যে, মুকুন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। সে সময় সন তারিখ দিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

রথযাত্রা, হিন্দুর এক মহামহোৎসব। কিন্তু ব্যাপারটি যে কি, ইহা এক দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন। কলেজের বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন—ইহা বৌদ্ধদিগের "দন্তোৎসব"। বুদ্ধদেবের দাঁত, রথে চড়াইয়া বৌদ্ধেরা নাকি রথ টানিত। এখন হিন্দুরা, দাঁতের স্থলে জগন্নাথ চড়াইয়া তাহারই অভিনয় করে। চতুষ্পাঠীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা বলেন—"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। কিন্তু বামনদেব কবে রথে চড়িলেন এবং এই ব্যাকরণ দুষ্ট শ্লোকাংশই বা কোথা হইতে আসিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের নস্যের টীপ বাড়িয়া যায় মাত্র, সিদ্ধান্ত আসে না। দশকর্ম্মের পদ্ধতিতে বামন-রূপ বিষ্ণুর উদ্দেশে রথোৎসর্গ করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে বামনের শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা নাই। জগন্নাথ কিন্তু শ্বশুর বাড়ী যান, এবং সেখানে সাত দিন পরম সুখে ভোগ লাগাইয়া অষ্টম দিবসে ফিরিয়া আসেন। কাজেই বলিতে হয়, ইহা বৌদ্ধের দন্তোৎসব ও নয়, বামনের রথারোহণ ও নয়। ইহা কি, জগন্নাথ বিজয়ে সে রহস্য বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাই জগন্নাথ বিজয়ের প্রকৃত আখ্যান বস্তু। কবি মুকুন্দ ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনিয়া বিষ্ণুর সেই লীলা-বিবরণ, পাঁচালী করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

বাড়ীর কর্ত্তা

(ক)

বেলা আটটায় কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গল। স্ত্রী সুভাষিণী অনেক আগেই উঠে ঘরের দরজা জানালা খুলে দিয়ে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে ভাবছিল। কর্ত্তা ধরমর করে উঠে বিছানায় বসে, দুই হাতের দুটী অঙ্গুল দিয়ে বেশ করে একবার চোখ দুটো রগ্‌ড়ে নিলেন, তারপরে কট্‌মট্ করে চারদিক পানে চাইতে চাইতে একখানা গরদের চাদর গায়ে দিয়ে থক্ থক্ করে কাশতে কাশতে খাট থেকে নাম্‌লেন। নেমেই হঠাৎ তাঁর নজর পরল খোলা জান্‌লার দিকে। দেখে দাঁত খিঁচিয়ে বল্লেন—কোন্ জানোয়ার এত ভোরে ঘরে ঢুকেছিল—দরজাটা বন্ধ করে রেখে যাবার আক্কেল হয় নি তার?" কি আপদ! কালকার এ পুরানো খবরের কাগজখানা কে রাখল আমার টেবিলে এনে? শিগ্‌গির এখানা সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে—নাও বল্‌ছি—নয়ত এক্ষুণি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলব। নাঃ! আর পারি না! এ চাকরগুলোর জ্বালায় পাগল হতে হবে আমায় দেখছি! ওরে বিপ্‌নে—বিপ্‌নে—নাঃ সে ব্যাটাছেলে কি আর দেশে আছে? কে ফেল্লে এ ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো দুখানা ঘরের মেঝেয়? একটা চাকর ডেকে এ কাগজ দুখানা আমার বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে মুখুজ্জেদের বৈঠকখানার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে আস্‌তে বল। কোনো ময়লা আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও থাকৃতে পার্ব্বে না। মাসে মাসে দশ বারোটা চাকরের মাইনে জোগাচ্ছি, তবু আমারি শোবার ঘরখানা অষ্ট প্রহর শুঁড়ীর দোকানের মতন বেগোছালো হয়ে থাক্‌বে! বারান্দায় থামের আড়ালে কে দাঁড়িয়ে দ্যাখো ত?"

ধীরে ধীরে সুভাষিণী—বল্ল—"ও হচ্ছে পশ্চিম পাড়ার পুঁটীর মা—তোমার কাছেই এসেছে।" বিকৃতস্বরে কর্ত্তা জিজ্ঞেস্ করলেন—ও মাগীর এত ভোরে আমার কাছে কি দরকার? কাতর ভাবে সুভাষিণী বল্ল—আহা সকাল বেলা কাউকে গালাগাল কর্ত্তে নেই—তুমি কাল আস্‌তে বলেছিলে তাই এসেছে ওর কিছু দোষ নেই।"

কর্ত্তা বল্লেন—না গো না গালাগাল করি নি—একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করেছি মাত্র। আর দ্যাখো, তুমি অমন ভাবে হাতগুটিয়ে চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার উপক্রম না করে, কোন একটা দরকারী কাজ করগে না কেন? কি অলস তোমাদের এই মেয়ে মানুষ জাতটা! আমি অবাক্ হয়ে যাই! এক একজন যেন খোদ কুঁড়ের বাদ্‌শা। পুরুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয় অস্ত খেটে পয়সা রোজগার কর্ব্বে, আর বাড়ীতে

জীবন্ত পুতুলটীর মতন সেজেগুজে বসে, সেই পয়সায় তোমরা বেশ মজা ওড়াবে! ধন্যি জাত বটে।—চক্ষু লজ্জা ভাতে দিয়ে খেয়েছ একেবারে! বাঃ রে বাঃ আবার কান্না হচ্ছে! কি অন্যায় কথাটি বলেছি আমি? উচিত কথা বড্ডই অপ্রিয় শোনায়। তোমার আর একার কি দোষ দেব? মানুষ মাত্রেই উচিত কথা শুনলে চটে।" চোখের জল মুছতে মুছতে সুভাষিণী বল্ল—বরাবরই আমি লক্ষ্য কচ্ছি, রাত্তির একটার সময় বাড়ী ফিরলেই তার পরদিন সকাল বেলা তোমার মুখ থেকে উচিত কথাটা একটু বেশীর ভাগেই বেরোয়।"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে কর্ত্তা বল্লেন—যাও আর বেশী বকিও না—কাজে যাও। আমার কাজের কৈফিয়ৎ আমি কারো কাছে দিতে বাধ্য নই। আমার যেখানে খুশী আমি যাব যতক্ষণ বাইরে থাকতে ইচ্ছে হবে থাক্‌ব—তাতে কার বাপের কি ক্ষেতিটা হয় শুনি?" সুভাষিণী আর কোন কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পুঁটীর মা বেচারাও ব্যাপার সুবিধেজনক নয় দেখে অন্য দিকে সরে পরল।

(খ)

দুপুর বেলা কর্ত্তা খেতে বসেছেন। কাছে বসে সুভাষিণী সাত বছরের ছেলে হাবুকে খাওয়াচ্ছে। গলাটান করে আরষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বামা ঝি কর্ত্তাকে পাখা কচ্ছে।

কর্ত্তা খেতে খেতে মাছের ঝোল মুখে দিয়েই হটাৎ একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। সুভাষিণী চম্‌কে উঠল—বামা ঝির পাখা থেমে গেল—হাবু মহাভীত হয়ে বাপের পানে চেয়ে থর থর করে কাঁপতে ২ মায়ের আঁচল ধরল। মহা বিরক্ত হয়ে কর্ত্তা বল্লেন—নাঃ এ ভাবে আর চলতে পারে না! কাল থেকে আমার আবার বন্দোবস্ত অন্যত্র কর্ত্তে হবে দেখছি! ভয়ে ভয়ে সুভাষিণী জিজ্ঞেসা করল—হয়েছে কি? মাছের ঝোলটা কি মোটেই খাওয়া যাচ্ছে না নাকি?" ভ্যাংচি কেটে কর্ত্তা বল্লেন—খাওয়া যাবে না কেন? শুয়োরের জিভ্ আর তারি মতন আস্বাদবোধ থাক্‌লে বেশ-ই খাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য ক্রমে মানুষের জিভ নিয়ে তোমাদের পাল্লায় পরেছি কিনা—তাই একটু একটু কষ্ট হচ্ছে। রান্নাবান্নার তদারক নিজে না করে ঐ ভালখোর কটুকীটার হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে তেতলার ছাদে বসে তুমি খুব হাওয়া খেও, তা হলেই রান্নাগুলো ক্রমে ক্রমে আরোও সুখাদ্য হয়ে উঠবে।" পরে রান্না ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিদ্রূপ পূর্ণস্বরে ডাক্‌লেন—ওগো বামুনের পুত্তুর, বলি এ দিকটায় একবার একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাও ত। ডাকার রকম শুনেই ঠাকুরের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গ্যালো। সে বেচারা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে খানিকটে হলুদ হাতে করে এসে কর্ত্তার সামনে ঘাড় কাত করে দাঁড়াল। কর্ত্তা পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞেস্ করলেন—বলি নেশাটেশা কিছু অভ্যাস আছে?" প্রশ্ন শুনে ঠাকুর যেন একেবারে আকাশ থেকে পরল। তার নেশা খাওয়ার কথা কর্ত্তার কাণে উঠল কি করে? এক আধটান গাঁজা সে মাঝে মাঝে ওপাড়ার বেহারী ধোপার বাড়ীতে গিয়ে খায় বটে কিন্তু কর্ত্তার সেটা জান্‌বার কোন সঙ্গত কারণ ত নাই? মৈজদ্দী সহিস সে দিন কর্ত্তার নতুন বালিশের ওয়ারগুলো ধোপা বাড়ীতে দিতে গিয়েছিল—সে ত এসে বলে দেয় নাই? ভেবে চিন্তে কি জবাব দেবে ঠিক্ কর্ত্তে না পেরে ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন জবাব না পেয়ে কর্ত্তা ভারি রেগে ধমক দিলেন—কথা বলতে পারিস্‌নে গাধা? তোর টিকি টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি! "টিকিটি আশু সমূহ বিপদাপন্ন মনে ভেবে ঠাকুর আম্‌তা আম্‌তা করে বল্ল—মুই ত বেশী নিশা না খাউছি করতা।"

শুনে নেশাপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে কর্ত্তা সোজাসুজি জিজ্ঞেস্ করলেন—ঝোলে ছারপোকার গন্ধ কি করে হল রে, জন্তু? ক'বার লবণ দিয়ে ছিলি এতে? কথা বলিস্ না—বড় চুপ্ করে রইলি যে? ... সুভাষিণী ঠাকুরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে বল্‌ল—আগে তাড়াতাড়ি হাবুকে এক মুঠো ভাত এনে দাওত?" আপাততঃ নিষ্কৃতি পেয়ে ঠাকুর রান্নাঘরে ভাত আন্‌তে চলে গেল। এবার কর্ত্তার সমস্ত রাগ গিয়ে পরল সুভাষিণী এবং হাবুর উপরে। তিনি বক্‌তে আরম্ভ করলেন—"মাছের ঝোলটা যে মোটেই আমি খেতে পাচ্ছি না, তা তুমি বুঝ্‌বে না। তোমার হাবুর খাওয়া হ'ল সকলের আগে। আমি না খেয়েখেতে রোগা হয়ে গেলে কারো কোন ক্ষেতি বৃদ্ধি নেই—হাবু দিনের মধ্যে চব্বিশবার গণ্ডেপিণ্ডে করে গিল্‌লেই হল। সবই ত এক রকম ছেড়েছি, এখন এই খাওয়াটা ছাড়্‌লে

তোমরাও বাঁচ আমিও বাঁচি। "সুভাষিণী ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। ঠাকুর পো'ও মাছের ঝোল খেয়ে নিন্দা করল না বরঞ্চ—ভালই বলে গেল।" এক চোখ বুঁজে রুদ্রদৃষ্টিতে সুভাষিণীর পানে অপর চোখে চেয়ে কর্ত্তা বললেন—আমি তা হ'লে মিথ্যে কথা বলছি? কি ভয়ঙ্কর আস্পর্দ্ধা তোমার! আমার স্ত্রী হয়ে, আমার বাড়ীতে থেকে আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থে লালিতপালিত হয়ে—আমারই মুখের উপরে আমাকে মিথ্যাবাদী বললে? অতি নেমকহারাম তুমি?" ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাত নিয়ে আস্‌ল। হাবুকে ভাত দিতে নিষেধ করে কর্ত্তা বললেন—হাঁারে হেবো, ভদ্দর লোকের ছেলে পুলেরা অম্নি করে খেতে বসে রে জানোয়ার? শিগ্‌গির ভাল হয়ে বোস্‌। "ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সুভাষিণী বল্‌ল—আহা, খামাখা কেন বক ওকে খাবার সময়ে! কাল থেকে আর তোমার সাম্‌নে ওকে ভাত দেব না। বাছা আমার দিন্ দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। রাত দিন অম্নি করে যখন তখন গাল মন্দ দিলে কি ছেলেপুলের শরীর ভাল হ'তে পারে।" কর্ত্তা চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লেন—দ্যাখ, অযথা আস্কারা দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ে দিও না। আমায় ওকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমারই মতন ও যাতে জগতের সাম্‌নে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তারও উপায় কর্ত্তে হবে। আমি হচ্ছি ওর বাবা—জন্মদাতা। ওর শুভাশুভ দেখা না দেখা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বড় হয়ে ও যদি চোর হয়, আর যার তার ঘরে সিঁদ কাটে, তা হ'লে দুর্ণাম হবে আমার—তোমার নয়। আমি ওকে কোন ক্রমেই খারাপ হতে দিতে পারিনে। ওই একরত্তি ছেলে—ওর জন্যে মাসে মাসে আমার এক রাশ করে টাকা খরচ হচ্ছে। টাকা জিনিসটা বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে পরে না জান্‌লে? পরিশ্রম কর্ত্তে হয় হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, আমায় খাটুতে হয় এর জন্যে। আ—মর্‌ তবু ছোড়াটা পা—ছড়িয়ে বসে আছে! "সহসা ধমক খেয়ে হাবু চম্‌কে উঠে ভাল হয়ে বসে কাঁদ্‌তে লাগল। কর্ত্তা আবার ধমক দিলেন—ফের কাঁদবি, ত গলা টিপে মেরে ফেলব!" বাবাকে হাবু, বেশ ভাল রকমেই চিন্‌ত। ধমক খেয়ে তাই চুপ করে থাক্‌ল বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হ'ল না। তা দেখে কর্ত্তা ঠাকুরকে হুকুম দিলেন—দাও ত হতভাগাটাকে কাণ ধরে বের করে!" প্রভুপুত্রের কান ধরার মতন ধৃষ্টতা ঠাকুরের আদৌ ছিল না। কর্ত্তার হুকুমে হাবুর কাণ ধরা উচিত কি অনুচিত ঠিক্‌ বুঝতে না পেরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। হুকুম তামিল হ'ল না দেখে, কর্ত্তা মুখ খিচিয়ে ধমক দিলেন—বড় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! রোমজানের নাচ দেখতে এয়েছিস্‌! কথা বললে কাণে সিঁধোয় না! এই গ্লাস্‌ ছুঁড়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব আমি—পাজী উড়ে মেড়া! "কাতর স্বরে সুভাষিণী বলল—আঃ খেতে দেও না ও'কে? একটা দিনও কি আমার চোখের জল না ফেললে তোমার মনস্তুষ্টি হয় না!" কর্ত্তা বললেন—না ওকে খেতে দেব না আমি—ওর মতন ছেলে দূর হয়ে যাক্‌ বাড়ী থেকে।" অবস্থা বুঝে, হাবু আর ঠাকুরের কাণ ধরার অপেক্ষা না রেখে, নিজে নিজেই বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসে কাঁদ্‌তে লাগল। সুভাষিণীরও চোখে জল আস্‌ল। সে বল্‌ল—"দ্যাখ কতদিন তোমায় বলেছি অম্নি করে ঝি চাকরের সাম্‌নে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না। বুঝতে পার না—হাজার হ'লেও ওরা বাইরের লোক।" কর্ত্তা বললেন—থাম আর বুদ্ধি খরচ কর্ত্তে হবে না। ঘরেরই হোক্‌ আর বাইরেই হোক্‌—আমি কোন লোকের তোয়াক্কা রাখি না। ঝি চাকরকে কিসের ভয় আমার? উচিত সত্যি কথা বলতে—আমি কাকেও ডরাই না। এই বাড়ী ঘর জিনিষ পত্তর সমস্ত করেছি আমারই স্বোপার্জ্জিত অর্থে। এখানে বসে যাকে যা খুসী বল্‌বার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। নিজের বাড়ীতে ঝি চাকরের ভয়ে মুখে তুলো বন্ধ করে বসে থাক্‌বার মতন কাপুরুষ আমি নই বুঝলে! এবার সুভাষিণীর আর সহ্য হ'ল না। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল—চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগল। তীব্রস্বরে সে বল্ল—জন্ম জন্মান্তরের বহু পাতক সঞ্চিত না থাক্‌লে তোমার মতন ছোট লোকের ঘরে কেউ আসে না। আত্মহত্যা করলে পাপ যদি না হ'ত আত্মঘাতীর জন্যে যদি অনন্ত নরকের ব্যবস্থা না থাকৃত, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই আমি আত্মহত্যা করে তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা কর্ত্তাম। হঠাৎ সুভাষিণীর রক্ত চক্ষু দেখে কর্ত্তা অনেকখানি দমে

গেলেন। তার পরে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন লজ্জা এবং অনুশোচনায় কর্ত্তার মনটা ভারি বিশ্রী হয়ে পড়ল। নিতান্ত অপরাধীর মতন জড়িত কণ্ঠে ঝিকে বলতে লাগলেন,—আচ্ছা, বলত ঝি, এমন কি দোষের কথাটা আমি ওঁকে বল্লাম, যে উনি একেবারে চটে লাল হয়ে ঘর থেকেই চলে গেলেন। আমার কথা যদি ভালই না লাগে তবে সেটা স্পষ্ট বল্লেই হয় আমি চুপ করে থাকতে পারি। যাক্‌গে তুমি বোলো কর্ত্রী ঠাকরুণকে, আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, ঝোলে লবণই বেশী হোক্, ভাতই পুড়ে যাক্, আর তরকারীই অখাদ্য হোক, এ পাপ মুখে আমি আর কিছু বলব না। আমি হয়েছি সকলের চক্ষুঃশূল। এই আমি বাড়ী থেকে চল্লুম। বলেই কর্ত্তা এঁটো হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হাবু তখনও কাঁদিতেছিল।—তাই দেখে হাবুকে তিনি বল্লেন—"বা রে হেবো, এইবার পা ছড়িয়ে বসে খুব খা গিয়ে। তোদের শত্তুর বাড়ী থেকে চল্ল—রাত্তিরের আগে আর ফিৰ্বে না—বলিস্ তোর মাকে।" তারপরে কর্ত্তা খোদাবক্স কোচম্যানকে ডেকে গাড়ী যুর্ত্তে হুকুম দিয়ে বৈঠকখানায় চলে গেলেন। পাচক ব্রাহ্মণ জানলা দিয়ে যখন কর্ত্তাকে সোজা বৈঠকখানায় চলে যেতে দেখল, তখন সে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঝির পানে তাকাল। ঝি চমকে হেসে বল্ল—এমন নিলর্জ্জ, দুর্ম্মুখ দুনিয়ায় দুটো মেলা ভার। "ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—এই মরার চীৎকারে মুই হরঘড়ি জ্বালাতন হউছি।"

(গ)

রাত্রি সাড়ে আটটায় কর্ত্তা বাড়ী ফিরলেন। হাবু তখন পড়াশুনো সেরে বাইরের ঘর থেকে বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার জন্যে বই শ্লেট ইত্যাদি গুছিয়ে নিচ্ছিল। বিপিন খানসামা তার কাছে লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। হাবুকে সামনে দেখে কর্ত্তা খুব মোলায়েম সুরে জিজ্ঞেস করলেন—"মাষ্টার আজ পড়াতে—এসেছিল রে হাবু? ঘাড় নেড়ে—হাবু জবাব দিলে, আবার বল্লেন—সব পড়া পেরেছিলি?" হাবু কিছু বলার আগেই বিপিন বল্ল—আজ্ঞে, হাঁ—আজ খোকা বাবুর একটা কথাও ভুল হয়নি—মাষ্টার মশাই খুব প্রশংসা করিয়েগেছিলেন।" বিপিনের কথা শুনে কর্ত্তাও কম খুসী হ'লেন না। হাবুর পিঠ চাপড়ে উল্লাস সহকারে বল্লেন—সাবাশ বেটা! আরে হবে না কেন? ছেলে আবার কার! জগৎ জয় করা চাই—আমার নাম রাখা চাই বাবা!"

কর্ত্তার মেজাজটা একটু এবেলা ভাল আছে বুঝে বিপিন বল্ল—মাষ্টার মশাই মাইনের কথা বলেছেন।" রুক্ষস্বরে—কর্ত্তা বল্লেন—এই গত মাসেই ত মাইনে নিয়েছে—এরই মধ্যে একমাস হয়ে গেল? বিপিন বল্ল—না তিনি বলেছেন যে এক মাসের পর আরও নাকি সতর দিন বেশী হয়েছে।" তিক্ত কণ্ঠে কর্ত্তা বল্লেন লোকটা দেখছি মহাপাজী! মাইনে ত ক্রমাগত নিচ্ছেই—তারপরও যদি এ রকম যখন তখন মাইনের তাগাদা করে তা হলে ত ওকে রাখা হবে না। আমার হয়েছে যত সব ছোট লোকের সঙ্গে কারবার! আর দ্যাখ বিপিনে, ফের যদি তুই কারো পক্ষের থেকে অমন করে আমার কাছে মোক্তারি কর্ত্তে আসবি তাহলে তোর কান টেনে ছিঁড়ে দেব আমি—বেটা বেল্লিক কোথাকার!

কর্ত্তার কাছে ধমক খেয়ে বিপিন একটু অপ্রস্তুত হল। আর কোন কথা না বলে সে আগে আগে লণ্ঠন ধরে চল্ল, হাবু আর কর্ত্তা—তার পেছনে পেছনে বাড়ীর মধ্যে চল্লেন। খানিক দূর গিয়ে বিপিন আবার বল্ল—ও পাড়ার নবীন মালী তার ক্ষেতের মস্ত একটা তরমুজ আর খুব বড় একটা পেঁপে কর্ত্তার জলযোগের জন্যে দিয়ে গেছে। শুনে মহাহৃষ্ট হয়ে কর্ত্তা বল্লেন—কে?—নবীন? ও ভারি ভাল লোক! বড্ড ভালবাসি আমি ওকে। "একটু থেমে বিপিন আবার বল্ল—সে কর্ত্তার কাছে দশটা টাকা হাওলাত চেয়েছে।" সুর একেবারে বদ্‌লে কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে বল্লেন—কিঃ টাকায় সুদ দেবে কত করে?" বিপিন বল্ল—সুদটুদ্ কিচ্ছু দেবে না—বলে ভিঁটে বাড়ীর প্রজা টাকাটা বিনে সুদেই নেব। বলেছে দশ পনর দিনের বেশী রাখবে না।" একটু শ্লেষপূর্ণ হাসি হেসে কর্ত্তা বল্লেন—বটে! শালা ত ভারি ফন্দীবাজ! এক তরমুজ খাইয়েই দশ দশটা টাকা বিনে সুদে নেওয়ার চেষ্টা! ওসব গেঁয়ো চালাকী আমার কাছে খাটবে না।"

বাড়ীর ভিতর এসে কর্ত্তা দেখলেন—সুভাষিণী শোবার ঘরে বসে চিঠি লিখছে। তাঁকে দেখে সে তাড়াতাড়ি চিঠি

ক'খানা ব্লটিং চাপা দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। সুভাষিণীর টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কর্ত্তা বল্লেন—এত রাত্তির পর্য্যন্ত আলো জেলে চিঠি পত্তর না লিখে ও সব দিনের বেলা লিখলেই পার। সারাটা দিন ত শুয়ে বসেই কাটাও—চিঠি ফিঠিগুলো তখন লিখলেই হয়! "কোন কথা না বলে সুভাষিনী হাবুর গায়ের জামা খুলতে লাগল। দেখে কর্ত্তা বিপিনকে ধমক দিয়ে বল্লেন—হাঁ করে, দেখছিস্ কি? হাবুর জামাটা তুই খুলে দিতে পারিস্‌নে? বিপিন জামা খুলতে অগ্রসর হ'লে তাকে বারণ করে সুভাষিনী বল্ল—তুই বরং ঠাকুরকে ওঁর খাবার তৈরী রাখতে বলগে—জামা আমিই খুলছি।" বিপিন বেঁচে গেল। বাড়ীর চাকর বাকর ইচ্ছে করে কর্ত্তার সাম্‌নে কেউ আস্‌তে কিম্বা থাকতে চায় না। তাই সুভাষিনীর হুকুম পাওয়া মাত্রই সে একেবারে রান্নাঘর মুখো দিল ছুট। কর্ত্তা জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?" সুভাষিণী কথা বল্ল না। হাবু ভয়ে ভয়ে বল্ল—মা দুপুর বেলাও খায় নাই। "ছেলেকে চোখ রাঙিয়ে সুভাষিণী বল্ল—যা শুয়ে থাক্ গিয়ে।" হাবুর কথা শুনে কর্ত্তার আবার মুখ খুলে গেল—বলতে লাগলেন—দুপুর বেলা না খাওয়ার কারণটা যে কি হ'ল তাত কিছুই বুঝতে পারলাম না। যখন তখন উপোস্ করে তুমি একটা অসুখ না করে নিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি! ঐ যে সেবার রাত্তিরে আমার কথা না শুনে গেরণের স্নান করে আমায় কত বড় বিপদে ফেলেছিলে মনে আছে? সতীশ ডাক্তার ওষুধের দাম আর ভিজিট বাবদ ছ' গণ্ডা টাকা আমার কান ধরে আদায় করে নিয়েছিল। তোমরা ত ঝোঁকের উপরে যার যা খুসী করে বস, শেষে তার খরচ যোগাতে আমার হয় প্রাণান্ত। "একটু থেমে, আর একটু কেশে, কর্ত্তা সুভাষিনীর কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে আদরের সুরে আবার বল্লেন—একটা কথাও যে বলছ না! আমার সঙ্গে ঝগড়া করা একেবারেই ছেড়ে দিলে নাকি?" পরে তার চোখে জল দেখে বল্লেন—ওকি! কাঁদছ! ছিঃ! লক্ষীটি আমার! কেঁদো না। তুমিই ত দুপুর বেলা আমাকে গালাগাল করে ২ ঘর থেকে বেরিয়ে দিয়েছিলে। আমি ত তেমন কিছুই বলি নাই! চোখ মুছে সুভাষিণী বল্ল—হাত পা ধোবে না, সারারাত কেবল বসে বসে বকবেই!" একটু ত্রস্ত হয়ে কর্ত্তা বল্লেন—হাঁ হাঁ এই ধুচ্ছি! আলোটা একটু কমিয়ে দাও ত সুভাষ অনর্থক বড্ড বেশী জ্বলছে। "সুভাষিণী আলোটা কমিয়ে দিল। কর্ত্তা বারান্দায় এসে হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে গিয়ে বল্লেন—রাত্তিরে আর জলস্পর্শও কর্ব্ব না। এই অবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে প্রাণটা যেন আই ঢাই কচ্ছে। এখন শোব!"

কোন কথা না বলে সুভাষিণী দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল। কর্ত্তা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন এ কি! তুমি কিছুই খাবে না কেন বলত। রুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষিণী খিদে নেই বলে শুয়ে পড়ল। মুখ কাঁচু মাচু করে কর্ত্তা আমার কথা ত এখন কেউ শুনবেই না চাঁড়ালের কথা বাসি হলে কাজে লাগবে। বলে অগত্যা শয্যা গ্রহণ করলেন।

শ্রীবীরেশ্বর বাগচী।

ঝটিকা সঙ্কেত।

(সংস্কৃত তনুমধ্যা ছন্দঃ।)*

অম্বর—ঘনরঞ্জন,
অম্বুদ—মনোরঞ্জন।
বিদ্যুৎ জ্বলে—ঝিল্ মিল্,
সর্পের গতি—বিল্ বিল্।
সূর্য্যের নাহি সন্ধান;
সন্ধ্যার মতো হয় জ্ঞান।
গম্ভীর ধরা—নির্ব্বাত;
ঝড় উঠ্‌বেরে নির্ঘাৎ!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

---

* মূর্ত্তিমুর শস্ত্রো·
স্বত্যাস্তু ত রূপা।
আত্মাং মর্ম্মচিত্তে
নিত্যাং তনুমধ্যা॥
নশ্যন্তি দদর্শ
বৃন্দানি কপীন্দ্রঃ।
হারীণ্য বলানাং
হারীণ্য বলানাং।
ভট্টি।

পৃথিবীর কথা।

একটী বাষ্পময় নীহারিকা (Nebuls) হইতে যে সৌর জগতের সকল জ্যোতিষ্কেরই উৎপত্তি হইয়াছে সে বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণের মত ভেদ নাই। সৌর জগতের অধিপতি সূর্য্য এবং বুধ, শুক্র, পৃথিবীর মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ সকলই এক বিরাট নীহারিকা জননীর সন্তান। উহারা যমজ ভ্রাতা ভগিনী। সকলই এক উপাদানে গঠিত; কেবল উহাদের আয়তনের পার্থক্য।

শ্যামল তরুলতা শোভিত এই রমণীয় পৃথিবী জন্ম কালে সূর্য্যের ন্যায়ই জলন্ত বাষ্পাবস্থায় ছিল। উহার অসামান্য প্রখর প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইত। যখন আমাদের ধরিত্রী প্রজ্জলিত অগ্নি গোলকের ন্যায় আকাশে ঘুরিতেছিল তখন উহার দেহের উপাদান সকল বাষ্পাবস্থায় ছিল। এখন পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ আছে তখনও তাহা ছিল। মহাসাগরের অতল জলরাশি, হিমালয়, আলপস্ প্রভৃতি পর্ব্বত সমূহের প্রস্তরময় দেহ, অগণিত উদ্ভিদরাজি এবং ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণ আদিতে এই সকলই ছিল। তখন উহাদের উপাদান সকল প্রজ্জলিত বাষ্পাবস্থায় ছিল এবং সেই বাষ্পরাশি আকাশে অবিশ্রান্ত আবর্ত্তন করিত। ধরণীর বক্ষে আজ যে অগণিত জীবকুল বাস করিতেছে উহাদের দেহের উপাদানও সেকালে জলন্ত অবস্থায় ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেহের উপাদান ছিল এবং কোটি কোটি বৎসর পরেও আমাদের দেহের উপাদান সকল বর্ত্তমান থাকিবে। যুগে যুগে কেবল উহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে।

সৌর জগতের সকল গ্রহই প্রথমে সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ছিল। কালক্রমে গ্রহগুলি শীতল হইয়া দীপ্তিহীন হইয়াছে। প্রাণীগণের জীবনের যেমন শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, গ্রহ সকলের ক্রম বিকাশেরও তেমনি বিভিন্ন স্তর আছে। বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতিষ্ক সকলের ক্রমবিকাশের নিম্নলিখিত ৬ টি বিশিষ্ট স্তর (stage) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম স্তর সৌরাবস্থা (sun stage) জন্মের পর সকল জ্যোতিষ্কই সূর্য্যের ন্যায় প্রখর উত্তপ্ত ও উজ্জল থাকে এবং আলোক বিতরণ করে। আমাদের সূর্য্য এবং আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র বর্ত্তমানে ক্রম বিকাশের প্রথম স্তরে অবস্থিত।

জ্যোতিষ্ক সকল যখন অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া ফুটন্ত তরল অবস্থায় উপনীত হয় তখন উহাদের জীবনের দ্বিতীয় স্তর। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই চারিটী সুবৃহৎ গ্রহ বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। উহারা তাপক্ষয় হেতু আলোকহীন বটে কিন্তু উহারা এখনও ভয়ানক উত্তপ্ত রহিয়াছে। এই সকল গ্রহের আকাশ হইতে বৃষ্টি ধারা পতিত হইবা মাত্র আবার বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠে সর্ব্বদা প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে। তৃতীয় স্তরে জ্যোতিষ্ক দেহ আরও শীতল হওয়ায় উহাদের তরল উত্তপ্ত উপাদানের উপর সরের ন্যায় একটী আবরণ (crust) পড়িতে আরম্ভ করে।

বৃহস্পতির আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

চতুর্থ স্তরে উপনীত হইলে জ্যোতিষ্ক দেহ অধিকতর শীতল হয় তখন উহাদের পৃষ্ঠের আবরণ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। আমাদের পৃথিবী বর্ত্তমানে তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্তরে উপনীত হইয়াছে। পৃথিবী পৃষ্ঠ শীতল হইয়া এখন অগণিত জীবকুলের বাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু উহার অভ্যন্তর ভাগ এখনও অত্যুষ্ণ রহিয়াছে। পঞ্চম স্তর জ্যোতিষ্ক জীবনের বার্দ্ধক্য কাল। তখন উহাদের পৃষ্ঠের জলরাশি শুকাইয়া যায়। আভ্যন্তরীণ তাপ লোপ পাইতে থাকে। ফুলফলাদি শস্যশ্যামলা পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হয়। মঙ্গল গ্রহ বর্ত্তমানে এই অবস্থায়

আসিয়াছে। দূরবীক্ষণ ও বর্ণবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন মঙ্গল গ্রহের নদ নদী ও সমুদ্র সকলের জল শুষ্ক হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা বড় বড় খাল কাটিয়া উহার মেরু প্রদেশের পুঞ্জীভূত তুষার রাশি হইতে বিগলিত জলধারা আনিয়া তাহাদের তৃষিত কণ্ঠ শীতল করিতেছে। কিন্তু এইরূপে জলাভাব পূরণ করা বেশী দিন চলিবে না। ষষ্ঠ অবস্থা মৃত্যু! তখন জ্যোতিষ্ক সকল একবারে শীতল হইয়া পড়ে। উহাদের জলরাশি শুকাইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল বিলুপ্ত হয়। এই সকল জ্যোতিষ্কের মৃত্যুর লক্ষণ। আমাদের চন্দ্র বর্ত্তমানে এই চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। চন্দ্রের কঙ্কালময় মৃত দেহটী শূন্যে ঘুরিতেছে। চন্দ্রের সমুদ্রগুলি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। আগ্নেয়গিরিগুলি নির্ব্বাপিত। চন্দ্র যেমন জলশূন্য, তেমনি বায়ুহীন। চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা অতীব ভীষণ।

আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কেরই ক্রমবিকাশের একরূপ ধারা। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয়টী স্তরের ভিতর দিয়া সকল জ্যোতিষ্ককেই অতিক্রম করিতে হইবে। বড় বড় জ্যোতিষ্কের জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রহগুলির বিভিন্ন স্তরের বিকাশ বোধগম্য হয় না।

সৌরজগতের সম্রাট সূর্য্য। উহার আলোকে সৌরজগতের সকল গ্রহাদি আলোকিত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যও কালক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবীর ন্যায় আলোকহীন হইবে এবং পরিণামে অধিকতর শীতল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এখন সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সূর্য্যমণ্ডলে অক্সিজান হাইড্রোজান প্রভৃতি বাষ্প পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। উহারা মিলিতে পারে না। বর্ণ বীক্ষণ যন্ত্রের (spectroscope) পরীক্ষায়ও ইহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

পৃথিবীর উত্তাপও এককালে এরূপ ভীষণ ছিল যে উহার মূল পদার্থ সকল পরস্পর মিলিতে না পারিয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর তাপ বিকিরণ করিয়া পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়াছে।

উত্তপ্ত পদার্থ তাপ বিকিরণ করে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। তাপ বিকিরণ করিলে তাহা যদি পূরণ না হয় তবে সকল পদার্থই ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। সূর্য্যের ন্যায় সৌর [illegible] বালে অতীত দিন [illegible] সূর্য্য

এখনও এইরূপ প্রখর আলোক বিতরণ করিতেছে আর গ্রহ সকল দীপ্তিহীন হইল কেন? ইহার উত্তর কঠিন নহে। যাহার ভাণ্ডার যত বড়, ব্যয় করিলে তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইতে তত অধিক সময় লাগে। যাহার ভাণ্ডার যত ক্ষুদ্র ব্যয় করিলে তাহার তহবিল তত শীঘ্র শূন্য হইয়া যায়। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বোধগম্য হইবে। সাধারণ অবস্থায় এক চামচ্ উত্তপ্ত জল দুই মিনিটেই শীতল হইয়া যায় কিন্তু একটী চা'র পেয়ালা পূর্ণ উষ্ণ জল শীতল হইতে ১০। ১৫ মিনিট সময় লাগে। এক ঘটি গরমজল ঠাণ্ডা হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। এক কলসী গরম জল ৪। ৫ ঘণ্টায় কমে শীতল হয় না। সম অবস্থায় যে পদার্থ যত বড় সেই পদার্থ শীতল হইতে তত বেশী সময় লাগে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় তের লক্ষগুণ বড় এই জন্য সূর্য্য আজও জলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্তু সূর্য্যের তুলনায় পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভাগ একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে।

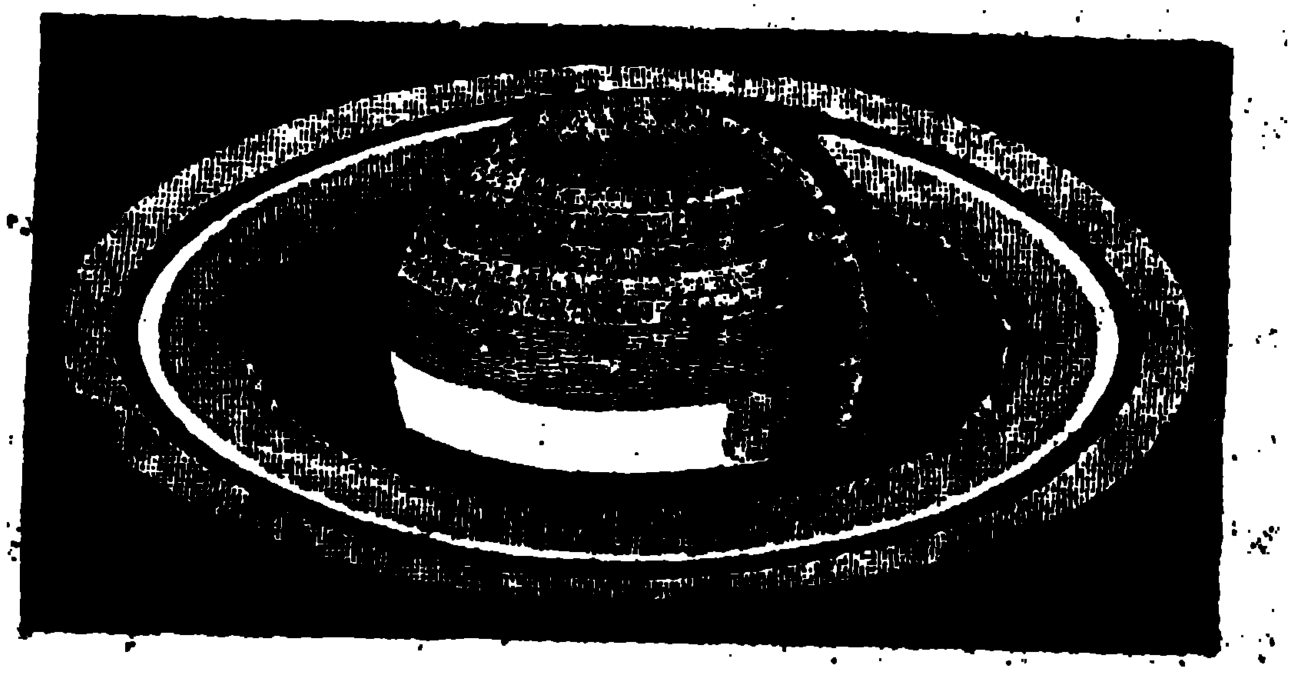

শনিও বৃহস্পতির ন্যায় অত্যুষ্ণ রহিয়াছে।

বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনাস নেপচুন এই কয়েকটী বড় বড় গ্রহ বর্ত্তমানে দীপ্তিহীন হইলেও উহাদের পৃষ্ঠদেশ এখনও অতিশয় উষ্ণ রহিয়াছে। একটী বড় লোহার গোলক খুব উত্তপ্ত করিলে উহার নিকবর্ত্তী স্থান আলোকিত হয়। তারপর উহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া আলোকহীন হয় এবং পরে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

পৃথিবী জলন্ত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ শীতল হইয়া বহু লক্ষ বৎসর পরে ফুটন্ত তরল (molten) অবস্থায় আসিয়াছিল। সেই অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ হইতে বাষ্পরাশি অবিশ্রান্ত আকাশে উত্থিত হইত। তখন পৃথিবীতে দিবারাত্রির কোন প্রভেদ ছিল না। পৃথিবী হইতে যে সকল ধূমরাশি ও বাষ্পসমূহ আকাশে উত্থিত সেই বাষ্প ও ধূমের আবরণ ভেদ করিয়া

সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীতে পৌছিতে পারিত না। সেই সময়ে একটা সুগভীর ফুটন্ত তরল পদার্থের সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছিল। তখন সেই সমুদ্রের তীর ছিল না। পৃথিবী বেষ্টিত গলিত ধাতু প্রস্তরাদির উত্তপ্ত সমুদ্রে অবিশ্রান্ত সুবৃহৎ পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইত। সহস্র বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় প্রচণ্ড তরঙ্গ গর্জ্জনে সর্ব্বদা দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত হইত। ঝটিকা ও ঘূর্ণাবর্ত্ত সর্ব্বদা সেই ফুটন্ত সমুদ্রকে মথিত করিত। তখন কিছুই শান্ত ও স্থির ছিল না। প্রকৃতির সে উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য ভাষায় বর্ণন করা ত দূরের কথা, কল্পনা করাও অসাধ্য। ইহাই পৃথিবীর জীবনের দ্বিতীয় স্তর।

পৃথিবী যখন জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থায় ছিল তখন উহা সূর্য্যের ন্যায়ই আলোক বিতরণ করিত। পৃথিবীর উপাদান যখন তরল হইল তখনও উহার উত্তপ্ত দ্রব ধাতুররাশি হইতে কিছু কাল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতেই পৃথিবীর বাষ্পীয় আবরণের বহির্ভাগ আলোকিত হইত। পৃথিবী তাপ বিকীরণ করিয়া যখন অধিকতর শীতল হইল তখন সেই ক্ষীণ জ্যোতিও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

প্রথমে নানাবিধ ধাতু ও প্রস্তরাদির বাষ্পই তরল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। দ্রব পদার্থের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক ভারী সেইগুলি যথাক্রমে নিম্নস্থান অধিকার করিল। পৃথিবীর দেহ তখনও অতিশয় উত্তপ্ত থাকায় জলরাশি বাষ্পাকারে পৃথিবীর চারিদিকের আকাশ বেষ্টন করিয়া থাকিত। সমুদ্র ও নদনদী প্রভৃতির জলরাশি তখন আকাশেই বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর তাপাধিক্য বশতঃ হাইড্রোজান ও অক্সিজান বাষ্প বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই ছিল। পরে পৃথিবীর উপাদান কতক পরিমাণে শীতল হইলে হাইড্রোজান ও অক্সিজান মিলিত হইল বটে কিন্তু জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান রহিল; পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপের প্রভাবে জলে পরিণত হইতে পারিল না। তার পর লক্ষাধিক বৎসর পরে পৃথিবী যখন আরও শীতল হইল তখন জলীয় বাষ্পরাশি মেঘে পরিণত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

জ্বলন্ত উনানের উপর দুধের কড়া বসান থাকিলে দুধ যেমন অবিশ্রান্ত উথলাইয়া পড়ে; এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। তেমনি পৃথিবীর ভীষণ উত্তাপে গলিত ধাতু ও প্রস্তরাদির সমুদ্র টগবগ করিয়া ফুটিত; আর উহার উপরিভাগ হইতে অবিশ্রান্ত নিবিড় কৃষ্ণ ধূমরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইত। উনানের আগুনের তাপ কমাইয়া দিলে যেমন উত্তপ্ত দুধ ধীরে ধীরে শীতল হইয়া উহার সর পড়ে তেমনি পৃথিবী যখন পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হইল তখন পৃথিবীর গলিত ধাতুরাশির উপরে একটা পাতলা আবরণের (crust) উৎপত্তি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এখন যে জলরাশি পৃথিবীর সাগর মহাসাগর ইত্যাদি জলাশয় পূর্ণ করিয়া আছে তাহা এক সময়ে প্রায় দুই তিন মাইল গভীর একটা জলীয় বাষ্পের আবরণ স্বরূপে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। বৈজ্ঞানিকগণ

মঙ্গলের অধিবাসীরা খাল কাটিয়া মেরু প্রদেশ হইতে গলিত বরফের ধারা আনয়ন করে।

অনুমান করেন সেই বাষ্পরাশি ৪০০০ হইতে ৫০০০ হাজার ফিট পুরু একটা কঠিন প্রস্তরের স্তূপের ন্যায় পৃথিবীর উপর চাপ দিতেছিল। চাপ তরল পদার্থের কঠিন হওয়ায় সহায়তা করে। পূর্ব্বোক্ত ভীষণ চাপে পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল পদার্থের উপর উৎপন্ন আবরণটা (crust) অসামান্য উত্তাপ সত্ত্বেও কঠিন হইতে লাগিল। তৎকালে পৃথিবীর উত্তাপ ফারেনহিটের (Fahrenheet) ২০০০ ডিগ্রীর ন্যূন ছিল না।

তাপের ক্ষয় এবং উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের অসামান্য চাপে পৃথিবীর আবরণ ক্রমেই কঠিন হইতে লাগিল। কিন্তু এই আবরণ স্থায়ী হইবার পক্ষে কতগুলি প্রতিকূল অবস্থা বর্ত্তমান

ছিল। পৃথিবীর নব গঠিত আবরণের নিম্নেই ছিল উত্তপ্ত তরল ধাতুরাশির গভীর সমুদ্র। তখনও চন্দ্রের জন্ম হয় নাই। কেবল সূর্য্যের আকর্ষণেই তখন সেই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা উৎপন্ন হইত। পৃথিবী তখনও নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করিত। সুতরাং সূর্য্যের আকর্ষণে যথাক্রমে পৃথিবীর সকল স্থানেই ক্রমে জোয়ার ভাটা হইত। সেই জোয়ার ভাটা জলের জোয়ার ভাটা নহে। সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাবে অত্যুষ্ণ গলিত ধাতুর সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিত আর সেই ধাতব সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গরাশির আঘাতে পৃথিবীর নব গঠিত আবরণ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাইত। এবং বিদীর্ণ স্থান দিয়া প্রবলবেগে গলিত ধাতুরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইত। একদিকে সূর্য্যের আকর্ষণ অপর দিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ। এই দুই প্রতিকূল শক্তির টানাটানিতে পৃথিবীর আবরণ সর্ব্বত্র

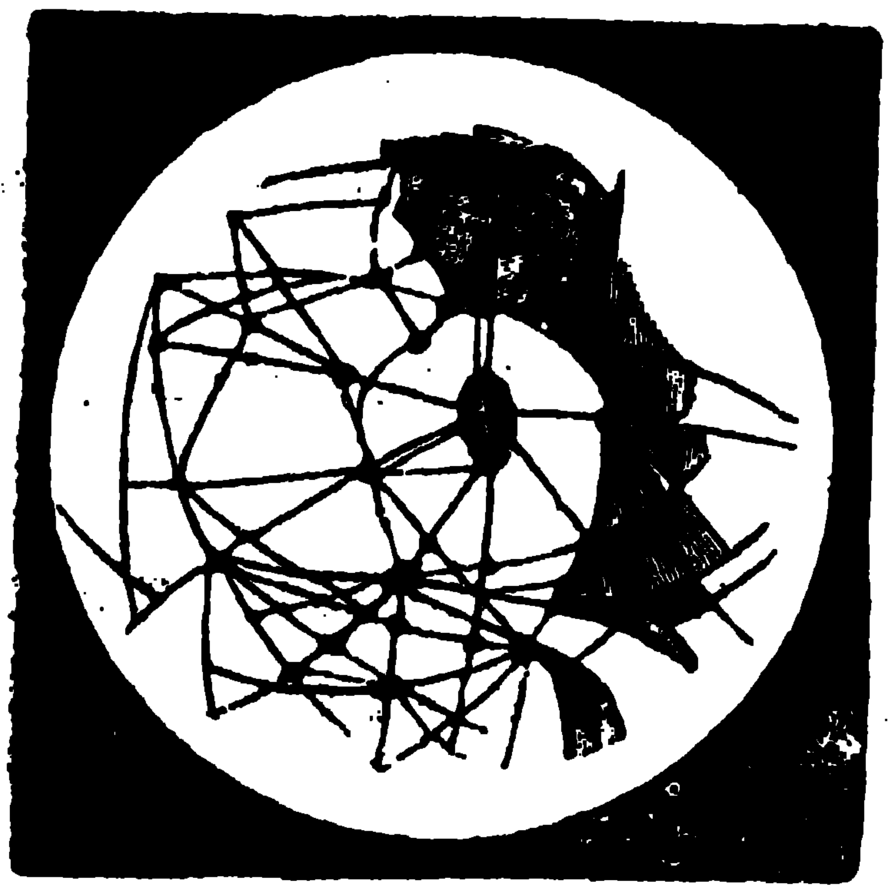

মঙ্গল গ্রহের সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে। কেবল মরু প্রদেশে বরফ জমে।

সমভাবে স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে পারিত না। উহা ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া ও কুঞ্চিত হইয়া যাইত। তৎকালে পৃথিবীর উপর অবিশ্রান্ত ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইত এবং প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবী সর্ব্বদা আলোড়িত হইত। সেই সময়ের নৈসর্গিক উৎপাতের কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপে বহুবার পৃথিবীর আবরণ বিদীর্ণ হইয়াছে এবং পুনরায় গঠিত হইয়াছে।

যখন পৃথিবী শীতল হইয়া উহার পৃষ্ঠদেশের তাপ প্রায় ৪০০ ডিগ্রীতে নামিয়া আসিল তখন উহার বায়ুমণ্ডলের বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল। এবং তাহা ক্রমে শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল কিন্তু তখনও ভূপৃষ্ঠ এত উত্তপ্ত ছিল যে বৃষ্টিপাত হইবা মাত্র পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপ প্রভাবে তরল পদার্থ সমূহ বাষ্পে পরিণত হইয়া পুনরায় আকাশে উঠিতে লাগিল। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইল। কালক্রমে পৃথিবী পৃষ্ঠ যখন অধিকতর শীতল হইল তখন বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বাষ্পরাশি বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করিল। নিম্ন ভূমিতে ক্রমে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে বিশাল সমুদ্রের উৎপত্তি হইল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এত অধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্পরাশি ছিল যে কালক্রমে তাহা হইতে পরিপাত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

কালীবাড়ী

[শেখভের অনুসরণে]

ভোর না হ'তেই আজ কালীবাড়ীতে ভিড় জ'মে গেছে। থেকে থেকে ঢাক বেজে উঠ্‌ছে। যাত্রীর গোলমাল, ছেলের কান্না, পাঁঠার ডাক, এ সব মিশে একটা কোলাহল অনেক দূর অবধি শোনা যাচ্ছে।

সূর্য্য উঠে প'ড়েছে। রোদ লেগে মন্দিরের চূড়া চক্‌চক্ ক'র্‌ছে। দূরের যাত্রীরা তখনো আস্‌ছে। পুরুত ঠাকুর প্রাতঃস্নান সেরে, চেলি প'রে, উত্তরীয় গলায় ফেলে, চন্দন চর্চ্চিত হ'য়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এক প্রহর বেলা হ'য়ে গেল। অন্য দিন এমন সময় পূজা আরম্ভ হ'য়ে যায়, আজ তা'র কোনো আয়োজনই দেখা যাচ্ছে না দেখে, যাত্রীরা অস্থির হ'য়ে উঠল। যারা ছোট ছেলে নিয়ে মানৎ শোধ দিতে এসেছে তা'দের ছেলেরা খিদেয় কান্না জুড়ে দিলে। ছেলেদের মায়েরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—লক্ষী বাবা, কাঁদে না; এই পুজো হ'লেই পেসাদ পাবে।

বাপেরা ধমক দিয়ে বল্‌লে—চুপ কর! পুজো না হ'তে খায় না।

তবু ছেলেরা থাম্‌লে না। পাঁঠার ডাক বেড়ে উঠল। ঘোম্‌টা টেনে গুঁড়িগুড়ি মেরে মেয়েরা গাছতলায় শুয়ে প'ড়ল।

কোনো কোনো বর্ষিয়সী মেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—বাবা ঠাকুর পুজো কখন হবে?

ঠাকুর মহাশয় ধমক দিয়ে উঠছেন—থাম্‌, থাম্‌, আজ পুজোর দেরি আছে। রাণীমা আস্‌ছেন পুজো দিতে; তাঁর পুজো না হ'লে কারো পুজা নেওয়া হবে না।

কথাটা চা'রদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল। লোকগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কেউ এগিয়ে গিয়ে গলাটান ক'রে কপালে হাত তুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লে, রাণীমার পাল্কী দেখা যাচ্ছে কি না।

একজন চেঁচিয়ে উঠলে—ঐ আস্‌ছে।

অম্‌নি চা'র দিকে একটা আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল। শেষে দেখা গেল, পাল্কী খানা মন্দিরের দিকে না এসে সোজা চ'লে যাচ্ছে। আবার লোকগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

দেখতে দেখতে দুপুর হ'য়ে পড়ল। কেউ কেউ বলতে লাগ্‌লে—চল, আজ ফিরে যাই।

রোদ চ'ড়ে উঠেছে। পাঁঠা ডাকে, ছেলে কাঁদে, লোকজন চেঁচামেচি করে, কালীবাড়ী যেন মেছোহাটা হ'য়ে পড়ল।

শেষে সত্যসত্যই রাণীর পাল্কী দেখা গেল। কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করলে না। সদর রাস্তা ছেড়ে পাল্কী যখন কালীবাড়ীর দিকে মোড় ঘুরল, তখন সবাই দেখতে পেলে, সত্যই রাণীর পাল্কী বটে। বেহারারা দাঁড়িয়ে কাঁধ বদ্‌লাচ্ছে। আগে পাছে সেপাইসান্ত্রী—খাপ খোলা তলোয়ার হাতে। ডাইনে বাঁয়ে পাইকপেয়াদা—আসাসোটা কাঁধে। পাল্কীর পাছে পাছে দুজন লোক এক জোড়া পাঠা কাঁধে ক'রে আসছে।

হুম্‌হাম্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাল্কী এসে পৌঁছল। ভুঁয়ে প'ড়ে দুর্‌ধারী লোকেরা প্রণাম করছে। সেপাইরা তাদের ঠেলে রাস্তা ক'রে চলেছে লোকগুলো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে। তবু রাণী দেখ্‌বার সখে ছোট ছেলে মেয়েরা পাল্কীর পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। মেয়েরা ঝুঁকে পড়ল।

ভোগের দালানের কোঠার সামনে পাল্কী নামিয়ে, বেহারারা কাঁধের গামছা খুলে বাতাস খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। সব লোকদের দেউড়ীর বা'র ক'রে দেওয়া হ'ল। নাছোড়বান্দা দুচার জন ধাক্কা না খেয়ে গেল না। লোক সব বেরিয়ে গেলে পাল্কী থেকে পূজার দালান অবধি পর্দা ঘিরে দেওয়া হ'ল। রাণী তা'র ভিতর দিয়ে হেঁটে মন্দিরের মধ্যে গেলেন। বাইরে থেকে কেবল তা'র আলতাপরা পায়ের পাতা দেখা যেতে লাগ্‌ল।

কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজ্‌তে লাগ্‌ল। পুজা আরম্ভ হ'য়ে গেল। বাইরের লোকেরা কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু হ'লে কি হবে, পুরোহিত সে দিন পুজার ঘটাটা কিছু বেশী করেই আরম্ভ করলেন। তাঁর ঘণ্টা খুব ঘন ঘন নড়তে লাগল। মন্ত্র জোরে জোরে পড়তে লাগলেন।

চালাক লোকেরা এদিকে সেদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে এক একবার এসে খবর পৌঁছাতে লাগলে—এই পাঁঠা নাওয়ানো হ'ল।—এই পাঁঠা উচ্ছুগ্‌গু হ'চ্ছে।—এবার বলি হবে।

লোকেরা পাঁঠার কাৎরাণীর প্রতীক্ষায় কান খাড়া ক'রে রইল।

বেলা গড়িয়ে পড়ল। পুজা শেষ হ'ল না দেখে অনেক লোক ফিরে যেতে লাগল।

এমন সময় জোরে ঢাক বেজে উঠল। পুজা শেষ হ'য়ে গেল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এ'সে চেঁচিয়ে বল্লেন—ওহে, তোমরা সব যাচ্ছ কেন?

একজন বল্লে—যাব না ত কি? সেই ভোর না হ'তে এসেছি, চোপর দিন গেল; কাঁহাতক ব'সে থাকি।

পুরোহিত চটে বল্লেন—রাজার পুজো না হ'তে তোদের পুজো হ'বে কি করে?

—কেন, আমরা যারা আগে এসেছি, তাদের পুজো ত অনেক ক্ষণ আগে সেরে দিতে পার্‌তেন।

—আরে মুক্‌খু, তা'কি হয়? দেশের রাজা, মা তাঁর পুজো আগে না নিয়ে তোদের পুজা নেবেন কেন?

এক বেটা মাতাল ছিল। সে ব'লে উঠল—দেখছি বাবা, কলির দেবতারাও রাজাকে ভয়!

শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

প্রবাদের আবাদ।

(৪র্থ চাষ)

খনার বচনে আছে—

"ষোল চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা,
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাষে পান।

অর্থাৎ বেশী রসাল ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে বেশী চাষও আবশুক। যেমন মূলা খুব রসাল ও মোলায়েম তেমনি তার চাষও বেশী আবশ্যক।

আমিও দেখি আবাদের চাষে মূলার মত রসাল কিছু জন্মে কি না! তাই ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তির সহিত চাষ করিতে মন দিয়াছি। তবে 'ভোগের কর্ত্তা ভগবান'—দেখা যাউক কি হয়।

কতকগুলি প্রবাদ পাওয়া যায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, কতকগুলি বা অনেকটা বিশুদ্ধ ভাষায়, এগুলির মধ্যে দুই চারিটী বা পুঁথি পত্রেও দৃষ্ট হয়। আজকার চাষের প্রবাদের প্রায়গুলিই ভদ্রলোকের মুখে শুনা কথা—কিন্তু মূল্য বেশী। যথাসম্ভব টীকাও সংগ্রহ করা গেল।

১। "কাণে তুলসী লেকো মুন্সী
নাকে ঘোমটা নারী
পেনার নীচের শীতল জল
চাইরই নষ্টকারী।"

অনেক ব্রাহ্মণ কাণে তুলসী দিয়া 'হরিবোল' জপ করেন নিজকে খুব খাঁটি দেখাইতে চাহেন—অন্তর খুব মন্দ। অনেক মুন্সী লেকোবেকো (সরলতার ভাণ) করেন, তবে তলে ফুষ্টামী ও বজ্জাতি ষোল আনা। অনেক স্ত্রীলোক সর্ব্বদা লম্বা ঘোমটা দিয়া অত্যধিক লজ্জাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু ভিতরে অতি মন্দ। আর পেনার (পানা) নীচের জল দেখিতে স্বচ্ছ কিন্তু সূক্ষ্ম দূষিত কণায় পরিপূর্ণ, খাইলে অসুখ নিশ্চয়। উপর্য্যোক্ত চারিটীই সমান অনিষ্টকারী।

২। "থাকতে কাচি হারাইলে দাও"।

জিনিষ থাকতে অনেকেই মর্য্যাদা করে না, হারাইলে হায় হায় করে।

৩। "একেত নাচনি কাণী
তাতে আবার মৃদঙ্গের তালি।

৪। "আদা পড়ায় হাগা মানে না"।

৫। "ছাগলের পাড়ায় ধান পড়ে না"।

৬। নাপ্রাহাতা (১) স্বপ্নে দেখে
চিড়া আর তেঁতই মাখে।"

নিম্নলিখিত গ্রাম্য ছড়াগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও সবগুলি ছড়াই 'মুদ্রামাহাত্ম্য' সূচক।

৭। টাকার নাম মহাশয়
যা কওয়ান যায় তাই কয়।"

৮। "টাকার নাম ময়নার ছাও
মিছায় করে সাঁচার রাও।"

৯। "টাকার নাম কামধেনু গাই
যখন যা চাই, তখনই পাই।"

১০। "টাকার নাম ভাগ্যিধর
আপন বানায় পরের পর।"

১১। "টাকা দিলে কাণা ছেঁড়ী(ও)
বিয়া কর্ত্তে কাড়াকাড়ি।"

বিনা টাকায় স্ববংশজ সুশ্রী কন্যা বিবাহেও বেগ পাইতে হয়, কিন্তু দুইশ স্থলে চারশ দিলে 'কাণা ছেড়ী' অর্থাৎ নিগুর্ণা কন্যা বিবাহ করিতেও কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। হায়রে টাকার মোহ!

১২। "টাকায় নিবায় মনের জ্বালা,
বাপ ডাকে আপন শালা।"

১৩। "টাকা থাকলে মেড়াকান্ত
দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।"

দৃষ্টান্তের অভাব নাই—'নাম বলব যার
ছার কপাল তার।'

১৪। "টাকাহীন যোগ্য লোকে
ইসারায় সকলে দেখে।"

১৫। টাকাওয়ালা 'অবধূত'
লোকে কয় 'বাপের পুত (?)'

টাকার গুণে অনেক নীরেট মূর্খকেও লোকে বলে 'বাপকা বেটা'।

১। নাপ্রাহাতা—কাহিল মানুষ।

১৬। "টাকা থাক্‌লে রামা শ্যামা
সরা দেখে দুনিয়াইখানা।"

১৭। "বেশী থাকলে জঙ্গলে গাড়ে *
নাগাল না পাইলেও খাজুয়াইয়া মরে।"

১৮। "কীল খাইয়া গেলাম দাদার ঘর
দাদাও কিলায় আড়াই প'র (প্রহর)।"

১৯। "চূর্ণ', 'চিন্তা', 'চালবাজি'
তিন লইয়া কবিরাজী।"

২০। মূর্খ বৈদ্য, বে-ইমান
দুইই ঠিক যমের সমান।"

টি৫। নিম্ন রাজন।

২১। "বাপের মুখে পাকনা দাঁড়ী
পুতের মোচ্ছে, মাথায় টেড়ি।"

২২। পুরুত খায় দাইরা (দাবী করিয়া)
জ্যোতিষে খায় ভাঁইড়া (ঠকাইয়া)।

২৩। গুরু, গরু, আগুণ,
যত পায় তত বাড়ুন (বাড়ন্ত হয়)

২৪। "সাপ জব্দ সীজের মুলে, বৌ জব্দ কীলে,
পাড়া পড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।"

২৫। "দা'য়ে, বালু, কুড়ালে শীল,
বান্দীরে লাথি, গোলামরে কীল।"

অর্থ—যেছা কা তেছা।

২৬। "কলিতে তিন জাগ্রত দেবতা
আগুণ, চুত্‌রা, 'কীলগুঁতা'।"

২৭। "বোতল বোতল পানি খায়,
'জলাতঙ্কে' (?) মূর্চ্ছা যায়।

অনেকে নিজ বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী পুত্রকেও সুনজরে দেখেন কিন্তু পরের সুপুত্র কোথায় কোন্ অস্পৃশ্য জাতির জল পান করিল তাহা নিয়া মাথা ঘামান।

এক পণ্ডিতকে এক মূর্খ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "পণ্ডিত মশাই, মাকড় মারিলে কি হয়? উত্তর "দোকড়" হয় (দুঃখভাগী) "আপনার পুত্র মাকড় মারিয়াছে।" ওঃ— মাকড় মারলে কি—ছু হয় না?" এইত অবস্থা!

২৮। "চুন্না চুন্না দীনাশীল
পাথরেতে পাঁচ কীল।"

২৯। "মরা মইরা গঙ্গায় যাউক
যেমনে তেম্‌নে বামুনে পাউক।"

৩০। কোদাল ভাইঙ্গা করতাল বানায়!

৩১। "এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম চাচা
মোল্লা হইলা কবে?"

সম ব্যবসায়ী দুইজনের মধ্যে একজন অন্য জনকে খোঁটা দিলে বলা হয়।

৩২। কই বা ফকীর, কই বা দরগা
কই বা চাল, কই বা বরগা।"

৩৩। "বুদ্ধি থাকলে ঘর জামাই হয়?"

৩৪। "কুমার কাটা পাতিল।"

৩৫। হাজার কড়ি, ভাঙ্গা ঘর।"

৩৬। "একলা গেলেও আগে যাই না
নুন দিয়া খাইলেও হুদা খাই না।"

৩৭। "সেরের উপর সোয়া সের।"

৩৮। "কীর্ত্তনার অভাব নাই।"

৩৯। "শনিরে পুজে, রবিরে না।"

৪০। "জন্ম, মৃত্যু, বিয়া
তিনই নিমিত্ত দিয়া।"

৪১। "মামার শালা পিসার ভাই
তার লগে সম্বন্ধই নাই।"

৪২। "রাড়ী নিন্দে, তেনা পিন্দে।"

৪৩। চইতালা লাউ থাবুয়া বিকী। চৈত্র মাসে লাউ সস্তা, "থাবুয়া" অর্থ গণা বাছা নাই—অনেক।

৪৪। "গোদা পায়ের ধমক।"

৪৫। "ভাত পায় না বিলাই
খাডাই খাডাই করে।"

৪৬। হাতীও মাটী খায়
কইলে বুলে আক্কল পায়।"

৪৭। "মেড়ার শিঙ্গে, হীরা ভাঙ্গে।"

অর্থ—বুদ্ধিমান দরিদ্রের "বুদ্ধি" ধনী বেকুবের নিকট হার মানে।

৪৮। লাঙ্গল্যা ছুতার, বাঙ্গাল্যা সরকার।

---

* গাড়ে—পুঁতিয়া রাখে। মাটীতে কোপে।

৪৯ । "পণ্ডিতের পাঁতি
ডাইন হাতি আর বাঁও হাতি ।"

৫০ । আধা কইলে গাধায় বোঝে
ভাইঙ্গা কইলে বলদে(ও) বোঝে ।"

৫১ । অবোধেরে ঠকায় বুধায় (বুদ্ধিমানে)
বুধারে ঠকায় খোদায় ।"

৫২ । "নিদানের সারথী (সম্বল)
বুড়া মানুষের ভারতী (উপদেশ) ।"

৫৩ । "কুস্বপ্নের গোয়াইল ।"

৫৪ । "নিজে পিন্‌তে থাপী ধুতি
বাপের শ্রাদ্ধে দুই হাতি ।" (দুই হাত কাপড়)

৫৫ । "পালই পাইক্যা মরিচ বড় ।"

এক বিধবা পালই শাক রাঁধিয়া ছিল, আর তাতে কাঁচা মরিচ দিছিল খুব বেশী—চাকরের পাতে দিলে সে সব মরিচ ফেলতে ফেলতে শেষটা দেখিতে পাইল পাতে শাক যৎসামান্য। তখন বলিয়াছিল, মা ঠাক্রুন্ 'মরীচ শাক'টা বেশ হইয়াছে, ২।৪টা পালইর ডুগা দেওয়ায় বেশ উত্তম লাগিয়াছে। অর্থাৎ আসলের নামে উদ্দেশ নাই স্থলে প্রযোজ্য ।

৫৬ । "জ্ঞানের নামে উদ্দেশ নাই
ধ্যানে ... ... কাডে ।"

৫৭ । নিরামিষ খাওয়া (আর)
উপোস যাওয়া (সমান) ।

জনৈক মৎস্য প্রিয় ব্যক্তির উক্তি ।

৫৮ । মাতৃহীনের জেঠী, খুড়ী
ভাতহীনের চিড়া মুড়ি ।

মা না থাকলে জেঠী খুড়ী পালন ও আদর করেন, কিন্তু মায়ের অভাব দূর হয় না। ভাত অভাবে চিড়া মুড়ি খাইলে তৃপ্তি হয় না।

৫৯ । কইলে জাত যায়, নইলে মা—।

৬০ । পাতের ভাত্তে আপনা হাতে
ঘি মাখন যত দেও তাতে ।

অর্থাৎ কথায় বলে "আপনা হাত জগন্নাথ ।"

৬১ । সতীনের পুত সুন্দরও ভূত ।

অর্থাৎ যারে দেখতে না পারি তার চলন বাঁকা ।

আবাদের চাষে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি ফসল কি জন্মিবে জানি না। আগামী বারে আরও উন্নত প্রণালীর চাষ করিতে ইচ্ছা আছে—ভদ্র লোকের ছেলে চাষী হিসাবে ত আমি "রাজ সংস্করণ আনাড়ী"। তবে "নীর ত্যজি ক্ষীর হংস করে যথা পান।" সেইরূপ "দোষ গুণ বিচারিবে পাঠক সুমতি।"

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

আমার বাংলা ভাষা

আমার বাংলা ভাষা,
কি মধু তার বুকে !
মায়ের মতন স্নেহ-ধারা ঝরিতেছে শত মুখে !

কোন্ দেশেতে শিশুর ঠোঁটে,
সপ্ত সুর বেজে ওঠে,
আকুল-করা মা ডাকে প্রাণ উধাও হয়ে ছুটে !
সে যে এই বাংলার ভাষা, (সে যে আমার গো !)
মুক্ত বঙ্গের সুপ্ত আশা,
কি যে মিঠে কি যে খাসা,
তুলনা নাই এ তিন লোকে !

রূপটি তার দেখতে পাই, যখন আমার চাষী ভাই,
সোণার ক্ষেতে গায় বসে—"কমলিনী রাই"
যখন সাঁঝে ডিঙি বেয়ে (ছায়া শীতল নদীর কোলে,)
পরাণ খুলে গায় নেয়ে—
"মনুম ঝি তোর বৈঠা নেরে,"
ঢেউয়ের গায়ে তাল ঠুকে ।

চণ্ডীদাস মধু বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র হেম চিত্ত নবীন
সেবি' যারে ধন্য শত সাধক প্রবীণ,
সেই ভাষা যেন আমার (অন্তিম শয়নে গো !)
কণ্ঠে আসে অনিবার,
তবেই সার্থক জন্ম আমার,
মরবো আমি বলার সুখে !

শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ।

মৈমনসিংহ গীতিকা।

(দেওয়ান মদিনা মনসুর বয়াতি প্রণীত).

বানিয়াচুঙ্গের দেওয়ানের আলাল দুলাল নামে দুই মাতৃহীন পুত্র বিমাতার চক্রান্তে কোন দূর বনে নির্ব্বাসিত হয়। একজন সওদাগর জলপথে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল; অসহায় শিশু দুইটীকে দেখিতে পাইয়া নৌকায় তুলিয়া লয়; পরে তাহাদিগকে কোন সম্পন্ন কৃষকের নিকট বিক্রয় করে। দুই ভাই সেখানে কৃষকের গরু চরাইত এবং অন্যান্য কার্য্য করিত। এই কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আলাল পলায়ন করে। ধনু নদীর তীরে দেওয়ান সেকন্দর নামে কোন জমীদার বাস করিতেন। তিনি একদিন শিকারে যাইয়া আলালকে দেখিতে পান, এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। আলালের চেহারায় তিনি তাহাকে ভদ্র লোকের সন্তান মনে করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি তাহাকে কোন নীচ কার্য্য করিতে দিতেন না। বেতন দিতে চাহিলে আলাল উত্তর করিত, আমি সমস্ত বেতন একদিনে একসঙ্গে লইব।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। আলালের কার্য্য দক্ষতায় দেওয়ান সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। আলাল একদিন সুযোগক্রমে আপন পরিচয় দিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনি সাহায্য করিয়া আমার পৈতৃক জমিদারী দখল করিয়া দিন, ইহাই আমার চাকরির বেতন। তৎকালে আলালের পিতার মৃত্যুতে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল। দেওয়ান সেকেন্দরের সাহায্যে আলাল সহজেই তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া জমিদারী দখল করিলেন। দেওয়ান সেকেন্দরের দুইটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার একটি আলালের সহিত বিবাহ দিতে চাহিলে আলাল মিঞা উত্তর করিলেন, আমরা দুই ভাই; একজন এখন নিরুদ্দেশ তাহার উদ্দেশ করিতে পারিলে দুই ভ্রাতার সহিত আপনার দুই কন্যার বিবাহ হইবে। অতঃপর দেওয়ান আলাল ভ্রাতার উদ্দেশে গমন করিলেন। বহু কষ্টে তাহার সন্ধান পাইয়া দেখিলেন, এক কৃষকের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, এবং একটী পুত্রও জন্মিয়াছে। আলাল মিঞা ভ্রাতাকে কহিলেন, এই স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আমার সহিত চল; ইহাকে ত্যাগ না করিলে জাতি থাকে না।

কবির আপন ভাষায়—

জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে,
কিসের সংসার বল জাতি না থাকিলে।

এইখানে থাকিলে অর্থাৎ এই স্ত্রীর সহিত এইখানে থাকিলে জাতি থাকে না। আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই ধর্ম্ম অপেক্ষা জাতি রক্ষার ঝোঁক অধিক। দুলাল মিঞা অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। অবশেষে একখান তালাকনামা লিখিয়া শ্যালকের হাতে দিলেন, এবং স্ত্রীর সহিত দেখা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন। তৎপরে দেওয়ান সেকন্দরের দুই কন্যার সহিত দুই ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গেল।

এদিকে দুলালের পরিত্যক্তা পত্নী মদিনা বিবি তালাক নামা দেখিলেন। তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না। মনে করিলেন আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই স্বামী এইরূপ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

আইজ আসে কাইল আসে এইনা ভাবিয়া,
মদিনা সুন্দরী দিন কত রাইত গোঁয়াইয়া।
আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খৈ,
ছিক্যাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দৈ।
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া,
হাঁড়িতে ভরিয়ারাখে ছিক্যাতে তুলিয়া।
এই মত খাদ্য কত মদিনা বানায়,
হায়রে পরাণের খসম ফিন্যা নাহি চায়।

গ্রাম্য ভাষায় এই সকল কবিতায় কত গভীর ভালবাসা ব্যক্ত হইয়াছে!

এইরূপে অনেকদিন গত হইলে মদিনা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আপন ভ্রাতার সহকারে পুত্রকে দেওয়ান দুলালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুলাল মিঞা তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও. এখানে আসিলে আমার লজ্জা! পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া মায়ের কাছে পিতার নিঠুর বাণী শুনাইল।

ইহার পর মদিনার করুণ বিলাপ। এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মদিনা কান্দেরে আল্লা কি লেখছ কপালে
বনের পাখী হইয়া যেমন উড়্যা গেল চলে।
পরাণের পাখী আমার পরাণ লইয়া গেল,
পাষাণে বান্দিয়া দিল রহিলা একেলা।
অঘ্রাণ আগন মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি,
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি।
দুইজনে বস্তা পরে ধান দেই উনা,
টাইল ভরা ধান খাই করি বেচা কিনা।
হায়রে পরাণের খসম এমন করিয়া,
কোন্ পরাণে রইলা আমারে ছাড়িয়া?

এইরূপ পূর্ব্ব স্মৃতি অবলম্বন করিয়া খেদ প্রকাশের রীতি সেকালের সকল কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহুয়াতে কিছু কিছু আছে; চণ্ডীদাসের কবিতায় অনেক আছে।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অনাহারে অনিদ্রায় শরীর শুকাইতে লাগিল, অবশেষে স্বর্গের পরি স্বর্গে চলিয়া গেল। এদিকে দেওয়ান দুলাল জনসমাজে হতমান হওয়ার আশঙ্কায় পুত্রকে বিদায় দিয়া পরে অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরিত্যক্তা পত্নীর উদ্দেশে হঠাৎ বহির্গত হইলেন। পথে নানা অমঙ্গল দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে,
মদিনার আদরের গাই পড়িয়া পন্থেতে।
ঘাস নাই পানি নাই ডাকে ঘনঘন
তারে দেখ্যা দুলাল কিঞ্চার দুঃখ হইল মন।

ক্রমে পূর্ব্ব কথা যত দুলালের মনে পড়িতে লাগিল।

"ছয়লা বছরের মদিনা হাট্যা বেড়ায় পাড়া,
এক দণ্ড নাহি থাকে দুলালের ছাড়া।"
"বৈশাখে বুলবুল্যার বাচ্চা উড়াইয়া নেয় বায়,
দুলালে ডাকিয়া কন্যা ধরিবারে যায়।
সেইত বুলবুল্যার বাচ্চা ঝুলুঙ্গায় রাখিয়া,
দুইজনে পালে তারে যতন করিয়া।
শূন্যরে ঝুলুঙ্গা আজ উসারাতে পড়ি,
ছোটকালের বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি।"
জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের চারা দুইজনে লাগাইল,
মদিনারে লইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইল।
সেইত না আমের চারা গরুতে খাইল,
পরাণের পরাণ বিবি কোন্ দেশে গেল?"
"ঘরে কান্দে পালা বিলাই গোয়ালে কান্দে গাই,
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই।"

করুণ রস বর্ণনে কবির নিপুণতা এই সকল কবিতায় আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

দুলাল পত্নীকে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সমাধিস্থান দেখাইয়া দিল। দুলাল বিলাপ পরিতাপ অনেক করিলেন। তৎপর সেই সমাধির পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফকীরের বেশে সেইখানেই রহিয়া গেলেন; আর দেওয়ানগিরি করিতে গেলেন না।

লোকের নিকট সম্মান পাইবার আশায় মানুষ কত দূর দিশাহারা হইয়া পড়ে, এই গল্পে তাহা সুন্দর দেখান হইয়াছে।

শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদার।

খোকার হাসি।

পথের ধারে কদম-গাছে
হাসছে কুসুম-রাশি!
ওই বুঝিরে বিশ্বনাথের
কোমল-মধুর হাসি!
কোথায় গেলো খোকা আমার
চির-বিদায় নিয়ে,
সোণা মুখের হাসিটী তার
কদম ফুলে দিয়ে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

ই, বি, রেলওয়ে "প্রদর্শনী" ট্রেণ

ই, বি, রেলওয়ের এক ডিমনষ্ট্রেশন ট্রেণ সারা "ব্রড্ গেজ" ঘুরিয়া আসিয়াছে। গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহা শিয়ালদহ ষ্টেশনের পার্শ্বে শেডে রাখা হইয়াছিল।

এই প্রদর্শনী ট্রেণটা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত। যথা—

১। "পাবলিসিটি কার"। এই গাড়ী খবর দিতেছে, ভারতের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ রেল চলিতেছে।

২। "পাবলিক্ হেলথ ডিপার্টমেন্ট"। ৫টী অংশ আছে—

(ক) কি করিয়া কলেরা নিবারিত ও প্রশমিত হয় (খ) ম্যালেরিয়া (গ) বসন্ত (ঘ) মাতৃ-মঙ্গল (ঙ) খাদ্য-বিচার।

৩। ভেটারিনারি ডিপার্টমেন্ট বা পশুবিভাগ। চার্ট ও ছবির সাহায্যে দেখাইতেছে, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বেয়ারাম পীড়া গরুবাছুরকে আক্রমণ করে এবং কিরূপেই বা টীকা ইত্যাদি দ্বারা তা নিবারিত হইতে পারে।

৪। আগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বা কৃষি-বিভাগ। রেশম উৎপাদন ইহার অন্তর্গত। ভারত ও জাপানের বিভিন্ন স্থানের কতুন পালন ছবিতে দেখান হইতেছে। পাট ও তুলার আঁশ প্রদর্শনীতে রহিয়াছে। বোতলে করিয়া নানা রকম গুণের মাটি নানা নদীতীর হইতে যোগাড় করা হইয়াছে ও তাদের উর্ব্বরাশক্তি পরীক্ষিত হইতেছে।

৫। গবর্ণমেন্ট উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ বা সরকারী বয়ন-শালা। বহু শাখাযুক্ত শাটল বস্ত্র লুম, চরকা, রেশমপ্রদর্শনী ইহাতে আছে।

৬। বেঙ্গল ট্যানারি ইন্‌ষ্টিটিউট বা বঙ্গীয় চর্ম্ম-শালা চামড়া ট্যানিং ও কেমিক্যালের বিভিন্ন রকম দেখাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান দেখাইতেছে, গরুবাছুরকে যথেষ্ট খাইতে না দিলে, বসন্তের দাগ থাকিলে ও অন্যান্য কারণে চামড়া নষ্ট হয়। ভাল চামড়া পাইবার উপায় গরুবাছুরের স্বাস্থ্যরক্ষায় ও চাষীদের যত্ন লওয়ায়।

৭। দি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট বা সমবায় বিভাগ। চড়া দরে সুদ আদায় করিয়া মহাজনেরা চাষীদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই কথাটা বহু সুন্দর ছবির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর এর প্রতীকার যে সমবায় তাও দেখান হইয়াছে।

৮। ইণ্ডিয়া টী কোম্পানী বা ভারতীয় চায়ে বাজার। এই বিভাগে শিবসাগর, দেরাদুন, কাছার, দার্জ্জিলিং, শ্রীহট্ট, তরাই, ডুয়ার্স, দরং ও টঙ্গু উপত্যকায় উৎপাদিত চা দেখান হইয়াছে। চা-বাগানের যন্ত্রপাতি তোড়জোড়ও বাদ যায় নাই।

সমালোচনা।

"বঙ্গে দুর্গোৎসব"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত।

মূল্য—আট আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানা বাঙ্গালাদেশে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ, সুলিখিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় পরিপূর্ণ। বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই পুস্তিকায় দুর্গাপূজা সম্বন্ধীয় বিবিধ পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন; পূজা-পদ্ধতি, ধ্যান, নবদুর্গা প্রভৃতি বিষয় ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এই পূজার উল্লেখাভাবের বিষয় ধরিয়া একটু বিস্তারিত ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহাহউক বঙ্গের প্রধান উৎসব সম্বন্ধে এত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তিকা আর বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তিকার ছাপা ও কাগজ উত্তম। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য সংবাদ

২০শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সভা-পতিত্বে ঢাকা বীণাপাণি সাহিত্য সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে বৈশাখ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে টাউনহলে "রবীন্দ্র জয়ন্তী" উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী আষাঢ় সংখ্যা সৌরভে চারুবাবুর অভিভাষণ প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার মুখপত্র চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথের একখানা ত্রিবর্ণ চিত্র প্রদত্ত হইল।

আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সৌরভ কেদার স্মৃতি পূত হইয়া বাহির হইবে।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্তি করে আস্‌ছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে—মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি **সুরমা** ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী ?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"মিল্ক অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দূর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলভ্য বিলাসভোগ। বড় শিশি ১৲ মাঝারি ৸৹ ছোট—৷৷৹ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখ্‌বে। রুমালে একটু ঢাল্‌লে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৸৹ আনা, ছোট—৷৷৹ আনা।

এস্, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৯।২ লোয়ার-চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

Shourabh--Reg. No. C. 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী–

ময়মনসিংহের বিবরণ ১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস ১৷৷০
ঢাকার বিবরণ ১৷৷০
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ৷৷০
সাময়িক সাহিত্য ৩৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ।৵০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৸০

লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲
ব্রতকথা ৸০
শৈব্যা ।৵০
মহরম ৷৷০
কালের ছায়া (সচিত্র) ৷৷০
রংকথা (যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। স্মৃতি সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ ৫ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the
LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children
whom you would love so much? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest
way to create an estate.
WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Representative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

এই সংখ্যার মূল্য চারি আনা।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গমী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিকশ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিকশ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৵ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।৵০

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,
দায়ানী রোড, পোঃ কোডেল রোড, বোম্বে, নং ১৪
টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউম্যাপুর" বোম্বে।

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কে বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	...	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	„	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	„	...	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা	„	...	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা	„	...	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—
মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ - ৸০ আনা, রামধনু ১৲।
গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স
অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাগি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি
[illegible] (ঢাকা)

সূচী।

কেদার তর্পণম্ ... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থস্য ৯৭
কেদার কাহিনী : শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাশগুপ্ত ... ৯৮
কেদার স্মৃতি [কবিতা) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ ... ১০৪
সাহিত্যিক কেদারনাথ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১০৪
কেদার স্মৃতি (কবিতা) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ... ১০৬
বক্তৃতায় আহ্বান... শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী ... ১০৭
কেদার প্রয়াণ (কবিতা) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ১০৮
কেদার-স্মরণে ... শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ... ১১০
গুরু বরণ (কবিতা) শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১১১
কেদারনাথের বৈশিষ্ট্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ... ১১১
কেদার মণ্ডলী ... শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১১৫
স্মৃতি পূজা ... শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় ... ১১৯
কেদার তর্পণ ... শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ ... ১২০
বঙ্গবাণী সম্পাদকের পত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ... ১২২
স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১২২
সভাপতির অভিভাষণ... শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার ... ১২৪
ছাত্র জীবনে সাহিত্য-সাধনা শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ ... ১২৫
রামায়ণের সমাজের কথা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ১২৭
ইন্দ্রপাত ... শ্রীযুক্ত শিশিররঞ্জন গুহ ... ১৩০
স্মৃতি সভা ১৩০

সৌরভ চিত্রাবলী
বা
ময়মনসিংহ এলবাম্

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন। তাঁহাদের জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,
ময়মনসিংহ।

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং
ময়মনসিংহ।
সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার একমাত্র ষ্টল।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত

বিশ্ব-বীণা

সভা সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে গীত হইবার উপযোগী বিবিধ সঙ্গীত, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির জন্য নানারকমের রচনা মুসলমান বালকদের উপযোগী কবিতা ও গান, মহিলা সভায়, হিন্দু সভায় ও ব্রাহ্মণ সভায় পঠনার্থ ওজস্বিনী কবিতা, হিন্দুসমাজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের উপকারার্থ রচিত কবিতাসমষ্টি এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক সমাজের বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নারী এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতিতে প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান!

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডান-হাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিস্মার্কের তিনটি বোমা", রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"...প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রাজী! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র!! "সংবাদ-কোষ" বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ!!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা" ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি!

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দেড়গুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সৌরভ—

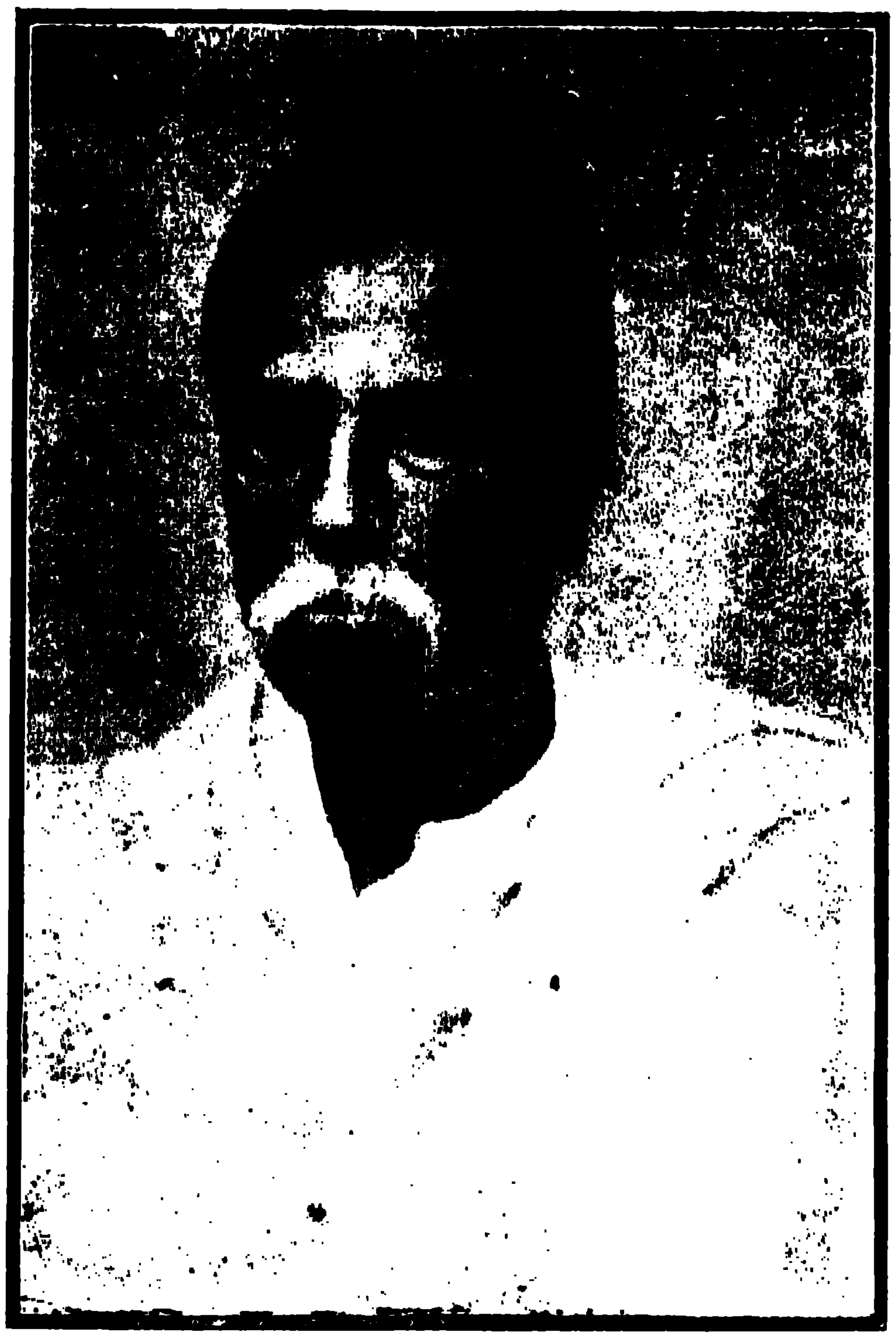

স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার।

সৌরভ প্রেস—ময়মনসিংহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪। ৫ম সংখ্যা।

কেদার তর্পণম্।

বঙ্গেষু সাহিত্য-রসার্ণবে যঃ
বিচিত্র-চিত্রৈস্তরণীং প্রসাধ্য।
শুভ্রং যশো-নৌবসনং বসানাং
পারং গতো, নাস্ত্যধুনা সুধীঃ সঃ॥

কেদারনাথে বিদুষাং বরিষ্ঠো
জনপ্রিয়াং সৌরভ পত্রিকাং তাম্।
প্রিয়ামিব প্রাপয়তি স্ম লোকান্,
হাহন্ত কুত্রাস্ত গতো রসজ্ঞঃ?

বৃদ্ধোঽপপি যুবৈব, সদা স ভোগী
যোগীব সাহিত্যরসে নিমগ্নঃ।
পপৌ সুধাং কণ্ঠ গতা মকুণ্ঠ
শ্চাপ্যোঽমরত্বং নবতাং বিহায়॥

যস্য স্বাভাবিকী বাগ্ নিখিলগুণযুতা রম্যহর্ষ প্রকর্ষা
কর্ণে পীযূষধারা মনধিগতবত্তাকাপি সম্বর্ষতি স্ম।
শান্তৈ রাকারভাবৈঃ প্রবয়সি যুবকে বালকে চান্ত্যজে চ
তস্যাসীত্তুল্যভাবঃ, স বত বুধবরো ধ্যানগম্যোঽস্ত জাতঃ॥

প্রতি গৃহমপি যোঽয়ং রাজতে বঙ্গদেশে
স্বরচিতবহুগ্রন্থানস্ত শক্তি প্রভাবাৎ।
বিবিধগুণবৃতো যো নিগুণাকার-চেষ্টঃ
সকলমনুজচিত্তং বিত্তপূর্ণং চকার॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
ব্যাকরণতীর্থস্য।

কেদার কাহিনী

দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ অতীত হইয়া গেল, কেদারনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার তিরোধান দিনে তাঁহার জীবন স্মৃতির কিছু আলোচনা করিব।

এই জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় গচিহাটা গ্রাম। সেই গ্রামে পরলোকগত লোকনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাস ছিল। তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল কাপসাটিয়া গ্রামে। গ্রামখানি কালী-নদীর তীরে। এই গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। আজ হইতে সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে, এই গ্রামে লোকনাথের পত্নী জয়দুর্গার গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই আমাদের কেদারনাথ। কেদারনাথ ছিলেন চতুর্থ সন্তান। তাঁহারা চারি ভগ্নী ও পাঁচ ভাই ছিলেন। কেদারনাথ শৈশবে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন।

কেদারনাথের সাহিত্যানুরাগের হেতু অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মাতুলালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পিতৃভবনের সাহিত্যিক আবেষ্টন, এই দুই পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের মধ্যে পালিত হওয়ায় কেদার নাথের সাহিত্য প্রতিভা বিকসিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

মহাভারত প্রণেতা রামেশ্বর নন্দী এবং ভারত সাবিত্রী রচয়িতা বিষ্ণুরাম নন্দীর বংশে ইঁহার জন্ম। কেদার নাথের পিতা লোকনাথ মজুমদার মহাশয় একজন সাহিত্যানুরাগী লোক ছিলেন। সর্ব্বদা সাহিত্য-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। কেদার নাথের জননী জয়দুর্গা অতিশয় গুণবতী রমণী ছিলেন। তিনি ভালো গল্প বলিতে পারিতেন। বালক বালিকারা তাঁহার নিকট গল্প শুনিতে ভালোবাসিত। কেদার নাথ উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্থ সম্পত্তি বিশেষ না পাইলেও এই সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কেদারনাথের নিজ গ্রাম গচিহাটায় একটি বিরাট পুস্তকালয় আছে। এই পুস্তকালয় দেখিয়া শৈশব হইতেই কেদারনাথের অধ্যয়নে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল।

চিরন্তন প্রথানুসারে কেদারনাথের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল শৈশবে পল্লীপাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইতে না হইতেই ময়মনসিংহে তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায় মহাশয়ের নিকট পাঠান হয়।

ময়মনসিংহ আসিয়া কেদারনাথ প্রথমতঃ নসিরাবাদ এন্‌ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন সেই স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। কেদারবাবুর শাস্ত্রস্পৃহা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংশ্রবে আসিয়াছিল।

তাহার পর সিটি স্কুল, শেষে জিলা স্কুলেও তিনি পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগীর যাহা প্রায় হইয়া থাকে কেদারনাথের জীবনে তাহার বিপর্য্যয় হয় নাই। বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পড়ায় তাহার তেমন মনোযোগ ছিল না। কেদারবাবু নিজে বলিতেন--বাঁধাবাঁধি নিয়মে থাকিয়া কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক পড়িতে আমার আদৌ ভালো লাগিত না। আমি সকলের পেছনের বেঞ্চে বসিয়া বাঙলা বই পড়িতাম, গল্প লিখিতাম।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই এই ব্যভিচার অল্পবিস্তর দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে

লিখিয়াছেন—"শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়—পেট ভরিবার পূর্ব্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রস গুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোট খাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে সেটা যে লোষ্ট্র জাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাকাকরা মোদক বস্তু তাহা বুঝিতে বুঝিতেই অর্দ্ধেক বয়স পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোক দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিই মন্দা পড়িয়া যায়।"

জেলা স্কুলেঅধ্যয়নকালে ক্লাশের সময় শিক্ষকের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রফুল্ল লেখা হয়। পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহার নাম 'স্রোতের ফুল' হইয়াছিল।

স্বাধীন ভাবে জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা তাঁহাকে এতদূর আকুল করিয়া তুলিল যে, বিদ্যালয়ের গণ্ডি তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াই তিনি বিদ্যালয়ের নাগপাশ ছিন্ন করিলেন।

তখন হইতেই কেদার নাথের সাহিত্য চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশ হইল। আঠারশত বিরানব্বই সালে বাঙ্গলার একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রেসে মুদ্রণ জন্য দিয়াছিলেন। দুর্দ্দৈব বশত গ্রন্থখানা মুদ্রাযন্ত্রের কবলেই কবলিত হইল।

তাঁহার পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্য পত্রিকায়, বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রবর্ত্তিত "আর্য্যাবর্ত্তে"। শ্রীমতী সরযূবালা দত্তের "ভারতমহিলা," "নব্যভারত," "বীণাপাণি," "নির্ম্মাল্য," "প্রয়াস," "ভারতী" প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

বাল্যাবধিই তিনি সাময়িক পত্রিকা পরিচালনের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সেই আকাঙ্ক্ষার ইন্ধন জোগাইত কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের সাময়িক পত্রিকা সমূহ। তিনি নিজে বলিতেন—যখনই ঠাকুরবাড়ী হইতে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তখনই আমি ময়মনসিংহ হইতে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের সংকল্প করিতাম।

ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত "বালকের" আদর্শে তিনি "কুমার" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুমারের পরমায়ু কমই ছিল।

ঠাকুর পরিবারের সাধনার অনুকরণে তিনি তেরশত ছয় সালে "বাসনা" বাহির করেন। প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই বাসনা বন্ধ হইল।

উদ্‌যোগী পুরুষ ইহাতেও দমিলেন না। তেরশত সাত সালের পহেলা আষাঢ় তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সমবেত চেষ্টায় "আরতির" প্রচার হইল। অনেকের ধারণা কেদারবাবুর মৃতা কন্যা আরতির নামেই আরতি নাম রাখা হইয়াছিল। তাহা ভুল। আরতি পত্রিকা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এক কন্যা জন্মে, আরতির সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত রাখিবার জন্য তাঁহার কন্যার নামও আরতি রাখেন। আরতি ছিল বড় আদরের মেয়ে। আরতি পীড়িত হইলে তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, আরতি চলিয়া গেল।

তিনি এক অভিনব উপায়ে কন্যার শোক বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাময়িক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে আত্ম নিয়োগ করিলেন। সাময়িক সাহিত্য গ্রন্থের বীজ এইরূপে উপ্ত হইল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

আরতি প্রচারের পূর্ব্বেই কেদারবাবু তাঁহার মাতুলের সাহায্যে ময়মনসিংহ কালেক্টরীতে নকলনবিশী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন ইহাই ছিল তাঁহার জীবিকার একমাত্র উপায়।

আরতি যখন মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল, তখন শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যসেবী রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ময়মনসিংহে আসেন। সাহিত্য চর্চ্চার তাহার বড়ই উৎসাহ ছিল। রমণীবাবুর চেষ্টায়

ও কেদারবাবুর উদ্যোগে তেরশত আট সনে এই সহরে একটি সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেদারবাবু উহার সম্পাদক মনোনীত হন। আরতি এই সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে লাগিল। আরতির সম্পাদক ছিলেন প্রথম বৎসরে পণ্ডিত উমেশ বিদ্যারত্ন মহাশয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে রায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বাহাদুর।

এই সময় গবর্ণমেণ্ট রমণীবাবুর উপর ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার লিখিবার ভার দিলেন। তিনি কেদারবাবুকে সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে কেদারনাথ গভর্ণমেণ্টের অনেক কাগজপত্র পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের ইতিহাসের অনেক দুষ্প্রাপ্য উপাদান তিনি এই সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রমণীবাবু চলিয়া গেলে আরতির পরিচালন ভার সুহৃদসমিতি গ্রহণ করেন। সুহৃদসমিতি কেদারনাথকেই সাগ্রহে সম্পাদকপদে বরণ করিয়া লইলেন। এই সময় আরতিতে প্রথম ময়মনসিংহের ইতিহাস বাহির হইল।

যে সময় আরতি পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে সেই সময় সহসা কেদারনাথ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। আরতির জীবন প্রদীপও তাঁহার আরতির ন্যায়ই নির্ব্বাপিত হইল।

তখন ময়মনসিংহে সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী কোন পাঠাগার ছিল না। রোগাক্রান্ত হইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে কলিকাতা থাকিয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নোট লিখিতে লাগিলেন। কতকগুলি দুর্লভ গ্রন্থও হাতে লিখিয়া লইবার প্রয়াস পাইলেন। এই অবিশ্রান্ত শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবার তিনি বাতরোগে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। দুরন্ত রোগে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ এবং দক্ষিণহস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। ইহাতে তিনি চিরদিনের জন্য পঙ্গু হইয়া গেলেন। জীবনে আর স্বাধীনভাবে চলিতে পারিলেন না। কলমটি মাটিতে পড়িয়া গেলে অন্যের সাহায্য ব্যতীত তুলিতে পারিতেন না। তথাপি তাঁহার লেখনীর বিশ্রাম ছিল না। লিখিতে কখন শ্রান্তিবোধ করেন নাই।

পীড়িত অবস্থায় তেরশত এগার সালে তিনি "ময়মনসিংহের বিবরণ" মুদ্রিত করেন। এই কার্য্যে স্থানীয় জেলা বোর্ড তাঁহাকে দুইশত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

তেরশত বার সালে ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইল, কেদারবাবু ছিলেন প্রদর্শনীর কর্ম্মসচিব। অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত পুস্তকের মধ্যে "মহারাষ্ট্রপুরাণ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহারাষ্ট্রপুরাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই বৎসরই তাঁহার ময়মনসিংহের ইতিহাস এবং চিত্র নামক গল্প পুস্তক প্রকাশিত হয়।

যখন রুগ্নদেহে গভর্ণমেণ্টের চাকরী করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন তিনি সাহিত্যিক ভাতার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি টাইপরাইটার মেশিন দিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় শিথিল হওয়ায় মেশিনের সাহায্যে কাজ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। কাজেই উনিশশত নয় সালের জুন মাসে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যিক ভাতার জন্য পুনরায় বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। সেই হইতেই তিনি অকর্ম্মণ্য স্বাস্থ্য লইয়া রুগ্নদেহ সাহিত্য সেবায় উৎসর্গ করিলেন।

তেরশত আঠার সালের পহেলা বৈশাখ ময়মনসিংহের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। সেই নববর্ষের প্রথম দিনে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সাহিত্য সর্ব্বস্ব কেদারনাথ ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ। সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে "সম্মিলন" নামক নূতন একটি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইল। কেদারবাবুই ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা, প্রথমে স্থির হইল ময়মনসিংহ হইতেই ইহা প্রকাশিত হইবে, পরে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়ের "ঢাকা রিভিউ" ও "সম্মিলন" একত্র করিয়া ঢাকা হইতে তাহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কেদারবাবুকেই উহার পরিচালক নিযুক্ত করিলেন। কেদারনাথ কিছুকালের জন্য ময়মনসিংহ ছাড়িয়া ঢাকাবাসী হইলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা কেদারনাথের

এই কার্য্য যেন তেমন মনঃপূত হইল না। তিনি আবার ময়মনসিংহে আসিয়া তেরশত উনিশ সালের কার্ত্তিক মাসে "সৌরভ" প্রকাশিত করিলেন। কেদারনাথের প্রতিষ্ঠিত সৌরভ আজ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। মফঃস্বলের একমাত্র দীর্ঘায়ু পত্রিকা আজিও টিকিয়া আছে।

সৌরভ প্রবর্ত্তনের পর হইতে কেদারনাথ উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার শুভদৃষ্টি, সমস্যা, প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোট গল্প সৌরভে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তাঁহার জীবনের আর একটি স্মরণীয় কার্য্য জয়দুর্গা ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপন। জননী জয়দুর্গার নামে এই বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। মাতার স্মৃতিরক্ষা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। উনিশশত সতের সালে তেরই আগষ্ট জয়দুর্গা এম, ই, স্কুল স্থাপিত হয়। ব্রহ্মপুত্র তীরে জহরউদ্দিন দারোগা সাহেবের ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই প্রথম স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। পর বৎসর দোসরা জানুয়ারী জয়দুর্গা এম, ই, স্কুল, হাই স্কুলে পরিণত হয়। ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্কুলের কার্য্য পরিচালন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। কেদারনাথ একত্রিশ শত টাকায় স্কুলের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় নব নির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া কেদারনাথ শান্তিলাভ করিলেন। কয়েক বৎসর স্কুল বেশ চলিল। তখন স্যর আশুতোষ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার। তাঁহার অনুগ্রহে বিভাগীয় পরিদর্শকের প্রতিকূলতা সত্বেও জয়দুর্গা ইনিষ্টিটিউসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিল। মাতৃভক্ত কেদারনাথের জননীর স্মৃতিচিহ্ন বড় সাধের জয়দুর্গা স্কুল ধীরে ধীরে লোপ পাইল। এই অনুষ্ঠানে কেদারবাবুর প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই গুরুতর ক্ষতি বহন করিয়াও তিনি একদিনের জন্যও কাহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

কেদারনাথের জীবনের আর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁহার পুস্তকাগার। গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁহার কার্পণ্য ছিল না। তাঁহার পুস্তকালয়ে এখন প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা মূল্যের গ্রন্থ আছে। কেদারবাবুর ন্যায় অবস্থার লোকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক তাঁহার গ্রন্থাগারে দেখা যায়। হস্তলিখিত পুস্তকের সংখ্যাও প্রায় পাঁচশত হইবে। বহু সংখ্যক প্রাচীন মাসিক পত্রিকা প্রথম হইতে সংগৃহীত আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে নরেন্দ্রবাবুর সামর্থ্য ও অবসরের অভাবে এই সব অমূল্য রত্ন নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

গত বৎসরের কেদার স্মৃতি সংখ্যা সৌরভে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারু বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন— "তাঁহার পুস্তক সংগ্রহ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম বড় সহরে না থাকিয়াও কেদারবাবু কিরূপে রামায়ণী সমাজের ন্যায় এরূপ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

কেদারনাথ অধিকাংশ সময়ই ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা মূলকগ্রন্থ "রামায়ণের সমাজ" ও "রামায়ণী সভ্যতা" একদিন আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ধারা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, সেদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তথাপি গ্রন্থ দুইখানি শেষ হইতেছে না। আমি কি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারিব না ?

আজ তাঁহার সন্দেহ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র রামায়ণের সমাজ লেখা শেষ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহার মুদ্রণকার্য্য এখনও কিছু বাকী আছে। রামায়ণী সভ্যতা কয়েক অধ্যায় মাত্র লিখিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট খণ্ডের স্মারক লিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহের শীতের প্রকোপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেজন্য প্রতি বৎসর শীতকালে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি রামায়ণের সমাজের পাণ্ডুলিপি পড়িতে দিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া উহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে— মজুমদার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে অধ্যবসায়ে সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হইয়াছি। একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

গত ফাল্গুন মাসে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদিগের নিকট আনন্দের সহিত বলিলেন শাস্ত্রী মহাশয় আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এখন পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করা প্রয়োজন। তাহার প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে অন্যত্র পুস্তক ছাপিতে অত্যন্ত আয়াস পাইতে হয় বলিয়া তিনি সৌরভ প্রেস নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র নিজেই স্থাপিত করেন। তাঁহার নিজের প্রেসেই রামায়ণের সমাজ ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইতেছিল। এবার কলিকাতা হইতে আসিয়া পূর্ণোদ্যমে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

বিপদ কখন একা আসে না। অমনি তাঁহার নিজের পালা আসিল। তিনি লাইব্রেরীতে বসিয়া রামায়ণের প্রুফ দেখিতে ছিলেন হঠাৎ প্রবলবেগে কম্প হইয়া জ্বর আসিল। তখন বেলা ১০টা তথাপি তিনি কম্পিত হস্তে প্রুফ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কাগজ কম্পিত হাত হইতে পড়িয়া গেল, তখন তাঁহার নিকটে কেহই ছিল না। দৈবাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বুলবুল আসিয়া তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার শুইবার ঘরে লইয়া গেল। কেদারবাবু শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসকগণ আপ্রাণ

মৃত্যুশয্যায় কেদারনাথের কনিষ্ঠা কন্যা।

সহসা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রায় সপ্তাহকাল জ্বরে ভুগিয়া কন্যা পরলোক গমন করিলেন। সাহিত্য সন্ন্যাসী কিছুতেই টলিলেন না। কন্যার শোক বুকে লইয়াই তিনি শ্রীমতী সরলা দেবীর অনুরোধে ভারতীর জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেন। কন্যার মৃত্যুর পরেই তাঁহার পত্নীর পৃষ্ঠে ফোঁড়া হইল। পুনঃ পুনঃ বিপদপাতে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে আত্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখ করিলেন—কন্যা চলিয়া গেল পত্নীও বোধ হয় আমাকে ছাড়িয়া যাইবে। ভগবানের কৃপায় তাঁহার পত্নী আরোগ্যলাভ করিলেন।

চেষ্টায় প্রতিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বরের আর বিরাম হইল না। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণের চেষ্টা বিফল হইল।

পাঁচই জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তাঁহার চৈতন্যের লোপ হইল। পরদিবস ৬ই জ্যৈষ্ঠ দিবা দশ ঘটিকার সময় সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, সাহিত্য সাধনার হৃত-সর্ব্বস্ব, ময়মনসিংহের সর্ব্বস্ব, বাঙ্গালার গৌরব কেদারনাথ সর্ব্বযন্ত্রণা মুক্ত হইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

অশ্রুজলে আজীবন তর্পণ করিবার জন্য রহিলেন কেবল তাঁহার সাধ্বী পত্নী ও সাত বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র, একটি

কন্যা। আর তাঁহার যোগ্য অনুজ নরেন্দ্রনাথ। আর রহিলেন তাঁহার সাহিত্য সহোদর বঙ্গের সাহিত্যসেবীগণ। আজ তাঁহারা মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন, আমরা প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করুন।

কেদারনাথের বংশাবলী।

লবণেশ্বর নন্দী।

- বৃহস্পতি বা বিশ্বেশ্বর।
- সুরেশ্বর। (ইনি দক্ষিণ পাড়ায়)
  - শ্রীপতি।
    - শ্রীচন্দ্র।
      - রামভদ্র।
        - **রামেশ্বর** (মহাভারত রচয়িতা)
      - গোবিন্দ।
        - যদুনাথ।
          - মুকুন্দরাম
            - লক্ষ্মীনারায়ণ।
              - রাজকৃষ্ণ।
                - সূর্য্যনারায়ণ।
                  - ত্রৈলোক্যনাথ।
                    - প্রফুল্ল।
                    - সুখময়ী।
                    - ইন্দু।
              - জয়কৃষ্ণ।
                - লোকনাথ।
                  - তারক
                  - কন্যা
                  - কন্যা
                  - **কেদারনাথ**
                    - নলিনী
                    - আরতি
                    - তরু
                    - সৌরভ
                    - অমর
                  - শরৎকামিনী
                  - কুমুদিনী
                  - কৈলাস
                  - দিগেন্দ্র
                  - নরেন্দ্র
                    - বেলা
                    - ধীরেন্দ্র
                    - বকুল
                    - মুকুল
                    - নীরেন্দ্র
    - জগৎ।
- ভুবনেশ্বর। (ইনি বেজুড়া গেলেন)

শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

কেদার স্মৃতি।

সে ফিরে ফিরে না আর যে যায়, সে যায়।
মুছে ফেলে চিরতরে সব মমতায়।
ধরণীর অশ্রু জলে,
তার না পরাণ গলে,
তারে না বাঁধিতে পারে আর এ মায়ায়।
ত্রিদিবে দেবের সনে
আনন্দে নন্দন বনে,
সে যে রহে নিশিদিন প্রমত্ত খেলায়।
মিছা কথা; সে কি পারে,
এত স্নেহ ভুলিবারে,
জীবনে যা গাঁথা ছিল শিরায় শিরায়?
থাকিয়া নন্দন বাসে,
সে তেমনি ভালবাসে,
আসে সে স্বরগ ছাড়ি মাটীর ধরায়।
আসে সে স্বপনে সত্য,
দেয় স্নেহ প্রীতি নিত্য,
রূপে ভরা সে অরূপে ভোলা ফিরে যায়?
এস বন্ধু এস সখা,
দেও আজি দেও দেখা,
ব্যাকুল পরাণ আজি চাহিছে তোমায়।

শ্রী রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

সাহিত্যিক কেদারনাথ

আজ এক বৎসর হইল, কেদারনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ময়মনসিংহের সাহিত্য সমাজের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা আমরা এখনও করিয়া উঠিতে পারিতেছি কি না, সন্দেহ। তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আমাদের আদৌ আছে কি না, জানি না। আত্মীয় জনের বিয়োগে শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে মানুষ যতক্ষণ হাহাকার করিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কতখানি ক্ষতি তাহার হইয়াছে, সেটা সে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শোকের উৎকণ্ঠা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেই মানুষ ভাবিবার অবকাশ পায়, কত বড় ক্ষতি তাহার ঘটিয়াছে। তেমনই সমাজের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন তিরোহিত হন,—কোন মূল্যবান জীবন প্রবাহ যখন হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন সে আঘাতের প্রাথমিক প্রাবল্যে মানুষ ভাবিবার অবসর পায় না, কত বড় গুরু অনিষ্ট সমাজের ঘটিয়াছে।

ময়মনসিংহের সাহিত্যিকেরা এখনও কেদারনাথের অভাবের প্রাথমিক আঘাতটাই সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। যদিও এক বৎসরকাল অতীত হইতে চলিল, কেদারনাথ আমাদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, তথাপি এখনও আমরা তাঁহার অভাবের তীব্রতা এতখানি অনুভব করিতেছি, যে এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, কতখানি ক্ষতি আমাদের হইয়াছে।

অচিরে কেদারনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পরিণত হইবেন; তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে সমসাময়িক সম্বন্ধ ছিল, সেটা ক্রমশঃ স্মৃতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান, নিকট বন্ধু হিসাবে আমাদের জীবনে তিনি আর উপস্থিত থাকিবেন না। বর্ত্তমানের সঙ্গে অনুভূত সুখ-দুঃখ মিশ্রিত যে একটা নিকট সম্বন্ধ মানুষের থাকে, সেটা আর তাঁহার সঙ্গে আমাদের থাকিবে না। যে সাময়িক সৌহার্দ্দ কিম্বা কলহ মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে, ঐতিহাসিক ব্যক্তির বেলায় সেটা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া গিয়া একটা নূতন রকমের সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে স্থাপিত হয়। কেদারনাথের সঙ্গেও তেমনি একটা সম্বন্ধ আমাদের ক্রমশঃ স্থাপিত হইবে। যাঁদের তাঁর সঙ্গে কোন ঝগড়া ছিল, তাঁরা সেটা বিস্মৃত হইবেন; যাঁরা চিরকালই তাঁকে বন্ধুভাবে দেখিয়াছিলেন, তাঁরাও অবশেষে তাঁর বন্ধুত্বের ঋণ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। তখন কেদারনাথ শুধু একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমাত্র থাকিবেন; বিশেষভাবে কাহারও বন্ধুও নয়, বিশেষভাবে কারও শত্রুও নয়। সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক হিসাবে কেদারনাথের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবার অবকাশ তখনই আমাদের হইবে। ব্যক্তিগতভাবে ময়মনসিংহের সাহিত্যিকদের যে প্রকৃত উপকার তিনি করিয়াছেন, যেরূপ উৎসাহ এবং সুবিধা তিনি তাঁদের করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তার জন্ত সে সব সাহিত্যিক বিশেষভাবে তাঁর নিকট ঋণী এবং কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। এবং সে ঋণের কথা বিশেষভাবে তাঁরাই প্রকাশ করিবেন। এরূপ-

ভাবে নবীনদের সাহিত্য চেষ্টাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলাও সাহিত্যসেবার অঙ্গ; এবং এর জন্যও কেদারনাথ স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। এর জন্যও সমাজ তাঁর নিকট ঋণী। কিন্তু ইহার চে'য়েও মূল্যবান সম্পদ তিনি সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেটী তাঁর বিবিধ গ্রন্থরাজি।

কেদারনাথ এত বিষয়ে এবং এতগুলি বই লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেগুলির সম্যক সমালোচনা করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা, এক মুহূর্ত্তের কাজ নয়। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সাহিত্য সমালোচক এবং ঔপন্যাসিক ছিলেন। ছেলেদের জন্য ইতিহাস-ভূগোল লেখা ছাড়া, মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা এবং সুখপাঠ্য উপন্যাস তিনি কম লিখেন নাই। এ সমস্তগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করার সময় এখনও আসে নাই। তা ছাড়া, কোন গ্রন্থকারেরই সকল বই-ই সকলের কাছে সমান প্রতীয়মান হয় না। যাঁরা উপন্যাস-রসিক, তাঁরা হয়ত কেদারনাথের উপন্যাসগুলিকেই বেশী আদর করিবেন; আর যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা হয়ত তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে অনেক উপভোগ্য জিনিস পাইবেন। ইহা হইতেই কেদারনাথের মূল্যের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে যে, তিনি একাধারে এত বিভিন্ন রুচির লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ, যাঁরা তাঁর উপন্যাস পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন তাঁরাও তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা এবং সাহিত্য সমালোচনাকে মূল্যহীন মনে করিতে পরিবেন না; আর তেমনি, তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণাকে বেশী সমাদর করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর বাকী সাহিত্য চেষ্টাটা কিছুই নয়।

সুতরাং আমরা যদি তাঁর কোন গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ করি, তবে, তার অর্থে কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে, বাকীগুলি আমাদের কাছে মূল্যহীন। আমাদের মনে হয় তাঁর monumental work এখনও অপ্রকাশিত তাঁর "রামায়ণের সমাজ"। বইখানার অনেকাংশ বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় বিশেষতঃ সৌরভে প্রকাশিত হইয়াছে; সম্পূর্ণ গ্রন্থখানাও বোধ হয় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমার মনে হয় এই বইখানা কেদারবাবুর বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

রামায়ণ ও মহাভারত নিয়া কিছু কিছু নাড়াচাড়া সকলেই করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুইটী মহাকাব্যে তদানীন্তন সমাজের একটি প্রকাণ্ড ছবি রহিয়াছে সেটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা তেমন ভাবে কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। অথচ সেটী না করিলে, প্রাচীন ভারতের গৌরব কিম্বা অগৌরব কোথায় তাহাও ঠিক বুঝা যাইবার কথা নয়।

সেদিন দেখিলাম, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ পাঠ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় একটু দুঃখের সহিত কহিলেন, "এই আঠারখানা পুরাণ কেহই ভাল করিয়া এবং সম্পূর্ণ পড়ে নাই; অথচ এই নিয়া Researchও কতই হইয়া গেল।" বয়সে শতাব্দীর ত্রিপদে অতিক্রম করিয়াও এবং নিজের অসাধারণ প্রতিভা নিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী জুড়িয়া প্রচুর মৌলিক গবেষণা করিয়াও আজ শাস্ত্রী মহাশয়কে পুরাণগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে, আমাদের মনে হয় রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

কাহারও বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হইলে পুলিশের লোক আর কিছু করুক আর নাই করুক, আগেই একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে, কি কি জিনিস চুরি গেল এবং তার আনুমানিক দাম কত। তাতে সহজেই রিপোর্ট দেওয়া যায়, অমুক জায়গায় এত টাকার মাল চুরি কিম্বা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এটা বোধ হয় পাশ্চাত্যদের ধরণ। লেখাপড়ার বেলায়ও দেখা যায়, কোন একটা বই তারা বুঝুক বা নাই বুঝুক, সে বইয়ে কোন্ শব্দটা কিংবা কোন নামটা কতবার আছে, তার লিষ্ট তারা আগেই করিয়া ফেলে। অনেকে হয়ত ভাল সংস্কৃত জানেন না; বেদ বুঝা দূরে থাকুক, বেদের টীকারও দশ ছত্র সামনে ফেলিয়া দিলে মানে করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত গণিয়া রাখিয়াছেন "বর্ণ" কথাটী কিম্বা "মগধ" কথাটী সেথানে কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোথায় কোথায়।

বইয়ের অনুক্রমণিকা কিম্বা Index যে করে, সে হয়ত বইয়ের কিছুই বুঝে না; ছাপানের সময় প্রুফ্ যে দেখে, সে যেমন মানে জানিবার অবসর পায় না, তেমনি কোন্ শব্দ কতবার আছে যে গণে, তারও অর্থ বুঝিবার সুবিধা একেবারেই না হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ Index দ্বারা

পুরাতত্ত্বীদের ভারি সুবিধা হয়, বিশেষতঃ—Research—ওয়ালাদের ; সম্পূর্ণ বইখানা না পড়িয়াও কোনও বইয়ে কি কোথায় আছে বলা চলে এবং প্রয়োজন মত তাহা হইতে উদ্ধৃত করাও সম্ভব হয়।

এইরূপ Indexএর সাহায্যে বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি নিয়া আমরা ইচ্ছামত কারবার করিতে পারি ; অথচ সমস্ত বইখানা হয়ত কোনও দিনই পড়া হইয়া উঠিবে না।

কিন্তু কেদারবাবু রামায়ণখানা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের এক নিখুঁত চিত্র উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মনে হয় এই একটী কাজের জন্যই যে কোন যুগে তিনি স্মরণীয় হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। এবং মনে হয়, তাঁর বিবিধ গ্রন্থরাজির মধ্যে এইটী একটী হীরার টুকরা।

বলিয়াছি যে, তাঁহার গ্রন্থরাশির পরিপূর্ণ সমালোচনা করিবার মত মনের অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। সুতরাং সেদিকে আর অগ্রসর হইব না। তাঁহার তিরোধানের এই বৎসরান্তের দিনে, আমরা আবার কেবলই ভাবিতেছি, সাহিত্য-গগনের যে স্থানটী তিনি শূন্য করিয়া গেলেন, আর কবে কোন্ জ্যোতিষ্মান্ সে স্থানের অধিকার লাভ করিবেন ? কে আবার ময়মনসিংহের নবীন সাহিত্যিকদিগকে হাতে ধরিয়া সুপথে চালিত করিবেন ? কার চেষ্টায় এবং কার উৎসাহে আবার গ্রামে গ্রামে সাহিত্য চেষ্টা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে ? এবং কে আবার অজ্ঞাতনামা, প্রচ্ছন্ন সাহিত্যামোদীদিগকে নির্ভয়ে লোক চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আশ্বাস দিবে ?

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণম্ এনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥"

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে সুপথে মঙ্গলের দিকে নিয়া যাও ; তুমি বিশ্বের সবই জান। আমাদের কুটিল পাপরাশি বিনাশ কর ; আমরা তোমাকে বারবার নমস্কার করিতেছি।

শ্রী[illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কেদার স্মৃতি।

১

সাহিত্যিকের স্মৃতির সভায়
চক্ষে জমাট অন্ধকার !
হতাশ্বাসে হৃদয় কাঁদে,
বক্ষে দারুণ দুঃখভার !
হয় যেচে, হায়, কষ্টভাগী !
ফুরায় আয়ু রাত্রি জাগি' !
দেশবাসী রয় ঘোর বিরাগী !
কয় জনে পায় পুরস্কার ?
সাহিত্যিকের জীবন হেথায়
মূর্ত্তিমন্ত তিরস্কার !

২

বিশেষ করে এসব জেনে
আমরা যারা মৃত্যু বরি,
সেই আমাদের মধ্যে তুমি
মৃত্যুঞ্জয়ী মূর্ত্তি ধরি' !
থাকুক ব্যাধি অকাল জরা,
চিত্ত তোমার দীপ্তিভরা ;
অদ্যাপি সেই আকুল-করা
সরল কথা শ্রবণ করি',
চম্‌কে উঠে অনেক সময়
ঝাপ্‌সা চোখে তোমায় স্মরি !

৩

দেখ্‌তে পেলাম তোমার মাঝে
সাহিত্যিকের সত্য প্রাণ !
সত্য এবং প্রজ্ঞা লাভে
অকুণ্ঠিত আত্মদান !
ছিল নিষ্ঠা একাগ্রতা,
ভুললে তাতে লাভের কথা,
দুঃখদমন প্রফুল্লতা
করলো জীবন জ্যোতিষ্মান্ !
তুমি করেছ সাধন যাহা ;

[illegible]

৪

মানুষ হাজার হোক্ না বড়,
থাক্‌বে সবার দুর্ব্বলতা!
উস্কে দিলে প্রদীপ জলে,
বাউনি পেলে বাড়্‌বে লতা!
স্বরের যদি আদর পেতে,
পার্‌তে আরো এগিয়ে যেতে;
বুকের বল উঠ্‌তো মেতে,
নাইরে ওতে প্রগল্‌ভতা!
বাতির নীচেই আঁধার বেশী—
মিথ্যা নয় এ, প্রাণের কথা!

৫

বাংলাদেশের পূবাঞ্চলে
কোথায় সত্য সাহিত্যিক্?
থাক্‌লে তোমার জীবন-কথায়
মুখর হতো চতুর্দ্দিক।
নাই সাধনা, নাম্-ভিখারী,
সব্‌কে করে তুচ্ছ ভারী;
জন্মে না তাই দুঃখহারী
মৌলিকতা অলৌকিক!
গুণীর আদর করতো যদি
জাগ্‌তো লেখক সু-মৌলিক!

৬

আজ্‌কে তুমি বিরাজ করো
নিত্য যশের ঊর্দ্ধলোকে!
শুন্‌তে কি পাও প্রাণের কথা
বল্‌ছি যাহা দুঃখ শোকে!
বাণীর সেবায় তোমার মতো
যাচ্ছি চলে' অব্যাহত;
রয় যেন শির সমুন্নত
প্রবঞ্চনার প্রবল ঝোঁকে!
সান্ত্বনা এই—যাবৎ বাঁচি
বসৎ করি পুণ্যলোকে!

এই যে চাই [illegible]
[illegible]!

৭

ভাব্-জগতের রাজাতরীর
সবাই এক এক কর্ণধার!
সত্য-শিব ও সুন্দরের
ওরাই পূজে মনের টেরে;
উপেক্ষা কেউ করিস্ নেরে!
পাপ দেবে তাপ বারম্বার!
এদের চিন্তা-কর্ম্মফলে
বস্তু-জগৎ চমৎকার!

৮

এসব চিন্তাবীরের প্রেমে
অতি-মানব জনম লভে!
সভ্য জাতি এদের নিয়েই
বড়াই করে সগৌরবে!
এদের কটীর অভাব নাশি'
ছড়ায় বিশ্বে কীর্ত্তিরাশি;
হোক্ না ছুতার চামার চাষী,
গুণীর পূজা করছে সবে!
জ্ঞানীর গুণীর এমন আদর
এই দেশে, হায়, বাড়্‌বে কবে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বন্ধুতার আহ্বান

অন্যূন পচিশ বৎসরের কথা,—সাহিত্য সেবা উপলক্ষে যেদিন আমি সাহিত্যগত প্রাণ কেদারনাথের সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই সময়ে তাঁহার উপরে ময়মনসিংহের সাহিত্য দেবতার "আরতির" ভার ন্যস্ত ছিল, আমি সেই আরতিতে প্রবন্ধ ধূপ-ধুনা প্রদান করিয়াছি। আমরা দুইজনে যখন সাহিত্য মন্দিরের দিকে যাত্রা করি, তখন পথি মধ্যে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়; প্রথম সন্দর্শনেই আমরা একে অপরকে সহযাত্রী বন্ধুরূপে গ্রহণ করি। আমাদের বন্ধুতার মধ্যে কোন দিনও মনোমালিন্যের সামান্য আবা[illegible] সঞ্চার নাই। সাহিত্যিক বন্ধু কেদারনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রীতির চোখেই আমাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার বন্ধুতার মর্য্যাদা যোগ্যভাবে রক্ষা করিতে

পারিয়াছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। কালের নিষ্ঠুর তাড়নায় আরতি দীপ অসময়ে নির্ব্বাপিত হইল, অধ্যবসায়ী সাহিত্যিক কেদারনাথের আগ্রহ উৎসাহ আরতির সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল না। সাহিত্যের উত্তম সাধক কেদারনাথ মাসিক সাহিত্য "সৌরভ" হস্তে নিয়া সাহিত্যিক মণ্ডলীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন! যে কথা—বলিতেছিলাম,—বন্ধু-প্রবর কেদারনাথ বন্ধুতার আকর্ষণে সম্ভবতঃ আমার হাফ্‌-টোন চিত্র সৌরভে প্রকাশ করেন, এবং সৌরভের প্রবন্ধ লিখিবার জন্ম আমাকে বহুবার অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি নানা কারণে সাহিত্যিক বন্ধুর সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। এই জন্যই বলিয়াছি আমি বন্ধুতা রক্ষা সপ্রমাণ করিতে পারি নাই। অকালে সাহিত্যিক বন্ধুর সুরভি সুন্দর জীবন-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু রহিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার সৌরভরূপী মূর্ত্তযশঃ সৌরভ। এই সৌরভ জগতে যাহাতে চিরকাল সুধীজন সেব্যরূপে জীবিত থাকে লোকান্ত প্রস্থিত কেদারনাথের প্রত্যেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কায়মনোবাক্যে তাহা করা কর্ত্তব্য। কেদার-নাথ নাই, জানি, তথাপি কিন্তু তাঁহার সেই হাস্যময় মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে যেন সর্ব্বদাই উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি এবং তাঁহার সেই সরল মধুর আলাপ সর্ব্বদাই যেন আমাদের কানে বাজিতেছে।

সাহিত্য সাধনায় কেদারনাথের যে তন্ময়তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বস্তুতঃই অনন্য সাধারণ। তিনি শারীরিক সুস্থ ছিলেন না, কিন্তু মানসিক বলে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। এই সাহিত্যিক সাধক দারুণ রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া মহা-যোগীর ন্যায় সাহিত্যের আরাধনায় কেমন মগ্ন ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার ঢাকায় অবস্থিতিকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! এই একনিষ্ঠতা বা মনপ্রাণ সমর্পণই সম্ভবতঃ কেদারনাথকে প্রতিষ্ঠা প্রাঙ্গনে উপস্থাপিত করিয়াছিল। এই লব্ধ যশাঃ সাহিত্যিক সুহৃদের গুণ ছিল অনেক, কীর্ত্তিদেবী ইঁহাকে বরণ করিয়াছিল কিন্তু তাহার সহচর গর্ব্ব অভিমান এই সাহিত্য—উপাসকের কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইঁহার বেশভূষার আড়ম্বর ছিল না, কথাবার্ত্তায় অসরলতা ছিল না, সর্ব্বোপরি ছিল না সাহিত্যিক জনসুলভ আত্ম-প্রশংসাবাদ শ্রবণ-স্পৃহা।

কেদারনাথ মরিয়াও অমর, আরতি, সৌরভ, ময়মন-সিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে।

কেদারনাথের বিয়োগ ব্যথা আজিও তাঁহার পরিবার পরিজনকে ব্যথিত করিতেছে। আমরা আজ স্মৃতির তর্পণ বাসরে ভ্রাতৃপ্রতিম নরেন্দ্রনাথকে অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।

কেদার প্রয়াণ

মুদিয়াছে আঁখি ঝরে গেছে ফুল
থেমে গেছে আজ বাঁশরী কার;
নিভিয়াছে দীপ ডুবে গেছে চাঁদ
ছিঁড়িয়াছে হায় বীণার তার!
বাণীর সাধক ভাবের দুলাল
ভাষা সম্পদ্‌ মহিমা ভরা;
মরণের পারে চলে গেছে ধীরে
বাংলার এক গরিমা ধারা!
নয়ন গলিয়া অশ্রু ঢালিয়া
তাঁহারি চরণে অর্ঘ্য দেই;
হেমময় রথে গগনের পথে
ত্রিদিবে চলেছে "কেদার" ওই!
যত সুরবালা গলে দেয় মালা
বন্দনা গীতি পরীরা গায়;
পারিজাত শিরে বরিষে অমরে
অলকানন্দা জুড়ালো কায়!
হেম বঙ্কিম্‌ ভুদেব নবীন
রমেশ দ্বিজেন্‌ নামারে দেয়;
যশোমন্দিরে শ্রীমনোমোহন
কবি গোবিন্দ বরিয়া নেয়!
বাণী পদতলে বসিয়া সকলে
কবি-সাহিত্যিক কেদারে ল'য়ে;
ভুলে গেছে আজ শোক পরিতাপ
সংসার জ্বালা গিয়াছে ধু'য়ে!

সেরা ছেলে যত বাংলার শত
শুধাল আদরে, মুছাল ব্যথা ;
কতনা যতন কতনা সোহাগ
দরদী বন্ধু সকলি সেথা !
প্রত্নতত্ত্ব ঐতিহাসিক
গবেষণা তার সকলে শোনে ;
"সমস্যা" "অঞ্জলি" ক্ষুদ্র গল্পগুলি
"স্রোতের ফুল" এক করুণ গানে !
"বাংলা ভাষার ইতিহাস" তার
এ মহারতন সাহিত্য গলে ;

আপনার পায়ে আপনি দাঁড়ালে
দুঃখের আঘাতে নওনি তবু !
একাগ্রতার তুমি অবতার
বাণী আরাধনে লভিলে সিদ্ধি ;
জয়মাল্য ভূষা পরাইল ভাষা
সাহিত্য সেবায় পাইলে ঋদ্ধি !
ঋষির সংযম যুবার উদ্যম
শিশুর-সারল্য তোমাতে মিলে ;
কাঙ্গালের তরে ছিল বুক ভরে
দয়া ভাগিরথী নীরবে গলে !

মৃত্যুশয্যায় কেদারনাথ।

"রামমণী যুগে সমাজ" সভ্যতা
আঁকিলা অমর তুলিকা তুলে !
তোমার গৌরব "আরতি" "সৌরভ"
"ঢাকা ময়মনসিং ইতিহাসে" ;
"জয়দুর্গা" স্কুলে মায়েরে স্থাপিলে
লোক শিক্ষা লাগি পরের হিতে !
কমলার কৃপা স্বজনের সেবা
পাওনি শৈশবে পাওনি কভু ;

জনম ভূমির তুমি ছিলে বীর
বংশ-গরিমা তুমি যে ভাই ;
আবাল বৃদ্ধ বনিতা শুদ্ধ
কাঁদিয়া আকুল "কেদার" নাই !
ওগো মহাযশঃ জ্ঞানের তাপস
গেলে পরপারে ঘুচাতে ক্লান্তি ;
যাও সুধী আজ ফুরায়েছে কাজ
জীবন মরণ সকলি ভ্রান্তি !

স্বরগ হইতে স্বদেশের হিতে
ঢালিও সতত আশিস্-বাণী ;
ত্রিদিবের দলে থাকিও কুশলে
ভুলিও না জাতি-জনম ভূমি !
গেলে যদি দেব নাহি করি খেদ
কীর্ত্তি-জগতে প্রভাত তব ;
দেহের বিলয় সে'ত কিছু নয়
শ্মশানের বুকে জীবন নব !
যশের মরণ হয় না কখনো
কালের তাহাতে নাইরে হাত ;
ধন্যা ধরণী ধন্যা জননী
সন্তান যার "কেদারনাথ" !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কেদার-স্মরণে

১৩৩২ সনের ২০শে চৈত্র তারিখে ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম। ময়মনসিংহ গেলেই সাহিত্যিক মাত্রেরই এক প্রধান কর্ত্তব্যছিল প্রবীণ সাহিত্যিক সদানন্দ চিরহাসিমুখ অতিমিষ্টভাষী কেদারনাথ মজুমদারের সহিত দেখা করা। ৩া০টায় ময়মনসিংহ পৌঁছিলাম, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া প্রথমেই কেদারবাবুর নিকট গেলাম। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এবং মদীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর সহিতও কেদারবাবুর বাসায়ই দেখা হইল। কেদারবাবুর এক কন্যার তখন গুরুতর অসুখ, নিজেও বাতে কষ্ট পাইতে'ছলেন—কিন্তু মুখের প্রসন্নতাটুকু যথাস্থানে ঠিক আছে! অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, কত সুখ দুঃখের কথা হইল। আর তাহার কয়েক দিন পরেই কেদারবাবুর অনুজ নরেন বাবুর পত্রে অবগত হইলাম, কেদারবাবু ইহধামে আর নাই,—ময়মনসিংহের সাহিত্যিক আসন কালের এক করাল ফুৎকারে আঁধার হইয়া গিয়াছে! গত বৎসর যথাসময়ে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে পারি নাই, আজ তাই, আবার সৌরভের কেদার স্মৃতি সংখ্যা বাহির হইবে জানিতে পারিয়া বিন্দুমাত্র দেরী করিলাম না,—আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া সৌরভের দরবারে উপস্থিত হইলাম।

কেদারনাথ আমাদের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। ১৯১১—১৯১২ খৃষ্টাব্দে (১৩১৮ সনে) ঢাকায় যখন সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কেদারবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এবং আমাদের তখন হাতে খড়ি মাত্র হইতেছে। মনে আছে সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে কেদারবাবু "ইশা খাঁর কামান" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উহার উদ্বোধন করেন। তখনও আমাদের মত নাবালকের সমালোচনা তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই বরং অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কত উৎসাহ পাইয়াছিলাম, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক সাধনা সমৃদ্ধ করিতে তাঁহার কত উৎসাহ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া চোখে জল আসিতেছে।

কিছুকাল পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারে কেদার বাবুই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সম্মিলন উপলক্ষে ময়মনসিংহ গেলে তিনি যে কি রকম আশ্চর্য্য আন্তরিকতার সহিত আমাদের মত অখ্যাত সদ্য অতিক্রান্ত শৈশব সাহিত্যিক গণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিনই ভুলিবার নহে। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিলেই, তিনি যে বহুদিন ধরিয়া লিখিতেছেন আর আমরা মোটে কলম ধরিতে শিখিয়াছি, তাহা একেবারে তিনি ভুলাইয়া দিতেন।

কেদার বাবুর সহিত পরবর্ত্তীকালে অনেক মিশিয়াছি অনেকদিন অনেক উপদেশ তাঁহার নিকট পাইয়াছি—সাহিত্যিকগণের মধ্যে এমন অক্রোধ পরমানন্দ পুরুষ খুব অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার "ময়মনসিংহের ইতিহাস" এবং "ময়মনসিংহের বিবরণ" ময়মনসিংহবাসীর পরম আদরের জিনিস। তাঁহার সারস্বতকুঞ্জ ছোট্টর উপর বঙ্গসাহিত্যের বেশ একটী ধারাবাহিক বিবরণ। গল্পও তাঁহার হাতে জমিয়াছে মন্দ নয়। কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস। কি করিয়া যে তিনি ময়মনসিংহের মফঃস্বলসহরে বসিয়া এমন একটা কাজে হাত দিতে সাহস করিলেন এবং কেমনে যে তিনি এমন দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন, বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে তাহা এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার!

আমাকে তিনি দুইটী অমূল্য প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। একটী দনুজমর্দ্দনের অতি দুর্লভ ১৩৪০

শকের মুদ্রা। অপরটি কুচবিহারের আদি রাজা এক সময়ে পূর্ব্ব ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট শ্রীমন্নরনারায়ণের ১৪৯৭ শকের মুদ্রা।

আমরা চিরদিন বাঁচিতে কেহই আসি নাই। কিন্তু এমন অসমাপ্ত সাহিত্য সাধনা একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধকের অকালে তিরোভাব যেন বিধাতার ঘোরতর অন্যায় জুলুম বলিয়া অন্তরে একটা অনির্ব্বাণ দাহ জাগাইয়া রাখে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

গুরু বরণ।

সোণার মানুষ কেদারনাথ—
বাঙ্গালাদেশের হীরা,—
কীর্ত্তি সৌরভ 'সৌরভে' যার
রাখল জগৎ ঘি'রা।
'হোটেলবাস ঐ প্রথম যেদিন
কলম দিলেন ছুঁয়ে,—
সেদিন থেকেই ঐ চরণে
পড়্‌ল মাথা নু'য়ে।
বিন্দু আমি, সিন্ধুর কাছে—
ছোট্ট আমার জেদ
ভাব জোটে না, সাধ মিটে না
কি দে' কর্‌ব খেদ্।
সাহিত্যিকের গুরুঠাকুর
বরণ কর্ব্বে কে
সকল নহে যোগ্য তাহার
চরণ ধর্‌বে যে।
অমরধামে, অমর আত্মা
অমর হয়ে থাক্,
ময়মনসিংহে তোমার লক্ষ্যে
ছুটবে সিংহ লাখ
হাত বাড়ীয়ে আগের মতই
আশিস্ করো দান,
জন্মে জন্মে তোমার কাছে
বিকায় যেন প্রাণ।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কেদারনাথের বৈশিষ্ট্য

আজ স্বর্গীয় কেদারনাথের শ্রাদ্ধ বাসর। আজ আমরা এখানে তাঁহার স্মৃতির আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছি। কেদারনাথ বাঙ্গলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহের সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে কেদারনাথের সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অতি প্রাচীনকালেই ময়মনসিংহ জেলায় সাহিত্য চর্চ্চার সূচনা হইয়াছিল। কত স্বভাব কবি এই জেলার পল্লীতে পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পাতায় ঢাকা বন-ফুলের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ের সৌরভ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন! পশ্চিম-বঙ্গে যখন কীর্ত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ব ময়মনসিংহে নারায়ণ দেব পদ্মপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবাসের ন্যায় নারায়ণ দেবের যশ-সৌরভ সমগ্র বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইয়াছিল। তারপর আরও কত কবি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে সম্পদশালিনী করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য সম্পদে ময়মনসিংহ জেলা অপর কোন জেলা অপেক্ষা হীন নহে।

কেদারনাথের সাহিত্য জীবন আলোচনা সম্পর্কে এ জেলার আধুনিক সাহিত্যের ক্রম বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক হইবে। প্রাচীন সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সেকালে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচারকল্পে প্রাচীন যুগে অনেক পুঁথি প্রণীত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের সাহিত্যকে বিশেষভাবে লৌকিক সাহিত্য বলা যাইতে পারে। একমাত্র ধর্ম্ম প্রচারই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞান প্রচার ও লোক শিক্ষা বিস্তারই আধুনিক সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভুগোল, খগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে এই জেলায় আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরপুরের সুবিখ্যাত জমিদার বাণীর একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে এই জেলার আধুনিক সাহিত্যযুগের প্রবর্ত্তক বলিলে বোধ হয়

অত্যুক্তি হইবে না। এই নিষ্কাম সাধক এই জেলায় সাহিত্যের চর্চা ও জাতীয়তার বিকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ম্মযোগী সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে হরচন্দ্রবাবু তাৎকালীন কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, পুরাতত্ত্ববিৎ মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ ব্লকম্যান্, ডাক্তার রামদাস সেন, সাহিত্যিক প্যারীচরণ

৺হরচন্দ্র চৌধুরী।

সরকার, বিদ্যোৎসাহী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সুবিখ্যাত Asiatic Societyর সভ্য স্বরূপে বহু জ্ঞানী লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। এই সৌহার্দ্দের ফলেই হরচন্দ্রবাবুর হৃদয়ে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমও মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি কলিকাতার বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহচর্য্যে যে অনুপ্রেরণালাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবেই ময়মনসিংহের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হরচন্দ্রবাবু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যানুশীলনের জন্য সেরপুর সহরে বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময়েই সেরপুর হইতে বিদ্যোন্নতিসাধিনী পত্রিকা প্রকাশিত করেন। আধুনিক সময়ে এই জেলায় ইহাই সাহিত্য চর্চ্চার প্রথম উদ্যম। ১৮৬৬ খৃঃ হরচন্দ্রবাবু সেরপুর সহরে British Indian Association প্রতিষ্ঠা করিয়া জনহিতকর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮১ খৃঃ তিনি সেরপুরে চারুযন্ত্র স্থাপিত করেন। সেই যন্ত্র হইতে চারুবার্ত্তা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বীয় পুত্র চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নামানুসারে তিনি মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রিকার নামাকরণ

৺যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিয়াছিলেন। মহাত্মা টডের রাজস্থানের সুবিখ্যাত অনুবাদক স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় চারুবার্ত্তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া সেরপুরে আগমন করিয়াছিলেন। চারুবার্ত্তায় আধুনিক সংবাদ পত্রিকার ন্যায় জনসাধারণের কেবল অভাব অভিযোগের কথাই মুদ্রিত হইত না। তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইত। সুতরাং চারুবার্ত্তা বর্ত্তমান সময়ের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাব পূরণ করিত। যজ্ঞেশ্বরবাবুর পর যথাক্রমে বাবু চৈতন্যচরণ বসু বি, এল, কবি-কাহিনীর কবি দীনেশচন্দ্র বসু, ঔপন্যাসিক অমরচন্দ্র দত্ত চারুবার্ত্তার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

চারুবার্ত্তা এই জেলায় এক নূতনযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পত্রিকার প্রভাবে তৎকালে এই জেলায় বহু সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

১৮৭৪ সনে ময়মনসিংহ সহরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় "বাঙ্গালী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ১৮৭৫ সনে স্বর্গীয় বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয় এই সহরে ভারতমিহির যন্ত্র স্থাপন করেন এবং তাহা হইতে সাপ্তাহিক ভারতমিহির পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ময়মনসিংহ সহরে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল।

হেলেনা কাব্য প্রভৃতির কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, মানস বিকাশ ও কবি কাহিনীর কবি দীনেশচরণ বসু, প্রেম ও ফুল প্রভৃতির কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঔপন্যাসিক অমরচন্দ্র দত্ত,

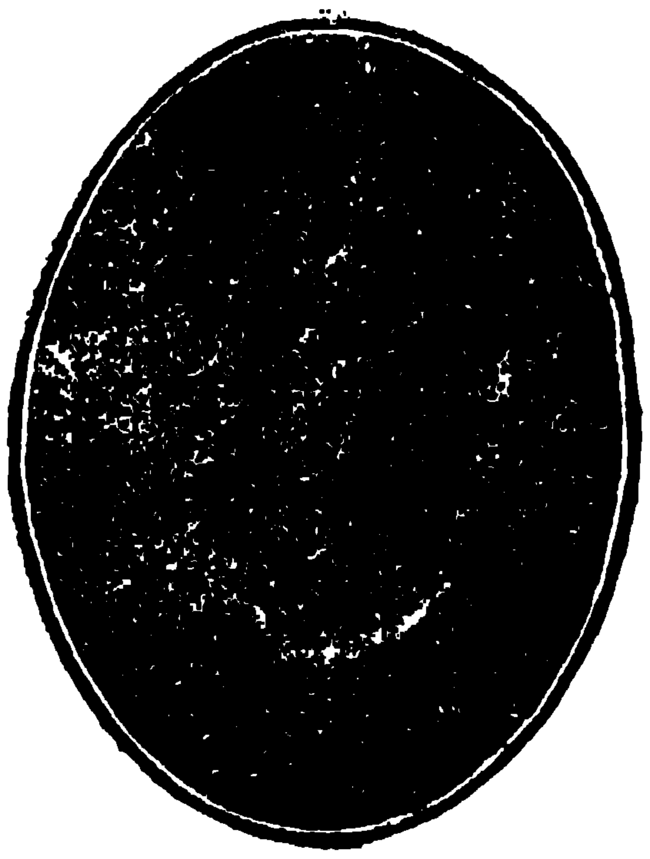

কবিবর দীনেশচরণ বসু।

সুলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইঁহারা সকলেই এই সহরে শিক্ষকতা করিতেন। ঐতিহাসিক ৺কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, ঔপন্যাসিক দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, সুলেখক ব্রজনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, জানকীনাথ ঘটক, শ্রীকণ্ঠ সেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ইঁহারাও একই সময়ে এই সহরে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। এতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র সেকালে ময়মনসিংহের সাহিত্যাকাশে আলোক বিতরণ করিতেছিল। এতগুলি সাহিত্যিক ও কর্ম্মীর আবির্ভাবে তৎকালে এ জেলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নবজাগরণের প্রবল উন্মাদনা আসিয়াছিল। কেবল সাহিত্য চর্চ্চায়ই ইঁহাদের কর্ম্মশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে তৎকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কেদারনাথ এই সহরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সাহিত্যানুরাগী শিক্ষকদিগের প্রভাবে বাল্যকালেই মাতৃভাষার সেবা করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ

৺জানকীনাথ ঘটক।

করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া তিনি জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে অপরাপর নবীন সাহিত্য সেবকের ন্যায় কেদারনাথও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই ক্ষেত্রে সময়ের অপব্যয় করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। অতঃপর তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক দুর্লভ ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট Imperial Gazetteerএর একটী নূতন সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস লিখিবার ভার শ্রেলা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস (এখন রায় বাহাদুর) মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। কেদারবাবু এই কার্য্যে রমণীবাবুকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। Imperial Gazetteerর জন্য এই জেলার অনেক পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। কেদারবাবু ঐ সকল উপাদান লইয়া এবং নিজেও অনেক

৺কালীনারায়ণ সান্যাল।

তথ্য সংগ্রহ করিয়া ময়মনসিংহের একখানি ইতিহাস লিখিতে ব্রতী হন।

ইহার কিছুকাল পরে ১৩০৭ সালে কতিপয় সাহিত্যিকের চেষ্টায় ও যত্নে এই সহর হইতে "আরতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আরতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কেদারবাবু বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইহার পরিচালন বিষয়েও তিনি যত্নশীল ছিলেন। এই সময় হইতে তিনি একনিষ্ঠভাবে বিশ বৎসর কাল সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলই অবসর গ্রহণ করিয়া বাণীর মন্দির হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। কেবল শ্রদ্ধাস্পদ অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া বাণীর সেবায় নিরত ছিলেন। শেষ জীবনেই অমরবাবু "লহরী" "অরূপা" "হরিবল্লভের স্নেহ" প্রভৃতি উপন্যাস সকল রচনা করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর কাল কেদারবাবুই অতিশয় নিষ্ঠার সহিত বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনার ফলস্বরূপ আমরা "ময়মনসিংহের ইতিহাস", ময়মনসিংহের বিবরণ" "সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" "সারস্বত কুঞ্জ" "স্রোতের ফুল", "শুভদৃষ্টি" "সমস্যা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাপ্ত

৺আনন্দচন্দ্র মিত্র।

হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেদারবাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় ১৫ বৎসর তিনি উৎকট ব্যাধিতে পীড়িত ছিলেন। এইরূপ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি এত গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার অসামান্য শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক হিসাবে কেদারবাবুর বিশেষত্ব আছে। তিনি কেবল নিজে গ্রন্থ রচনা করিয়াই সুখী হন নাই। নূতন লেখক প্রস্তুত করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "সৌরভ" পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই জেলায় কোন নূতন লেখকের সংবাদ পাইলেই তিনি

তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইয়াছেন। তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার প্রবন্ধাদি সংশোধন করিয়া সৌরভে মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেককেই তিনি লিখিবার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক ধার দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সৌরভে তিনি নিজের প্রবন্ধ অপেক্ষা অন্যের প্রবন্ধই বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় লেখকের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া সৌরভে মুদ্রিত করিতে তিনি একবারেই রাজি ছিলেন না। তাঁহার সাহিত্যের আসরে নূতন লেখকের আবির্ভাব হইলে তিনি পরমানন্দিত হইয়াছেন। কলিকাতার বাহিরে বোধ হয় এখন সৌরভ ছাড়া অন্য কোন মাসিক পত্রিকা বর্ত্তমান নাই। কেদারনাথ বহু টাকা ব্যয় করিয়া সৌরভের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন। ময়মনসিংহবাসীদিগের সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া ১৩ বৎসর সৌরভ পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাই কেদারনাথের সাহিত্য সেবার বিশিষ্টতা।

কেদারনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে ৪ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া "রামায়ণের সমাজ" নামক একটী গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় তিনি তাহা প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"রামায়ণের সমাজ" প্রকাশিত হইলে তিনি সূত্রযুগের একখানি ইতিহাস লিখিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখক কেদারবাবুকে বলিয়াছিলেন,—"গত বিশ বৎসরের মধ্যে ময়মনসিংহের ইতিহাসের অনেক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে আপনি ময়মনসিংহের ইতিহাসের একটী পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত করুন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"সূত্রযুগের একখানি ইতিহাস লেখা আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা। আর কিছু করিবার সময় নাই. প্রবৃত্তিও নাই।" তিনি প্রস্তাবককেই ময়মনসিংহের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে বলিলেন এবং এই কার্য্যে তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। হঠাৎ কালরোগে পরলোক গমন করায় তাঁহার আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল।

কেদারনাথের কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরব্ধ ব্রত উদ্যাপনের দায়িত্ব এখন তাঁহার দেশবাসীর উপর পতিত হইয়াছে। তিনি যে সাহিত্যের আসর সাজাইয়া গিয়াছেন তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা পরবর্ত্তী সাহিত্য সেবকদিগের কর্ত্তব্য। আজ স্মৃতিবাসরে এই কথাটাই বিশেষভাবে আমার মনে উদয় হইতেছে। কেদারনাথের পরলোকগত আত্মা আজ আপনাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আপনারা কি তাঁহাকে নিরাশ করিবেন? আপনারা সকলে বাণীর মন্দিরে সমবেত হইয়া নবোৎসাহে সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। ময়মনসিংহের সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা যেন আপনাদের সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয়। আপনারা যেন শৈথিল্য করিয়া ময়মনসিংহের গৌরব বিলুপ্ত না করেন। আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল যেন আপনাদের ত্রুটীতে বিনষ্ট না হয়। এই শ্রাদ্ধবাসরে বাণীর সেবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যেন আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভগবান্ আপনাদের সহায় হউন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

কেদার-মণ্ডলী।

কেদারনাথ শৈশবে শিক্ষালাভের জন্য ময়মনসিংহ আগমন করেন। তখন ময়মনসিংহে আনন্দ উৎসবের বন্যা বহিতেছিল। চারিদিকে স্থানীয় জমিদারগণের ধর্ম্মপ্রাণতায় বিবিধ সৎকার্য্য কলরোলে সম্পাদিত হইতেছিল। অপরদিকে একদল সাহিত্যরস পিপাসু ব্যক্তি ময়মনসিংহে সারস্বত উৎসবের সৃষ্টি করিলেন,—কেদারনাথ সেই উৎসবে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া আত্ম নিবেদন করিয়া ফেলিলেন। অকপট ভক্তের সেই দান অত্যন্ত গোপন হইলেও সর্ব্বান্তর্য্যামিণী দেবী তাহা সস্নেহে গ্রহণ করিয়া—কেদারনাথকে সকলের অলক্ষ্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই সময় ময়মনসিংহে সাহিত্য কুঞ্জ বড় সাধারণ ছিল না। ভারতমিহির মুদ্রাযন্ত্র লইয়া ৺কালীনারায়ণ সান্যাল "ভারতমিহির" সম্পাদন করিতেছিলেন। বাবু জানকীনাথ ঘটক, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ প্রবল আগ্রহে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে লাগিলেন। সেরপুর হইতে অক্লান্তকর্ম্মী বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী

সাহিত্যের দুন্দুভিধ্বনিতে বাঙ্গালা দেশে আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন, সুকবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের "ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবাবালা" গান উঠিল,—এই আনন্দ উৎসবে বাণীপূজার মাঝে কেদারনাথ ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চ্চায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি প্রকাশ হইতে লাগিল। দেবনিবাস হইতে বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী "গায়ত্রী" ও "অহল্যা" প্রকাশ করিলেন, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ব্রজনাথ বিশ্বাস, প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহিত্য সেবা সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিতে লাগিল।

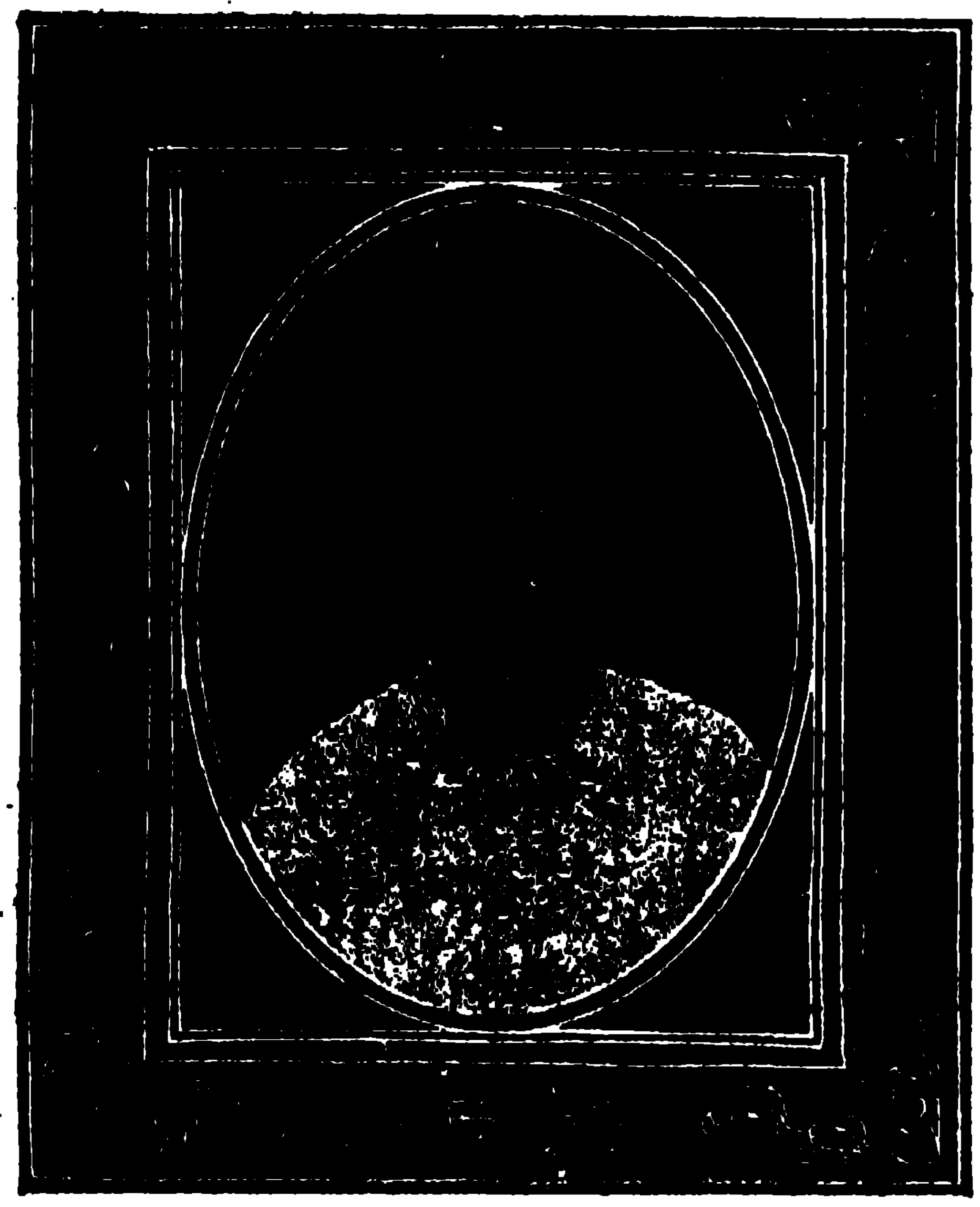

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কেদার মুরারী চৌধুরী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া "কুমার" প্রচারে হস্তক্ষেপ করিলেন।

"কুমার" শৈশবে মরিয়া গেল, কেদার বঙ্গের বিভিন্ন মাসিকপত্রে ও সংবাদপত্রে লিখিতে লাগিলেন।

১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে "আরতি"র শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেদিন পুণ্যবতী ভারতেশ্বরীর জন্মদিন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পৌরিহিত্যে ব্রতী হইলেন। কেদারনাথ, কবি মনোমোহন, রজনীকান্ত চৌধুরী, উপেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রভৃতি ফুল চন্দন আহরণে ব্যাপৃত হইলেন। ধূপধূনার গন্ধে সাড়া দিলেন কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, দুর্গাদাস রায়, রসিকচন্দ্র বসু, রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীনিবাস বন্দোপাধ্যায়, চন্দ্রকিশোর তরফদার, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মহীন্দ্রমোহন চন্দ, মানকুমারী বসু, চন্দ্রশেখর কর, জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রথম বৎসর ইঁহাদিগকে লইয়া আরতি চলিল। পর বৎসর ইঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন—অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দুর্গাদাস ঠাকুর, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, মহেশচন্দ্র সেন, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, কবি রমণীমোহন ঘোষ বি-এল, (অধুনা রায়বাহাদুর) অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, (অধুনা রায় বাহাদুর) চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ প্রভৃতি; সারদাচরণ ঘোষ রায় বাহাদুর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

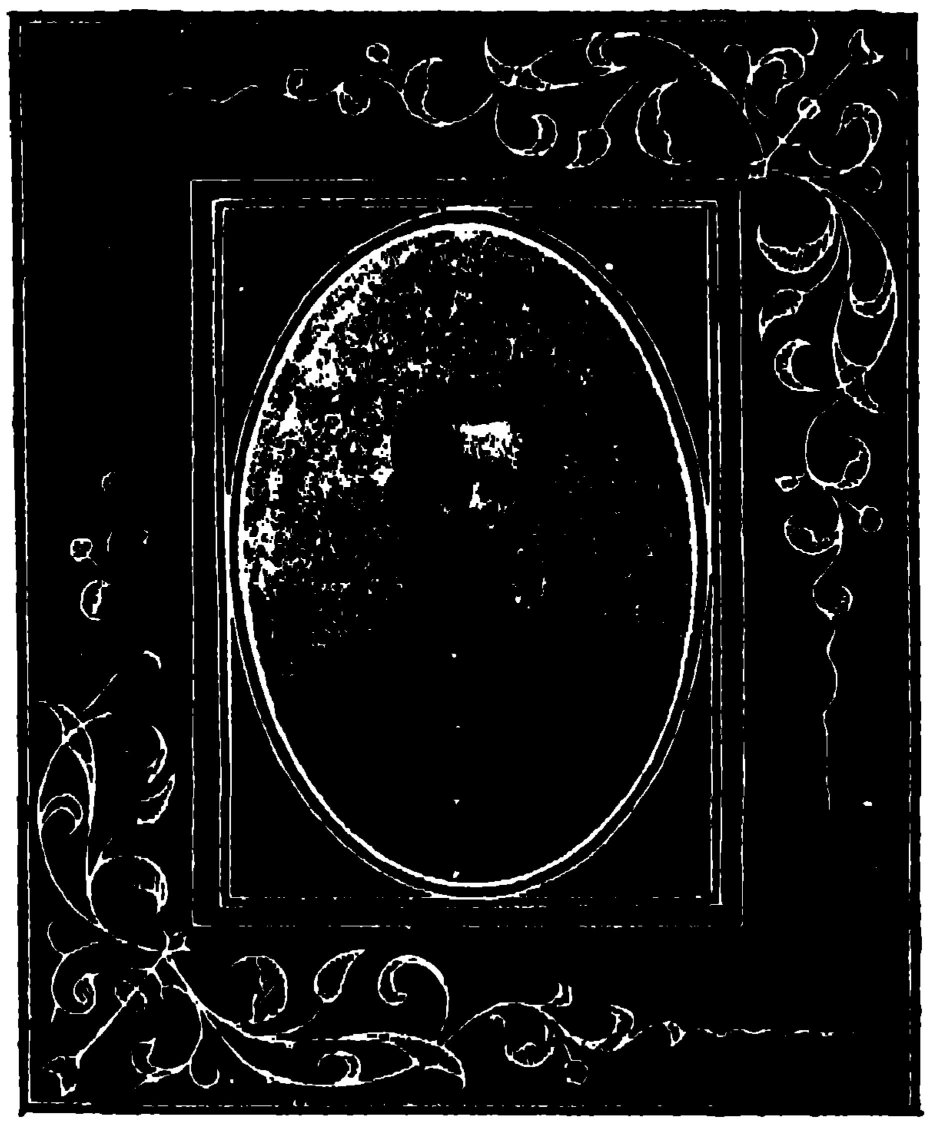

৺রজনীকান্ত চৌধুরী।

এই সময় রমণীমোহন দাস এখানে বদলী হইয়া আসিলেন। কেদারনাথ তখন কালেক্টরীর দপ্তরে আবদ্ধ। রমণীমোহন তাঁহাকে টানিয়া লইলেন। কেদারনাথ তাঁহাকে সভাপতি করিয়া ১৩০৮ সনের ১লা মাঘ এক সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সাহিত্য সভার নিবেদনে বলা হইয়াছিল—"আরতি ধনীর ভূমিতে জন্মিয়া থাকিলেও এতদিন দরিদ্রের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল সেই জন্ত আরতি এত মলিনা, এত নিরাভরণা। আরতির দরিদ্র অভিভাবকগণ তাঁহাদের প্রাণপণ যত্নেও আরতিকে দীর্ঘজীবি করিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় যাহাতে আরতি দীর্ঘ-জীবনী হইয়া

জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা "আরতির" সমূহভার "ময়মনসিংহ সাহিত্য সভায় সমর্পণ করিয়াছেন। সাহিত্য সভাও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।" এই সভার অধীনে আরতি চলিতে লাগিল। ঐতিহাসিক বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত প্রথম আরতিতেই প্রকাশিত হয়। তখন কেদারনাথের "ময়মনসিংহের বিবরণ" ও "ইতিহাস" "চিত্র" প্রভৃতি বাহির হওয়ায় তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর নিকট সমাদর-লাভ করিয়াছে।

এই সময় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় রামপ্রাণ গুপ্তের মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুর বিবিধ গবেষণা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল, ঔপন্যাসিক অমরচন্দ্রের লেখনী তখন উপন্যাস প্রকাশে ব্যাপৃত; কবিবর গোবিন্দচন্দ্রের দেশাত্মবোধক জ্বালাময়ী কবিতায় নব্যভারতের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল তখন কেদারনাথের মনে একটী সাহিত্যিক মণ্ডলী গঠনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। প্রাগুক্ত কৃতিকর্ম্মা সাহিত্যিকগণের পরেও যাহাতে ময়মনসিংহের সাহিত্যিক প্রবাহ অনবরত চলিতে থাকে তজ্জন্য আমরণ তাহার একটা আকাঙ্ক্ষা ও তদনুযায়ী হাতে ধরিয়া লেখক প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই কেদারনাথের বিশেষত্ব।

১৩১৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে "ইষ্টবেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীতে" ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পর সুরসিক পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয় আসিয়া কেদারনাথের সহিত যোগদান করিলেন—তাহার ফলে ময়মনসিংহে বিরাট "সাহিত্য সম্মিলন"। সম্মিলনের বিরাট সাফল্যের ধারায় ময়মনসিংহের সাহিত্য চর্চ্চা একটু অবসাদ গ্রস্থ হইল। কেদারনাথ ঢাকায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ ময়মনসিংহে এক সাহিত্য সমাজ গঠনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইল—তিনি ঢাকায় থাকিতে পারিলেন না। কেদারনাথ স্বপ্ন দেখিলেন "ময়মনসিংহে এক বিরাট সাহিত্য সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে এই জেলার সাহিত্যিক লইয়া "সৌরভ" সঙ্ঘ গঠিত হইল। "সৌরভ" ময়মনসিংহের লেখক লইয়াই পরিচালিত হইল। ইহা ময়মনসিংহের গৌরব।

কেদারনাথের সাহিত্য সাধনার সৌরভ যখন বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে ছুটিতে লাগিল তখন ময়মনসিংহের প্রাচীন ও নবীন বাণী সেবকের দল আসিয়া সৌরভে সমবেত হইলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অমরচন্দ্র দত্ত, কালীকৃষ্ণ ঘোষ, অক্ষয়কুমার মজুমদার, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, রসিকচন্দ্র বসু, কবিরাজ গিরিশচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, ৺কবি মনোমোহন, মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক ৺তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

৺অমরচন্দ্র দত্ত।

সেন, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হরিচরণ গুপ্ত, উমেশচন্দ্র চাকলাদার, (অধুনা রায় সাহেব), যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ, অবিনাশচন্দ্র রায়, বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, জ্যোতিষসিদ্ধান্ত, চন্দ্রকুমার দে, সুধীরকুমার চৌধুরী, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, কবি বিজয়াকান্ত, কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, রাজা জিতেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রাজা অরুণচন্দ্র সিংহ, মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়

স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার ও ময়মনসিংহের সাহিত্যিকগণ।

পশ্চাতে—শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

মধ্যে—শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ, কবিবর ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, ৺মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ৺অমরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সোম ও ৺কালীকৃষ্ণ ঘোষ।

সম্মুখে—৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্রকিশোর সেন, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ, সুরসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত, কুমুদচন্দ্র, তারকচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, যামিনীকুমার, গৌরচন্দ্র, অমৃতলাল, সুরেশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই অকৃতি লেখক কেদার মণ্ডলীতে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে ধ্রুবতারা প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন সিংহ, প্রহেলিকা প্রণেতা বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত, রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রকুমার কর প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীগণও কেদার মণ্ডলীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

কেদারনাথের ইচ্ছা ছিল প্রত্যেক ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংস্রবে এক একটী ছোট খাট সাহিত্যিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা যে কিছুমাত্র ফলদায়িনী হয় নাই এমন নহে!

আজ কেদারনাথ নাই তাঁহার মণ্ডলী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। মাথা নাই—দেহ অসার—নির্জ্জীব। আমার সকল চাইতে বাড়া দুঃখ কেদারনাথের স্মৃতি তাঁহার "সৌরভ" বাঁচাইবার কৃতজ্ঞতাটুকু পর্য্যন্ত এ জেলার লোক গ্রহণ করিতে চাহি না। মফস্বল হইতে আদর্শ যোগাইয়া আজ চৌদ্দ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে যে মাসিক পত্র, দুই টাকা মূল্য দিয়া তাহাকে রক্ষা করার মানুষও এ জেলায় বড় বেশী জোটে না! আর এক দুঃখ কেদারনাথের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় তাঁহার লাইব্রেরীর জন্য। সারাজীবন বুকের রক্ত নিংড়াইয়া যে সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞান অর্জ্জনের যে পন্থা রাখিয়া গিয়াছেন, কোন নবীন জ্ঞানপিপাসুকে সেই পথে পদার্পণ করিতে দেখি না! নরেন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক দাদার ভাই। গুরুর দীক্ষা প্রাপ্ত শিষ্য। পরিশ্রমের দ্বারা লব্ধ গুরুদত্ত সম্পত্তি যদি যথার্থই ওয়ারিশের মত ভোগ করিতে পারেন,—তবেই কেদারনাথের সাহিত্যকুঞ্জ সারস্বতগণের কলধ্বনিতে মুখরিত হইবে। আমরা আশায় উৎফুল্ল হইয়া রহিলাম—কেদার মণ্ডলী ততদিনই জীবিত রহিবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতি পূজা।

স্বর্গীয় কেদারনাথের স্মৃতি পূজার দিবসে আজ বহু প্রাচীন স্মৃতি মানসপটে উদিত হইয়া চিত্তকে উদ্বেলিত করিতেছে। নিরহঙ্কার, পরহিতব্রত, সদাহাস্যময় কেদারনাথের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাহাদের ঘটিয়াছিল, তাহারাই সেই বিরাট পুরুষের বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বনস্পতির জন্ম হয়। কেদারনাথ ও নিতান্ত দীনভাবে আড়ম্বরহীন জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। দরিদ্রের সন্তান কেদারনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সুযোগলাভ করেন নাই, উদরান্ন সংস্থানের জন্য স্থানীয় কালেক্টরীতে নিম্নতম চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত শ্রম ও কর্ম্মকুশলতায় যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেশের লোকের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

আজ যে স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি বালক কেদারনাথ এই স্থানেই মাতুলালয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, কিশোর কেদারনাথের চিত্তে এই স্থানেই সাহিত্য চর্চ্চার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এই দুর্গাবাড়ীর মণ্ডপের অন্তর্গত এক নিভৃত কক্ষে এক ক্ষুদ্র পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া যুবক কেদারনাথ

অতি দীনভাবে স্বীয় সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুজনকে সাহিত্য চর্চ্চায় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে বহু সম্মান অর্জ্জন করিয়া বিগত বৎসর ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি এই স্থানেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই স্থানের প্রচুর বিশেষত্ব রহিয়াছে।

ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও পল্লী বিবরণ প্রকাশ করিয়া কেদারনাথই জগৎ সভায় মাতৃভূমিকে শ্রেষ্ঠ আসনে আরূঢ় করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "আরতি" ও "সৌরভ" পত্রিকায় এ জেলার বহু নূতন লেখকের প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা কেদারবাবুর এক সঙ্কল্প ছিল। সেই সঙ্কল্প সাধন করিতে গিয়া এ জেলার বহু অজ্ঞাত ও অখ্যাত লেখককে অবশেষে সাহিত্যসেবী নামে তিনিই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। "মৈমনসিংহ গীতিকার" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে কেদারবাবুর উৎসাহ, সহানুভূতি ও আনুকূল্য না পাইলে আজ বঙ্গ সাহিত্যের আসরে এতটা প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না।

অল্প বয়সেই কেদারবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নানা ব্যাধিতে ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াও একদিনের জন্যও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন নাই। পাঠ গৃহে সর্ব্বদাই তাঁহাকে গ্রন্থরাজির ভিতর নিমজ্জিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দেবী বীণাপাণির দীনতম সেবকরূপে ময়মনসিংহ নগরের ক্ষুদ্র ও নিভৃত গৃহে জীবন কাটাইয়া যাইবেন, কেদারবাবুর ইহাই প্রথম জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু বনান্তরালে প্রস্ফুটিত পুষ্প যেরূপ সুগন্ধ বিস্তার করিয়া দূরবর্ত্তী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেদারবাবুর লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠে তদ্রূপ বিভিন্ন স্থানীয় গুণীজন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিচারপতি স্যর গুরুদাস, স্যর জগদীশচন্দ্র, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র, সারদাচরণ, স্যর আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনস্বী রমেশচন্দ্র কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যশস্বী পণ্ডিতমণ্ডলী, সুসঙ্গ, কাশিম বাজার, মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, কালীপুর, সন্তোষ, করটীয়া, সেরপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারীবৃন্দ দীনদরিদ্র কেদারনাথের ঐতিহাসিক গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর সম্মান করিতেন। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল।

কেদারনাথের আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন ময়মনসিংহ নগরে সম্পন্ন হয়। এই বিরাট সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদকরূপে কেদারবাবু সে সময়ে যে অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহার কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল। দুই শতাধিক লোক বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এ অধিবেশনে প্রতিনিধিস্বরূপ আগমন করিয়াছিলেন, সভামণ্ডপে ছয় সহস্রেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। এই বিরাট সম্মিলনের আয়োজন ও অধিবেশনের সফলতা বহুলাংশে পীড়াগ্রস্ত শীর্ণকায় কেদারনাথের উপর নির্ভর করিয়াছিল।

কেদারবাবুর ময়মনসিংহের বাসভবনকে ময়মনসিংহ শাখা সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয় Research House নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কেদারবাবুর পাঠ গৃহখানি যেন সরস্বতীর লীলা নিকেতন স্বরূপ ছিল। প্রতিদিন বহু সাহিত্যসেবী তথায় মিলিত হইতেন। আজ কেদারনাথের অভাবে তাঁহারা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কেদারনাথের অশরীরী আত্মা স্বর্গ হইতে ময়মনসিংহের সাহিত্যিকগণকে অনুপ্রেরণা দান করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

কেদার তর্পণ

মহৎ লোকের জীবনী আলোচনায়—শুধু যে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা নয়; তাঁহাদের চরিত্র কথা আলোচনায় আমরাই লাভবান হই বেশী। একজন বিখ্যাত মনীষী লিখিয়াছেন—"মহৎ লোককে জন্ম দিতে জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিকে আরও উচ্চ করিয়া তোলেন।" আর এই মহত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন যে—দেহরাজ্যের জীবন দ্বারা কাহারও মহত্ত্ব

উপলব্ধি হয় না। কাহার কয়খানা প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা আছে, বা কে সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য এক একখানা মোটর গাড়ী ক্রয় করিয়াছেন বা ব্যাঙ্কে কাহার কত লক্ষ টাকা মজুত আছে—ইহা দ্বারা কাহারও মহত্ব উপলব্ধি হয় না। মহত্বের জীবন মনন-রাজ্যে আবদ্ধ। আর সে জীবন গগন সঞ্চারী বায়ু স্রোতের ন্যায় স্বাধীন। সুতরাং মানুষের চিন্তারাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

বাহিরের জীবন নিয়া বিচার করিলে আমাদের কেদারনাথের বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। অপরিচিত কেহ দেখিলে তাঁহাকে নেহাৎ দীনহীন অকিঞ্চন বলিয়াই মনে করিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাঁহাকে বাহিরের ঘরে তপস্বীর মত সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত দেখিয়াছি, শীতে, গ্রীষ্মে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, তাঁহাকে তাঁহার আসনে আসীন দেখিয়াছি, এক জোড়া ভাল জুতা, বা একটী ভাল জামা বা একখানা দামী কাপড় তাঁহাকে একদিনের জন্যও ব্যবহার করিতে দেখিলাম না। অথচ সে লোক মায়ের নামে স্কুল করিতে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন শত শত টাকার মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন। মাত্র এই একটা কথা দ্বারাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব বুঝা যায়। কেদারনাথকে "সাহিত্য-সেবী" না বলিয়া যিনি তাঁহাকে "সাহিত্য সন্ন্যাসী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি এক কথায় কেদারনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত ভাবটীকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই বিদ্যার মাপকাঠি হইয়া থাকে তবে আমাদের কেদারনাথ মহামূর্খ ছিলেন বলিতে হইবে—কেননা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা দ্বারও কখন উদ্ঘাটন করেন নাই। কিন্তু কেদারনাথের রচনাবলী পাঠ করিলে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেকটী রচনা পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিপূর্ণ। তাঁহার রচিত "বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যে" প্রতি পৃষ্ঠায় রত্নরাজি ছড়ান রয়েছে, তাঁহার "রামায়ণের সমাজের" প্রত্যেক লাইন এক একটী কোহিনুর। তা ছাড়া তাঁহার গল্প উপন্যাস ও তাঁহার অসাধারণ ধী ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁহার স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাদিও অতুলনীয়, ঐ বিষয়ে তাঁহাকে প্রথম পথ প্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যালয়ে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সময় গ্রন্থের উপর কেদারনাথের নাম মুদ্রিত থাকাই যথেষ্ট—গ্রন্থ খুলিয়া পাঠ করিয়া তাঁহার পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হয় না। তাঁহার মানচিত্র ও এট্‌লাস্ সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত।

এই সমস্ত জ্ঞান পাণ্ডিত্য গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিতে যে বিদ্যার প্রয়োজন তাহা তিনি বিদ্যালয়ে পড়িয়া লাভ করেন নাই, কলেজের নোট্ মুখস্থ করিয়া বদ্‌হজমি জিনিষ আয়ত্ত করেন নাই, গৃহ শিক্ষক রাখিয়া অধ্যয়ন করেন নাই বিদেশে যাইয়া বিদ্যার চালান বস্তাবন্দী করিয়া আনেন নাই এমন কি কলিকাতার একটী বড় লাইব্রেরীর সুযোগও তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইংরেজীতে যাহাকে বলে Self-made man কেদারনাথ অক্ষরে অক্ষরে তাহাই। আত্ম চেষ্টার বারি সিঞ্চনে তাঁহার জ্ঞানাঙ্কুর প্ররোহিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পল্লবিত এবং মহাশাখা প্রশাখায় মহামহীরুহে পরিণত। এ বিষয়ে কেদারনাথ যে কিরূপ প্রশংসার যোগ্য কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্র তাঁহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে ইহা একটু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নয়ন পল্লব মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত।

ঠিকই বলা হইয়াছে কেদারনাথ সাহিত্য সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা নাম যশের প্রত্যাশী নহে তাই কেদারনাথ মফস্বলের একটী ক্ষুদ্র সহরে বাস করিয়া বন্য কুসুমের মত প্রস্ফুটিত হইয়া অন্যের অজ্ঞাতে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা একদিন একখানা ইংরেজী সাহিত্য নিয়া কেদারবাবুর নিকট আলোচনার জন্য গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া। তাঁহার নামের শেষে তখন এম, আর, এ, এস্ লেখা থাকিত। সুতরাং তাঁহাকে একটী খুব জাকজমকের ভিতরই দেখিতে পাইব ভাবিয়াছিলাম। আফিসে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোন অধীন কর্ম্মচারী ভাবিয়াছিলাম। যখন জানিলাম তিনিই কেদারনাথ তখন হতাশ হইলাম—আরও বেশী হতাশ হইলাম তখন—যখন তিনি বলিলেন যে ঐ সব ইংরেজী সাহিত্য কখনও তিনি গভীরভাবে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু এই হতাশ বেশী দিন স্থায়ী রহিল না। ক্রমশঃই তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। আমি আজ যে সাময়িক সাহিত্যে এক আধটু অনধিকার চর্চ্চা করি তাহা সম্পূর্ণ

কেদারনাথের উৎসাহের ফল। বলিতে গেলে তিনিই হাতে ধরিয়া আমাকে লেখক করিয়াছেন। আমাকে কেন তিনি অনেককে হাতে ধরিয়া লেখক তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা সত্বেও তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। তাঁহার নিজ প্রবন্ধের গবেষণায় সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যায় অনেক সময় আমার সহিত আলোচনা করিতেন কিন্তু তাঁহার নিজ সূক্ষ্মদৃষ্টি-লব্ধ-ব্যাখ্যা অনেক সময়ই উপাদেয় হইত তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। অথচ তিনি সংস্কৃত ভাষা গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। উপনিষদ্‌, ব্রাহ্মণ গৃহসূত্র, সংহিতা প্রভৃতি মন্থন করিয়া তিনি রামায়ণ সমাজ লিখিয়াছেন অথচ দেশে অনেক মহামহোপাধ্যায় রহিয়াছে তাঁহারা ঐ সব তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এই সব সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের চিন্তারাজ্যের ইতিহাসই তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস। কেদারনাথের চিত্ত যে সাহিত্যে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহার মৃত্যু সময়ে যাহারা নিকটে উপস্থিত ছিলেন তাহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

দারুণ রোগের প্রলাপে তিনি বিভীষিকা দেখেন নাই কাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখান নাই পত্নী পুত্রাদির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই, ত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার জন্য আকুল হন নাই—তখন সেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে বেদের ব্রাহ্মণের কথা, গৃহসূত্রের কথা, উপনিষদের কথা, রামায়ণের কথা তিনি আলোচনা করিয়া কি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের কতখানি ছাপা হইল কতখানি প্রুফ দেখা বাকী ইত্যাদি। হঠাৎ অজ্ঞান অবস্থায়ও তিনি তাঁহার ধ্যানের জিনিষ ভুলিতে পারেন নাই। পীড়া হইলেই বলিয়াছেন "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"। সাহিত্য-সন্ন্যাসীর এমন অপরূপ মূর্ত্তি কোথাও দেখা যায় না।

সন্তান বিষয়ে কেদারনাথ ভাগ্যবান্‌ ছিলেন না। বহু সন্তান প্রাপ্ত বয়স হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু কোনও দিন তাঁহাকে শোক করিতে দেখি নাই। সন্তান মুমূর্ষু অথচ তিনি তাঁহার আফিসে নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন গভীরভাবে প্রবন্ধ রচনায় নিমগ্ন।

আজ এই কাঁকিরযুগে কেদারনাথের মহত্ব আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না। কিন্তু—

"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী"

একদিন কেদারনাথ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান নিশ্চয়ই পাইবেন। আমরা যে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ-নিবেদন করার জন্য মিলিত হইয়াছি ইহাতে আমরা গৌরবান্বিত। ভগবান্‌ তাঁহার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। ওঁ শান্তি!

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

বঙ্গবাণী-সম্পাদকের পত্র—

"কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সুলেখক ছিলেন ও ইতিহাসের চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যাঁহারা কলিকাতা সহরে বাস করিয়া ঐ সহরের পদস্থ সাহিত্যিকদের সহিত পরিচিত হন না, শত গুণ থাকিলেও সাহিত্যে তাঁহাদের নাম ও যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ খাঁটি গুণ দেখিয়া এদেশে এখনও সাহিত্যিকের আদর হয় নাই; এটা দেশের দুর্ভাগ্য। কেদারনাথ কৃতী সাহিত্যিক ছিলেন; কলিকাতায় সাহিত্যিকেরা তাঁহার নামে যশের ঢোল না পিটিলেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কীর্ত্তি লুপ্ত হইবার নয়।"

কেদারনাথের গুণমুগ্ধ—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার

কেদারবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সে প্রায় কুড়ি বৎসর আগে। সে সময়ে ময়মনসিংহ হইতে "আরতি" নামে একখানা মাসিক কাগজ বাহির হইত—কাগজখানার সম্পাদক স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন,—কাগজ সম্পর্কিত সমুদয় ব্যাপার প্রবন্ধ বাছাই, গ্রাহক সংগ্রহ করা, এমন কি পত্রিকা পাঠাইবার মোড়কটি বাঁধাই পর্য্যন্ত কেদারবাবু করিতেন। এমনি ছিল ময়মনসিংহে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাঁর অখণ্ড অনুরাগ। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরে—আরও কেহ কেহ ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—স্বর্গীয় কেদারবাবুও কিছুদিন করিয়াছিলেন। এই "আরতি" পত্রেই বিক্রমপুরের ইতিহাসের কয়েকটী অধ্যায় "বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম।

সাহিত্য-সাধনায় বাঙ্গালা দেশে কেদারনাথের ন্যায় কয়জন একনিষ্ঠ সাধক আছেন জানি না। অসুস্থ দেহে নিয়ত ব্যাধি-পীড়ার জ্বালা যন্ত্রণা সহিয়াও তাঁহাকে দেবী বীণাপাণির চরণ তলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে দেখা গিয়াছে। আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে আমি অসুস্থ অবস্থায় লিখিতে কোনরূপ অসোয়াস্তিবোধ করি না।"—ময়মনসিংহ তাঁহার স্বদেশ ও জেলা, ময়মনসিংহকে তিনি অতীব প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ময়মনসিংহের গৌরব-সমৃদ্ধি ময়মনসিংহের অতীত ইতিহাস, ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্পদ সকলই ছিল তাঁহার ধ্যানধারণার সামগ্রী—এই জন্যই "ময়মনসিংহের বিবরণ" ও "ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। কেদারবাবু কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এই ইতিহাসের বই দু'খানা প্রকাশ করেন। সে সময়ে আমাদের দেশে ইতিহাসের প্রতি সাধারণ পাঠক শ্রেণীর কোনও আগ্রহ দেখা যাইত না—এখনও যে খুব বেশী আছে তাহাও মনে হয় না। ময়মনসিংহের বিবরণ ও ময়মনসিংহের ইতিহাস লিখিয়াই কেদারবাবু সাহিত্য সমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার শেষ জীবনে যে দুইটি কাজ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে "রামায়ণের সমাজের" আলোচনা ও বাঙ্গালা "সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" এ দু'খানি তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "রামায়ণের সমাজ" "সৌরভ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল; উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া যাইবার মত সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। এ দু'খানা বহিতেই তাঁহার বিরাট বিপুল পরিশ্রম ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের সমাজ মুদ্রিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

মফঃস্বল হইতে কোনও মাসিকপত্র প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অক্লান্তকর্ম্মী কেদারবাবু—এ বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার "সৌরভ" আজও বাঁচিয়া আছে। ধীরে নীরবে আপনার মনে সংহত হইয়া আপনার কর্ত্তব্যপথে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক আপনার জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহে যে সাহিত্য সম্মেলন বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিল তাহার মূলে ঐ রুগ্ন, জরাগ্রস্ত প্রৌঢ়ের প্রাণের ব্যগ্রব্যাকুল বাসনা ও অক্লান্ত শ্রম যে কতখানি কার্য্য করিয়াছিল তাহাত কাহারো অবিদিত নাই। ভাগলপুরে সাহিত্য সম্মিলন সভায় আমি ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপেও আমি একা তথায় গমন করিয়াছিলাম, সে সকলের মূলেও কেদারবাবুর পুনঃপুনঃ অনুরোধ ও পত্রবিনিময়েই আমাকে ভাগলপুর যাইতে যে অনেকটা আগ্রহান্বিত করিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেও আনন্দ হয়।

ময়মনসিংহের সাহিত্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ঢাকা কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম, এ মহোদয় "ঢাকা রিভিউ এবং সম্মিলন" নামে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত একখানা পত্রিকা প্রচারের উদ্যোগী হইয়াছিলেন—সে সময়ে কেদারবাবু ঢাকা আসিয়া উহার সম্পাদন ও প্রচার কার্য্যে যেরূপ শ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই মনে থাকিবার কথা। এ সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার বহু পত্র বিনিময় হইয়াছিল, তাহার কতক আছে কতক বা হারাইয়া গিয়াছে। ঢাকায় তখন একটা না একটা দলাদলি লাগিয়াই ছিল, ঢাকায় সে সময়ে সাহিত্যিক থাকুক বা না থাকুক—ঢাক বাজাইয়া গোল বাঁধাইবার মত লোকের অভাব ছিল না। তাহার মধ্য দিয়াও এই নির্ব্বিরোধী ভদ্র লোক হাসিমুখে সত্যেন্দ্রবাবুর কাগজখানাকে জগতের দীপ্ত আলোকের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

কেদারবাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজ কোনও সম্মান করেন নাই। ময়মনসিংহের ন্যায় জমিদার প্রধান স্থানের জমিদারেরাও দরিদ্র কেদারের সাহিত্য চর্চ্চায় সহায়ক স্বরূপে অগ্রসর হন নাই তবু কেদারনাথ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া এক লক্ষ্যে চলিয়া আপনার দারিদ্র্যকে দূর করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বৃদ্ধ কেদারনাথকে কোন সাহিত্য সমাজ—কোন সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত করেন নাই—তাহার কারণ অতি সহজ। প্রথমতঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ তিনি ধনী ছিলেন না, তৃতীয়তঃ তিনি বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ছিলেন না—সমাজে রাজকর্ম্মচারী

হিসাবে কি অন্য কোন হিসাবেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল না—বোধহয় ইহাই তাহার প্রধান কারণ। নতুবা বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা একখানা গ্রন্থও রচনা করেন নাই তাঁহারাই বা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন কেন?

কেদারবাবুর ন্যায় অধ্যয়নপ্রিয় ব্যক্তি খুবই কম দেখিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে ঘরের সর্ব্বত্র পুথির স্তূপ, প্রাচীন দুর্লভ পুস্তক, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি সে যে কত তাহা এক নিমিষে ঠিক্ করা কি সহজ! সাধক যেমন ইষ্টদেবের সাধনায় আপনাকে তন্ময় করিয়া ফেলে এই একনিষ্ঠ সাধকও তেমনিভাবে সংসারের শোক-দুঃখ-ব্যথা বেদনা ভুলিয়া যাইয়া পুস্তকের মধ্যে আপনাকে সমাহিত করিয়া রাখিতেন।

কেদারবাবু অনেক লেখক গড়িয়া গিয়াছেন। একদিন মফস্বলের ক্ষুদ্র কাগজের ভিতর দিয়া মক্স করিয়া যাঁহারা বড় হন,—পরে সেই কাগজের কথাও তাঁহারা যে শুধু ভুলিয়াই বসেন তা নয়, মুদ্রিত গ্রন্থে সেই কাগজে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ বলিয়া যে তাঁহার নামটা স্বীকার করিবেন তাহাও মনে থাকে না। কেদারবাবুর এই অভিজ্ঞতাটুকু ছিল বলিয়াই বড় লেখকের তোষামোদ বড় একটা করিতেন না। ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আজকাল যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে কেদার বাবুর নিকট ঋণী তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

কেদারবাবু চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার নাম বাঁচিয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে তাহা মুছিয়া যাইবে না। কেদারবাবুর যোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রবর্ত্তিত "সৌরভকে" যদি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতি চির উজ্জ্বল থাকিবে এবং তাঁহার আত্মা অনন্ত শান্তিলাভ করিবে। আজ বৎসর শেষে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সভাপতির অভিভাষণ

বাবু যতীন্দ্রনাথ মজুমদার আপনাদিগকে ময়মনসিংহের সাহিত্য চর্চ্চা ও সাহিত্য গৌরবের ইতিহাস দিয়াছেন। আমি ১৮৯১ সনে এখানে আসিয়া সাহিত্যিকদিগের মধ্যে স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়কে পাই। ময়মনসিংহ সদর হইতে কোনও সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছিল না। চারুবার্ত্তা সুদূর সেরপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত চারুবার্ত্তার সম্পাদক ছিলেন। তখন প্রতি বৎসর সারস্বত সমিতির উৎসব হইত। সারস্বত উৎসবে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী হইত। প্রথম দিন সায়ংকালে সমিতির উদ্বোধন ও সাহিত্য চর্চ্চা জন্য সভা হইত। তাহাতে বক্তৃতা, রচনা ও কবিতা পাঠ হইত। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের কবিত্ব শক্তি প্রথম এই সারস্বতক্ষেত্রে স্ফূর্ত্তিলাভ করে আমি ময়মনসিংহে আসিয়া কবি গোবিন্দ দাসকে পাই নাই। স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্তের সহিত সারস্বত সমিতি ও চারুমিহির পত্রের সংস্রবে আমার বান্ধবতা জন্মে। এই বান্ধবতা তাঁহার মরণকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাবু অমরচন্দ্র দত্তের সাহচর্য্যে দুই জন প্রতিভাবান ব্যক্তির সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় একজন দরিদ্র কবি গোবিন্দ দাস ও আর একজন কালেক্টরীর ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী তখনকার নগণ্য কেদারনাথ মজুমদার।

অমরবাবু প্রায় প্রতিদিনই দুইবেলা না হইলেও একবেলা আমার বাসায় আসিতেন। একদিন তিনি কেদার বাবুকে লইয়া আমার বাসায় আসিলেন। কেদারবাবুর সঙ্গে একখানা পাণ্ডুলিপি ছিল। তিনি তখন ময়মনসিংহের ইতিহাস লিখিতেছেন। কেদারবাবু আমাকে দুই এক অধ্যায় শুনাইলেন ও অমরবাবুর দ্বারা কিছু কিছু সংশোধন করাইয়া নিলেন। আমি বুঝিলাম যে ময়মনসিংহের একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সহিত আমার পরিচয় হইল। বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। কেদার বাবু ইহার পর অনেকবার অমরবাবুর সহিত আমার বাসায় মিলিত হইয়াছেন। কি প্রকারে ময়মনসিংহের ইতিহাস দরিদ্র লেখক প্রকাশ করিতে পারেন তাহার আলোচনা হইয়াছে। ডিঃ বোর্ডের দেশীয় মেম্বরগণ দরিদ্র নগণ্য কেদারনাথকে

আমল দিলেন না। স্বনামধন্য মেঃ ব্লেকউড্ চেয়ারম্যান ময়মনসিংহের ইতিহাসের মূল্য বুঝিলেন ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে উহা প্রকাশিত হইল।

ইহার পর কেদারনাথ কি ভাবে ক্রমে সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন তাহা সুরজিৎবাবু কেদারনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন। কেদারনাথের শরীর কোনদিনই সুস্থ দেখি নাই। তাঁহার রুগ্ন শরীর তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ধারণ করিতে ক্রমে অসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি তাঁহার সাহিত্য তপস্যা কোন দিনই হীনবল হয় নাই।

কেদারনাথ কোনও দিনই আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আত্মগোপন করিয়া চলিতেই ভালবাসিতেন। নিজের কুটীরে বসিয়া কাজ করিতেন কিন্তু কখনও আত্ম মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। এখানে যখন সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যিক অধিবেশন সময়ে ঐ উপলক্ষে প্রদর্শনী হয়। "বাঙ্গালা সাহিত্য" ঐ প্রদর্শনীর একটী বিশেষ বিভাগ ছিল। আমি প্রদর্শনীর সম্পাদক ছিলাম। কেদারনাথের হস্তে প্রধানতঃ সাহিত্য বিভাগের ভার ছিল। আমি সম্পাদক স্বরূপে অমরবাবু ও কেদারনাথের সহায়তা করিয়াছিলাম সত্য কিন্তু কেদারনাথই নানাস্থান হইতে হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

"ময়মনসিংহ গীতিকা" যাহা Mymensingh Ballad নামে কলিকাতা University হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রোমা রোঁলা প্রভৃতি মনিষীগণ অতুলনীয় বলিয়া এই Mymensingh Ballad এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এ একমাত্র কেদারনাথের উৎসাহ, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলেই ঐ গীতিকাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

কেদারনাথের প্রতি আমার সমধিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়াই বোধ হয় আপনারা আমাকে অদ্যকার স্মৃতি সভার সভাপতির আসনে বরণ করিয়াছেন। আশা করি আপনারা শ্রাদ্ধ বাসরে বৎসর বৎসর এই স্মৃতি সভা করিতে ভুলিবেন না। কেদারনাথ বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ইহা ময়মনসিংহের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। ময়মনসিংহ কোনও দিনই সাহিত্য সেবায় পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। আশা করি ময়মনসিংহের বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ কেদারনাথের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

ছাত্র জীবনে সাহিত্য-সাধনা।

জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে যাঁহারা মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যলীলার ভিতর দিয়াই পরিণত বয়সের কর্ম্মজীবনের স্বরূপটি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। নেপোলিয়ান্ শৈশবেই সমরাভিনয় ও কন্দুকক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। স্বভাব কবি ঈশ্বর গুপ্ত ৩।৪ বৎসর বয়সেই

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে ভাই কলকাতায় আছি"

এইরূপ কবির ভাষায় অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ইংরেজ কবি পোপ বাল্যকালে পড়াশুনায় নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন। তিনি কেবল কবিতা লিখিয়াই সময় নষ্ট করিতেন। তজ্জন্য একদিন তাহার পিতা তাহাকে গুরুতর বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তখন পোপ নির্ম্মম প্রহারের যাতনায় বলিয়া উঠিলেন,

"Father, father, mercy take,
I shall no longer verses make."

আজীবন সাহিত্য সেবী কেদারনাথের বাল্যজীবনের নানা কার্য্যের ভিতর দিয়াও এই সনাতন সত্যের স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রজীবনে পড়াশুনায় কেদারনাথের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়িতে মোটেই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি নাটক নভেল ও অন্যান্য উপাদেয় বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং কবিতা ও গল্প লিখিয়া সহাধ্যায়ী ছাত্রগণকে পড়িয়া শুনাইতেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ব্রহ্মপুত্রতীরে অথবা অন্য নির্জ্জন স্থানে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া কবিতা চর্চ্চা করিতেন। কোন কবিতার অর্থ ও সমালোচনা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ প্রশ্নের স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইতেন। কেদারবাবুর নিকট শুনিয়াছি, ছাত্র-সাহিত্যসেবীগণ অমরবাবুকেই এ বিষয় final authority

মনে করিতেন। কবিতা চর্চ্চাপ্রসঙ্গে কবিবর স্বর্গীয় মনোমোহন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোমোহন সেনই কবিতা চর্চ্চায় কেদারনাথের প্রধান সঙ্গী ছিলেন।

কেদারনাথ ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন ১৮৮৪ সালে। তখন হইতেই তিনি পেছনের বেঞ্চে বসিয়া তাঁহার প্রথম উপন্যাস "প্রফুল্ল" লিখিতে আরম্ভ করেন। ভরার মেয়ের করুণ কাহিনীই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৮৭৭ অব্দের আশ্বিন মাসে নোয়াখালি জেলা জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। এই দুর্ঘটনা দৌলতখাঁর জলপ্লাবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ভীষণ বন্যার অপূর্ব্ব কাহিনী যেমন বাঙ্গালীর হৃদয়ে একটা বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি সহানুভূতিও জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ভাবপ্রবণ স্কুলের ছাত্র কেদারনাথও ইহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ছাত্র-সাহিত্য-সেবী কেদারনাথ, এই হৃদয় বিদারক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ১৮৮৮ সনে সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছেন—বঙ্কিমবাবুর "দেবী চৌধুরাণীর" প্রফুল্লের অনুকরণেই তাহার উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছিলেন—"প্রফুল্ল"। নায়িকা বন্যার স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিল বলিয়া পরে তিনি ইহাকে "স্রোতের ফুল" আখ্যা দিয়াছিলেন।

তখন জিলা স্কুলে সাহিত্যালোচনার জন্য "মনোরঞ্জিকা" সভা ছিল। ইহার প্রায় সকল অধিবেশনেই কেদারনাথ প্রবন্ধ অথবা কবিতা পাঠ করিতেন। ছাত্রজীবনে তিনি কেবল প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিরূপে এ গুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করিয়া লোক সমাজে প্রচার করা যায়, ইহারও উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্রের নিতান্তই দুর্ভিক্ষ ছিল। মুদ্রণ ব্যয় ও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল। কাজেই স্কুলের কোন ছাত্রের পক্ষে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। কর্ম্মবীর কেদারনাথ এই অসম্ভাবনার ভিতরেই সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়া লইলেন। তিনি নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কম্পোজিটারের কার্য্য শিক্ষা করিলেন। মফস্বলে সাময়িক পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। অমৃত বাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শিশিরবাবু, মতিবাবুও প্রথমে স্বহস্তে কম্পোজ করিয়াই মফস্বলে "অমৃত বাজারের" সূতিকাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

তখন দুর্গাবাড়ীতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহারই চিতাভস্মের উপর দুর্গাবাড়ীর বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গাবাড়ীর অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠে খারুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চৌধুরী মহাশয়ের "সংসার যন্ত্র" নামে একটি প্রেস ছিল। উদ্যোগী কেদারনাথ নিজে কম্পোজ করিয়া এই "সংসার যন্ত্র" হইতেই ১২৯৫ সালের বৈশাখ মাসে সাময়িক পত্রিকা "কুমার" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। যখন কুমার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব্ব চলিতেছিল, তখন এখানে আসিয়াছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) মহাশয় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদানের জন্য। কেদারবাবু অন্যান্য উদ্যোক্তাদিগকে লইয়া সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক সেন মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশে নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া আনন্দের সহিত কুমারের জন্য একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। তিনি ভূমিকার প্রথমেই লিখিয়াছিলেন, "দিন দিন ভারত সুশিক্ষার অভাবে, কুশিক্ষার প্রভাবে, অশিক্ষার স্বভাবে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে।" এইরূপ গুরুগম্ভীর ভূমিকা বক্ষে লইয়া ছাত্র-সম্পাদিত কুমার লোক সমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।*

কুমারের পরমায়ু কতদিন ছিল, ঠিক বলা যায় না। আমরা কুমারের ৪র্থ সংখ্যা (বৈশাখ হইতে শ্রাবণ ১২৯৫) মাত্র দেখিয়াছি। কুমারে নানাপ্রকার সুলিখিত প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাসাদি প্রকাশিত হইত। কুমারে প্রকাশিত "সরলা" উপন্যাস বেশ সুখপাঠ্য ও উপাদেয়, কিন্তু ইহার লেখক কে ঠিক বলিতে পারি না। কারণ বান্ধব ও বঙ্গদর্শন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকার অনুকরণে কুমারেও লেখকগণের নামের আদ্য অক্ষর মাত্র মুদ্রিত দেখা যায়।

*স্থানীয় মোক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন ঘোষ মহাশয় কেদারবাবুর সহাধ্যায়ী। কুমারের সূতিকা গৃহের সংবাদ তাঁহার নিকটই বিশেষভাবে শুনিয়াছি। (লেখক)

কুমার দীর্ঘায়ু না হইলেও ছাত্রজীবনে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়া কেদার বাবু যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই সাময়িক পত্রিকা পরিচালন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং মরণের ডাক আসিবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি একনিষ্ঠভাবে সাময়িক সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৯ সালে কেদারনাথ জিলাস্কুলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জ্জনে ও সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন।

ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ (Continental tour) না করিলে সেখানকার খ্যাতনামা ছাত্র ও পণ্ডিত-গণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহারা একার্য্য করিয়া থাকেন। ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতেই আমাদের জ্ঞানলিপ্সু কেদারনাথও ভারতভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনিও মনে করিলেন ভারত পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিলে তার শিক্ষা দীক্ষা একান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু নানা পারিবারিক অনিবার্য্য কারণে তাঁহাকে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কর্ম্মকুশল কেদারনাথের পক্ষে দুনিয়ায় কিছু অসম্ভব ছিল না।

প্রতিকূল ঘটনা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াই কেদারনাথ ভারত পর্য্যটনের আয়োজন করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন স্থানীয় মোক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন ঘোষ মহাশয় কলিকাতা সিটিকলেজে অধ্যয়ন করিতেন। কেদার বাবু প্রথম কলিকাতা যাইয়া হেমাঙ্গবাবুদের ছাত্রবাসেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন পর তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে হেমাঙ্গবাবুর নিকট ১০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া বলিয়া গেলেন, "এলাহাবাদে, রামানন্দবাবুর ঠিকানায় টাকা পাঠাইলেই আমি পাইব।" তখন শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেদারবাবু এলাহাবাদে পৌছিয়া রামানন্দ বাবুর নিকট হইতে টাকা নিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ হইতে কেদারবাবু আগ্রায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি "যমুনা লহরীর" কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে ছিলেন। গোবিন্দবাবু আগ্রায় ডাক্তারী করিতেন। কেদারবাবুর নিকট শুনিয়াছি, আগ্রার তাজমহল ও যমুনালহরীর সান্ধ্য সৌন্দর্য্য যেমন উপভোগ্য ছিল, কবি গোবিন্দচন্দ্রের সাহিত্যিক সংসর্গও তেমনি তাঁহার নিকট উপাদেয় ছিল।

এইরূপে কেদারনাথ কয়েক মাস ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন ও পরিদর্শন করিয়া এবং প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক গণের সহিত ভাবের আদান প্রদান ও নানা বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া মাতৃভূমির কোলে ফিরিয়া সাহিত্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী ভারতী, প্রয়াস, বীণাপাণি প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌর চন্দ্র নাথ।

"রামায়ণের সমাজের" কথা।

প্রায় সিকি শতাব্দীর চেষ্টায় অগ্রজ মহাশয়ের "রামায়ণের সমাজ" লিখিত হইয়াছে। গত দুই বৎসর ধীরে ধীরে ইহার মুদ্রণকার্য্য চলিয়াছিল কিন্তু গত ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামায়ণের সমাজকে বৈশাখ মধ্যে শেষ করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় মধ্যে জাগরিত হয়। হায় তাহার মুদ্রণকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

১৩১০ বঙ্গাব্দে "রামায়ণের সমাজ" লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন ভাবী আশায় নিরাশ হইয়া মনের সান্ত্বনা প্রদান জন্য এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে বিষয়টী যত সান্ত্বনাপ্রদ হইবে মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা তেমন সহজ ও সান্ত্বনাপ্রদ বোধ হইয়াছিল না, তথাপি অদম্য উৎসাহে ধৈর্য্য ধরিয়া দুইখানা রামায়ণের বঙ্গানুবাদ (দুই সমাজের) ছয় মাসের মধ্যে শেষ করিয়াছিলেন এবং দুই বৎসরে আলোচনার ধারা ও বিষয় সূচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বিষয়সূচী প্রস্তুত করিতে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" হইতে প্রকাশিত "রামায়ণতত্ত্ব" দুই খণ্ড তাঁহার শ্রম

যথেষ্ট লাঘব করিয়াছিল। তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন "পরিষদের ঐ রামায়ণের সূচীর সাহায্য না পাইলে এত সহজে রামায়ণের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত হইত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।"

১৩১৪ বঙ্গাব্দে রামায়ণের সমাজ কতকাংশ লিখিত হয় এবং স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার সাহিত্য পত্রে তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে রামায়ণের সভ্যতা সম্বন্ধে ও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হয় এবং তাহা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়া উক্ত পত্রিকা সম্পাদকদ্বয় যেমন গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সপক্ষে ও প্রতিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া এবং সমালোচনা করিয়া সেইরূপ অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধের প্রশংসায় যে লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহা স্বীকার্য্য হইলেও ক্রটী দর্শাইয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে যে লেখকের উপকার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে সকল পত্রিকায় ঐরূপ আলোচনা বাহির হইয়াছিল তিনি যত্নের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

রামায়ণের সমাজশীর্ষক যে সকলপ্রবন্ধ "সাহিত্য" ও আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা লইয়াই রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন ইচ্ছা করিয়া ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেইখানে একদিন তাঁহার পূজনীয় শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তাঁহার সেই মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিখানা দেখাইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মতের সহিত কোন দিন কাহারও মতের মিল হইত না, তাহা হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি অগ্রজ মহাশয়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধ মতেরও যে প্রচুর মূল্য আছে তাহা অগ্রজ মহাশয় স্বীকার করিতেন এবং অনেকেই করিয়া থাকেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া প্রমাণসহ মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতিদিন যাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। নিজের লেখাপড়ার চর্চ্চা ফেলিয়া পরের লেখা দেখিবার সময় যথার্থই তাঁহার অত্যন্ত কম ছিল। তথাপি তিনি স্নেহ পরবশ হইয়া তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার স্বাধীন মত প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ মতগুলিরও প্রমাণ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিলাম কি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল সে বৃদ্ধের, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেদ, মহাভারত, পাণিনি, ব্রাহ্মণসূত্র—এ গুলির পৃষ্ঠাগুলি পর্য্যন্ত যে তাঁহার স্মৃতির আয়ত্ত ছিল।

এই সময় অগ্রজ মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সমস্তই একবার পড়িয়া লইয়া, আবার গ্রন্থখানাকে শোধিত করিবার ইচ্ছা করেন। এবং সেই গৃহেই সে ইচ্ছা কার্য্যতঃ আরম্ভ করেন।

এই সময় একদিন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন - "বাবা বেদ যে পৃথিবীতে কোন পণ্ডিত বুঝিয়াছে তাহাই আমার মনে হয় না"।

পণ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ জ্ঞান তাঁহাকে অনেকেরই নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সম্বন্ধে অগ্রজ মহাশয় স্মৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন "বিভিন্ন বেদ সংহিতার ৫।৬খানা ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়া এবং সেই সেই সংহিতার ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থগুলি দেখিয়া আজ প্রকৃতই পণ্ডিত মহাশয়ের কথার সার্থকতা অনুভব করিতেছি।" রামায়ণের সমাজ গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহা প্রদর্শন করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলোচনার পর হইতে গ্রন্থখানাকে তুলনামূলক অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমাজের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া লিখিবার ইচ্ছা হয়. এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রেসে না দিয়া তাহা লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

এইরূপে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের এক যুগ অতিক্রম করিল। পণ্ডিত মহাশয়ের বিরাট পুস্তকাগারে শাস্ত্র গ্রন্থরাশির সান্নিধ্যে বসিয়া যাহা সহজ মনে করিয়াছিলেন গ্রন্থাগার শূন্য ময়মনসিংহে আসিয়া তাহা মোটেই সম্ভবপর হইয়া উঠিল না।

এই সময় কতিপয় পারিবারিক দুর্ঘটনায় মনকে বিষাদাক্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। এবং বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই

স্থান আলোচনার বিষয় না হইলে উহার নিরাশব্যঞ্জক ফল যে উপস্থিত গ্রন্থ সংকলনে বাধা প্রদান করিতেছিল ইহা উল্লেখ করিতেই হইবে, কেন না উহাই এই গ্রন্থ প্রচারের দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কৈফিয়ৎ।

"বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের" পাণ্ডুলিপি ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইবে আশা ছিল। নিরপেক্ষ সমালোচনায় গ্রন্থখানা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহা সুফললাভ করিতে পারে নাই। এই সময় সাময়িক অর্থ কৃচ্ছ্রতায় পড়িয়া ১ম সংস্করণের পুস্তকগুলি সামান্য মূল্যে এক পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। পুস্তক ক্রয় করিবার অল্প দিন পরে ঐ পুস্তক ব্যবসায়ীর ব্যবসা ঋণের দায়ে বিপন্ন হইয়া পড়ে সুতরাং পুস্তকখানা বাজারে বাহির হইবার পূর্ব্বেই দপ্তরীর গৃহে থাকিয়া নীরবে সমাধিপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গের সুধী সমাজের চক্ষে এ গ্রন্থ অধিক আলোচিত হইতে পারে নাই, ইহাও গ্রন্থকারের একটা অনুশোচনা সন্দেহ নাই।

সাময়িক সাহিত্য সংকলনে বিপুল মানসিক শ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতায় ৬ মাসের জন্য স্থায়ী বাসস্থান স্থির করিয়া প্রায় প্রতিদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে, জোড়াসাঁকো হইতে চেতলা—কলিকাতার অলিগলির লাইব্রেরীগুলি খুঁজিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যকে অতি মাত্রায় নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ভাবী আশায়ই মানুষ এইরূপ স্বাস্থ্য ও অর্থ উপেক্ষা করিয়া সাধনা করিতে পারে। সাধনায় সিদ্ধিও হইয়াছিলেন, সত্য কিন্তু সুফললাভ হয় নাই।

তীর্থস্নান করিয়া সুফললাভ না হইলে পুণ্য-লোভাতুর যাত্রীর মনে যে অনুতাপ ও অবসাদের উদয় হয় "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" প্রকাশের পর তাহার পরিণাম ভাবিয়া সেইরূপ অবসাদে ও অনুতাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন।

যদিও অনুতাপে ও অবসাদের ফলে অর্থব্যয়শক্তি সংকোচিত হয় তথাপি অভ্যাস দোষ চাপা থাকে না। লেখনী কুণ্ডয়ন বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই সময় গল্প উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থগুলি লিখিতেও পুনরায় মনসংযোগ করেন। উপন্যাস ও গল্প লিখিবার এই সময় প্রয়োজনও হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এই দুই বিষয়ে যাহার ভাণ্ডারে পুঁজি কম তাহার পক্ষে পত্রিকা সম্পাদন এক দুর্ঘট ব্যাপার। সুতরাং সম্পাদককে যেমন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হইতে হইবে, তেমনি গায় না মানে আপনি মোড়লভাবে গ্রাহকের পরিতুষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক এবং গাল্পিকও হইতে হইবে।

ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি লিখিয়া যেমন নিরাশ হইয়াছিলেন উপন্যাস প্রকাশ করিয়া তেমন নিরাশ হইতে হয় নাই। তিন বৎসরে যে তিনখানা উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দুইখানাই পুনঃসংস্করণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী পাঠকের নির্ব্বাচন রুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন; ইতিহাস লেখকের নিরাশাও অবসাদের অন্যতম কারণ।

১৩২৯ সন হইতে আবার বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ ও প্রশংসায় "রামায়ণের সমাজের" দিকে তিনি মনসংযোগ করিলেন; এবং উপনিষৎগুলি ক্রয় করিয়া পড়িতে লাগিলেন। সৌরভ পরিচালনের জন্য যেমন উপন্যাস ও গল্প রচনা করিতে হইতেছিল, সেইরূপ রামায়ণ সম্বন্ধেও নূতন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি সৌরভে প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা উদ্ধৃত হইতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" প্রতি সংখ্যায় সৌরভের রামায়ণী সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি তাঁহার কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া ভারতীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছিলেন। তাহার ফলে মান্দ্রাজ যুক্তপ্রদেশের কোন কোন ইংরেজী ও হিন্দি পত্রিকায় ও ঐ সকল প্রবন্ধ অনূদিত হইতেছিল—বাস্তবিকপক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে এই সকল উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতা গ্রন্থ দুই খণ্ড পৃথক করিয়া প্রচার করিতে ও নূতন করিয়া গড়িয়া লিখিবার জন্য অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল।

"সাহিত্য" ও "আর্য্যাবর্ত্তে" যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল দুইশত কি আড়াইশত পৃষ্ঠা। এবার ঐ মুদ্রিত বিষয়গুলিকে দুই গ্রন্থের জন্য পৃথক করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাবে "রামায়ণের সমাজ" রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার পূর্ব্ব চিন্তা অনুসরণে রামায়ণের সামাজিক আদর্শগুলিকে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক ও পরবর্ত্তী মহাভারত ও সূত্রযুগের সমাজের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা

করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আদর্শে পাঁচ বৎসরে রামায়ণের সমাজ সম্পূর্ণ নূতন আকারে প্রস্তুত হইল।

রামায়ণের নিবেদনে লিখিয়াছেন "রামায়ণ হিন্দুজাতির একখানা ধর্মগ্রন্থ। এমন গ্রন্থের সমাজ বা প্রকৃতি নির্ণয়ে আমি ইচ্ছা করিয়াই কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের মত গ্রহণ করি নাই। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ তাহা আমি মনে করি না। পরন্তু তাহাদের শ্রৌত সূত্র ও রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কীয় গ্রন্থগুলির যতটা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা শ্রদ্ধার সহিতই পড়িয়াছি; বেদ ব্রাহ্মণ সূত্রগুলির ও বৈদেশিকের অনূদিত ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছি কিন্তু রামায়ণের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপারে তাহাদের মত গ্রহণ করি নাই। রামায়ণের সমাজ আলোচনায় আমি নিজ চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই মনে করিতেছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে বৈদেশিক ভাব বহু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে তাহা খুব কম।"

ময়মনসিংহের ন্যায় মফস্বল সহর, যে স্থানে উপযুক্ত লাইব্রেরী ও পণ্ডিত সমাজ নাই সেরূপ স্থান হইতে এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা যে কতদূর বিড়ম্বনার বিষয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। শাস্ত্রীয় কত বিষয়ের যে সমাধান গ্রন্থের অভাবে করিতে পারেন নাই তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রন্থ লেখা বরং সোজা কিন্তু মুদ্রণ করিবার বিপুল অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য ধারণ করা বড় কঠিন। এইটা চিন্তা করিয়াই এই পুস্তক মুদ্রণ জন্য নিজেই একটা ক্ষুদ্র প্রেস করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য ইচ্ছা করিয়াই ধীরে ধীরে চালাইয়াছিলেন। অন্য প্রেসে হইলে নিজে প্রুফ দেখিয়া এত অল্প সময় মধ্যে হইত না। ঢাকা কলিকাতা হইতে এইরূপ ফুট নোট বহুল গ্রন্থ ছাপাইয়া আনাও অসম্ভব হইত।

গ্রন্থকার চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণী সমাজ আজও প্রেসের কবলেই আবদ্ধ আছে। শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই, আশাকরি পুস্তক সমাপ্ত হইয়া জন সমাজে প্রচারিত হইবে। ভগবান সহায় হউন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ইন্দ্রপাত

কক্ষচ্যুত হয়েছে কি ওগো, উল্কাটি আজি অকস্মাৎ?
একি শুনি, হায়, দিকে দিকে আজি হয়েছে কি মহাইন্দ্রপাত?
বঙ্গবাণীর প্রবীণ সাধক, নসিরাবাদের অগ্নিশিখা!
কেন গো আজিকে রয়েছ নীরব? ললাটে জ্বলে না উজল টিকা
কোথায় গিয়েছ হে বীরকর্ম্মি! হে বাণীমাতার সুসন্তান,
ওগো নিষ্ঠুর, ওগো ও পথিক, পশে নাকি কাণে এ শোকগান!
ছাড়িয়া তোমার আত্মীয়গণে, ছাড়ি 'সৌরভে,' কাহারি পানে
ছুটেছ আজিকে? পরাণ তোমার হয়েছে বিভোর কাহারি গানে!
তুচ্ছ করিয়া সকল বিঘ্ন, লঙ্ঘিয়া গিরি সাগর শেষে,
শুভ্রমুক্ত আত্মা তোমার চলেছে আজিকে কোন্ সে দেশে?
কেই বা জ্বালিবে পঞ্চপ্রদীপ? কাহার ডঙ্কা উঠিবে বাজি?
তোমারি বিহনে দেশবাসীজনে, 'সৌরভ' কেবা বিতরে আজি?
"রামায়ণী গান" কে শুনাবে আর? নীরব হয়েছে তোমার বীণা
ওগো মহাগুরু, তোমার বিহনে ভারতী আজিকে হয়েছে দীনা।
কে শুনাবে আর ইতিহাস কথা? "স্রোতের ফুলটি" চলেছে ভাসি,
পশ্চাতে তব শোকের অশ্রু বরষিবে শুধু এ দেশবাসী।
যাও যদি যাবে, হে মহাসাধক—! নসিরাবাদের উচ্চশির!
হবে না লুপ্ত সাধনা তোমার, যদিও বহিছে অশ্রুনীর!
গেছ, চলে গেছ, হে মহাসাধক! এবেগো তোমার কর্ম্মভূমি!
নব নব রূপে এদেশ জাগাতে যুগে যুগে বীর আসিও তুমি!

শ্রীশিশির রঞ্জন গুহ।

স্মৃতি সভা।

ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর আহ্বানে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি পূজার জন্য এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এ সভায় স্থানীয় ও মফস্বলের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ; বি, এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেদারনাথের পরলোকগত আত্মার তৃপ্ত্যর্থে গীতা পাঠ করেন। সভায় কেদারনাথের স্মৃতি সম্পর্কিত বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয় ও ঐ সকল প্রবন্ধ কবিতাই সৌরভের কেদার স্মৃতিসংখ্যা প্রকাশিত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

কেশরঞ্জন তৈল

=কারণ=

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না ?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে ? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না ?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন ?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা ?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা ?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেসে—সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh--Reg. No. C. 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী	
ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৷৹
ঢাকার বিবরণ	২৷৹
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস)	৷৹
সাময়িক সাহিত্য	৬৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)	
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	।৵৹

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷৹

"ভাষার গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।" [illegible]

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১৷৹

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই)	১৲	মহরম	৷৹
ব্রতকথা	৷৵৹	কালের ডায়রী (সচিত্র)	৷৹
শৈব্যা	।৵৹	রংকথা	(যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। আষাঢ়—১৩৩৪ ষষ্ঠ সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the
LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children
whom you would love so much? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest
way to create an estate.
WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Representative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গমী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘা, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি দন সারাংশ ১৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵৹

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵৹

বাটলীওয়ালার এগুপিল্‌স্‌ সকল জ্বরের মহৌষধ ১৵৹

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷৹ ও ১৸৹

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফুলুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৵ ও ৸৹

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷৹

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—৷৵৹

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ।৶

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

দাম্মানী রোড্‌, পোঃ ক্যেডেল রোড্‌, বোম্বে, নং ১৪

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	...	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	„	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	„	...	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা	„	...	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা	„	...	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵৹ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—৷৵৹ আনা, হাসির হল্লা—৷৵৹ আনা, ছায়াপথ—৸৹ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা কুটিরা বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কনুকনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷৹ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পুরোধা ও কতিপয় পারিষদ

সৌরভ প্রেস—ময়মনসিংহ।

সূচী।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী	শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৩১
টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু ...	১৩৮
আজব পাখী	শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাসগুপ্ত ...	১৪৩
পূর্ব্ব স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৪৪
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী	শ্রীযুক্ত নীহারকণা বসু ...	১৪৫
প্রাচীন কাহিনী	শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন ...	১৪৬
বর্ত্তমান চীন সেনানায়ক	শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর বাগচী ...	১৫০
পাট (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত ...	১৫৩
প্রবাদের আবাদ	শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ...	১৫৩
মায়ের ডাক	... ...	১৫৫
বঙ্গ জ্যোতিষে অয়ন বিচার	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	১৫৮
বাদল রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৫৮
সংবাদ	... ...	১৫৮
শোক সংবাদ	... ...	১৫৮

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ

ময়মনসিংহ।

পুঃ ময়মনসিংহের অধিবাসী যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে অবস্থান করেন, তাঁহাদের ঠিকানা জানা প্রয়োজন।

জে, সি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও এবং সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র স্থল।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত

বিশ্ব-বীণা

সভা সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে গীত হইবার উপযোগী বিবিধ সঙ্গীত, স্কুল কলেজেরছেলে মেয়েদের আবৃত্তির জন্য নানারকমের রচনা মুসলমান বালকদের উপযোগী কবিতা ও গান, মহিলা সভায়, হিন্দু সভায় ও ব্রাহ্মণ সভায় পঠনার্থ ওজস্বিনী কবিতা, হিন্দুসমাজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের উপকারার্থ রচিত কবিতাসমষ্টি এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক সমাজের বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নারী এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

‘তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!’

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—‘তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!’, এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান!

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—“হর পার্ব্বতী সংবাদ,” এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের “মানবের দশ দশা,” রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের “ডান-হাতের ব্যাপার,” কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের “শরীর-চর্চ্চা,” অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের “বিস্মার্কের তিনটি বোমা”, রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে’র “গো-রোগের চিকিৎসা,” শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের “বীজ”...প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রাজী! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র!! “সংবাদ-কোষ” বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ!!! তা’ছাড়া “দিন-পঞ্জিকা” ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি!

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

আজ ২৫এ বৈশাখ। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। আজ আমাদের উৎসবের দিন। বৈশাখ মাসের এক নাম মাধব মাস; মধু থেকে তার আবির্ভাব; সে নূতন পুরাতনের গাঁঠছড়া বাঁধ্‌বার জন্ম মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে—বাঁ হাতে সে ধ'রে আছে মধুমাস চৈত্রকে, যে একদিকে বৎসরের অবসান আবার প্রকৃতির নবপ্রাণ বসন্তের পরিপূর্ণতায় চিত্ররূপ; এবং ডান হাতে সে ধ'রে আছে জ্যৈষ্ঠকে, যে ফলে পরিণত জ্যৈষ্ঠ, যে আষাঢ়ের অবিরল বর্ষণের অগ্রদূত। এবং নিজে সে নূতনের প্রতিরূপ। এই বৈশাখের মধ্যে বসন্তের কোমল সুষমা, প্রখর রৌদ্রের রুদ্রতা আর কালবৈশাখীর ঝড় ও বর্ষণ সবই একত্র সম্মিলিত হয়েছে। এই পুণ্য প্রথম মাসে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিলো—এ যেনো বিধাতার হস্তে মহাকবির ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমরা আনন্দোৎসব করি কেনো? আমাদের আনন্দ, যে, রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়ে আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যা তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি।

রবীন্দ্র-নিন্দা এককালে ফ্যাশান ছিলো; এখন ফ্যাশান হয়েছে রবীন্দ্র-প্রশংসা। আমরাও সেই ফ্যাশানের বশবর্ত্তী কি না, তা নির্ণয় কর্‌বার জন্ম রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ঈষৎ আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-স্রষ্টা। নূতনের জন্মদাতা, তাঁর [illegible]। কিন্তু তিনি একেবারে সৃষ্টিছাড়া বিশ্বামিত্রের পৃথিবী সৃষ্টিও করেন নি; দেশের মানসসরোবর থেকে ভাব মন্দাকিনী প্রবাহিত ক'রে কতো ভাবধারার ত্রিবেণী-তীর্থ রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা করা কঠিন ব'লেই তিনি বড়ো কবি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক Hudson ব'লেছেন—

A great writer is not an isolated fact. He has his affiliations with the present and the past; and through these affiliations he leads us inevitably to his contemporaries and predecessors, and thus at length to a sense of a national literature as a developing organism having a continuous life of its own, yet passing in the course of its evolution through many varying phases. Thus in our study of literature on the historical side we shall have to consider two things—the continuous life, or national spirit in it; and the varying phases of that continuous life, or the way in which it embodies and expresses the changing spirit of successive ages.—Hudson.

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব'লেছেন— সাহিত্য যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন, তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন, সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।—সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের দ্বারা এই যোগসাধন যতো অধিক হয়েছে এতো আর পূর্ব্বাপর কোনো কবির দ্বারা হয় নি। আমার

এই উক্তি প্রমাণে সমর্থন কর্‌তে হ'লে একবার বিশ্ব-সাহিত্যের—বিশেষ ক'রে বঙ্গসাহিত্যের—ইতিহাসের ধারার উৎস থেকে যাত্রা ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্য সাগরে অবগাহন কর্‌তে হয়।

বাংলা ভাষার বয়স বড়ো জোর হাজার বছর। খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে শুভাগমন করে। তারপর বিহার পর্য্যন্ত আর্য্যভাষার বিস্তার হ'তে ৫০০ বৎসর লেগেছিলো। খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধে আর্য্যভাষা কায়েমি হ'য়ে গিয়েছিলো। তখনও পুণ্ড্র দেশ বঙ্গ রাঢ় দেশ বর্ব্বর ব'লে পরিগণিত; বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে ও ঐতরেয় আরণ্যক ও ব্রাহ্মণে দেখা যায় এই সব দেশে এলে আর্য্যদের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'তো। ক্রমে পশ্চিম মগধ থেকে প্রাচ্য বঙ্গে আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। তাই যে দেশ যতো পূবে সে দেশ ততো বর্ব্বর ব'লে চিরকালই গণ্য হয়ে এসেছে। পাশ্চাত্যরা চিরকাল "প্রাচ্যাঃ" ব'লে পূবের লোক দেখে নাক সিঁটকেছে!

বঙ্গদেশের ইতিহাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত-রাজাদের সময় থেকে আরম্ভ। তার আগের সংবাদ বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এর পর ৮ম শতাব্দীতে গৌড়ীয় রীতি ব'লে একটা বাক্‌পদ্ধতি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়েছিলো।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার যে নমুনা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়স হাজার বছরের বেশী নয়। আর্য্যভাষা দেশীভাষার সঙ্গে মিশে বাংলাভাষায় পরিণত হ'তে হাজার বছর লেগেছিলো। কিন্তু সেই যে ভাষা, তাকে বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কেউ বাংলা ব'লে চিন্‌তেই পার্‌বে না। সেই প্রাচীনতম সাহিত্যের মূলপ্রকৃতি পশ্চিম বঙ্গেরই কথিত ভাষা এবং এখন পর্য্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের বাক্‌পদ্ধতিই আদর্শ হয়ে আদৃত হয়ে আসছে।

প্রাচীনতম বাংলাভাষার পুস্তকের নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। এর রচনার সময় ৯০০—১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

তারপরে যে সব বই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে, তারা ১৩ শতাব্দীর, যেমন শূন্যপুরাণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। মাঝের [illegible] বা দুই শতাব্দী কালের কোনো রচনা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এই সময় দেশে বিদেশী মুসলমানের আক্রমণে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিলো। তখনকার লোকে "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" এবং "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" মন্ত্র জপ ক'রে একেবারে কুণো হয়ে উঠেছিলো; দেশকে তারা আপনার ব'লে জানে নি, স্বজাতিকে তারা স্ব ব'লে বোঝে নি, বৃহৎ চিন্তা উচ্চ ভাব তারা বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডী টেনে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছিলো।

এর ফলে যে কেবল রাষ্ট্রীয় দুর্গতি হয়েছিলো তা নয়, সমাজে ও ধর্ম্মে সকল দিকেই সঙ্কীর্ণতা চেপে ধ'রেছিলো। ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির প্রাবল্যে বৌদ্ধ উদারতা লোপ পেতে ব'সেছিলো; জাতিভেদ দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও নারীদের অবস্থা পর্দ্দায় ঘোমটায় জড়ীভূত হয়ে উঠ্‌লো। মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য ও আনন্দ না থাক্‌লে তার সাহিত্য স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। বাংলা সাহিত্যেরও সেই জন্য জন্ম থেকেই পঙ্গুদশা।

কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিরা কেবলমাত্র পরের জিনিস নকল ক'রেই জীবন ও শক্তির অপব্যয় ক'রে গেছেন। মঙ্গলকাব্য-রচয়িতারা "পুচ্ছগ্রাহী"—যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতা পিতামহাঃ সেই গতানুগতিক পথেই বিচরণ করেছেন; কেউ নূতন সৃষ্টি কর্‌তে পারেন নি, কেউ একটা উচ্চ আদর্শের চরিত্র কল্পনা কর্‌তে পারেন নি; তাঁদের হাতে দেবতার চরিত্র পর্য্যন্ত মানুষের হীনতায় হেয় হয়ে পড়েছে—চণ্ডী ছলনাময়ী লোভপরতন্ত্রা, মনসা শীতলা কোপনা বৈরনির্য্যাতনে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা, শিব ও কৃষ্ণ লম্পট, সবাই নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহাউৎকণ্ঠিত।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির আবির্ভাবে নূতন সৃষ্টির জোরের হাওয়া বয়েছিলো; তাঁদের একতারায় যে সুর বেজেছিলো তা নূতন হলেও একতারার সুর মাত্র। তবু তাঁরা রস ও মাধুর্য্য সৃষ্টি ক'রে বঙ্গবাসীকে নূতন আনন্দ বিতরণ করে-ছিলেন। বৈষ্ণব দর্শনে মানব-প্রেমের যে পঞ্চ সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছিলো, সেই শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর সম্পর্ককে রাধা-কৃষ্ণের বেনামীতে তাঁরা গান ক'রে বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত ক'রেছিলেন। এতোদিনে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের [illegible] দেখানোর জমোট কেটে গেলো; [illegible] জোরাই হাওয়া পেয়ে দেশের লোক [illegible]

কিন্তু যেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির খ্যাতির জ'মে উঠ্‌লো অমনি আবার তাঁদের নকল শুরু হলো—দেশ একেবারে বৈষ্ণব-কবিতায় ছেয়ে গেলো।

এই বৈষ্ণবীয় প্রেম মাধুর্য্যে দেশের লোকের চিত্ত এমন অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলো যে পরবর্ত্তীকালে যেসব কবি আবার মঙ্গলকাব্য রচনা ক'রে পুরাতন ধারাকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছেন তাঁদের রচনায় শক্তি আর আগের মতন উগ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অন্নদা ও রামপ্রসাদের শ্যামা অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছেন।

এঁদের সময় মুসলমান বিজয় অনেকটা দৃঢ় হয়ে দেশের বুকে জেঁকে বসেছিলো; দেশ রাজশাসনে অনেকটা নিরুপদ্রব

মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

হয়ে এসেছিলো। সেই সময় বুদ্ধিমান লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা বা দেশদ্রোহিতার পুরস্কার-স্বরূপ মুসলমান সম্রাটের অধীনে জমিদারী বাগিয়ে বিলাসে ব্যসনে অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলো। তাদের ছিলো কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। অশ্লীল জুগুপ্সিত ব্যাপারের আলোচনাই ছিলো তাদের রসিকতা ও রসজ্ঞতার পরিচয়। তাই তাদের সভাকবিদের কাব্যও অবাচ্য কথায় অদ্ভুত হয়ে উঠ্‌ছিলো। ভারতচন্দ্র নিপুণশিল্পী হয়েও নূতন কিছু সৃষ্টি না ক'রে গতানুগতিক হয়ে মঙ্গলকাব্যই রচনা কর্‌লেন এবং অন্নদার আখ্যায়িকার সঙ্গে জুড়ে দিলেন বিদ্যাসুন্দরের খেউড়। রামপ্রসাদ সাধক ভক্ত হয়েও রচনা কর্‌লেন বিদ্যাসুন্দর।

এই সময়ে বঙ্গে ইংরেজের আগমন হলো। আবার দেশ বিপর্য্যস্ত ও অন্তর্বিপ্লবে পীড়িত হয়ে উঠ্‌লো। কবির কর্‌বার অবসর আর লোকের রইলো না। কিন্তু কবিত্বের ধারা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে লাগলো কবিওয়ালারা। এদেরও সম্বল শুধু পৌরাণিক কথার চর্ব্বিতচর্ব্বণ আর অশ্লীল খেউড়।

ইংরেজ রাজত্ব স্থির হয়ে বস্‌লে দুজন কবির আবির্ভাব হলো যাঁরা প্রাচীন কবিওয়ালার ঢঙে নূতন বিষয়ের আলোচনা প্রবর্ত্তন কর্‌লেন—এঁরা হচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্ত।

তারপরে ইংরেজ মিশনারী ও গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা গরজে ও ফরমানে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিযুক্ত হলেন। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥
"আপনি সহজে যদি হয় উপনীতা।
তবেই সুখের হয় কবিতা বনিতা॥
এ দুটিরে জোরে যদি টেনে আনা হয়।
নিতান্ত নীরস তবে লাগিবে নিশ্চয়॥"

(পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের অনুবাদ—কবিবচনসুধা)।

বিদেশী মিশনারী ও দেশী পণ্ডিতে মিলে যে উৎকট সাহিত্য তৈরি কর্‌লেন তা দেশের অন্তর থেকে উৎসারিত প্রকৃত সাহিত্য হলো না—সেই রচনার সহিত দেশের অধিকাংশ লোকের ভাবের যোগ রইলো না।

এই সময় একজন মহামনীষীর আবির্ভাব হলো—তিনি রাজা রামমোহন রায়। তিনি চিন্তা ও ভাবরাজ্যের দিগ্‌বিজয়ী রাজা। বাংলা ভাষায় প্রথম স্বাধীনচিন্তা প্রকাশ ক'রে তিনি বাংলা ভাষাকে নূতন প্রাণ শক্তি ও মর্য্যাদা দান করলেন।

রামমোহনের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্য বল্‌তে ছিলো নকল সাহিত্য—পুরাণের নকল, রামায়ণ-মহাভারতের নকল, সংস্কৃত কাব্য-কথা নাটকের নকল। কিন্তু রামমোহন প্রথম নিজের

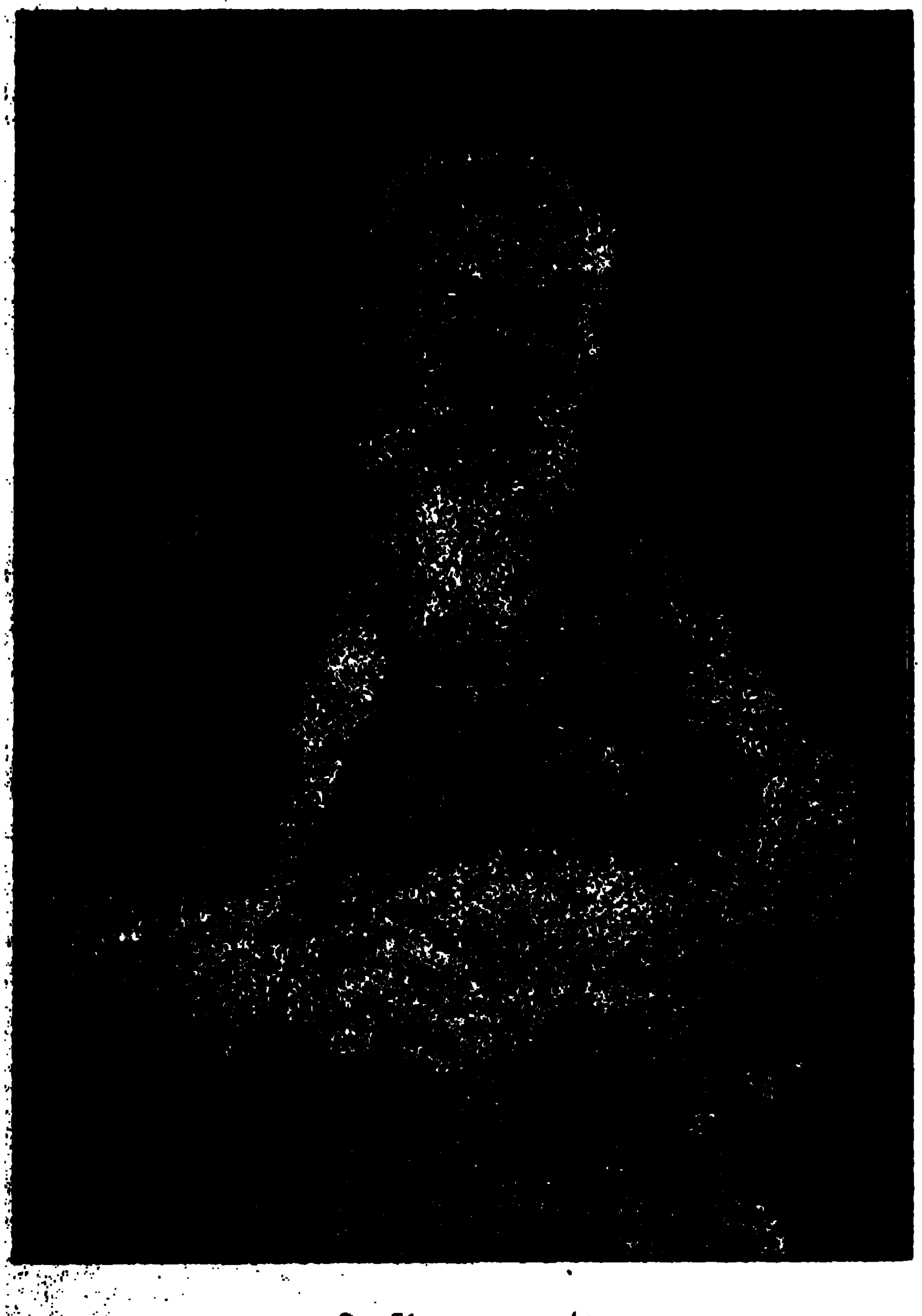

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিন্তালব্ধ কথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন। এর আগে বাংলা সাহিত্য বল্‌তে পদ্য সাহিত্যই বুঝ্‌তে হতো; রামমোহন গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করলেন। সেই যুগ প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মানব সমাজের জন্য যে সর্ব্বাধীন স্বাধীনতার আদর্শ উপস্থিত ক'রেছিলেন তার কাছে তাঁর স্বদেশবাসী তো দূরে থাকে, কোনো দেশের লোকই এখনো পৌঁছুতে পারে

রামমোহনের পরে ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্কীর্ণতা মোচনের জন্য যে চেষ্টা চলেছিলো তার ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। একদিকে হিন্দু স্কুলে ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের স্বাধীন চিন্তার শিক্ষার ফলে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরদিকে ডাফ সাহেব প্রমুখ ক্রিশ্চান মিশনারীদের শিক্ষার ফলে যুবকদের ধর্ম্মত্যাগ নিবারণের জন্য মধ্যস্থ হয়ে দণ্ডায়মান হলো ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ তখনকার বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের সমাজ। তাঁদের মধ্যে প্রধান কর্ম্মী ও ভাবুক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই ঠাকুর বংশের কোন্ আদিপুরুষ মুসলমান সংসর্গের পিরালী আখ্যা পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর ব্রাহ্মণত্বের দাবী ছাড়েন নি। এই পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় করবার সাহস ও উৎসাহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের আরব্ধ কর্ম্ম উদ্‌যাপন করলেন—কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ দেখিয়ে স্বদেশ বিমুখ বহু ব্যক্তির চিত্ত স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধায় আকর্ষণ করতে লাগলেন।

মধুসূদন দত্ত ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বিদেশী ধর্ম্ম স্বীকার ক'রেছিলেন; তিনি আর গৃহীত ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যে দেশের ধর্ম্মকে স্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর মন কাতর হয়ে বিলাপ করেছিলো—

"আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়!
তাই ভাবি মনে!"

তাঁর চিত্ত দেশের দিকে শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হলো, তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াস ত্যাগ ক'রে বঙ্গভাষার শরণাপন্ন হলেন—

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, –
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি'
পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।

* * * *

মাইকেল মধুসূদন অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কাব্যসাহিত্যে নূতনের সৃষ্টি ক'রে বঙ্গবাসীকে যেরূপ মুগ্ধ চমৎকৃত করলেন, সেইরূপ গদ্যসাহিত্যে করলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ও পথিকৃৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

এই সময় আরও দুই জন কবি সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন কর্‌ছিলেন—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। কিন্তু তাঁরা স্রষ্টা নন। তাঁরা দুজনেই মাইকেলের অনুকারী মাত্র। তাঁদের খ্যাতির মূলকারণ স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক রচনা—ভারতসঙ্গীত ও পলাশীর যুদ্ধ; তাঁদের মহাকাব্য বৃত্রসংহার ও কুরুক্ষেত্র স্বদেশের নষ্ট স্বাধীনতা উদ্ধারেরই কথা। এগুলির খাঁটি সাহিত্যিক মূল্য যে কতো তা কালের যাচাই এরই মধ্যে স্থির করেছে—এখন ঐসব কাব্য খুব অল্প লোকেই প'ড়ে থাকে।

এই সময় আর একজন কবি কাব্যকুঞ্জে যে মধুর ঝঙ্কার তুলেছিলেন তা হেম-নবীনের তূরী-ভেরী-নিনাদে একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। এঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিলো। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম। * * *

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীতে সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে যে তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেলো না। এই জন্য তাহার সুর অন্তরতররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।"

বিহারীলালের সারদামঙ্গল-আশীর্ব্বাদে রবীন্দ্রনাথের চিত্তকমল বিকশিত ক'রে তার উপর তাঁর পাদপদ্ম স্থাপন কর্‌লেন। রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের ন্যায় বিহারীলালের কমণ্ডলু-স্থিত রস সঞ্চয়কে ধারাপ্রবাহে স্রোতস্বিনীতে পরিণত ক'রে বিশ্বসাহিত্যসাগরে সম্মিলিত করে দিলেন।

রাজা রামমোহনের উত্তরসাধক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র এবং বঙ্কিম ও বিহারীলালের সাহিত্যশিষ্য রবীন্দ্রনাথ শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ ক'রে বাঙ্গালীর জীবনে সমাজে ধর্ম্মে সাহিত্যে সঙ্গীতে নবরসের সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

তাঁর পূর্ব্বজগণ এক এক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট নূতনের সৃষ্টি ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ একাই সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সমান বা ততোধিক কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—তিনি যেরূপ সামগ্রী যতোখানি দিতে পেরেছেন এমন আর কেউ কখনো কোনো দেশে দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে গল্প ও উপন্যাস-লেখক, সমালোচক, চিন্তাশীল নিবন্ধরচক, ভাষাতত্ত্ববিদ,

সমাজতত্ত্বজ্ঞ, স্বদেশপ্রেমিক, গায়ক ও সঙ্গীত স্রষ্টা! এমন বৈচিত্র্য আর কোন্ দেশের কোন্ কবির আছে? বাংলায় বৈচিত্র্যময় গীতিকবিতার তো স্রষ্টাই তিনি; গীতিকবিতার সপ্তস্বরা বীণায় তিনি যে মূর্চ্ছনা ধ্বনিত করেছেন তাতে জগৎমুগ্ধ হয়েছে! ছোটো-গল্পেরও স্রষ্টা তিনিই। উপন্যাসের প্রবর্ত্তক বঙ্কিম, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নূতনত্ব আছে। প্রবন্ধ-রচনা ও সমালোচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? শব্দতত্ত্বের প্রথম আলোচনা তিনিই করেছেন। আর সঙ্গীত-সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। তানসেন, সরি মিঞা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি নূতন সুর তান লয় সৃষ্টি ক'রে অমর হয়েছেন; যখন বাংলাদেশে বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতের চর্চ্চা হবে তখন রবীন্দ্রনাথের দানের মহামূল্য নির্দ্ধারিত হবে। য়ুরোপে তাঁর জন্ম হলে কেবল এই সঙ্গীত সৃষ্টির জন্যই তিনি বেঠোভেন, মোজার্ট বাখ শোপ্যাঁ প্রভৃতি মহাগুণীদের সঙ্গে সম্মানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হতেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈচিত্র্যই কেবল মাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়; তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বাণী বা Message. রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির পুত্র স্বয়ং ঋষি—সত্যদ্রষ্টা। তিনি সত্য শিবসুন্দরের, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পূজারী কবি। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর জীবনী-লেখক Ernest Rhys লিখেছেন—

He is the tenderest of lovers, the fondest idolator of a small child, the happiest dreamer, that ever walked under the moon; yet he is a stoic who knows very well what the terrors of Siva mean, and what exceeding darkness there is in the sun, on which its bright light rests.

তিনি বিশ্বপ্রেমিক, শিশুপ্রিয়, আনন্দময় কল্পনাকুশলী; কিন্তু যে মূলমন্ত্র তাঁর সাধনার নিত্য অনুধ্যান—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—সেই মন্ত্র তাঁর জীবনে সত্য হয়েছে, তিনি সত্যকে অকুতোভয়ে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর মন রবির মতনই প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়, তিনি মৃত্যুকে অমৃতরূপে উপলব্ধি করেছেন ও মঙ্গলস্বরূপ শিবকে রুদ্র রূপেই দেখেছেন; তিনি দুঃখ আঘাত বাঁচিয়ে নিরুপদ্রব শান্তিকে বরণীয় মনে করেন নি। তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হয়েছে—

করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল-প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি' দাও সক্ষম স্বাধীন।—নৈবেদ্য।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সঙ্গীতে যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়েছেন তার সব বিভাগেই তাঁর সৃষ্টি হয় তো সবার সেরা হয় নি; কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এমন উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য একাধারে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। বিশেষ ক'রে তো কোনো ভারতীয় কবি পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বজ একজন কবির নাম করা যেতে পারে যিনি রবীন্দ্রনাথের তুল্য রসবৈচিত্র্যের স্রষ্টা—তিনি কালিদাস। কিন্তু এই কালিদাসকেও পরাজিত ক'রে কবি রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ ভরে তাঁর মানসী প্রতিমাকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি!
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী,
মহাকবির কল্পনাতে
ছিলো না তাঁর ছবি!
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে!

রবীন্দ্রনাথ এমন কালে জন্মেছেন যে কালে সমগ্র পৃথিবী

স্বদেশে এসে সম্মিলিত হয়েছে, এবং তিনিও স্বপ্রতিভায় বিশ্ববিজয় ক'রে এসেছেন। তাই তিনি স্বদেশের মানস সরে বিশ্বসরস্বতীর আসন শতদল বিকশিত ক'রে তুলেছেন। এ কাজটিও আর কেউ করতে পারেন নি।

কোনো কোনো নিন্দুক ব'লে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ সব ক'রেছেন, কিন্তু মহাকাব্য তো রচনা করতে পারেন নি। এর জবাবও রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর মানসীকে দিয়েছেন—

আমি নাবুবো মহাকাব্য
সংরচনে
ছিলো মনে।
ঠেকলো কখন্ তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেলো ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

*   *   *

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈলো গত
স্বপ্ন মতো!
পুরাণ চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈলো খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ!
রৈলো মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী-কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ!

*   *   *

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আরেক নালিশ যে তাঁর কবিতা বোঝা যায় না; তিনি যখন বাংলা ভাষায় রচনা করছেন তখন তা বোঝবার অধিকার যেনো বাঙালী মাত্রেরই আছে। একদিন বন্ধুবর শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে তুষ্ট ক'রে দেবার আশায় এক খোসামুদে ব'লেছিলো—আপনার লেখা তো আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর লেখা কিছু বোঝা যায় না। তার উত্তরে শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে ব'লেছিলেন—তার কারণ কি জানো? আমরা তোমাদের জন্যে লিখি, আর রবিবাবু আমাদের জন্য লেখে!" এ অতি ঠিক কথা হলেও এ তিরস্কার; এ যুক্তি নয়। কিন্তু সাহিত্যের রসোপলব্ধি যুক্তির দ্বারা হয় না।

বড়ো বড়ো কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেনো? কারণ, তাঁরা যা অনুভব ক'রেছেন তা যে অধিক ব'কে সহজ করতে হবে এ কথা তাঁদের মনেও হয় না; এবং তাঁরা যা অনুভব করেছেন তা সকলে অনুভব করে নি; কাজেই সকলের কাছে তাঁদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হয়ে পড়ে। সহজ কথা লিখেছেন ব'লেই শক্ত বোধ হয়। সহজ কথার গুণ এই যে তা যতোটুকু বলে তার অপেক্ষা অনেক অধিক বলে; সে সমস্তটা বলে না; পাঠকদেরকে কবি হবার পথ দেখিয়ে দেয়, যেদিকে কল্পনা ছুটাতে হবে সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যা আবিষ্কার করেছে, পাঠকদেরকেও তাই আবিষ্কার করতে বলে। যাদের কল্পনা কম, যাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়, তারা এরূপ কবিতার পাঠক নয়। (সমালোচনা, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।—রবীন্দ্রনাথ।)

সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে রস। দীর্ঘকালের শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে যেমন অজ্ঞান বিদূরিত হয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে, সেইরূপ বহুকাল সাহিত্যের অনুশীলন করতে করতে মনে যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দসম্বলিত চমৎকারের প্রতিফলন হয় তাকেই আলঙ্কারিকেরা রস বলেছেন। রস স্বানুভবেদ্য, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য লোকোত্তর চমৎকার-প্রাণ ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। সুখ দুঃখ যেমন নিজেরই মানস-প্রত্যক্ষ, তেমনি রসও। এই রসানুভূতিই আনন্দ— রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি!

কাব্যপ্রকাশ কবিভারতীকে ব'লেছেন—নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, নবরসরুচিরা!

কবির কাব্যের রস ও সৌন্দর্য্য একমাত্র সহৃদয় দরদী মরমীরাই অনুভব করতে পারে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্র তাঁর বিসর্জ্জন নাটক তাঁর স্নেহাস্পদ

ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

লয়ে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিস নে কানে,
আইনের লৌহছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে, কে নাই বোঝে, ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে॥

রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনীর মধ্যে কবিশেখর জবানী বলেছেন—"আমার এসব জিনিস বাঁশীর মতো—বুঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির বিশ্বরচনা দেখে মুগ্ধ হয়ে যে কথা বলেছেন, তাই ব'লে আজ আমার বাক্য উপসংহার করি—

বুঝেছি কি বুঝি নাই বা, সে তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে যে রইলো সেই কথাই।

—প্রবাহিণী।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

(৩)

বৈষ্ণব সাহিত্যে রামমঙ্গল বা রামায়ণ পাঁচালী এবং মহাভারত বা ভারত পাঞ্চালী দুইটি প্রধান ধারা। বাল্মীকি ও ব্যাসের পদানুকরণ করিয়া কত কবি যে, এই দুই পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নাম এখন সর্ব্বখ্যাত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হাতের লেখায় পরগণায় পরগণায় বিভিন্নরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের পাঁচালী প্রচলিত ছিল। উহা পাঠও হইত, গীতও হইত। জলে, বাতাসে, অগ্নিতে ও কীটে তাহার অনেকেই বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু এখনও অনেকের চিহ্ন আছে। টাঙ্গাইল মহকুমার ভারত পাঞ্চালীর রচয়িতা—ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী; তাঁহার আদিপর্ব্ব ও শান্তিপর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। আদি ও অন্ত পাওয়াতেই বুঝা যাইতেছে, ত্রিলোচন সমগ্র মহাভারতের পাঁচালী করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের আরম্ভে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন :—

সর্ব্ব আগে বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ।
যার কৃপালেশে খণ্ডে ভবাদি বন্ধন॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা নাহি ভিন্ন ভেদ।
অজ শিব জানে ইহা, জানে চতুর্ব্বেদ॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা ভিন্ন বপু হয়।
স্বরূপ বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
গুরুরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিতে প্রকটে।
শ্রীগুরু করুণা হৈলে কর্ম্মসূত্র কাটে॥
আগম নিগম শাস্ত্রে যতেক পুরাণ।
যজ্ঞ হোম মহোৎসব ক্রিয়া কর্ম্ম দান॥
পর্য্যটন দরশন যতেক তীর্থাদি।
প্রভাস পুষ্কর সুরধনী সুর নদী॥
গুরু সমতুল্য নয় বেদ বিধি বলে।
সর্ব্ব তীর্থ ফল পাই শ্রীগুরু সেবিলে॥
গুরু কৃপা বলে মুক্ত হয় পশুযোনি।
শ্রীগুরু চরণপদ্ম জানহ তরণী॥
সকলের পরাৎপর গুরু মহাশয়ে।
দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত কটাক্ষে হৃদয়ে॥
চক্ষুদান দিয়া গুরু করিল উদ্ধার।
কোটী কোটী দণ্ডবৎ চরণে তাহার॥
শ্রীগুরু কমলপদে আমার শরণ।
নমো গুরু মহাশয় দুর্গতি ভঞ্জন॥
আমি অতি শিশুমতি কিশোর বয়েস।
অপার মহিমা তব না জানি বিশেষ॥
যে বোলাও তাহা বুলি, তাহা মাত্র জানি।
শ্রীগুরুচরণ বন্দম লোটায়া ধরণী॥
গুরু কৃষ্ণ পদাম্বুজে রহু মোর মন।
শ্রীগুরু বন্দনা কহে দ্বিজ ত্রিলোচন॥

এই গুরুবন্দনা হইতে জানা যায়, ত্রিলোচন, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তিনি কিশোর বয়সে মহাভারত রচনা করেন। নিম্নলিখিত ভনিতা হইতে জানা যায়, তাঁহার উপাধি "চক্রবর্ত্তী" ছিল :—

(১) তোমার চরণপদ্ম হৃদয়ে করিয়া সদ্ম
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন গান।

(২) ভারতে বিচিত্র কথা মার্কণ্ড আখ্যান।
শুনিলে বাড়য়ে আউ মার্কণ্ড সমান॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৃদ্ধি যশ কীর্ত্তি।
ভাবিয়া গোবিন্দ ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী॥
রচিল ভারত কথা ব্যাস আশীর্ব্বাদে।
সমূহ ব্রাহ্মণগণ চরণ প্রসাদে॥

শান্তিপর্ব্বের সমাপ্তিস্থলে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন :—

"শান্তিপর্ব্ব দিব্য কথা অমৃত অর্ণবে।
শুনিলে পাপের ক্ষয় যশ কীর্ত্তি লভে॥
এহি লোকে সুখ ভোগ অন্তে স্বর্গবাস।
শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস॥
সেহি কথা কহি আমি পয়ারের ছলে।
মোর নিবেদন শুন পণ্ডিত সকলে॥
ভাষা ছন্দে কহি নাহি সমস্কার জ্ঞানে।
শুদ্ধাশুদ্ধ থাকে যদি করিবা শোধনে॥
সমুদ্র সদৃশ হয় পণ্ডিত গম্ভীর।
সমুদ্রে আইসে জল সকল নদীর॥
ছাড়িলে * * অর্ণব করে গ্রাহ্য।
সুখী দুঃখী প্রজা থাকে নৃপতির রাজ্য॥
সর্ব্বকথা শুনয়ে প্রশংসা নৃপের।
তাদৃশী পণ্ডিত রাজা মূর্খ সকলের॥
ত্যাগ নাহি করে রাজা দুঃখী প্রজাগণে।
তাদৃশী পণ্ডিত নাহি ত্যজে মূর্খ জনে॥
শুনহ পণ্ডিত জন মূর্খের রচিত।
গোবিন্দের পাদপদ্মে ভারতের গীত॥
বিরচিল ত্রিলোচন শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাপন॥"

আমরা যে ভাষাকে এখন সংস্কৃত বলি, কিছুদিন পূর্ব্বেও এ প্রদেশে উহাকে "সংস্কার" বলিত। প্রাকৃতজনের মুখে উহাই উচ্চারিত হইত—"সমস্কার"। ত্রিলোচনের "সমস্কার-জ্ঞান" ছিল না, ইহা তাঁহার বিনয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু, আদি ও শান্তিপর্ব্বে তিনি কোন কোন শ্লোকের একবারে অক্ষরানুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদ শ্রুতিকটু হয় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ॥

ত্রিলোচনের অনুবাদ :—

জাহ্নবী যমুনা গোদাবরী সরস্বতী।
প্রভৃতি যতেক তীর্থ ধরণীতে স্থিতি॥
অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ যথায়।
সকল তীর্থের গম্য জানিহ তথায়॥

ত্রিলোচন, ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার শান্তিপর্ব্বে কেবল কৃষ্ণভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানের চমৎকারিত্বে এবং বিবিধ তত্ত্বের মধুর বর্ণনায় এই শান্তিপর্ব্ব অতুলনীয়। এই পর্ব্বের শ্লোক সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক, সুতরাং একশান্তিপর্ব্বই প্রকাণ্ড গ্রন্থ। আর সতর পর্ব্ব, এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা কিছু ন্যূনাধিক হইলে ত্রিলোচনের মহাভারত হইতে বড় হইয়া দাঁড়ায়।

রামমঙ্গল বা রামায়ণ পাঁচালী

পূর্ব্বে এ প্রদেশের রামমঙ্গল-গায়কেরা সকলেই অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণই গান করিত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ তখন এদেশে প্রচারিত হয় নাই। কৃত্তিবাসের মুদ্রিত রামায়ণ আমদানী হইলে পর, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, কাষ্ঠফলক মধ্যে প্রায় সমাধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ লোকে অদ্ভুতের নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া যায়; কেবল কদাচিৎ কোন রামমঙ্গল গায়ক অদ্ভুতের নাম জানিত, এবং কোন কোন সময়ে সেই নামের দোহাই দিয়া দুই একটি পালা গাইত।

অদ্ভুতাচার্য্যের প্রকৃত নাম—নিত্যানন্দ বা নিতাইচাঁদ। নিত্যানন্দ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহার বয়স যখন সাতবৎসর যজ্ঞোপবীত হয় নাই—অক্ষর পরিচয়ের জ্ঞান জন্মে নাই—সেই সময়ে ইনি রামায়ণ রচনা করেন। এই অদ্ভুত কর্ম্মের জন্য তিনি "অদ্ভুতাচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে কবির নিজের উক্তি এই :—

"সোণার রাজ্য নামে ছিল বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে হৈল কেষ্ট নিত্যানন্দ নাম॥
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥

প্রভুর কৃপা হৈল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হইল নাম সেহি সে কারণ॥
যজ্ঞ পবিত্র নাহি বয়সে সপ্তবৎসর!
রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥
জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ।
যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥"

সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালকের রচনা হইলেও অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, আকারে ক্ষুদ্র বা উৎকর্ষে কোনও বাঙ্গালা রামায়ণ হইতে ন্যূন নহে। ইহার শ্লোক সংখ্যা বিংশতি সহস্রেরও অধিক। আমাদের নিকট উহার যে হস্তলিপি আছে, তাহার এক একখানি পত্র ২৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চ বিস্তৃত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র। এইরূপ ৩০৭ খানি পত্রে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ারে লিখিত, মধ্যে মধ্যে ত্রিপদী ছন্দও আছে। কবি, সমাপ্তি স্থলে:—

"শ্রীনিতাইচান্দ লিখে রামপদ আশে।
ও চরণ মিলে যেন অন্তে গঙ্গা বাসে॥"

বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। গ্রন্থ শেষ—"ইতি রাম-সীতা সমাপ্ত"—লিখিত আছে। ইহাতে জানা যায়, কবি স্বীয় গ্রন্থের নাম— "রামসীতা" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উহা "অদ্ভুত রামায়ণ" নামেই শেষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

অদ্ভুতাচার্য্য বাল্মীকির বন্দনা নিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন কিন্তু বাল্মীকির কেবল নামের সহিতই তাঁহার পরিচয় ছিল, গ্রন্থের সহিত পরিচয় ছিল না। তিনি কথক ও গায়কদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহারই সহিত স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া 'রামসীতা' বা রামমঙ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বাল্মীকির সহিত অনেক স্থলে তাঁহার মিল নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিতও নিত্যানন্দের পরিচয় ছিল না। প্রমাণ স্বরূপে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

কৃত্তিবাস, বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম 'রত্নাকর' লিখিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"দূর্পরস্তা নাম ধরে চ্যবন নন্দন।
মরা মন্ত্র দিয়া গেল নারদ তপোধন॥"

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে মন্দোদরী ও অঙ্গদের জন্ম সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান বাল্মীকিতেও নাই, কৃত্তিবাসেও নাই। গল্পটি এই:—

হিমালয় প্রদেশে এক মুনির আশ্রমে একটি ভেক ছিল। মুনির বরে ভেকটি পরম সুন্দরী কন্যারূপে পরিণত হয়। একদা বালী, তপস্যার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া ঐ কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং ঐ কন্যাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রই অঙ্গদ। অতঃপর মুনিকর্ত্তৃক এই কন্যা ময়দানবকে প্রদত্ত হয়। ময়দানব উহাকে স্বীয় কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া মন্দোদরী নাম রাখেন। তৎপরে রাবণ, উহাকে বিবাহ করেন।

অদ্ভুতাচার্য্যের কবিত্বশক্তি অল্প ছিল না। তাঁহার দুই একটি উপমা বড়ই সুন্দর ও অভিনব:—

(১) মধ্যে লঙ্কাপুরী যার প্রহরী সাগর।
সোণার কমল যেন জলের ভিতর॥

(২) সিতিন্ত সিন্দুর রেখা অধিক শোভা করে।
ইন্দ্রের ধনুক যেন অভ্রের উপরে॥

অদ্ভুত কবি, স্বীয় গ্রন্থে এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে যাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ও অভিধান রচনায় এই সকল শব্দ-চয়নের প্রয়োজন হইবে। আমরা এস্থলে কতকগুলি লুপ্ত-প্রয়োগ শব্দ, অর্থসহ উদ্ধার করিতেছি:—

১। সমা—সবা।

২। গোসানি—কর্ত্রী।

শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ "গোস্বামিনী" হইতে উৎপন্ন।

"সর্ব্বভূত আত্মা দেবী জগত গোসানি।"

৩। মেমায়—কাতর ধ্বনি করে।

"মেমায় কুঞ্জর"

৪। উপাদান—জন্ম।

৫। মেলা—ঝাঁপ দেওয়া।

'মেলানি' শব্দ, কৃত্তিবাসে আছে, উহার অর্থ বিদায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'মেলা' শব্দ এখনও গমন অর্থে (সে বাড়ীতে মেলা করিয়াছে) এবং অনেক অর্থে (মেলা লোক, মেলা গরু) ব্যবহৃত হয়।

৬। নিয়ড়ে—নিকটে।

৭। তিকিচ্ছা—চিকিৎসা।

৮। টোন—তূণ।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায়, অদ্ভুতাচার্য্যের গ্রন্থেও দ্বিতীয়ার 'কে' স্থলে 'ক' এবং 'হইতে' স্থলে 'হনে' প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চমীর 'হইতে' চিহ্ন, শতবৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত না। এখন প্রাকৃতজনের ভাষায় 'হইতে' শব্দের প্রয়োগ নাই। 'হইতে' স্থলে 'হনে', 'গণে' 'থনে' প্রযুক্ত হয়:—

কহান্ গণে আইচস্? }
কহান্ থনে আইচস্? } কোথা হইতে আসিয়াছিস?

কইথনে কই লইয়া যায়,...কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়।
হেই হনে অর হইচে। ... সেই হইতে অর হইয়াছে।

গ্রন্থ শেষ রচনার কাল নির্দ্দেশক যে শ্লোক আছে, তাহার নির্ভুল পাঠোদ্ধার করা যায় নাই।

"শাকে বেদ ঋতু সপ্ত চন্দ্রেতে × ×" এই বাক্য হইতে ১৭৬৪ অঙ্ক পাওয়া যায়। কিন্তু উহাকে শকাব্দ মনে করিলে অদ্ভুতাচার্য্য মোটেই ৮৫ বৎসরের লোক হইয়া দাঁড়ান। কাজেই ইহা ঠিক নয়। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী চরণগুলি হইতে গ্রন্থখানি যে, শ্রাবণ মাসের ৭ই তারিখ কৃষ্ণপক্ষ শুক্রবার রাত্রি এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নির্ভুল ভাবেই জানা যায়।

কল্কি পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

তেরথি গ্রাম নিবাসী বৈদ্যবংশীয় রামলোচন দাস কল্কি-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের 'ভাষা-গান' রচনা করেন। এতদিন এই প্রকারের গ্রন্থ "পাঁচালী" নামে আখ্যাত ছিল, কদাচিৎ কোন কবি "ভাষা"ও বলিয়াছেন, "ভাষা-গান" নাম রামলোচনই দিয়াছেন। কিন্তু এ নামের এইস্থলে আরম্ভ এবং এইখানেই শেষ। ছয় সাত শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার নগর ও পল্লীতে 'পাঁচালী' গানের যে স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, রামলোচনেই তাহারা অবসান হয়। ইহার পরে আর কোন প্রসিদ্ধ "পাঁচালী", "ভাষা" বা 'ভাষাগান' রচিত হয় নাই।

১১৮৯ সনের পৌষমাসে রামলোচনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৃষ্ণকান্ত দাস, মাতার নাম যমুনা। দিনাজ-পুর-পতি রাজা তারকনাথের আদেশে রামলোচন কল্কি-পুরাণের 'ভাষা-গান' রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের 'ভাষাগান' রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য তিনি "কবিরত্ন" উপাধি পাইয়াছিলেন। কল্কিপুরাণের ভাষাগান রচনা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি এই:—

একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে।
পাত্রমিত্র সহিত বসিলা রাজাসনে॥
মহা মহা উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
উপবিষ্ট জগচ্চন্দ্র রাজ পুরোহিত॥
হরনাথ চূড়ামণি সভাতে আইলা।
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ বসিলা॥
শিবপ্রসাদ নামক এক চূড়ামণি।
যদুনাথ বিদ্যারত্ন রত্নতুল্য গণি॥
পুরুষোত্তম নামেতে ভট্টাচার্য্য ধীর।
সাগর সমান সবে গম্ভীর সুস্থির॥
বড়সা বল্লম আশা-সোটা বরদার।
সকলে আদবে খাড়া কাতারে কাতার॥
মোগল পাটান আইল শরিফ নজীব।
হামেশা হুজুরে খাড়া আছয়ে নকীব॥
মোস্তানিক সিকস্তায় খোষ নবিছ কাজি।
রাজার মজলিশে আইল শওবোচ্ছ তাজি॥
হরনাথ চূড়ামণি প্রতি রাজা কন।
পুরাণ তন্ত্রাদি বহু করাইলা শ্রবণ॥
মৎস্যকূর্ম্ম বরাহাদি নৃসিংহ বামন।
রাম রাম রাম বৌদ্ধ কল্কি হরি হন॥
প্রথমাবতার হইতে নবমাবতার।
শুনায়াছ পুরাণাদ্যে সভার বিস্তার॥
কিন্তু দশমাবতারে কালির দর্প ভঙ্গ।
শুনি নাই শুনাও সে কল্কির প্রসঙ্গ॥
চূড়াম'ণ শুনি নৃপমণির আদেশ।
শুনাইলা কল্কি পুরাণের সবিশেষ।
নিতান্ত লালসা মনে হইল রাজার।
এ গুপ্ত পুরাণ কথা ভাষা করিবার॥
তবে সে প্রকাশ হবে শুনিবে সকলে।
কিরূপে হইবে ভাষা মহীপাল বলে॥

বিনা ভাষা প্রকাশের হেতু অন্য নাই।
ভাষা করে যোগ্য জন দেখিতে না পাই ॥
সভাসদ সবে কন হইয়া হরিষ।
ইহার উপায় আছে শুন অবনীশ ॥
শ্রীরামলোচন দাস বৈদ্যকুলে জাত।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা করেছে বিখ্যাত ॥
ইথে কবিরত্ন নাম হইয়াছে তাহার।
তার প্রতি দেও রাজা এ কর্ম্মের ভার ॥
শুনি আনন্দিত মন হইল রাজার।
চলিলা শ্রীকান্তকে করিতে নমস্কার ॥
এ দীনেরে মহারাজা করিলা স্মরণ।
শ্রুতমাত্র গেল মহীপালের সদন ॥
এ অধীন হেরি রাজা হরিষ হইলা।
কল্কি পুরাণের ভাষা হেতু আজ্ঞা দিলা ॥
রাজ আজ্ঞা শির ধরি শ্রীরামলোচন।
করিল কল্কিপুরাণ ভাষা বিবরণ ॥”

রামলোচনের এই “ভাষা” কেবল পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত নহে, প্রধানতঃ ইহা গাইবার জন্য রচিত অর্থাৎ ইহা “ভাষাগান”। এ জন্য ইহা ঝিঝিট খাম্বাজ রাগিণীতে মধ্যমান তালে—

“চরণে করি প্রণাম।
শ্রীনাথ হে।”

এই গানে আরম্ভ হইয়া ভৈরবী রাগিণী ঠেকা তালে—

“ত্রিতাপ হরগঙ্গে তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলিমালে ত্রিবেণী ত্রিভঙ্গে ॥”

এই গানে সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে নানা রাগিণী ও তালে অধ্যায়ের পরে অধ্যায় রচিত হইয়াছে।

রামলোচনের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণও এইরূপ প্রণালীতেই রচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ভাষাগানের আরম্ভে তিনি এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

“বিশ্বেতে ব্যাপক পরগণে কাগমারি।
তেরখি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি ॥
নদীতীরে এ নগরে বসতি প্রচুর।
মিশ্রিত ইহাতে গ্রাম সহদেবপুর ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ব্রাহ্মণ সকল এই স্থানে।
বিদ্যা ধর্ম্মে পুণ্যে কর্ম্মে সকলে বাখানে ॥
নানা জাতি বাস করে এইত নগরে।
স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম সকলে আচরে ॥
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত।
এ গ্রামে নিবাস নরদাস সুবিখ্যাত ॥
কবি কণ্ঠহার করি কৃপা সুপ্রকাশ।
কুলে কৈলা মর্য্যাদা এই নরদাস ॥
সেই বংশে শিব অংশে আবির্ভাব হন।
যশসরোবরে ফুল্ল কমল যেমন ॥
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ।
পুণ্যকীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণকান্ত দাস ॥
তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্বসাধারণে বলে শ্রীরামলোচন ॥

গ্রন্থ শেষে লিখিয়াছেন :—

“মম নিজ পরিচয় জনকের নাম।
পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যথা ধাম ॥
বিশিষ্ট রূপেতে আর বাকী পরিচয়।
অবধান কর সব শ্রোতা মহাশয় ॥
রামায়ণ দাস শ্রীরাম তুল্য জন।
আমার প্রপিতামহ সেই শান্ত হন ॥
পিতামহ নাম কৃষ্ণকেশব প্রচার।
যোগে জ্ঞানে তপে শীলে মুনির আচার ॥
পূর্ব্বে মম পিতা নাম করেছি প্রকাশ।
মাতামহ পক্ষ বলি সবার সমপাশ।
নবগ্রাম হয় রামভদ্র সেন নাম।
দুর্গাভক্ত মহাশক্তি অতি গুণধাম।
আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহ মহাশয়।
তপেতে ছিলেন তিনি অতি তেজোময় ॥
প্রমাতামহ শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণ সম।
সত্ত্ব গুণাবলম্বনে না ছিল উপম ॥
মাতামহ রামহরি সেন সবে জানে।
শক্তি, গোত্র গুণময় সর্ব্বত্র বাখানে ॥
তাহার তনয়া হন জননী আমার।
জননী যমুনা নাম্নী সর্ব্বগুণোত্তমা।
মহালক্ষ্মী দুর্গা তুল্য অন্যে উপমা ॥
এ জননী জঠরে আমার উপাদান।
এ দেহ ধারণ তার কর্ম্মফল পান ॥”

কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্যতীত রামলোচন সঙ্গীতামৃতসিন্ধু নামে একখানি সঙ্গীত পুস্তক ও রচনা করিয়াছিলেন।

লাউজানা নিবাসী চণ্ডীপ্রসাদ নেউগীর "হরিনামামৃতরস" এই পর্য্যায়ের আর একখানি গ্রন্থ। ইহা নামে হরিনাম হইলেও ঠিক একবারে বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে। অথচ ইহাতে চণ্ডী, কালী ও তন্ত্রোক্ত চৌষট্টি নায়িকার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইলেও ইহাকে শাক্ত গ্রন্থ বলিবার উপায় নাই। ইহাতে ব্রহ্ম এবং মায়ার কথাও আছে, আবার প্রকৃতি-পুরুষ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ—"আগম নিগম বেদ পুরাণ সম্মত" এবং "তন্ত্রমত" ইহাই তাঁহার কৈফিয়ত। তবে ইহা ছাড়াও "গুরুবক্ত্র গম্য" সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে। সে সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণনারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতির নিকট গ্রন্থকার অবগত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় রঙ্গপুর জেলার মন্থনার জমিদার বাটীর দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। চণ্ডীপ্রসাদ, মন্থনা—জমিদারদিগের চাকুরী করিতেন। এই স্থানেই তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি এই—

বঙ্গে বঙ্গভূমি রঙ্গপুর অন্তঃপাতী।
প্রদেশ মন্থনা মধ্যে দুই নরপতি॥
হর ইন্দ্র নারায়ণ তং হয়েন জ্যেষ্ঠ।
ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠ।
পূর্ব্বে যেন রামকৃষ্ণ লীলার প্রচার।
যুগ্ম নরপতি হন তেন ব্যবহার॥
শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ দাস নৃপতির রাজ্যে।
বেতন গৃহীতে স্থিতি মূল মন্ত্রী কার্য্যে॥"

"হরিনামামৃতরস" রচনায় নারদ—পঞ্চরাত্রই চণ্ডীপ্রসাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।

নারদকে হরি নাম দীক্ষার সময়।
নারদ পঞ্চরাত্রে যাহা শিব উক্ত হয়॥
সেই বাক্য অনুসারে বাচস্পতি উক্তি।
হরিনামামৃতরস বর্ণনে আসক্তি॥
হরবক্ত্রে উক্ত যাহা নারদ পঞ্চরাত্রে।
নারদ হইলা হরি নাম দীক্ষা যাথে॥
সেই স্থূল মূল কিছু করিয়ে সংগ্রহ।
সংক্ষেপে বলিব শুন করি অনুগ্রহ॥

সুতরাং "হরিনামামৃতরস"কে নারদ পঞ্চরাত্রের "ভাষা" বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থারম্ভে চণ্ডীপ্রসাদ, নিজ পরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশ অন্তঃপাতী প্রদেশ কাগমারি।
নিবাস লাউজানা গ্রাম খ্যাত সর্ব্বোপরি।
সেই গ্রামে অনুপম কায়স্থ মণ্ডলী।
আছয়ে নন্দন গুহ তথা বংশাবলী॥
শুনহ আশ্চর্য্য এক জন্ম বিবরণ।
গুহ বংশে রামকৃষ্ণ লভিলা জনম॥
পরম পুরুষ অংশে দেহ অধিষ্ঠানে।
লাউজানা গ্রামে জন্ম রামকৃষ্ণ নামে॥
শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ রামকৃষ্ণের নন্দন।"

চণ্ডীপ্রসাদ হরিনামামৃতের সমাপ্তি স্থলে লিখিয়াছেন—

চন্দ্রের দক্ষিণে স্থিতি করি তার পিতা।
তাহার দক্ষিণে ঋতু বসুর সংহিতা॥
নির্ণয় অঙ্কেতে গণ্য গতে শকাদিত্য।
বৎসরের পঞ্চতম্ মাস মৃগেন্দ্রে আদিত্য॥

ইহা হইতে জানা যায় হরিনামামৃতরস, ১৭৬৮ শকে ভাদ্র মাসে সমাপ্ত হইয়াছিল।

চণ্ডীপ্রসাদের পৌত্র প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী, এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সংস্করণে তাঁহার লিখিত উপক্রমণিকা পাঠে জানা যায়, ১২৫৫ সনে সান্নিপাতিক জ্বরে কুচবিহারে চণ্ডীপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

আজব পাখী

বনের পাখী বনে ছিলো, ছিলো না কোনো বালাই। ভোর না হ'তে যা'র যা' গান আছে গাইতো, তা'রপর বেরিয়ে যেতো যে যা'র কাজে। সারাদিন ঘুরে-ফিরে, ফিরে-আস্‌তো সন্ধ্যা বেলায় নিজের নিজের খড়কুটার বাসায়!

টিয়া নীল আকাশে সবুজ পাখা মেলে ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াতো, আর লাল ঠোঁটে ফসলের শীষ কেটে খেতো।

কোকিল ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে রাঙা চোখে উঁকি মার্‌তো, আর থেকে থেকে "কুহু" দিতো।

বুলবুল মাথায় তাজ প'রে শিস্ দিয়ে বেড়াতো।

চিল আকাশে তা ধরে ভাস্তো, আর শাদা মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতো।

ঘুঘু সারাদুপুর ডাক্তো—ঘুঘু—ঘু।

মরাল তা'র লম্বা গলা ডুবিয়ে ডুবিয়ে মৃণাল টেনে তুল্তো। না হয় নীল জলে নিজেকে ভাসিয়ে দিতো পাল তোলা পান্সির মতো।

সারস সারাদিন জলে বসে' থাক্তো তা'র লম্বা একটা ঠ্যাঙের উপর ভর ক'রে, লম্বা ঠোঁট নিয়ে।

চকোর জ্যোছ্না-সাগরে সাঁত্রে বেড়াতো, কপোত কপোতীকে নিয়ে আরামে থাক্তো মস্‌গুল হ'য়ে।

এ রকমে চলে আস্ছিলো কতকাল থেকে কে জানে। একদিন সহসা বনে শব্দ হ'লো—ঠক্—ঠক্—ঠকর্—

পাখীরা ত্রস্ত হয়ে চম্কে উঠ্লো। চাতকের ফটিক জল চাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। বাবুইর নীড় রচনা থেমে প'ড়্লো; খঞ্জনের অস্থির নাচন স্থির হ'লো।

সবাই চম্কে চেয়ে দেখে একটা পাখী! তা'র সারা গায়ে ছিট্‌কাটা। মাথার উপরে আর একটা ঠোঁট্। পাখীটা একটা গাছ বেয়ে উঠ্‌ছে আর তা'তে ঠোকর মার্‌ছে —ঠক্—ঠক্—ঠকর্—

পাখীটাকে দেখে সবাই অবাক্ হ'য়ে গেলো। পাখীর রাজা ময়ূরের কাছে খবর গেলো। তিনি তখন পেখম খুলে' দাঁড়িয়ে ছিলেন; খবর শুনে পেখম নেমে পড়্‌লো। তিনি এলেন। দেখে কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে বল্‌লেন—ডাকোতো বক মন্ত্রীকে!

ফচ্‌কে ফিঙে ল্যাজ নাচাতে নাচাতে চোঁচা দৌড়ে বকের কাছে গেলো। মন্ত্রী মহাশয় সারাদিন কাজকর্ম্মের পর একবার বেরিয়ে ছিলেন মেঘের কোলে উড়্‌তে। খবর পেয়ে চট্‌পট চলে এলেন। দেখে বল্‌লেন—কিছু তো ঠাওর করা গেলো না।

কাক বড় চালাক লোক। সে ঝট্‌পট্ উড়ে বসে' ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক চোখে কতক্ষণ দেখে' মরিয়া হ'য়ে বলে' ফেল্‌লো—মশায়, আপনি কে? কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে। কি চা'ন?

পাখীটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখ্‌লো, কিছু না বলে আবার শব্দ কর্‌লো—ঠক্ ঠক্ ঠকর্—

কাক বল্‌লে—কিছু বোঝা গেলো না, প্রকাশ ক'রে বলুন।

পাখীটা ঠোক্‌রানো বন্ধ করে' উড়ে গেলো। পাখীরা দেখ্‌লে তা'রা যেটাকে ঠোঁট মনে কর্‌ছিলো সেটা ঠোঁট নয়, চূড়া। উড়্‌বার সময় সেটা ছড়িয়ে পড়্‌লো।

কাক বল্‌লে—ঠিক পেয়েছি, এটা কাঠঠোক্‌রা।

বক বল্‌লেন—আমার মনে হয় ইনি দেবদূত। আম্‌রা যা'তে বাস কর্‌ছি তা'র অন্তরের খবর জানা উচিত, তা'ই ইঙ্গিত করে' গেলেন।

কিছুই ঠিক হ'লো না। সেই থেকে এদের অর্দ্ধেক আনন্দ দ'মে গেলো। সব কাজই করে, কিন্তু এই শব্দটা শুন্‌লেই থম্‌কে যায়। এদের জীবন-পথের অন্তরায় হয়ে রইলো ঐ—ঠক্ ঠক্ ঠকর্—

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত।

পূর্ব্ব স্মৃতি

১

পথের ধারের চাঁপা বরণ মুচকুন্দফুল
গন্ধে প্রাণে চৈৎবোশেখে জাগায় পূর্ব্ব স্মৃতি!
তখন সবি লাগতো ভালো, আকাশ বাতাস ক্ষিতি!
নোতুন বয়েস, মধুর জীবন, গভীর প্রেমাকুল!
দিতাম প্রিয়ায় এই সে প্রসূন, উজল খোঁপার চুল!
লুকিয়ে কভু রাখ্‌তো বুকে জাগ্‌লে লোকের ভীতি,
আবার কভু চুমাই খেতো, কেমন প্রেমের রীতি!
ব্যাকুল হোতাম এসব দেখে', জাগ্‌তো কতই ভুল!
জীবন থেকে সে সব স্মৃতি এখন গেছে উবে'!
গা-ঢাকা সে দেছে কোথায়! পাই না চোখোর দেখা!
দক্ষিণে সে লক্ষ্মীরাজে! আমি অনেক পুবে!
কেউ কি কারো খবর রাখি? ভাব্‌ছি একা একা!
হৃদয় মোদের আগেই গেছে শোক্-সাগরে ডুবে'!
আজ যে তবু বেঁচে আছি, কারণ ভাগ্যে লেখা!

২

দ্বাদশ বছর পূর্ব্বে পেলে আজকের অভিজ্ঞতা,
বন্ধু, চির-সখ্যে জীবন ধন্য হোতো মোর!

মেনে নিতাম প্রেমের বিধান, বইতো সুখে লোর।
সইতো কি প্রাণ বর্ত্তমানের দারুণ বিষন্নতা!
টান্‌লো যাদের সজল আঁখি, প্রাণের আকুলতা,
যাদের তরে এলাম ফিরে আঘাতপেয়ে ঘোর,
তাদের কাছে আজ্‌কে যেন আমিই গরুচোর!
আমার ত্যাগে কোথায় তাদের একটু কৃতজ্ঞতা?
সেদিন থেকেই শান্তিহারা, আর কি পাবো সুখ!
লক্ষ লোকের হট্টগোলে একাই তবু থাকি!
দুখের কথা বল্‌তে আবার হই যে চতুর্ম্মুখ!
কেউ বা হেসে উড়ায় সবি, কেউ বা ঝরায় আঁখি!
(মোদের মধুর গীতিই তাহা, যার মাঝে ঘোর দুখ;)
বুঝ্‌ছি এখন চোখের জলে, জীবন একটা ফাঁকি!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী যে স্থানে অধিষ্ঠিতা সে স্থানের মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে নারীজন্ম সার্থক হয়। রবীন্দ্রের যুগ নারীরপক্ষে অচিন্ত্যপূর্ব্ব নবজন্মলাভের যুগ। রবীন্দ্রের অভয় বাণী পাইয়াই সমাজ ব্যবস্থায়—যেখানে কৃত্রিমতা, যেখানে অন্ধতা, নারী সেখানে তাহার নয়নের সহজ দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছে। সমস্ত মিথ্যা আবরণ উন্মোচন করিয়া পূর্ণতা ও সার্থকতালাভের জন্য নারী বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবার আধ্যাত্মিক সাহস অর্জ্জন করিয়াছে। সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থায়, দুঃখে সুখে নারীর জীবন তন্ত্রীর সুরে সুর মিলাইয়া কত প্রাণ ঢালা সহানুভূতিতে তিনি নারীকে দেখিয়াছেন! অন্তরের সকল সুধা ঢালিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ নারীর সমস্ত অকল্যাণ, সমস্ত অগৌরব, সমস্ত ব্যথা ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছেন। নারীর ব্যথায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, নারীর অশ্রু বিন্দুতে তাঁহার দু'টী চোখ বাষ্পাকুল হইয়াছে, নারীর মৌন বেদনা তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কবির মানস নন্দিনী, আনন্দময়ী, সুচরিতা, কল্যাণী, মৃণাল, হৈমন্তী, দামিনী প্রভৃতির চরিত্র আমাদের জীবনের সম্মুখে নূতন সত্যরূপে উদ্ভাসিত। বাক্যে, চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে মাধুর্য্য ভরা সংযম তাঁহাদের ছিল। নারী হৃদয়ের অন্তস্তলে যে "মানুষ"টী মৌন হইয়া আছেন, তাঁহার সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন; মনুষ্যত্ব তাঁহাদের সম্মুখ হইতে কাঁদিয়া ফিরে নাই,—সত্য অবমানিত হয় নাই। কবির অগণিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল একটী চরিত্রের উল্লেখ করি। ইহাতে নারী সত্তার তেজোদৃপ্ত, নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন স্বরূপের কী পরিপূর্ণ আভাস! সমাজের প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিতা নিগৃহীতা বালিকা বিন্দুর শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিতা "মৃণাল" সত্যের আলোকে দৃষ্টিলাভ করিয়া দ্বিধাহীন নির্ভীকচিত্তে তাঁহার স্বামীকে লিখিয়াছিলেন "আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয় যে কি তা আমি পেয়েছি, আর আমার দরকার নেই, তারপর এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপর তোমাদের যত জোরই থাক্ না কেন, সে জোরের অন্ত আছে ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত। সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙ্গা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনা পারে যে দিন বাজলো সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম জগতের মধ্যে যা' কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ, তাই সব চেয়ে কঠিন কেন; এই গলির মধ্যকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগতে তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক্ না এক মুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দর মহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাট পেরতে পারিনে? তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতিতুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে, কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ বন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হল

তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দ লোকের? কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগলো—কোথায়রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায়রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে, কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে? ঐত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়বে! ওরে মেজ বৌ, ভয় নেই তোর, তোর মেজ বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হ'তে এক নিমেষও লাগে না"!

প্রাণপণে বিধাতার অভয় পদ আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্তরাত্মার গভীর প্রেরণায়, প্রাণবন্তার আলোকে উদ্ভাসিত মৃণাল স্বামীকে যে অপূর্ব্ব পত্র লিখিয়াছিলেন যাহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম তাহা রবীন্দ্র সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে ভাব ও ভাষার সম্পদে অতুলনীয়। ইহার পর হৃদয় আপনা হইতে বিমুগ্ধ ও লেখনী স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। লোক ধর্ম্মের মিথ্যা ও কৃত্রিমতার অন্তরালে যে নিত্যধর্ম্ম মানব সত্তার গূঢ় কেন্দ্রস্থলে বিশ্বসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত তাহার সন্ধানলাভ করিলে স্বভাব দুর্ব্বলা নারীও কিরূপ স্বাধীন সমুজ্জল তেজোময় অপরূপ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে মৃণালের পত্রে নারীর সেই বলদৃপ্ত নির্ভীকতা ও বজ্র কঠোরতার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। কিন্তু মৃণালের চিত্রে কবিবর নারীর সমস্ত কথা নিঃশেষিত করেন নাই; নারীর মাতৃরূপ এবং প্রেয়সীরূপের মাধুর্য্য ও লাবণ্য বর্ণনা করিয়া নারীকে তিনি যেরূপ কমনীয় ও স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে নারী আপন মহিমা উপলব্ধি করিয়া নিজকে ধন্য মানিয়াছে। নারীর কল্যাণ হস্তের দরদভরা সেবার উপর তাঁহার কী গভীর শ্রদ্ধা। তাইত তিনি কর্ম্মশ্রান্ত পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা বেদনা মুছিয়া নিবার জন্য করুণ আবেগে নারীকে আহ্বান করিয়াছেন—"

সাঙ্গ হয়েছে রণ
অনেক যুঝিয়া, অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন,
তুমি এস এস নারি,
আন তব হেম ঝারি
ধুয়ে মুছে দাও ধুলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন,
সুন্দর কর, সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন"।

জ্যোতির্ম্ময়ী সত্তারূপে বিশ্বের মর্ম্মস্থলে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া নারী যে তাহার সুধামাখা হাসি, তাহার সুকোমল সান্ত্বনা, তাহার নিঃসঙ্কোচ ক্ষমা, তাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করে, কবি ইহা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেন তাই তিনি আবার নারীকে এই বলিয়া ডাক দিয়াছেন—

"এসো পুণ্যবান বেয়ে এস হে কল্যাণী,
শুভসুপ্তি, শুভজাগরণ দেহ আনি,
দুঃখ রাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকে নির্নিমেষে,
আনন্দ উৎসবে তব স্নিগ্ধ হাসি ঢালো,
অগ্নি শিখা এসো এসো আন আন আলো,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে, পুণ্য দীপ জ্বালো।
আনো শান্তি, আনো দীপ্তি
আনো ক্ষমা, আনো তৃপ্তি
আনো শুভ্র ভালবাসা, আনো নিত্য ভালো।"

এমন ডাক কত গৌরবের, কত পুলকের! বড় আনন্দে বলি—

কবির সৃষ্টিতে নারী ধন্য, নারী বিশ্বজয়ী॥

শ্রীনীহারকণা বসু।

প্রাচীন কাহিনী

আমার বয়স ৮২ বর্ষ প্রায় অতীত, স্মরণশক্তি এখনও আমার যুবকের ন্যায় আছে। ৮।৯ বৎসর বয়সের ঘটনাগুলিও আমার মানসপটে সংস্কারাবদ্ধ আছে, একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট মনে হয়। আমার পিতৃদেব ৯০ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছেন এবং আমার নিকট যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। দুইশ কি দেড়শ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের কি অবস্থা ছিল তাহা আজকাল অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। এই জন্য আমি ১০ম বর্ষের সৌরভ পত্রিকায় ময়মনসিংহের প্রাচীন কাহিনী শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ধারাবাহিকক্রমে কিছুদিন লিখিয়াছিলাম। এবারও ঐ বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রাচীন কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের বাল্যকালে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি এত সুলভ ছিল যে

মুটেমজুরে ॥০ আনা মাস মাহিনায় চাকুরি করিয়াও ৪।৫ জন লোক প্রতিপালন করিতে পারিত।

আমার খুড়া মহাশয় বলিতেন তাঁহার একজন বাহিরের চাকর মাসিক ॥০ আনা বেতনে ছিল। সে দিবারাত্রি নিরাপত্যে খাটিত আর গৌরব করিয়া বলিত, দিবারাত্রি কাজ না করিলে মুনিবে ॥০ আনা মাহিনা দিবে কেন? ইহাতে বোধ হয় যাহারা দিবারাত্রি কাজ করিত না তাহাদিগকে মাসিক ॥০ আনার কম বেতনেও পাওয়া যাইত।

সেকালের জিনিস পত্রের মূল্যের একটু নমুনা দেখাইলেই ইহা সম্ভবপর মনে করিবেন। ৭০।৭৫ বর্ষ পুর্ব্বে বরিশালে উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মণ ॥৵০ কি ॥৶০ আনায় বিক্রয় হইত। ছোট লোকে মোটা চাউল খায়, তাহার মূল্য আরও কম ছিল।

৫৬ বৎসর পুর্ব্বে আমি ময়মনসিংহে আসিয়া কালীজীরা চাউলের মণ বার কি তের আনায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। মিঠা আলু পাঁচ মণ টাকায় ছিল; এক টাকার আলু কিনিলে গৃহস্থের নিকট এক পঁশারি ফাও পাওয়া যাইত। খাঁটী দুগ্ধ ১৮।১৯ সের টাকায়, উৎকৃষ্ট ঘৃত /২॥ সের টাকায় ছিল।

যশোহর জেলায় সময় সময় এক পয়সা কি দেড় পয়সাও দুগ্ধের সের দেখিয়াছি।

তৈল টাকায় সাত আট সের পাওয়া যাইত, এক পয়সা কি দুই পয়সার অধিক কোন ডাইলের সের ছিল না। নারিকেল ছয় সাত কুড়ি টাকায়, পাকা শবরিকলা ৮।১০টা পয়সায়, এক পয়সার পান কিনিলে ১৫।২০ জনের ৩।৪ দিন চলিত। দুই আনা কি তিন আনার পাকা আম একজন যুবকে বহন করিতে পারিত না। কেবল লবণের সের সাত পয়সা ছিল, কোন দিনই সুলভ দেখি নাই, বরং এখন একটু সুলভ দেখিতেছি।

কিন্তু লবণ সুলভ না হইলেও তখন অনেকেই ঘরে লবণ প্রস্তুত করিতেন। এ বিষয় রাজকীয় শাসন তত প্রবল ছিল না। বরিশাল জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছ ছিল, (এখনও আছে) তখন ঐ প্রদেশের লোকে নারিকেলের শুকনা ডেগা জ্বালাইয়া পাক করিত, এবং সেই ছাই জলে ছাকিয়া জাল দিয়া প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত। কেহবা এই ভাবে কেহবা সমুদ্র জলে প্রস্তুত করিয়া লইত।

মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ছিল, সামান্য অর্থ ব্যয় করিলেই বহু মৎস্য মিলিত। আমি বরিশালে ২৫ কি ৩০টা ইলিশ মৎস্য টাকায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। সময় সময় এক পয়সাতেও ১টা মৎস্য পাওয়া যাইত। ৫৫।৫৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, আমি একবার ময়মনসিংহ হইতে বরিশাল যাইতেছিলাম, নারায়ণগঞ্জ গিয়া দুই পয়সায় একটা প্রকাণ্ড শোল মৎস্য কিনিলাম। নৌকার মাঝিরা বলিল আপনাকে ঠগাইয়াছে, শোল মাছের কুড়ী তের চৌদ্দ পয়সার অধিক নহে, একটু পরেই তাহারা এক পয়সায় ২টা শোল মৎস্য কিনিল। ছোট লোকে মৎস্য কিনিত না, ধরিয়া খাইত, ভদ্রলোকেরও পুষ্করিণীতে এত মৎস্য থাকিত যে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের মৎস্য কিনিতে হইত না।

আমি ৫৩ বৎসর পুর্ব্বে ময়মনসিংহে একটা পাঠা চারি পাঁচ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। আমি একবার পূজার সময় চারিটী পাঠা ২৲ টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম, আত্মীয় স্বজনে অনেকেই আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ দিতে লাগিলেন যে তোমার বড় দুঃসাহস, এত বড় পাঠা কিছুতেই এক কোপে কাটা যাইবে না।

খাদ্য বস্তুর ন্যায় ব্যবহার্য্য বস্তুও অতি সুলভ ছিল। ভদ্র অভদ্র অনেকের ঘরেই চরকা ছিল। প্রায় সকলেই সূতা কাটিতেন, বহুল পরিমাণে তুলার চাষ ছিল। ছোট লোকের মধ্যে অনেকেই কাপড় বুনিয়া পরিতেন। যাঁহারা বুনিতেন না তাঁহারাও অনেকে যুগী জোলা তাঁতিকে সূতা দিয়া অল্প মূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। এইভাবে অন্নবস্ত্রের কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না, পেটের জন্য জীবন সংগ্রামে মরিতে হইত না।

একজনে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়াও পরিবারস্থ ১৫।২০ জন লোককে অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারিতেন। ইহাতে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না থাকিয়া এক সঙ্ঘবদ্ধ থাকিত। নানা জাতির নানা ব্যবসায় থাকায় চাকুরীও তখন এত দুর্লভ ছিল না। এই ভাবে অন্নবস্ত্রের চিন্তা না থাকায় আমোদ প্রমোদ সুখশান্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল।

সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকের বিলাসিতা একেবারেই ছিল না, বিলাসিতার এত উপকরণও তখন ছিল না।

আজকাল যাতায়াতের জন্য রেল, ষ্টীমার, গাড়ী, মটর, রিক্সা ছাইকেল প্রভৃতি যান বাহনের সীমা সংখ্যা নাই, ইহার পরে আবার ব্যোমযান উপস্থিত। সেকালে ভারতের অতি অল্প স্থানে মাত্র রেলওয়ে ছিল, তদ্‌ভিন্ন নৌকা, পাল্কী ও পদব্রজে ভিন্ন কোথাও যাতায়াতের সুবিধা ছিল না।

অনেকে বলেন ভারতের দুর্দ্দশা ঘুচিয়াছে, রেল ষ্টীমারের বিস্তৃতিতে বাণিজ্যের ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। আমরা দেখি ভারতের দুর্দ্দশা ঘোচে নাই, বরং একপক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে। রেল ষ্টীমার কোম্পানীর মালীক সমস্তই ভিন্ন দেশীয় লোক, যাতায়াতের প্রচুর অর্থ দেশ হইতে ভিন্ন দেশীয় লোকে শোষণ করিয়া লইতেছে। মোটর ছাইকেল প্রভৃতির টাকাও ভিন্ন দেশে যাইতেছে। এ দিকে দেশী নেয়ে মাঝি বেহারাগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। একপক্ষে বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু পক্ষান্তরে দেশের সমস্ত শস্য ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতেছে, দেশের লোক অন্নাভাবে মরিতেছে। আমরা পাও থাকিতে পঙ্গু হইয়াছি, এখন আর ২।৪ ক্রোশ পথও হাটিয়া যাইতে পারি না, ঘরের অর্থ পরের হাতে না দিলে চলে না, ইহার নামই সুবিধা, না আত্ম-নির্ভর করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখার নাম সুবিধা, পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

প্রাচীনকালে দেশের লোক পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না, আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুই দেশে উৎপন্ন হইত। আজকাল আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু ভিন্ন দেশ হইতে আসিতেছে। আবশ্য-কীয় বলি কেন অনাবশ্যকীয় বস্তুও আসিতেছে; পেটে অন্ন নাই, এ দিকে ঘড়ি চেইন সোণার ফ্রেমের চসমা প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু না থাকিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। প্রাচীন-কালে এরূপ বেজায় বিলাসিতা ছিল না। আমার খুড়া মহাশয় বলিতেন লোকে বিত্ত পশার দালান কোঠার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করে, খাওয়ার জন্য চিন্তা করে কে? খাওয়া তো পশু পক্ষীরও যোটে। আর আজকাল খাওয়ার জন্য লোক পাগল। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ অতি অল্প লোকই ছিলেন।

হেমনগরের হেমবাবুর শ্বশুর কালীবাবু নামে একজন কালেক্টরীর কেরাণী আমাদের পাড়ায় বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হইয়া এই জেলায় আসাতে বহু গ্রামের বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত, বাঙ্গালী ইংরাজি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তৎকালে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল। মহিলাদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অতি সামান্য মাত্র ছিল, তাহাও বাংলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষদিগের মধ্যেও জমিদারী কার্য্যের উপযুক্ত বাঙ্গলা লেখাপড়াই অনেকে জানিতেন। আমরা বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এক দাতাকর্ণ পাঠ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি। সেকালে রামায়ণ, মহাভারত, দণ্ডী পর্ব্ব, অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বসাধারণের পড়িবার পুস্তক ছিল। হাতের লেখা পদ্মপুরাণও পড়ার জিনিষ ছিল।

তৎকালে কেহ কেহ পারস্য কি উর্দ্দু ভাষাতেও শিক্ষালাভ করিতেন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈদ্য জাতির মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার পর স্মৃতি নব্যন্যায় ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করা হইত, রঘুনন্দনের স্মৃতিই বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল, মন্বাদি মূল সংহিতার অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল না। বৈদ্যদিগের মধ্যে সাহিত্য দর্শনাদির পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করা হইত। তখনকার শিক্ষালাভে কিছুমাত্র অর্থব্যয় করিতে হইত না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও বৈদ্য চিকিৎসকগণ অধ্যা-পনায় অর্থ গ্রহণ করিতেন না, বরং অর্থব্যয় করিতে হইত। তাঁহারা ছাত্রদিগের খোরাক যোগাইয়া বিদ্যা দান করিতেন। এক একজন অধ্যাপকের গৃহে ৮।১০ জন ছাত্র পর্য্যন্ত থাকিত, গ্রাম্য লোকে অন্যান্য ছাত্রের আহার দিয়া টোল রক্ষা করিত।

এখনও অনেক অনেক অধ্যাপক ছাত্রদিগের আহার দিয়া থাকেন বটে কিন্তু গ্রাম্য লোকের সাহায্য করা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। আজকাল সংস্কৃত ভাষায় বহু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এখন আর ছাত্রদিগের পুস্তক লিখিয়া পড়িতে হয় না, কিন্তু প্রাচীনকালে অনেকেরই পুস্তক হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত।

তখনকার ছাত্রের সম্বল ছিল তালের আঁশে নিবদ্ধ তাল পত্রে বা সুপারীর খোলে নির্ম্মিত একটী চোঙ্গা। ইহার মধ্যে থাকিত পুস্তকের তাল পাতার মধ্যে ছিদ্র করার জন্য একটী গোল নরুন, তিন চারিটী বাঁশের কলম, একটী তামার দোয়াত, এবং সেই দোয়াতে বিবিধ ফল পত্রের রসে প্রস্তুত কালী। ঐ কালী প্রস্তুত করিতে প্রায় ৬ মাস লাগিত।

সেই কালীর লেখা তাল পাতার পুস্তক মাসেক খানেক জলে ভিজাইয়া তেনা দিয়া শক্ত ঘষা দিলেও কালীর লেখা উঠিত না। যে বাঁশের চুগায় বহুদিন তৈল থাকিত তাহা ফারিয়া চুগার নিকটে লটকাইয়া রাখিতে হইত। ৫।৬ মাস পরে তৈল শুষ্ক হইলে উহাতে কলম প্রস্তুত হইত এই অক্ষয় কলম ২।৩ পুরুষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইত। তুলট কাগজের পুস্তক ও তাড়ী পাতার পুস্তক অনেকের ঘরে দেখিয়াছি। ঐ সকল পুস্তক যত্নে রাখিলে ৩।৪ শত বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিত। আমার নিকট ২০০ দুই শত বৎসরের তাল পাতার ও তুলট কাগজের পুস্তক এখনও কয়েকখানা আছে।

তৎকালের বালকগণ সর্ব্বপ্রথমে তালপাতায়, তারপর কলার পাতায়, সর্ব্বশেষে সামান্য কাগজে লেখাপড়া শিক্ষা করিত। সেকালের স্বার্থশূন্য অধ্যাপকগণ ঠিক পিতার ন্যায় ছিলেন, টোলের ছাত্রগণ অধ্যাপকের স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন ও পুত্রকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞাকারী থাকিতেন। আর আজকালের ছাত্রগণ পিতৃভক্তও যেরূপ গুরুভক্তও ঠিক সেইরূপ।

প্রাচীন অধ্যাপকগণ ঠিক পিতার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে অন্নদাতা বিদ্যাদাতা ছিলেন, ছাত্রগণও তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় দেখিতেন। আর আজকালের শিক্ষকগণ বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেন ছাত্রগণও তাঁহাদিগকে পিতার বেতনগ্রাহী ভৃত্যের ন্যায় মনে করিয়া থাকেন।

মোট কথা সেকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে না থাকিলেও নীতিপরায়ণতা, কর্ত্তব্যশীলতা, ভক্তি, বিশ্বাস, সরলতা, ধর্ম্মভীরুতা, পবিত্রতা, অধিক মাত্রায় থাকায় সমাজে ঘরে ঘরে সুখ শান্তি বিরাজিত ছিল।

মানবগণ সুস্থ সবল দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি প্রত্যেক গ্রামে বালক বৃদ্ধ যুবক তুল্য পরিমাণে ছিল। যে গ্রামে তিন শত বালক তিন শত যুবক ছিল সে গ্রামে পলিত কেশ গলিত দন্ত শিথিল চর্ম্ম ৮০।৯০ কি শত বৎসরের বৃদ্ধকেও সেই পরিমাণে গুজা হইয়া লাঠীভর দিয়া চলিতে দেখিয়াছি।

কৈ আজকাল্ তো এরূপ বৃদ্ধ একটীও কোন গ্রামে দেখিতে পাই না। ততদুর পৌছিতেই পারে না, ৫০ কি ৬০ বৎসর বয়সেই তলপী তুলিতে হয়। পিতামহের আয়ুঃ পিতা পায় না, আবার পিতার আয়ুঃ পুত্রে পায় না, এইরূপে ক্রমে ক্রমে আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, বল বীর্য্য হারাইয়া আমরা সিংহের কুলে পিপীলিকার পাল জন্মিতেছি। ইহা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল, না আমাদের অন্য কোন পাপের ফল, জানি না।

সেকালের রাজকীয় শাসন ও বিচার বিভ্রাটের কথা শুনিলে আপনারা আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, একটু নমুনা দেখাইতেছি ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে আইন কানুনের এত কড়াকড়ী ছিল না। কি ফৌজদারি, কি আদালত, উভয় দিকেই বিচার বিভ্রাট ঘটিত। হিন্দুর বিত্ত বিভাগাদি হিন্দুর দায়ভাগ অনুসারে হইত, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা দায়ভাগাদি স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারাই মুন্সেফ ও সবজজ হইতেন। তাঁহাদের আর পৃথক কোন আইন দেখিতে হইত না। সে সময় সবজজকে সদর আলা বা আলা সদর আমিন বলিত। পশ্চিমবঙ্গের নরহরি শিরোমণি প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত হাকিম ছিলেন।

এই পণ্ডিত হাকিমগণের মধ্যে প্রায়ই ঘুশখোর ছিলেন, এমন কি বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতেও ঘুশ গ্রহণ করা হইত, তারপর যে ঘুশের পরিমাণ অধিক সেপক্ষে ডিক্রী দেওয়া হইত।

বিচারে হাকিমের কিছুই চিন্তা বা পরিশ্রম করিতে হইত না। পেস্কার মহাশয় দলিলপত্র দেখিতেন, হাকিমের অসাক্ষাতে সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেন, ইত্যাদি কার্য্য শেষ করা হইলে তাহার নাম হইত তৈয়ারী মোকর্দ্দমা। হাকিম সেই তৈয়ারী মোকর্দ্দমায় পেস্কারের মুখে অবস্থা শুনিতেন। অর্থাৎ পেস্কার সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনাইতেন, তারপর তিনি ডিক্রী কি ডিস্‌মিস্ এরূপ একটা কথা মুখ দিয়া বাহির করিতেন। কেন ডিক্রী কেনই বা ডিস্‌মিস্ হাকিম তাহা বুঝাইয়া দিতেও প্রস্তুত নহেন। রায় লিখিতেন পেস্কার মহাশয়, তিনিই একপ্রকার বিচার বিভাগের কর্ত্তা, হাকিম যন্ত্র বিশেষ মাত্র।

পেস্কার মহাশয়ের হাতে সমস্ত কার্য্য থাকায় তিনিও সামান্য পাত্র ছিলেন না। সেকালে এক একজনে পেস্কারী করিয়া দালান কোঠা, তালুক জমিদারী পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন একটী বাগানের স্বত্ব নিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, স্থানীয় অবস্থা দেখিবার জন্য পণ্ডিত (নাম বলিব না) সদর আলা আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে আহারান্তে ব্যবহারের বিষয় আলাপ আরম্ভ করিলেন। ঠিক হইল আট শত টাকা ঘুশ নিয়া আমাদের পক্ষে ডিক্রী দিয়া যাইবেন।

হাকিমদিগের উভয়পক্ষেই ঘুশ নেওয়ার অভ্যাস ছিল, সুতরাং অগ্রিম টাকা দিয়া কল্পিতানুরূপ ফল হয় কি না, এবিষয় অনেকেরই সন্দেহ থাকিত, এজন্য ঘুশখোর হাকিমের অগ্রেই একটা শপথ গ্রহণ করিতে হইত। সেকালের সংস্কারানুসারে আমাদের মোকর্দ্দমায় এক তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল, শালগ্রাম, তুলসী পত্র ও ঘুশের টাকা রাখিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া আমাদের পক্ষে ডিক্রী দিবেন বলিয়া হাকিম ঠাকুর শপথ করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া তাঁহারাও এই পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ১২০০৲ টাকা দিলেন, টাকার পরিমাণ অধিক বলিয়া তাঁহারাই পরে মোকর্দ্দমায় ডিক্রী পাইলেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ন।

বর্ত্তমান চীন সেনানায়ক

আধুনিক সেনানায়কগণের মতন চীনের বর্ত্তমান সেনানায়কদের অধিনায়কত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ কর্ত্তে সামরিক বিভাগের ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলিতে আদৌ পা দিতে হয় নাই। তাঁদের প্রত্যেককেই দস্যুর মতন ভূঁইফোড় বলা চলে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বোধ করি তাঁদের কেউই দেখেন নাই। বর্ত্তমান চীনযুদ্ধে তাঁরা সেনাপতির পদলাভ করেছেন কেবল অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায়, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌশল আর অসীম সাহসিকতার বলে। এর ফলে তাঁদের বিগত জীবনের ভয়াবহ ঘৃণিত ঘটনাগুলির বিবরণ জানা সত্ত্বেও তাঁদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করে তাঁদের অন্যান্য সাধারণ সামরিক প্রতিভা দেখে, আমরা প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। আজকালকার যশস্বী সেনানায়কদের সঙ্গে সর্ব্বদিক দিয়ে তাঁদের তুলনা না চল্‌লেও, ভূতপূর্ব্ব যুগে যে সমস্ত সেনাপতিরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁদের সমকক্ষ এঁদের প্রত্যেককেই বলা যেতে পারে।

যে চারজন সেনানায়ক বর্ত্তমান চীনযুদ্ধে জগতের কাছে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে চ্যাংসোলীন্‌ই হচ্ছেন সর্ব্বপ্রধান। ইনি ভারি দুর্দ্দান্ত লোক, কিন্তু চেহারা দেখে সেটা বোঝাবার উপায় নাই। দেখ্‌তে ইনি মোটেই লম্বা চৌড়া নন; ছোট ছোট দুখানা নরম হাত এবং মেয়েলী ধরণের মুখখানি দেখ্‌লে, এঁকে মোটেই ভীষণ বলে বোধ হয় না। এই বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দারকে সাধারণভাবে চলাফেরা কর্ত্তে দেখ্‌লে, এঁর ভয়েই যে একদিন রুষ এবং জাপান গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তা কেউ বুঝতে পার্ব্বে না। একবার চীনের রাজধানী পিকিংএর কাফীখানায় একজন সাধারণ লোক এঁকে চিন্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল—"মশায়, লেখাপড়া শিখেছিলেন কোথায়?" হেসে ইনি জবাব দিয়েছিলেন—"জঙ্গলের ইস্কুলে"। যে জঙ্গলের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে শেষটায় সেখানেই তিনি কায়েমী আড্ডা গেড়েছিলেন, সেই জঙ্গলের ভিতরের রেল লাইনের উপর দিয়ে গাড়ী চালাতে বহুদিন পর্য্যন্ত রুষ জাপান গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল—রেল গাড়ী লুট তখনকার দিনে এঁর একটা মস্ত আয়ের পথ ছিল। চীন সরকার এঁকে সেনানায়ক করেছিলেন নিতান্তই দায়ে ঠেকে। এঁর দলবলের অত্যাচারের প্রতিবিধান কোন রকমেই কর্ত্তে সমর্থ না হয়ে অগত্যা—দুর্জ্জনং প্রাণপাতেননীতির অনুসরণে সেনানায়কের পদগ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সহ একপ্রস্থ সামরিক পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ডাকাতের সর্দ্দার চ্যাং-সোলীন চীন সেনাপতি হয়ে পরেছেন।

চীনের প্রেসিডেণ্ট হওয়াই হচ্ছে তাঁর আজকালকার প্রধান চেষ্টা। দেশের দুরবস্থা দূর করাই যে তাঁর প্রেসিডেণ্ট হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেন না। বংশ গৌরব বাড়বার জন্যেই তাঁর প্রেসিডেণ্ট হওয়া। সশস্ত্র মোটরকারে না চড়ে তিনি কখনও পথে বেরোন না। তাঁর গুপ্তশত্রুর অভাব নাই। পাছে কেউ কোন সুযোগে শত্রুতাসাধন করে এই ভয়ে সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদা দশ বারজন শরীর রক্ষকও থাকে।

সেনানায়ক হিসাবে এঁর পরেই হচ্ছে জেনারেল চ্যাং-

ছাং-চ্যাংয়ের স্থান। সানটং প্রদেশে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। প্রথম বয়সে তিনি কখনও ডাকাতি কখনও বা ভাল মানুষ সেজে আফিসে চাকরী কর্ত্তেন। কিন্তু চাকরী বাকরীতে তেমন ভাল পোষাল না দেখে, আগের পেশাটাই তিনি ভাল করে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র হল তখন মাঞ্চুরিয়া। আগুন বেশী দিন ছাইচাপা থাকে না! অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ডাকাতের দলের বেশ একজন নাম করা সর্দ্দার হয়ে উঠ্‌লেন। দেশ বিদেশ থেকে চোর ডাকাতেরা প্রতিনিয়তই এসে তাঁর দলপুষ্টি কর্ত্তে লাগ্‌ল। তিনি যখন পূর্ণ উদ্যমে পরস্বপহরণে প্রবৃত্ত, ঠিক্ সেই সময়েই বাধ্‌ল রুষের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ। শত্রুপক্ষের রসদাদি লুট করাবার উদ্দেশ্যে, রুষেরা তাঁকে কাপ্তান পদবী দিয়ে তাঁদের দলে টেনে নিল। এবার চ্যাং ছাং-চ্যাংয়ের ভারি সুবিধা হয়ে গেল। ইচ্ছামত লুটতরাজ ত কর্ত্তে লাগ্‌লেনই, উপরন্তু রুষ সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনেও পেতে থাক্‌লেন।

রুষদের দেখাদেখি জাপানীরাও চ্যাং-ছো-লীনকে ঠিক্ ঐ রকম কাজেই নিযুক্ত করেছিল। চ্যাং সেই সময় রুশ ভাষা শেখেন। তার ফলেই বেতন ভোগী রুষ সৈন্যদলের অধি-নায়ক হতে পেরেছেন। রুষ সেনার নায়ক হতে না পারলে সাংহাই রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠ্‌ত। অবিশ্যি তিনি যে নিস্বার্থভাবে সাংহাই রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলেন একথা বলা চলে না। উত্তরের সেনাপতি ছ্যান্-চুসান্-ফ্যাংকে লোকের কাছে নালায়েক সাব্যস্ত করাই তাঁর মতলব ছিল।

জেনারেল চ্যাং-ছাং-চ্যাং দেখ্‌তে ঠিক্ একটা দানবের মতন—পুরো ছয় ফিট্ লম্বা। চীনদের মধ্যে এত বড় লম্বা লোক কখ্‌খনো দেখা যায় না।

খবরের কাগজের কোন এক রিপোর্টারের সঙ্গে জেনারেল চ্যাং একদিন ছদ্মবেশে পথে বেড়াচ্ছিলেন; বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর তামাক খাবার ইচ্ছা হল। কোন রকমের ইচ্ছা চেপে যাওয়া মোটেই তাঁর স্বভাব নয়। অম্‌নি "সিগার", "সিগার" বলে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন। একটা ফেরিওয়ালা মুহূর্ত্ত মধ্যেই এসে হাজির হল; কিন্তু তার কাছে সিগার ছিল না—ছিল সিগারেট। এই দেখেই জেনারেল চ্যাং একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন। সে বেচারার সিগারেটের বাক্সগুলো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে খুব ঘা কতক চাবুক মেরে বল্লেন—"হারামজাদা, পাজি! আমি চাচ্ছি সিগার—তুই সিগারেট নিয়ে আসিস্ আমার সঙ্গে ইয়ার্কী দিতে!" ছেলে ধর্ত্তে গিয়ে যে কেউটের লেজ হঠাৎ মাড়িয়ে দিয়েছে তা আর ফেরিওয়ালার বুঝ্‌তে বাকী রহিল না। তার কাঁধের উপরে মাথাটী যে তখনও বর্ত্তমান রয়েছে এইটেই পরম সৌভাগ্য ভেবে সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে প্রকাণ্ড এক বাক্স সিগার এনে দিল। সিগার পেয়ে জেনারেল সাহেবের মেজাজটা একটু নরম হল। তিনি ফেরিওয়ালাকে আরও ঘা কতক চাবুক মেরে একশ টাকার দুখানা নোট বক্‌শীস্ করে বিদায় দিলেন। পরে একটী সিগার খুলে রিপোর্টারের সাম্‌নে ধরে বল্লেন—'খান', সে অতি বিনীতভাবে বল্‌ল—আজ্ঞে, আমার তামাক খাওয়ার অভ্যাস নাই।" চ্যাং আর কোন কথা না বলে, সিগারেটের একটা দিক্ তাঁর বড় বড় হল্‌দে রংয়ের দাঁত দিয়ে কেটে, অন্য দিকে আগুন ধরালেন। তারপরে বাঁ হাতে রিপোর্টারের ঘাড় ধরে, ডান হাতে সিগারেটের খানিকটে তার মুখের ভিতর পুরে দিয়ে, পূর্ব্ববৎ বল্লেন—'খান'—। এবার অনন্যোপায় হয়ে খেতেই হল। অনভ্যাসে সিগার টেনে, বেচারা কাশতে কাশতে একেবারে বমি করে ফেলল। দেখে চ্যাং খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন। এক বছর পরে আবার সেই রিপোর্টারের সঙ্গে চ্যাংয়ের দেখা হয়ে ছিল। পূর্ব্ব পরিচয়ের ফলে জেনারেল সাহেব এবার ও তাকে সিগার সাধ্‌তে গিয়ে সে সিগার খায় না মনে পড়াতে বল্লেন—ওঃ আপনি ত সিগার খান না বুঝি। "রিপোর্টার বলল—আজ্ঞে আজকাল খাই—আপনি-ই ত হাতে খড়ি দিয়েছেন।" শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে চ্যাং তাকে পাঁচ বাক্স সিগার উপহার দিলেন।

চ্যাংয়ের পরেই জেনারেল ফেং-ইউ-সিয়াংএর নাম উল্লেখ যোগ্য। এঁকে লোকে খৃষ্টান জেনারেল বলে—কারণ ইনি খৃষ্টধর্ম্মবলম্বীয়। এর সৈন্যগণ কুচ কাওয়াজ করে চলবার সময় ব্যাণ্ডে ক্রমাগত—খৃষ্টান সৈন্যগণ অগ্রসর হও—এই সুরটী বাজতে থাকে।

দক্ষিণ বাহিনীর অধিনায়ক হচ্ছেন ফেংএর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি বৌদ্ধ সেনানায়ক বলে জনসমাজে পরিচিত। ফেংএর মতন তিনিও নিজের বাহিনীকে বৌদ্ধ-

ভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। সৈন্য পরিচালনাদী কোন ব্যাপারেই তিনি ফেংএর সমকক্ষ নন, বলে এ প্রবন্ধে আর তাঁর কথা উল্লেখ কর্ব্ব না।

জেনারেল ফেংএর জন্ম হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। ভবিষ্যতে সৈন্য বিভাগে কাজ কর্ব্বেন বলে, তিনি প্রথম বয়সে একটী সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে স্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি সাধারণ সৈনিক-রূপে সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন। মতিস্থির না থাকায় ক্রমাগত চাক্‌রী ছাড়ার ফলে, ইউরোপের প্রায় সমস্ত শক্তির সৈন্য বিভাগেই তিনি কাজ করেছেন। তাই আজকালও গর্ব্ব করে বলেন—"ইউরোপের সব শক্তির সঙ্গেই আমি লড়েছি।"

জেনারেল ফেং নিজের সৈন্যদলকে ভারি কড়াশাসনে রাখেন। খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত কাজই তিনি তাদের করতে বাধ্য করেন। যুদ্ধ অন্তে বা কুচকাওয়াজ করে পথ চলার সময়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর বাড়ী তাঁর সৈন্যেরা কখখনো লুট করতে পারে না। অবসর সময়ে তাদের দিয়ে তিনি পথ প্রস্তুত করান। তাঁর সৈন্যেরা ভাল রাস্তা তৈরী কর্ত্তে পারে বলেই যুদ্ধের সময়ে রাজধানী তিনি নিজের দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পথের পাশের বড় বড় গাছগুলি কেটে বিক্রী করে আগে চীনের রাজ কর্ম্মচারীরা টাকা নিজেদের পকেটে পুরতেন। কিন্তু জেনারেল ফেং এতে মহাআপত্তি করে, পিকিংরাজ পথের মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপন লট্‌কালেন—"পুরানো গাছ-গুলি রক্ষা করলেই দেশ রক্ষা হবে।"

জেনারেল ফেং গোঁড়া খৃষ্টান হলেও, লোকে বলে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম কিম্বা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। লোকের কাছে স্বল্পাহারী বলে পরিচিত হবার ইচ্ছা ফেংএর অত্যন্ত বেশী। নিমন্ত্রণ ইত্যাদিও তিনি খুব কম খান। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বলেন যে লোকের সম্মুখে অল্প খাবেন বলেই বাড়ী থেকে তিনি আগে একাই তিন চারজন লোকের খাবার খেয়ে আসেন। গো মাংস ফেংএর অতি প্রিয় খাদ্য।

অধীনস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীরা তাঁকে অত্যন্ত ভয় করে। সামান্য একটু ত্রুটী পেলেই তিনি বাঁশের লাঠী দিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর প্রহার করেন। ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেনের * 'কুমিণ্টং' মতবাদের সঙ্গে ফেংএ সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

আগে যে তিনজনের কথা বললাম তাঁদের সবার চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন মার্শাল উ-পি ফু। উত্তর বাহিনীর সেনানায়কদের মধ্যে ইনিই হচ্ছেন সব চেয়ে দয়ালু, ন্যায়বান এবং কার্য্যতৎপর। বিদেশেও এঁর একটু বেশ নাম আছে। সৈন্যেরা এঁকে খুব খাতির করে এবং আপনার লোক বলে ভাবে। একবার একটা যুদ্ধে তাঁর জনৈক সহকর্ম্মীর সৈন্যগণ রীতিমত মাইনে পাচ্ছিল অথচ তাঁর অধীনস্থ সেনাদের প্রত্যেকের দুই মাস করে মাইনে বাকী পরেছিল বলে তাদের তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসন। কর্ত্তৃপক্ষ এতে তাঁর উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও সৈন্যদের পাওনা পরিষ্কার করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উত্তর দেশের যুদ্ধে তিনি হেরে গিয়েছিলেন শুধু কেবল খৃষ্টান সেনাপতি ফেংএর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। পরাজয়ের পরে উ-পি-ফু বহুদিন হ্যাঙ্কোতে এসে বাস করেন। কিন্তু সেখানে থেকেও জাতীয় দল কর্ত্তৃক তাড়িত হয়ে চেংচাউ সহরের অন্তর্গত হুনানে এসে আশ্রয় নেন।

এঁর আবার একটু কবিত্ব কণ্ডুতিও আছে। কামানের গোলায় একটী সৈন্যকে মরতে দেখে ইনি লিখিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের ঠাণ্ডা বাতাস আমার গাত্রাবরণ টানিয়া ধরিয়া তাহার উপরকার সদ্যরক্তের দাগ দেখিতেছে। কাপড়ে রক্ত দেখিয়া দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি নিঃসম্বল। সাহসী হৃদয় ভিন্ন আর আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই। বর্ত্তমান দুর্দ্দশা আমার চিরসাথী হইলেও, আমার সরল হৃদয় কখনও দুর্ব্বল হইবে না।"

---

* "কুমিণ্টং" কথাটার মানে ব্যাপক হলেও সোজা কথায়ই বলার চেষ্টা কর্ব্ব।

কু মানে হচ্ছে দেশ, মিন লোক আর টং হ'ল সমিতি। এর থেকে মোটের উপর মানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে সমিতি দেশের শাসন সংরক্ষণের কাজ দেশীয় লোকের দ্বারা করাতে প্রয়াস পায় তারই নাম "কুমিণ্টং"। ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেনের বিখ্যাত মতবাদত্রয়ের উপরেই "কুমিণ্টং" দল প্রতিষ্ঠিত। মতবাদত্রয় যথা:—

(১) বিদেশীর হাত থেকে জাতীয় স্বাধীনতার সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার।

(২) শিক্ষা বিস্তারের দ্বারায় জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা।

(৩) দেশের লোকের অন্নাভাব দূর করা।

বহুবার পরাজিত হলেও সত্যিসত্যিই উ পি-ফু একটী দিনের জন্যও হতাশ হন নাই। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে তিনি কখনও সম্মতি প্রদান করেন নাই। মোটের উপর যথেষ্ট সজ্জন থাকলেও চীনে সেনানায়কদের খামখেয়ালী, দীর্ঘসূত্রীতা প্রভৃতি দোষগুলি থেকে ইনিও মুক্ত নন। একটা চীনে প্রবাদ আছে—"সমস্ত পচা মাংসের গন্ধই এক"—কথাটা এঁদের সকলের সম্বন্ধেই বেশ খাটে।

এইবার চিয়াং-কে-সেকের কথা সামান্য একটু বলেই প্রবন্ধ শেষ কর্ব্ব। ইনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছেন। দেখতে টিং টিংএ চেহারার হলেও লোকটী একেবারে কর্ম্মের অবতার। অষ্টপ্রহর কাজ নিয়েই আছেন। চীনেরা নামজাদা চাখোর হলেও ইনি নাকি একেবারেই চা খান না। তার পরিবর্ত্তে প্রায় সদা-সর্ব্বদাই এক এক ঢোক গরম জল খেয়ে থাকেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। আমেরিকা প্রভৃতির মতন যে কোন একটা স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্টের আসনে এ'কে বসিয়ে দিলেও মোটেই বেমানান হয় না। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনকে লোকে যেমন চীনের জর্জ্জ ওয়াশিংটন বলে থাকে, এঁকেও তেমনি চীনের নেপোলিয়ন বলা চলতে পারে।

শ্রীবীরেশ্বর বাগছী।

পাট।

দেশ্‌টা জুড়ে' প্রতি বছর কেবল পাটের চাষ !
হায়রে, কৃষক পাট বুনে' আজ কর্‌লে সর্ব্বনাশ !
চৌদ্দ "পাখি" পাট বুনে' সে "খাদা" ভুঁই যার আছে,
দুই পাখি তার ধানের জমি যা' দিয়ে প্রাণ বাঁচে,
ছোট বড় গুদাম সবই পূর্ণ তাতে পাট ;
চালান দেওয়ার নৌকা এসে ভরছে নদীর ঘাট !
রথের দিনে পাট কিনে সব করছে শুভক্ষণ,—
নদের চাঁদ, রাম কানাই আর পাটের বাবুগণ !
দালাল, কুলি, মাঝিগুলি করছে হট্টগোল !
"বড় বাবু" সুর তুলেছেন, "পাটগুলি নায় তোল !"
বিশ টাকা মণ দু হাজার গাঁট্‌ চালান দিবেন আজ ;
ফজল গাজি মাপুছে একা, চলছে পাটের কাজ !
ধর্ম্মপ্রাণ নিধিরাম তিলক ফোটা করে,
টাকার খুতি হাতে নিয়ে চলছে "আরত ঘরে।"
আড়তদার ঐ রাধাচরণ ফির্‌ছে ঘরে ঘরে ;
টাকার চিন্তা টাকার ধেয়ান, মুখেই "কৃষ্ণ হরে।"
ছলিম মিঞা থলি নিয়া আশায় চেয়ে আছে ;
নশ' পঞ্চাশ পাটের টাকা বড় বাবুর কাছে !
সেলাম দিয়ে হাত বাড়ায়ে হাস্যমুখে কয়,—
"টাকা দিয়ে মেহেরবানি করেন মহাশয়।"
দেশবাসী আজ অনাহারে অন্নাভাবে কাবু ;
পাটের চাষীর মুখেই হাসি, টাকায় ভীষণ বাবু !
দুদিন তারা দুধে মাছে মজা করেই খায় ;
ফুৎকারে সব পাটের টাকা কোথায় উড়ে যায় !
অন্ন বলে' কাঁদন শেষে, হ'য়ে নিরুপায় ;
ধানের গোলা বাঙ্গালা হতে উঠল বুঝি, হায় !
বোঝে না কেউ ভাল মন্দ, মরে আপন দোষে ;
পাট্‌কে বলি "রক্ত চোষা" দেশের রক্ত শোষে !
গরম হাওয়ায় নরম করে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়,
পাট্‌ ডুবানো পচা জলে মহামারীর ভয় !
বুদ্ধিনাশা হাবা চাষা পাটের আবাদ করি,
দেশ্‌টা দিল রসাতলে সেই দুখে আজ মরি !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

প্রবাদের আবাদ।

(৫ম চাষ)

বাংলার প্রবাদ যে মূল্য বহন করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। নহিলে "সৌরভ" এই "প্রবাদের আবাদ" করিত না। আরো কিছু প্রবাদ পাইয়াছি. আশা করি পাঠকেরা এই নববর্ষে প্রবাদের আবাদ পাইয়া বিরক্ত হইবেন না। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন—

"আবাদ করলে ফলতো সোণা।" সোণা ফলুক আর নাই ফলুক আষাঢ়ের মেঘে বারিবর্ষণ করিলে এই আবাদী মাটীতে হয়ত কিছু কিছু ভাল ফসল গজাইয়া উঠিবে। মাটী খাঁটি হওয়া চাই।

১। যে দেয় ভাত শালা পানী শালী
যম তারে পাড়ে গালি।

অর্থাৎ যে আগন্তুককে ভাত, শালা (গৃহ) পানি (জল) শালি (শালি তণ্ডুলের ভাত)।

২। বিহানী লৌকিক যে জন ছাড়ে
শনি ঠাকুর ঘুরায় তারে।

প্রাতঃকালে আহারাদির জন্য অনুরোধ করিলে তাহা উপেক্ষা করিতে নাই।

৩। বলবে না—ঢাক্‌বে।

কাহারো গোপন দোষ প্রকাশ করিবে না।

৪। স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান
শতেক পাপী স্বর্গে যান।

৫। যার গাই সে বলে বাঁজা (বন্ধ্যা)
পাড়ার লোকে কয় বছর-বিয়ানী।

টিকা নিষ্প্রয়োজন।

৬। কীর্ত্তন ছাড়াইয়া দশা।

৭। মার পরণে তেনা নাই, বেটার বাঁকা টেরি।

৮। গোঁসাইর চেয়ে কসাই ভাল।

১০। শত শত চিম্‌টার বাড়ি খায়,
একটা ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

১০। সূর্য্যের তাপ মাথায় সয়, তাতা বালি পায়ে সয় না।

১১। রাজার যুবরাজ, মোহন্তের চেলা,
ঘর জামাই, পোষ্যপুত, এটাও নয় ভালা।

১২। হিসাব নাহি, তজবীজ নাহি
সে পরগণা জয়নসাহী।

১৩। দশজন কইলেই একজন ভূত।

১৪। আগুণ আর কাঁঠাল হালি।

১৫। হস্তপ্তীর আলু পোড়া
ক্ষিধা বেবাক পেট জোড়া।

১৬। হাড়াভাইত্যার দাঁত বিষ ; (হাড় হাভাত)

১৭। চেংড়ার কথা, টেংড়া মাছ।

১৮। সাধলেই উজাইয়া উঠে।

১৯। তেলচোরাও পক্ষী।

২০। ... কবিরাজের বাতের রোগী
পৈতাওয়ালা আসল যোগী,
কামধেনু কবলী গাই
শতেকে দু একটা পাই।

২১। ধন দৌলত চুণের ফোটা
যার দাগ, থাকে খোঁটা।

২২। শতেকে নিরন্নব্বই।

(অর্থাৎ অনেকেই একশ কথার ৯৯টাই মিছা বলে, কিন্তু খাতিরে কেহ ভাঙ্গিয়া না বলিয়া এই কথা বলে।

২৩। খলের পীরিত, জলের রেখ,
চইলা যায় দেখ না দেখ।

২৪। খুড়ার জয়েই সকলের জয়
লগে লগে হয় হয়।

একজন "হাম বড়া" অতি অসঙ্গত কার্য্য করিলেও সকলে তাহা সমর্থন করে।

২৫। বামুন, গরু, ছাগল
তিনই দড়ির পাগল।

২৬। আজাইরা বেটী ডাইলে চাউলে মিশাইয়া বাছে।
(আজাইরা যাহার হাতে কাজ নাই)

২৭। চোরের বাড়ীতে দালান হয় না।

২৮। কর্ত্তায় কইছেন * ভাই
আনন্দের আর সীমা নাই।

২৯। কথা কড়া, কারসাজি
তিন 'ক' তে কবিরাজী।

৩০। বাকী, বাক্য, বাটপাড়ী
এই তিনে দোকানদারী।

৩১। বাকী দিলেই ফাঁকী।

৩২। সস্তার তিন অবস্থা।

৩৩। ভাইগো চিড়া, পিডায় ত জাতিনাশ।

৩৪। আমি যদি কই, ভাইঙ্গা পড়ে দই।

৩৫। ছালার মুখ খুললেই মুস্কিল।

৩৬। দান, দক্ষিণা, দিন পাইলে,
দোষ নাই "মিছা" কইলে।

৩৭। কুত্তারে লুত্তা দিলে ঘাড়ে উইঠা নাচে।

৩৮। পথের মুদি হাওরের ডাকাইত।

৩৯। অন্ন চিন্তা চমৎকার,
বস্ত্র চিন্তা নিরাকার
তার থাইক্যা অধিক চিন্তা
তামাক নাই যার।

জনৈক ধূমপানাসক্ত ব্যক্তির রচিত উক্তি।

৪০। লাভ নাই বাণিজ্যের কেচকেচি সার।

৪১। আকাঁড়া চাউলের দোকানদারী।

অনর্থক কথার আলোচনায় সময় কাটান স্থলে এ প্রবাদ প্রযুজ্য।

৪২। আগে হাঁটুনী পান বাঁটুনী
বউএর ধাই
এ তিন কাজের নাম নাই।

৪৩। দিতে তিন কড়া
লইতে পাঁচ কড়া।

ব্যবসায়ীরা ছেলেপিলেকে ছেলে বেলায়ই হিসাব শিক্ষা দিতে এইরূপ কথাই শিখাইয়া থাকে।

৪৪। উই, ইন্দুর, কুজন
ভাল ভাঙ্গে তিনজন।

৪৫। উচ্ছে কাঁচ, পটলের বীচি, মাছের মা (খুব বড় মাছ)
বুড়া মেড়া, ছাগের ছা (কচি পাঠা)।

৪৬। উঠানই পিরথিমীর শেষ।

যাহারা নিজ নিজ ঘরে বসিয়াই দুই চারজনকে নিয়া জটলা পাকাইয়া এ উহাকে বড় বলিয়া শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলে তাহারা চক্রবাল রেখাকেই পৃথিবীর সীমা মনে করে।

৪৭। আবাত্তি পাক্‌লেই মিঠা কম।

লেখাপড়া না শিখিয়া বাপ দাদার টাকার জোড়ে অল্প বয়সেই যাহারা বুদ্ধিমান সাজে ? তাহাদের প্রতি।

৪৮। "একছিপে মাছ লাগে না
সেই বা কেমন বড়শী,
(আর) এক ডাকে রাও করে না
সেই বা কেমন পড়শী।"

৪৯। "একমনে সমুদ্র শুকায়।"

দশজন পিণ্ডে প্রাণে লাগিলে একজনকে জব্দ করা সহজ। সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করিয়া একজনকে বিনা কারণে নাস্তানাবুদ করা অতি সোজা।

৫০। একে নিদ্রা, দুই এ পাঠ,
তিনে গল্প চাইরে হাট।

ছেলেপিলেরা পড়ার সময়, একা থাকিলে ঝিমায়, দুইজন হইলেই পড়ে, তিনজন হইলে গল্পের আড্ডা হয়, আর চাইর-জন একত্র হইলে দস্তুরমত 'এক হাট' বসিয়া যায়।

৫১। লেখাপড়ায় কাঁচা কলা,
তবুও ত টাকা ওয়ালা। :

৫২। গয়নার মধ্যে বালা,
কুটুম্বের মধ্যে শালা।

৫৩। খাইতে পায় না পঁচা পুটী
হাতে আবার সোণার আংটী।

৫৪। গায়ে ফুঁ দিয়া পাড়া বেড়ায়
'পড়া'র নামে পেট পাকায়।

এক শ্রেণীর ছাত্র বাবুয়ানায় ষোল আনা বহাল রাখে— কিন্তু পড়ার জন্য বলিলেই পেট বেদনা'র অজুহাতে মুখ চুণ করিয়া বসে। পেট বেদনা দেখার যো নাই।

৫৫। ছাপরবন্দের টুলি উদাম।

৫৬। ছেলে নষ্ট হাটে,
বউ নষ্ট ঘাটে।

৫৭। ভাঙ্গা লোটা, ছাবড়া গাই
চোর পড়শী ধূর্ত্ত ভাই
বেকুব পুত (আর) নষ্ট স্ত্রী
এর চাইতে আর কষ্ট কি ?

৫৮। কুত্তার কামড় হাঁটুর নীচে।

৫৯। দই দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যায়
পেঁয়াজ, রসুন, হটুকী(ও) খায়।

৬০। কথায় বার্ত্তায় ছটর ফটু।

চাষ ত চল্লো পাচটা আবাদও হইল না, কিন্তু ফসলের নমুনা যে কেমন, তা দশজন বিচার কর্ব্বেন।

আরও অন্যান্য কয়েক জেলার কয়েকটী প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। ক্রমশঃ সে গুলি বাহির করিবার ইচ্ছা; পাঠক মহোদয়গণ একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মায়ের ডাক।

কে ডাকিতেছে ঐ! ভগ্ন ক্ষীণকরুণ-কণ্ঠে চিরপরিচিত স্বরে কে ডাকিছে ঐ ? বিদ্যুতালোকোদ্ভাসিত, শত-শকট-চক্র-শব্দিত, অনেক-জন-মুখরিত মহানগরীর মহাকোলাহল ভেদ করিয়া কাহার এই ক্ষীণ কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল ?

"কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে
আয় ছুটে আয় আমার পাশে ?"

একদিন প্রথম নয়ন উন্মিলন করিয়া যাহার মধুর হাসি দেখিয়াছিলাম, যে শ্যামার শ্যামল ক্রোড়ে প্রথম আশ্রয় পাইয়াছিলাম, যাহার মুক্ত বায়ুতে আমার প্রথম শ্বাস বহিয়াছিল, যাহার গোধনের স্বাদু ক্ষীর ধারা আমার প্রথম ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিল, এ আমার সেই পল্লীজননী। আজ রুক্ষ-কেশা দীনা মলিনা ধুল্যবলুণ্ঠিতা। পদ্ম কুমুদ কহ্লার পূর্ণ, বাপী-তড়াগ শোভিতা পল্লী আজ নানা রোগ বীজানুবাহী স্বল্প তোয়া পঙ্কিল পল্বলা।

যাহার নানা-কুসুম সুগন্ধবাহী প্রাণতর্পিত বায়ু, মনে আনন্দ আনিত, আজ তাহার পর্য্যুসিত-তৃণ পর্ণ-গুল্মের শ্বাসরোধকারক গন্ধে প্রাণে ভীতির সঞ্চার করে। ধেনুচরা মাঠ আজ ধেনু-শূন্য। ঘটোধ্নী গাভীর প্রাচুর্য্য আর নাই। কঙ্কালসার শীর্ণ-স্তনী গাভীগণ আজ ক্ষীর হীনা। তা'ই লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা আজ লক্ষ্মীছাড়া। অকাল মায়ের কোল ছাড়িয়া অকালে কালেরে কোলে আশ্রয় লইতেছে।

একদিন প্রতি সন্ধ্যায় কত দেউল হইতে যাহার শঙ্খ-শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ উত্থিত হইত, আজ তথায় মশক কুলের করুণ ঝঙ্কার সন্তান হীনা মাতার কাতর ক্রন্দনের ন্যায় শোনাইতেছে।

তাই মা ডাকিতেছেন—ওরে আমার উদাসীন সন্তান আয়, ফিরিয়া আয়, দুঃখিনী মায়ের কোল ছাড়িয়া আর কত কাল দূরে থাকিবি !

বঙ্গ জ্যোতিষে অয়ন বিকার।

আমাদের অনুমান হয় যে রবিশুদ্ধির প্রথমোক্ত শ্লোকটী এরূপ সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে যখন ১৩ই চৈত্র ও ১৩ই আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। অর্থাৎ যখন অয়নস্ফুট (কলাদি বাদ দিয়া) ছিল ১৭।০।০ বর্ত্তমান ১৩৩৩ সনের প্রারম্ভ কালে (অর্থাৎ ১৩৩২ সনের অন্তে) অয়নাংশাদি ছিল ২১।২৪।১৮ তখন হইতে বর্ত্তমান ১৩৩৩ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অয়নবিন্দু ২১।২৪।১৮ – ১৭।০।০ = ৪।২৪।১৮ অংশাদি আরও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর ৫৪ বিফলা বৃদ্ধি হইলে ৪।২৪।১৮ অংশাদি বৃদ্ধি হইতে $\frac{\text{৪।১৪।১৮ অংশাদি}}{\text{৫৪ বিফলা}} = \frac{\text{২৬৪।১৮ কলাদি}}{\text{বিফলা}}$

$= \frac{\text{১৫৮৫৮ বিফলা}}{\text{৫৪ বিফলা}} =$ ২৯৩৷৷০ বৎসরের আবশ্যক। সুতরাং ঐ শ্লোকটী বাঙ্গলা ১৩৩৩ – ২৯৩ = ১০৪০ সনের বা ১৫৫৫ শকের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ ১৫৫৫ শকের কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাৎ সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং এই শ্লোকটীর বয়স ৩০০ বৎসরের বেশী বলিয়া অনুমান হয় না। কাজেই শ্লোক কর্ত্তা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। *

আমরা শ্লোক রচয়িতার উদ্দেশ্যের ও কথঞ্চিৎ আভাষ পাইতে পারি। তিনি সায়ন ও নিরয়ণ এই উভয় মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কোনটাতেই যেন তাহার পূর্ণ আস্থা ছিল না। তাই এখনকার ন্যায় নিরয়ণ মত সাধারণে প্রচলিত থাকিলেও তিনি সায়ন মতটীকে আদৌ উপেক্ষা করিতেন না। পক্ষান্তরে এই পরবর্ত্তী মতটীর যথেষ্ট পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কাজেই দেখা যায় স্থল বিশেষে অর্থাৎ যে সময়ে শুভদিনের অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিত সেই সময়ে তিনি (মতান্তরে) সায়ন মতেও ব্যবস্থা দিয়া ১৪টী শুভদিন খুঁজিয়া বাহির করিতেন।

কিন্তু পরস্পর মতদ্বৈধ পূর্ণ ভাবদ্বয়ের উভয়টী একই সময়ে পৃষ্ঠপোষিত হইতে পারে না। তাহাতে ভুল অনিবার্য্য। সুতরাং শ্লোক কর্ত্তার মতের সম্পূর্ণ মূল্য কি তাহা নির্ণয় করা বিচার সাপেক্ষ।

এখানে শ্লোককার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে উপচয় স্থানস্থিত রবিই সর্ব্বদা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। কারণ নিরয়ন মতে উপচয় স্থানস্থিত অর্থাৎ তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থানের রবি ইষ্ট ফলপ্রদ। আর সায়ন মতে গননা করিলে তখন চৈত্র মাসের তের দিন পরই বৈশাখ আরম্ভ হইত। সুতরাং মাসের ১৩ দিন পরে সায়ন মতে দ্বিতীয়, পঞ্চম,

---

* গণিত হিসাবে এই শ্লোকটীর বয়স ২১০০ ৩৯০০, ৫৭০০, ৭৫০০ ইত্যাদি বৎসরও হইতে পারে। কিন্তু এরূপে হিসাব করিলে বিষয়টীকে অসম্ভাবিত প্রাচীনযুগে নিয়া ফেলানো হয়।

নবম (ও দশম) স্থানস্থিত রবিকে যথাক্রমে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম (ও একাদশ) স্থানে ধরা যাইতে পারে। দশম ও একাদশ এই উভয় স্থানস্থিত রবিই শুদ্ধ বলিয়া মতান্তরে যে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে "দশগোহনীষ্ট" একথা বলা হয় নাই, এবং তাহা বলার আবশ্যকতাও নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও জন্মরাশির ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহার জন্মরাশি মেষ, তাহার নিরয়ন মতে আষাঢ় মাসের মিথুনস্থ রবিশুদ্ধ। আর ১৩ই চৈত্র দিবা রাত্রি সমান হইলে (১৪ই চৈত্র হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইলে, অর্থাৎ সায়ন মতে) ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে রবিকে মিথুন রাশিতে ধরা যায়। কাজেই এই মতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত নিরয়ন মেষ রাশির রবিশুদ্ধ বলা হইল। আমরা নিরয়ন মতে আষাঢ়ের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরয়ন মেষ রাশির, আর সায়ন মতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সায়ন মেষ রাশির রবিশুদ্ধ হইতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে নিরয়ন ও সায়ন রবির সমন্বয় করিবার ব্যবস্থা করা হইলেও নিরয়ন চন্দ্রস্ফুটকে সায়ন করিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। যাহা হউক ১লা আষাঢ় হইতে ১৩ই আষাঢ় পর্য্যন্ত রবি উভয় প্রণালীতেই শুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু এ স্থলেও চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদির সম্বন্ধে কোন কিছু জানা নাই। জন্মচন্দ্র যদি মেষের ১৩ অংশের মধ্যে অবস্থিত থাকেন তবেই ১লা হইতে ১৩ই আষাঢ়ের রবি উভয় মতে শুদ্ধ হইবেন নচেৎ নহে। সুতরাং এই শ্লোকে শাস্ত্রকার অয়ন সিদ্ধান্তটিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আমাদের অনুমান হয়।

এস্থলে আরও একটী কথা বলিবার আবশ্যক। ৩০০ বৎসর বা ২৯৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৩ই চৈত্র দিবা রাত্রি সর্ব্বত্র সমান হইত। কিন্তু অয়নের পশ্চাদগতি নিবন্ধন বর্ত্তমানে ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইতেছে। সুতরাং "ত্রয়োদশ দিনাৎপরং" এর অনুযায়ী মতান্তরে রবিশুদ্ধির যে ব্যবস্থা আছে তাহা বর্ত্তমানে আর চলে না। "নবম দিবসাৎপরং" হইলেও কতকটা যুক্তি সঙ্গত হইত।

আমাদের আলোচনার সার মর্ম্ম এই যে মূল শ্লোকানুসারে দেখা যায়—

(১) মেষের ০ অংশ হইতে ৩০ অংশের মধ্যে চন্দ্র থাকিলে মিথুনের ০ অংশ হইতে ৩০ অংশের মধ্যে অবস্থিত রবিশুদ্ধ হইবে। শ্লোককার এই ব্যবস্থাটী নিরয়ন মতে দিয়াছেন।

অথবা

(২) মেষের ০ অংশ হইতে ৩০ অংশের মধ্যে চন্দ্র থাকিলে বৃষের ১৩ অংশের পর হইতে মিথুনের ১৩ অংশস্থ রবিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। (প্রত্যহ রবি প্রায় ১ অংশ গমন করেন) এই ব্যবস্থাটী শ্লোককার সায়ন মতে দিতে যাইয়া একটী ভুল করিয়া থাকিবেন ; এই ভুলটী সংশোধন করিয়া লইলে

(৩) শ্লোক রচনার কালে সায়ন মতে মীনের তের অংশের পর হইতে মেষের ১৩ অংশের মধ্যে চন্দ্র থাকিলে বৃষের ১৩ অংশের পর হইতে মিথুনের ১৩ অংশের মধ্যে অবস্থিত রবিশুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমানের অয়নাংশ সংস্কার করিয়া লইলে

(৪) মীনের ৯ম অংশের পর হইতে মেষের ৯ম অংশ মধ্যে চন্দ্র থাকিলে বৃষের ৯ম নবম অংশের পর হইতে মিথুনের ৯ম অংশস্থ রবিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

অপরাপর স্থান সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। চন্দ্রশুদ্ধির শ্লোকটীতেও এইরূপ সন্দেহ করিবার আশঙ্কা আছে। তাহাতেও রবিশুদ্ধির বচনের উপলক্ষণে অনেক কথা বলা হইয়াছে এমত অনুমান করি। পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ঋষি প্রণীত শাস্ত্র কেবল কবি-কল্পনা নহে। হয়ত যুগ যুগান্তরের গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এক একটী সূত্র লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরবর্ত্তী-কালে আমরা ক্রমেই হীনধী ও হীনায়ু হইয়া পরার শাস্ত্র মর্য্যাদা বুঝিবার নিতান্ত অক্ষমতা বশতঃ তাহাতে কল্পনার সংযোজনা করিয়া দিয়াছি।

হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে যথা সময়ের অপব্যবহার হইলে এবং বিবাহাদি শুভকার্য্যে যে যে স্থলে শুভলগ্ন নিরূপণের ব্যবস্থা আছে তাহাতে লগ্নটী শুভ না হইয়া অশুভ হইলে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড হয়। এবং তজ্জন্য এই পণ্ড-কর্ম্মোদ্ভূত অশুভ ফলের দৃষ্টান্ত ও বিরল নহে। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

এই উভয় মতই একই সময়ে নির্ভুল হইতে পারে না। যে মতটী নির্ভুল আমরা তাহাই সাধরণে প্রচলিত হইতে অনুরোধ করি।

আমাদের জ্যোতিষ বেদ চক্ষু। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে পদে পদে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা শাস্ত্র-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকেরই জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকার বিশেষ আবশ্যক। কেননা বেদ-চক্ষু জ্যোতিষ ব্যতীত শাস্ত্র অন্ধ। আর গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবার আশা সুদূর পরাহত। আমাদের ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রটী গবেষণার একটী সুবিশাল ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন জ্যোতিষীরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে এবিষয়ে অনেক সুফললাভের আশা করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।

রবি ও চন্দ্রের শুদ্ধতার কারণটী যে পর্য্যন্ত অবগত না হওয়া যাইবে সে পর্য্যন্ত এই শ্লোকটীর প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়ার আশা করা যায় না। আমরা এই শ্লোকটী যে ভাবে আলোচনা করিলাম তাহা সুধীজনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল। আমাদের এই ধারণা যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকে তবে যিনি কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্মত বা গণিতাগত প্রমাণ সহ এই ভ্রান্তির অপনোদন করিবেন তাহার নিকট আমারা কৃতজ্ঞ থাকিব। তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি জন্মিবে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাদল্-রাতে।

আজ্ কোন্ বিরহির ব্যথা ঝরে,
আকাশ পথের বাদল্ জলে ;
কোন্ নিশীথের বিদায়-বেহাগ,
নয়ন-ধারায় পরছে গলে !
মেঘ্-মেদুরের ভিজা হাওয়ায়,
ভাসিয়ে বেড়ায় সে কার গীতি ;
সেই কবে কার হিয়ার পরশ,
বাদল্ নিশায় জাগায় স্মৃতি।
খোঁপা চুলের গন্ধ কার আজ্
দোল্ দিয়ে যায় মনের কোণে ;
দুই অজানার বাসর আলাপ,
কোন্ কথা কয় ফুলের বনে।
মেঘ্লা-রাতের মলিন পরাণ,
নলিন আঁখির মিলন খোঁজে ;
সবুজ মনের সরস বাঁধন,
পাই যে সখি চোখ্টী বোজে।
আজ্ মিঠাসুরের বাঁশীতে কার,
ভাসিয়ে নে'যায় দূর অতীতে ;
কল্প লোকের মুখখানি তার,
অশ্রু নামায় 'বাদল্-রাতে'।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শোক সংবাদ

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরমেশপ্রসন্ন রায় বি-এ বিদ্যানন্দ মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। গত ১লা আষাঢ় ঢাকা "পরম ভবন" নামক স্বীয় আবাসে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের লেখক ডাক্তার হরিচরণ গুপ্ত মহাশয় গত ৬ই আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

সংবাদ।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আগামী ৩রা জুলাই যাবা যাত্রা করিবেন।

আমাদের লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্য-পুরাণ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় এ বৎসর বেদান্ততীর্থ উপাধিতে ভূষিত হইয়া পঞ্চতীর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সাফল্যে আমরা আন্তরিক সুখী হইলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্তি করে আস্‌ছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে—মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি **সুরমা** ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"মিল্ক অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দূর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলব্ধ বিলাসভোগ। বড় শিশি ১৲ মাঝারি ৸৹ ছোট—৷৷৹ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখবে। রুমালে একটু চাল্‌লে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৸৹ আনা, ছোট—৷৷৹ আনা।

এস্‌, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌,

১৯।২ লোয়ার-চিৎপুর রোড্‌, কলিকাতা।

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ ১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস ১৷৷০
ঢাকার বিবরণ ১৷৷০
সারস্বত কুঞ্জ (বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস) ৷৷০
সাময়িক সাহিত্য ৩৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ৷৷০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৸০
"লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে" আনন্দ বাজার পত্রিকা।
শুভ-দৃষ্টি ১৲
"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।
স্রোতের ফুল ১।০
স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲
ব্রতকথা ৸০
শৈব্যা ৷৷০
মহরম ৷৷০
কালের ডায়েরী (সচিত্র) ৷৷০
রংকথা (যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children whom you would love so much ? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest way to create an estate.

WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Representative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

ডাক্তার অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাগী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৵ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।৵০

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,
দাদার রোড, পোঃ কোডেল রোড, বোম্বে, নং ১৪
টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউয়াসাপুর" বোম্বে।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ [illegible] বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	৪৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
" ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	১০৲
" ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	১৫৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—
মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হর্রা—।৵০ আনা ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।
গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স
অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাগি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিরা বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫॥০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি
দাশ গুপ্ত [illegible]

সূচী।

রামায়ণের শাস্ত্রানুশাসন…	৺কেদারনাথ মজুমদার…	১৫৯
টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	১৬৩
কালাপাহাড় (কবিতা) …	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য…	১৬৫
পৃথিবীর অভ্যন্তর… …	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল	১৬৬
প্রাচীন কাহিনী… …	শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন …	১৬৯
ছোট লোক (গল্প) …	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য …	১৭১
স্বর্গীয় পরমেশপ্রসন্ন রায়…	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় …	১৭৬
ইশা খাঁর মহত্ব … … … …		১৭৯
অভিভাষণ…	মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর	[illegible]
রাষগতির টপ্পা …	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ …	[illegible]
নিমিষের ভুল …	শ্রীরাসবিহারী রলাক …	১৮৬
সমালোচনা … … … …	…	১৮৬
সাহিত্য সংবাদ … … …	…	১৮৬

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কার্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

পুঃ ময়মনসিংহের অধিবাসী যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহাদের ঠিকানা জানা প্রয়োজন।

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র স্থান।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত,
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঙ্কলন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান!

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর-পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডান হাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিসমার্কের তিনটি বোমা", রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"···প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রাজী! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র!! "সংবাদ কোষ" বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সৎ-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ!!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা" ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি!

[illegible] বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-পিপাসু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত

বিশ্ব-বীণা

সভা সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে গীত হইবার উপযোগী বিবিধ সঙ্গীত, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির জন্য নানারকমের রচনা মুসলমান বালকদের উপযোগী কবিতা ও গান, মহিলা সভায়, হিন্দু সভায় ও ব্রাহ্মণ সভায় পঠনার্থ ওজস্বিনী কবিতা, হিন্দুসমাজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের উপকারার্থ রচিত কবিতাসমষ্টি এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক সমাজের বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নারী এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত
প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

স্বর্গীয় পরমেশপ্রসন্ন রায়।

কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩৩৪। ৭ম সংখ্যা।

রামায়ণের শাস্ত্রানুশাসন।

সমাজের উপর সাধারণতঃ দ্বিবিধ শাসন প্রচলিত থাকে। প্রথম রাজকীয় শাসন, দ্বিতীয় সামাজিক শাসন। এই উভয় শাসনেরই মূল উদ্দেশ্য সমাজকে নৈতিক পন্থায় সুশৃঙ্খলিত রাখা।

আইন বা নিয়মের আদর্শ যে জাতির ভিতর যত উচ্চ, সভ্যতার মাপকাঠিতে সেই জাতির আদর্শ এবং সভ্যতাও তত উচ্চ। আজ যে ইউরোপীয় সভ্যতা জগতের উচ্চ সভ্যতার আদর্শ বলিয়া আপনাকে জগৎময় প্রতিষ্ঠাও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রাচীন রোমের ব্যবস্থা শাস্ত্রই তাহার নিদান। রামায়ণ যুগের রাজনীতির আলোচনা আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে করি নাই বটে, কিন্তু রাজকীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া পারিব না; কেননা প্রাচীন ভারতের রাজা সমাজেরও নিয়ন্তা থাকা হেতু রাজবিধি এবং সমাজবিধি উভয়ই একই শক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত।

রামায়ণের সমাজ তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র রামায়ণে স্মৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের বর্ণিত বাল্মীকির গীতাবলীর ন্যায় এবং বেদের শ্রুতি-মন্ত্রসমূহের ন্যায় এই ধর্ম্ম শাস্ত্রের নির্দ্দেশ গুলিও তখন জনগণের স্মৃতিতেই বিরাজ করিত। তাহার কারণ তখনও সমাজে লিপি বিদ্যা প্রচারিত ছিল না। এই সমাজ-বিধিগুলি জনগণের স্মৃতিতে বিরাজ করিত বলিয়া এগুলি স্মৃতি নামে অভিহিত হইত। রামায়ণের সমাজ অনুশাসনকে স্মৃতি বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"এষ ধর্ম্মঃ প্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।" ৩৮।২।২৪

এই স্মৃতি যে শ্লোকে গ্রথিত ছিল এবং তাহা মনুর স্মৃতি বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারও আভাস রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ।" ৩০। ৪। ১৮

এই "শ্রূয়তে" শব্দ দ্বারাও ধর্ম্মশাস্ত্র যে তখন জনগণের স্মৃতিতে রক্ষিত থাকারই বিষয় ছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

মনুর নামটী যে অতি প্রাচীন, তাহা বৈদিক গ্রন্থের আলোচনায়ও বুঝিতে পারা যায়। ঋক্‌বেদে মনুর উল্লেখ আছে। ১ কিন্তু তিনিই মনুস্মৃতির রচয়িতা কি না বুঝা যায় না। যাস্ক ঋক্‌বেদের ঐ ঋক্‌টীর আলোচনায় মনুর পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"মনু বিবস্বানের পুত্র ও সবর্ণার গর্ভেজাত। মেক্ষমূলার কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে চান্ না। মেক্ষমূলারের মত পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল। ২

যাহাই হউক, মনুর পরিচয় ভুলই হউক, অথবা 'মনু' মানব শব্দেরই প্রতি শব্দ হউক, নামটী বা শব্দটী যে অতি

---

১ ঋক্‌বেদ ১।৩১।৪

২ "The hymn does not allude to Manu as the son of Savarna : it only calls the 2nd wife Vivasvat by that name ... ... The fable of Manu is probably of a later date. For some reason or other Manu, the Mythic ancestor of the race of man was called Savarni meaning possibly, the name of all colours is of all tribes & castes. The name may have reminded the Brahmans of Savarna, the second wife of Vivasvat ; and as Manu was called Vaivasta, the worshipper, afterwards the son of Vivasvat, the Manu Savarni was naturally taken as the son of Savarna."

(রমেশ বাবুর ঋগ্বেদ ৩১ পৃষ্ঠা হইতে।)

Science of Language (1882) Vol II P. 557.

প্রাচীন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদি মানব মনু জন্মগ্রহণ করিয়াই যে বংশধরগণের সমাজ-ধর্ম্ম শৃঙ্খলার জন্ত শাস্ত্র রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি আদিম সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিদেরা বা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিবেন না। তাহার কারণ সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভেই স্মৃতি রচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুর শৈশব সমাজ কিরূপ ধারায় এবং ধাপে ধাপে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার বহু সহস্র বৎসর পরে মানব সভ্যতায় আরম্ভ। সভ্যতার প্রারম্ভেও স্মৃতির প্রয়োজন হয় নাই। হইলেও ঋক্‌বেদে স্মৃতির উল্লেখ নাই। চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলেই স্মৃতি শাসন প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তখনই মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা মনুস্মৃতি কল্পিত হইয়াছিল। রামায়ণে আমরা এই মনুস্মৃতিরই উল্লেখ দেখিতে পাই।

কোন প্রতিষ্ঠানকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে হইলে তাহার জন্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম চাই। অন্যায়ের পরিহার ও নিয়ম সংরক্ষণই সেই বিধির কার্য্য। স্মৃতি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্তই সমাজ স্থাপনের পর রচিত হইয়াছিল।

স্মৃতির অনুশাসন তখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক উভয়বিধ ব্যাপারকেই সুনিয়ন্ত্রিত করিত। রাজনৈতিক অনুশাসনের কথা প্রস্তাবান্তরে আলোচিত হইবে। এই স্থলে আমরা কেবল সমাজ শাসন ব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করিব। রামায়ণের ঘটনাবলীর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলে রামায়ণ যুগের স্মৃতির অনুশাসনগুলির এবং সেই সঙ্গে তৎকালের সমাজনীতির বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাপের পরিহার ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই সমাজ-অনুমোদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজে পাপ বা পঙ্কিলতা প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মানুশাসন রচিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশাসনগুলির আলোচনা করিলে, সমাজে প্রচলিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে প্রচলিত কার্য্যসমূহের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই সমাজের নেতৃগণ এই সকল অনুশাসনের রচনা করিতেন। রামায়ণের সমাজে কিরূপ নীতির প্রতিষ্ঠা ছিল, রামায়ণ হইতে তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, রাম বনে গিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

> কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
> কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ। ৪৪
> কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
> কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ॥ ৪৫
>
> অযোধ্যা; ৭২ম সর্গ।

ভরতের এই উক্তি হইতে তৎকালীন ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কয়েকটি দণ্ড-ব্যবস্থা আমরা জানিতে পারি।

ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তখন ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ, নিষ্পাপ, ধনাঢ্য অথবা দরিদ্রের হিংসা, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি অপরাধের জন্ত নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অতঃপর ভরতের সহিত রাম-জননী কৌশল্যার সাক্ষাৎ হইলে, ভরত রাম-বনবাস যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তৎকাল-নিষিদ্ধ বিবিধ অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—আর্য্যে! রাম যদি আমার জ্ঞাতসারে বনে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে এই সকল অধর্ম্ম ও পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। নিম্নে ভরত-কথিত এই সকল অধর্ম্ম ও অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করা গেল।

পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না, পাপী ব্যক্তির কার্য্যস্বীকার, সূর্য্যাভিমুখে মলমূত্রত্যাগ, কর্ম্মান্তে ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, পুত্রবৎ পালনকারী রাজার বিদ্রোহাচরণ, ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও প্রজাপালন না করা, যজ্ঞের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রদান না করা, গুরুর উপদেশ ভুলিয়া যাওয়া, বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ, গুরুজনের অবজ্ঞা, পদ দ্বারা গো-শরীর-স্পর্শ, গুরুনিন্দা, মিত্রদ্রোহিতা, পরনিন্দা-কথন, প্রত্যুপকার না করা, সকল প্রাণীর বিদ্বেষ-ভাজন হওয়া, দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও নিজে উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা, অনুরূপা স্ত্রী লাভে বঞ্চিত হওয়া, ধর্ম্মকর্ম্মে অক্ষম হওয়া, পুত্রহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, পত্নীগর্ভসম্ভূত পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না পারা, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, লাক্ষা, মধু, মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্য প্রতিপালন করা; রাজমন্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করা,

অনুগত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা, যুদ্ধে পলায়নকালে নিহত হওয়া, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত ও নরকপালধারী হইয়া' ভিক্ষা করা, সর্ব্বদা মত্ত, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত থাকা, কাম ও ক্রোধে অভিভূত হওয়া, অপাত্রে দান করা, স্বধর্ম্মে আসক্তি-হীনতা, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন করা, গৃহ দগ্ধ করা, গুরুপত্নী-গমন, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি অভক্তি, পিতা মাতার শুশ্রূষা না করা, মাতৃ-শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে লিপ্ত থাকা, দীনভাবাপন্ন যাচকের আশা বিফল করা, ছলপূর্ব্বক রতিকার্য্য সমাধান, ঋতুস্নাতা, ও ও ঋতু রক্ষার্থ অনুরোধকারিণী সতী স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করা, ব্রাহ্মণের বংশহীনতা, বালবৎসা গাভীর দোহন, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পি পূজার বিঘ্নকারী হওয়া, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্ত্রী সেবা, বিষ মিশ্রিত জল ও অন্ন প্রদান করা, পানীয় সত্বেও তৃষ্ণার্থ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা, আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা, বিবাদ ভঞ্জনে সমর্থ ব্যক্তির বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া তাহা দর্শন করা, দরিদ্রের বহুভৃত্য-শালী হওয়া,—ইত্যাদি।

অতিপ্রাচীন কালে, যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্ম মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, তখন আর্য্যগণ গোধন দ্বারা নাকি বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশেও গো অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। ক্রমে সেই সকল দেশে গো-শব্দই মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে। (১) রামায়ণী যুগে আর্য্য সমাজে মুদ্রা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তখন মুদ্রার বিনিময়ে ধেনু ব্যবহৃত হইত কিনা জানা যায় না। কিন্তু অতিথি সৎকারে অর্ঘ্য, উদক ও মুদ্রার সহিত গো উপঢৌকন প্রদত্ত হইত! (২) ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানের সহিত কোটী গো দান করা হইত। সুতরাং গোজাতি সমাজে অত্যধিক সম্মানলাভ করিবে, ইহা বিচিত্র কি? প্রাচীন সমাজনেতা মহর্ষিগণ এই জন্যই গো রক্ষার্থ বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিয়াছিলেন। পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না করা, পাদ দ্বারা গো শরীর স্পর্শ করা, বালবৎসা গাভী দোহন করা প্রভৃতিও এই জন্ম পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গোকুল রক্ষার ও তাহার সম্মানবৃদ্ধির উপায়মাত্র। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেও এই ব্যবস্থা সম্মানিত হইয়া থাকে।

পাপীকে সমাজের সংস্পর্শে আনিলে সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। তাই পাপীর দাসত্ব সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে ব্যবহার-বৈষম্য লক্ষিত হইলে সে পরিবার অচিরাৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়; সমাজ তাই পরিবার পরিচালককে আত্মসুখ অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভৃত্য যে অন্ন আহার করিবে, আপনাকেও সেই অন্নে তৃপ্তিলাভ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সমাজ-রক্ষারই উপায় মাত্র। এখন এই উদার ব্যবস্থা পদ-দলিত হইতেছে।

মধু, মাংস, লাক্ষা, লৌহ ও বিষের বিক্রেতা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মধু (মদ্য), মাংস ও বিষের বিক্রেতা এখনও সমাজে পতিত। এই তিন পদার্থের ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছে।

(১) গো প্রভৃতি পশু লাটিন্ ভাষায় Pecudes বাক্যে অভিহিত হইত। Pecudesই মুদ্রার প্রয়োজন পূরণ করিত। Pecudes ক্রমে ইংরাজী Pecuniary শব্দে পরিণত হইয়া গরুর অভাবে money অর্থে প্রযোজ্য হইয়াছে। এখন Pecuniary 'গাভী-সম্বন্ধীয়' অর্থের দ্যোতন না করিয়া 'মুদ্রা-সম্বন্ধীয়' অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থলে এখনও অর্থের পরিবর্ত্তে গো বিনিময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় গো-বিনিময়ে বিবাহাদি হয়, পাঁচ সাতটি গাভীর বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যে গোধন অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতুই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখন গোদাম-গ্রহণ ভ দ্রতীয় সমাজের কোনও কোনও অংশে হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) অতিথিকে গো-উপহারে অভ্যর্থনা করা হইত। অনেক পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে অনেক অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হইলে মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য, উদক ও গো উপঢৌকন দিয়া অর্চ্চনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে কেহ 'বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ অন্য অর্থেরও কল্পনা করিয়াছেন। এই বিসংবাদ-নিষ্পত্তির জন্য আমরা এ স্থলে মূল উদ্ধৃত করিলাম।—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥ ১৭
নানাবিধানন্ন-রসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসঞ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ॥ ১৮

—অযোধ্যা; ৫৪।

লৌহ ও লাক্ষা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। অথচ, ইহাদের বিক্রেতারা সমাজে হেয় হইয়াছিল। ইহার কারণ কি?

প্রাচীনকালেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। কেহ গৃহদেবতার, কেহ বন-দেবতার, কেহ অগ্নির, কেহ রুদ্রের, পূজা করিতেন। এবং সম্ভবতঃ স্ব স্ব আরধ্য দেবতার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া অন্যের উপাস্য দেবতার নিন্দা করিতেন, এবং তাহার ফলে পরিশেষে ঘোর আত্মকলহের সৃষ্টি হইত। সমাজে এইরূপ কলহ ও দেব-নিন্দার সৃষ্টি দেখিয়াই সমাজপতিগণ তাহা নিবারণের জন্য অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ভরত-কথিত "আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা" দূষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "দরিদ্রের বহুভৃত্য-শালিত্ব" যে দোষ, তাহা অর্থনীতিরও অনুমোদিত। লঙ্কার রাক্ষস সমাজে পরস্ত্রী গমন ও পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইলেও রামায়ণের আর্য্য সমাজে ব্যভিচারীর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—পরস্ত্রীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। যে পরস্ত্রী ও পর-ধনের অপহারী, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। নিরপরাধের ক্ষতি করা ও পরস্ত্রী-গমনে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়া জননীর মুখে যখন শুনিলেন, "রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তখন তিনি সন্দিহানচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাম কি পরদারে আসক্ত হইয়াছিলেন—এই নির্ব্বাসন দণ্ড কেন হইল?"

সমাজে যাহা অহরহ ঘটিয়া থাকে, সামাজিক জনগণের চিন্তা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভরতের এই চিন্তা হইতেও ব্যভিচার অপরাধে তৎকালে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ভরত-কথিত এই সকল অবৈধ কার্য্যগুলির আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, সমাজের রক্ষা ও তাহা উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই সকল বিবিধ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পঞ্চবটীতে মায়ামৃগের অনুসরণে লক্ষ্মণের অনভিপ্রায় দেখিয়া পতিগতপ্রাণা আদর্শ লক্ষ্মী সীতার মনে লক্ষ্মণের প্রতি যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, পতির বিপদের ভাবনায় বিগতবুদ্ধি হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে কঠোর ভৎর্সনার সহিত যাহা বলিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা শিবিরে লঙ্কার ভীষণ যুদ্ধের অবসানে সীতার অগ্নিপ্রবেশের পূর্ব্বে পরগৃহে রক্ষিতা সীতার চরিত্র চিন্তা করিয়া আদর্শ-রাজা রাম সতীর প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে, এগুলি তৎকালীন সমাজের চিন্তনীয় বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অগ্নি পরীক্ষা ছিল সে কালের একটী শাস্ত্রীয় ও সামাজিক উভয়বিধ মারাত্মক শাস্তি। কিরূপে যে অগ্নি-প্রবেশ করিয়া লোক নিজকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় তাহা মীমাংসিত হয় নাই। সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা এই যুগে আমাদের নিকট অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল; যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থায় অগ্নি পরীক্ষার বিধি আছে। এবং শুধু পূর্ব্বকালেই নহে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে অগ্নি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে আমরা শুনিতে পাই।*

এই অগ্নি পরীক্ষা কেবল যে ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। প্রাচীন কালে তাহা অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে অগ্নিপরীক্ষা ছিল সফোক্লিসের এন্‌টিগোন্ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ৪র্থ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও এ প্রথা ছিল। ইংলণ্ডের রাজমাতা রাণী এমাকে কোন সাধারণের সমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। মোসিমের ধর্ম্ম ইতিহাস ২য় খণ্ডে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রাণী নাকি অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত-দেহে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং সেকালের অগ্নিপরীক্ষা অন্ধ বিশ্বাসী মারাত্মক প্রথা বলিয়া আজকাল মনে হইলেও তাহা খেয়াল কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

কেদারনাথ মজুমদার।

---

* ১৭৮৩ অব্দে কাশীর প্রধান বিচারপতি আলি ইব্রাহিম খাঁ দুইটী অগ্নি পরীক্ষায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা সেই বিবরণ পাঠ করিতে চান তাঁহারা এসিয়াটিক রিসার্চ ১ম খণ্ড পাঠ করিবেন।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

(৪)

ধর্ম্মের পাঁচালী।

ধর্ম্মের পাঁচালী, এ মহকুমার আর একখানি বৈষ্ণব সাহিত্য। বাণেশ্বর অগ্রয়ের পুত্র হরিহর অগ্রয়, ইহার প্রণেতা। হরিহর—

"রাম অশ্ববেদ মহীশকের বরিষে"—

অর্থাৎ ১৪৭৭ শকে এই পাঁচালী রচনা করেন। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোভাব, সুতরাং তাঁহার তিরোভাবের ১৭ বৎসর পরে এই পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। হরিহর বার্দ্ধক্যে—অন্ততঃ যৌবনেও এই গ্রন্থ লিখিয়া থাকিলে তিনি চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। ধর্ম্মের পাঁচালীর বয়স এক্ষণে ৩৭৬ বৎসর। বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে এ বয়সের গ্রন্থ অধিক নাই। যাহা আছে, তাহারও অধিকাংশই মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পাঁচালী।

"ধর্ম্মের পাঁচালী"—এই নাম শ্রবণ মাত্রেই মনে হয়, ইহা বুঝি শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ধর্ম্মঠাকুরের গানের বাঙ্গালা দেশের সংস্করণ। পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি নামে কয়েকখানা ধর্ম্মের পাঁচালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কচ্ছপ মূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুর, বুদ্ধদেব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালায় এরূপ কোন মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ধর্ম্মের পূজা যে পূর্ব্ববাঙ্গালায় ছিল না, এমন নহে। এ প্রদেশে "পর্ব্ব" নামে এক প্রকার ভজন গান প্রচলিত ছিল—এখনও উহার কিছু অবশেষ আছে উহার আরম্ভ এইরূপ—

"আগু আগু বন্দম ধর্ম্ম নিরঞ্জন,
হৌ ধর্ম্ম নিরঞ্জন,
যাহা হৈতে হৈল রে ভাই পর্ব্বের জনম।"

ইহা হইতে জানা যায়, ধর্ম্মের পূজার গাইবার জন্যই "পর্ব্ব" গানের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু শেষে ধর্ম্মকে এই দুই চরণে প্রণাম জানাইয়াই তাঁহার সেবকেরা কামদেবের বন্দনা করিয়াছেন এবং

"পর্থমে বন্দিয়া গায় ঠাকুর কানাইর চরণ।"

বলিয়া ভাঙ্গের ছাতু ও ভাঙ্গের লাড়ু কামদেবের নামে নিবেদন করিয়া দিয়া আপনারা প্রসাদ পাইয়াছেন। মার-বিজয়ী বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে কামদেবের আবির্ভাব, কল্পনার কথা নহে। সত্য সত্যই উহা ঘটিয়াছিল।

যাহাহউক এই বন্দনা হইতে দেখা যায়, বঙ্গের পূর্ব্বাংশেও এক সময়ে ধর্ম্মের পূজা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধর্ম্মের পাঁচালী নাম শুনিয়া প্রথমেই ইহা ধর্ম্মঠাকুরের পূজার গান বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। হরিহর লিখিয়াছেন—

"নারদী পুরাণের কথা ব্যাসের বচন,
বিষ্ণুর পিরীতে কৈল পাঁচালী রচন।"

সুতরাং ইহা যে নারদীয় পুরাণের পাঁচালী, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে ইহার ধর্ম্মের পাঁচালী নাম হইল কেন, ইহা প্রশ্ন হইতে পারে বটে। কবি লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মের পাঁচালী হৈতে ধর্ম্ম পরিচয়।"

কিসে ধর্ম্ম হয়, তাহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, এই জন্য ধর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া গ্রন্থের নাম ধর্ম্মের পাঁচালী হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের সহিত এ গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। কোন্ কার্য্য করিলে কি পরিমাণ ধর্ম্মলাভ হয়, কোন্ কার্য্যের ফলে কত দিন স্বর্গবাস ঘটে,—হরিহর অগ্রয়, তদীয় পাঁচালীতে তাহার একবারে ঠিক ঠিক পরিমাণ লিখিয়াছেন। সুতরাং এ গ্রন্থের নাম ধর্ম্মের পাঁচালী না হইয়া অন্য নাম হইতেই পারে না। কেন না ধর্ম্মকর্ম্মের এমন সূক্ষ্ম হিসাব ও এত কথা, অন্য কোথাও নাই।

ধর্ম্মের পাঁচালী ৩৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। এ গ্রন্থে অধ্যায়ের নাম—"ছিকলী"। নামটি নূতন বটে।

কবিত্বের হিসাবে অগ্রয় কবির প্রশংসা করিবার কিছু নাই। কিন্তু ৩৭৬ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার সেই আদিম অবস্থায় তিনি যাহা করিয়াছেন, কেবল প্রাচীন বলিয়াও তাহার একটা গৌরব আছে। হরিহর সে গৌরব পাইবার সম্পূর্ণই অধিকারী।

বিষ্ণুর বর্ণনায় হরিহর লিখিয়াছেন :—

"সোণার লগুণ ধরে অতি মনোহর।
শোণপুষ্প সম বর্ণ প্রভু কলেবর॥"

স্বর্ণ উপবীতধারী, শোণকুসুম বর্ণ বিষ্ণু—এ আবার কোন্

রূপ? নব জলধর শ্যাম বিষ্ণুর পীতবর্ণ অনেকের নিকটই অভিনব লাগিবে। অবশ্য, ভাগবতে পীতবর্ণের কথা আছে এবং চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ভাগবতীয় সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌরাঙ্গ চৈতন্যদেবকেই গৌর-কৃষ্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সেই এক গৌরাঙ্গ ছাড়া পীত বিষ্ণুর অন্য আবির্ভাবের কথা তিনি বা অন্যে বলিতে পারেন নাই। হরিহর অগ্রয়, নবদ্বীপের সে গৌরকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে এ কথা বলেন নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। জানি না কোন পুরাণে বা উপপুরাণে পীত বিষ্ণুর কথা আছে কি না, আর না থাকিলেই বা হরিহর লিখিবেন কেন?

হরিহরের সময়ে বৌদ্ধেরা হিন্দুর দলে মিশিতেছিলেন। অনেক বৌদ্ধ, শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, ইহাদের ঘরে খাইলে হিন্দুর পক্ষে নরক ভোগের ব্যবস্থা ছিল। এই শালগ্রাম পূজক বৌদ্ধ কাহারা? ইহারাই কি বর্ণ-ব্রাহ্মণ?

ধর্ম্মের পাঁচালী আকারে বেশ বড়। ইহা গানের জন্য রচিত হইয়াছিল, এ জন্য ইহার মধ্যে ধানশী প্রভৃতি রাগিণীর নাম আছে। কিন্তু এই পাঁচালী গান যে খুব প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

অগ্রয়, উপাধিটি অনেকের নিকটই নূতন লাগিবে। কেন না, এ উপাধির লোক বড়ই কম। ইহা এক শ্রেণীর কায়স্থের উপাধি। কম হইলেও এই উপাধিধারী কায়স্থ এখনও কোন কোন স্থানে আছেন। আপনার পরিচয়, হরিহর এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"তবে ত বন্দিব সভা করিয়া বিনয়।
বাণেশ্বরাগ্রয়ের পুত্র হরিহরাগ্রয়॥
পণ্ডিত মণ্ডলী স্থানে পূরে অভিলাষ।
দীঘুলিয়ার দক্ষিণেতে করিয়াছি বাস॥"

ইহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম বাণেশ্বর অগ্রয়। দীঘুলিয়ার দক্ষিণপাড়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল।

ধর্ম্মের পাঁচালীতে আমরা ৩৭৬ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষা দেখিতে পাই। আধুনিক বাঙ্গালার সহিত ইহার পার্থক্য অল্প নহে। একালের বাঙ্গালা ব্যাকরণে ছয়টা শব্দ বিভক্তি দেখা যায়। সে কালে এত বিভক্তি ছিল না। এখন প্রথমার বহুবচনের চিহ্ন—'রা'; যেমন—আমরা তোমরা। সেকালে ছিল—'সব'। সেকালের লোক বলিত:—

"আহ্মি সব তোহ্মাকে দিলাম এহিবর দান"

প্রথমার একবচনে একালে কোন চিহ্ন নাই, সেকালে ছিল—'এ'—

"আজি পর্য্যন্ত কথা ব্রহ্মাএ না জানে।" দ্বিতীয়ার চিহ্ন, একালে—'কে'; সেকালে ছিল—'এক', 'ক' ও 'তে':—

(১) "কেশবেক নানা স্তুতি করিয়া একমনে।"
(২) "যেবা জানে তাক পড়ায় সেহি পাপী হয়।"
(৩) "তোহ্মাতে কহি আমি কারণ কাহিনী।"

পঞ্চমীর চিহ্ন—"হনে"—

"আদি হনে কহে কথা বিস্তার করিয়া।"

অস্মদ্ শব্দের রূপ:—

আহ্মি	আহ্মিসব
আহ্মাকে	
আহ্মার।	
আহ্মাত।	

যুষ্মদ্ শব্দের রূপ:—

তুহ্মি	তুহ্মিসব
তোহ্মাকে	
তোহ্মার	
তোহ্মাত।	

তদ্ শব্দের রূপ (সম্ভ্রমার্থে)

তেঁহা	তেঁহা সব
তানে	
তান	তা সবার।

যাত্রাগান।

যাত্রাগান, বৈষ্ণব সাহিত্যের আর এক পর্য্যায়। নাটককে আদর্শ করিয়া যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছিল; যাত্রাগানের যাত্রা শব্দ, মঙ্গলার্থক।

নাটক, ভারতবর্ষের অতি পুরাতন সামগ্রী। কথিত আছে, ভরত ঋষি ইহার স্রষ্টা। বাঙ্গালার যাত্রাগান, নাটকেরই প্রকার ভেদ। নাটক, নানা বিষয় লইয়া রচিত হইতে পারে, কিন্তু যাত্রা কেবলই দেবলীলা—বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলা লইয়া রচিত। নাটক ও যাত্রার বস্তুতত্ত্বে ইহাই

প্রভেদ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, পারিষদদিগকে লইয়া কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। সে অভিনয়ে গান ও কথা দুইই ছিল। সেই অভিনয় হইতেই যাত্রার সূচনা। কৃষ্ণলীলা গানই প্রাচীন যাত্রার একমাত্র বিষয় ছিল। উহার আরম্ভে মহাজন পদাবলী গানের মতই "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গান করা হইত। পরে চৈতন্যলীলাও যাত্রার বিষয় হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ 'যাত্রা' শব্দের অর্থ গমন। ইহার অন্য অর্থও আছে। স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, রথ-যাত্রা, এ সকল স্থলে 'যাত্রা' উৎসবার্থক। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, যাত্রা-তত্ত্বে দ্বাদশ মাসে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার কথা লিখিয়াছেন। এই দ্বাদশ যাত্রা, ও দ্বাদশ প্রকার উৎসব। এই সকল যাত্রা কালে গানের বিধি, স্কন্দপুরাণে আছে। যাত্রা কালে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে গান হইত, উহাই যাত্রা-গান পরবর্ত্তী কালে যাত্রা কাল ব্যতীতও অন্য সময়ে এই 'যাত্রাগান' করিবার প্রথা হয়। কিন্তু অন্য সময়ে গান হইলেও উহা কেবল কৃষ্ণলীলা বিষয়কই ছিল। এই জন্য আমরা বাল্যকালে যাত্রাগানের যে সকল নিমন্ত্রণ পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে লিখিত থাকিত--

"অস্ম মমালয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন যাত্রাগান হইবে।" "শ্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন যাত্রা" সংক্ষিপ্ত হইয়া "কীর্ত্তন যাত্রা", শেষে কেবল "যাত্রা" হইয়াছে।

গোবিন্দ অধিকারী, এক সময়ে যাত্রার অধিকারীরূপে বড়ই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দূতী-আলী বাঙ্গালার যাত্রার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে গোস্বামী কৃষ্ণকমলের যাত্রা—"স্বপ্ন বিলাস," এক সময়ে ছোট বড় সকলকে কাঁদাইত। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাব, ভাজন ঘাটের ভাষায় কি সুন্দর করিয়াই কৃষ্ণকমল অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচিত্র বিলাসের উন্মাদিনী রাধিকা, কৃষ্ণভ্রমে তমাল আলিঙ্গন করিয়া যখন বলিতেন,—"সখি, কপাল গুণে শ্যাম আমার তমাল হ'ল"—তখন শ্রোতার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইত। কৃষ্ণকমলের স্বপ্ন-বিলাস ও বিচিত্রবিলাস, বাঙ্গালের ঘরে তৈরি হইলেও এবং বাঙ্গালারাই উহার গায়ক হইলেও ইহা বাঙ্গালের যাত্রা নয়। উহার ভাব,—চৈতন্যচরিতামৃতের, ভাষা—ভাজন ঘাটের বাঙ্গালের আপন ভাষায় 'স্বপ্নবিলাস' হয় নাই।

কৃষ্ণকমলের স্বপ্নবিলাসের অনুকরণে টাঙ্গাইল মহকুমার জামুর্কী গ্রাম নিবাসী ৺হরিনাথ চক্রবর্ত্তী "বিহঙ্গবিলাস" রচনা করেন। হরি ঠাকুরের নিজের যাত্রার দল ছিল, ইনি ছিলেন অধিকারী। বিহঙ্গবিলাসের একটী গান বড় সুন্দর। অভিমানিনী রাধিকা দুর্জ্জয় মানে ধূলায় পড়িয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ চূড়া বাঁশী দূরে ফেলিয়া বড়ই কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন…

"একবার ওঠগো,
ধরায় কেন, রাই ধনি ?
হরিদাস পানে নয়ন কোণে
একবার চাও ধনি।"

মানের এ পদটি গাইতে গাইতে এখনও সেই প্রাচীন দলের অনেকের অশ্রুপাত হইয়া থাকে। দ্ব্যর্থ ভাবে 'হরিদাস' পদটির প্রয়োগে হরিঠাকুর আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বাঙ্গাল হরিঠাকুরের রচনা হইলেও ইহা ভাবে ও ভাষায় দ্বিতীয় স্বপ্নবিলাস। কাজেই ইহাকে আমরা বাঙ্গালেরযাত্রা বলিয়া ধরিতে পারি কিনা সন্দেহ। তথাপি ইহা যে এ মহকুমার সম্পদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

কালাপাহাড়

রাজসাহীর এক মান্দা থানার বীরজাওন এক গ্রাম,
সেথায় নয়ানচাঁদের ছেলে শ্রীকালাচাঁদ রায়।
শৈশবেই তার মরলো জনক, পাললো বিধবায় ;
মাতামহের শিক্ষাগুণে সর্ব্বগুণধাম।
তাহার মতো নাই সুপুরুষ, জানলো সবে নাম ;
ফৌজদারী কাজ দিলেন তাকে গৌড়ের বাদ্‌শায়।
পরম রূপবতী কন্যা দুলারী তার, হায় !
মজলো শাক্ত যুবার রূপে ; রট্‌লো মনস্কাম !
ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর্য্যবন্ত করলো অস্বীকার।
আদেশ দিলেন শূলে দিতে বাদ্‌শা সলিমান !
খবর পেয়ে ধায় দুলারী খুলি' খিড়্‌কির দ্বার !
কেঁদে গিয়ে জড়িয়ে ধরে' বাঁচায় প্রিয়ের প্রাণ !
হন সলিমান হতভম্ব ! মুগ্ধ কালাচাঁদ !
দুলারীর বুক শীতল হোলো ! হায় কি প্রেমের ফাঁদ !

২

কালাচাঁদের মাতা তাকে করেন তিরস্কার !
প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চাহে তাঁহার ব্যবস্থায় ;
বিয়ে করায় হয়নি কসুর অমন অবস্থায় ;
হিন্দু সমাজ কর্‌লে তবু চির-বহিষ্কার !
প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লো সে-ও রাখ্‌তে আদেশ মা'র !
পুরীতে সে ধন্না দিল মনের যাতনায় !
প্রত্যাদেশে সপ্তাহকাল কাট্‌লো বুভুক্ষায় !
গুণ্ডা যত পাণ্ডা আরো কর্‌লো অত্যাচার !
ক্ষোভে দুঃখে অধীর হয়ে হয় সে মুসলমান ,
মহম্মদ ফর্ম্মুলি নাম গ্রহণ কর্‌লো পরে ;
পোড়ায় মূর্ত্তি জগন্নাথের কর্‌তে অপমান ;
পাণ্ডাদেরে ধরে' এনেই জোরে যবন করে ।
ভারত ভূমির বিগ্রহ সব কর্‌লো ভেঙে শেষ !
"কালাপাহাড়" নামটা জমাট্‌ একটা ঘৃণা দ্বেষ !

৩

এই যে "কালাপাহাড়", ইহার কান্তি অনুপম !
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত পার্‌সীতে পণ্ডিত !
এই বারেন্দ্র কুলীন বামুন শস্ত্রচালনবিৎ !
বিদ্যা বুদ্ধি আভিজাত্যে নয় এ কারুর কম !
নিত্যনামী, ধর্ম্মকার্য্যে মান্‌তো সুনিয়ম ;
আচারনিষ্ঠ,—ধর্ম্মভ্রষ্ট হোলো আচম্বিৎ !
'পম্বাটিকী' মূলে ইহার ছিল সুনিশ্চিত্‌ !
হোলো হিন্দুধর্ম্ম-জাতির মূর্ত্তিমন্ত যম !
চূর্ণ করি' দেবমূর্ত্তি বিষ্ঠাতে ত্যায় ফেলি' ।
সংগৃহীত শালগ্রামে মুত্‌তো প্রতিদিন !
লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সে যবন করে ঠেলি' !
অনিচ্ছা কেউ কর্‌লে প্রকাশ কর্‌তো মেরে ক্ষীণ !
এগারোটা বর্ষ করে হিন্দুধর্ম্ম নাশ !
বাঙ্‌লা বিহার উড়িষ্যাতে কম্‌লো না সেই ত্রাস !

৪

কালাচাঁদের মাতুলানী কর্‌তো কাশীবাস ;
অত্যাচারের সমন যবন ধর্ম্মনাশে তার !
কেঁদে কালাচাঁদকে গিয়ে করেন তিরস্কার !
সেইখানে তার সাম্‌নে আপন জীবন করে নাশ !
"কালাপাহাড়" যায় ঘুমাতে, সুরক্ষিত বাস ;
প্রত্যূষে কেউ পায় না দেখা, মুক্ত গৃহের দ্বার !
সেদিন থেকে নানান্‌ প্রবাদ রট্‌লো চমৎকার !
জীবন তাহার ক্ষোভের একটা ভীষণ মহোচ্ছ্বাস !
তুচ্ছ নহে জীবন তাহার, রোমাঞ্চকর বটে !
হিন্দু সমাজ-অত্যাচারেই ঘট্‌লো এমন ভ্রম !
সুখ্যাতি আর কুখ্যাতিটা ঘটনাতেই ঘটে !
কালাচাঁদের জীবনে তার হয়নি ব্যতিক্রম !
কম্বলের লোম কর্‌লে বাছাই কার্‌ না হৃদয় চটে ?
ভণ্ড সমাজপতিরাই কি অত্যাচারী কম ?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ।

বর্ত্তমান সময়ে অসামান্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই । নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহসকল ও অচিন্তনীয় দূরবর্ত্তী নক্ষত্ররাজি সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু অশেষ চেষ্টা করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কি অবস্থায় আছে তৎ সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না ।

মানুষ এরোপ্লেনে উঠিয়া অবলীলাক্রমে আজ কাল আকাশে বিচরণ করিতেছে । কালে হয়ত এরোপ্লেন যাত্রী গাড়ীতে পরিণত হইবে । ডুবো জাহাজ গভীর সমুদ্রের তল দিয়া একদেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমন করিতেছে । কিন্তু মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও ভূগর্ভে অধিক দূর গমন করিতে সমর্থ হয় নাই । ভূগর্ভ খনন করিয়া অধিক গমন করা অতি দুরূহ কাজ, দ্বিতীয় কথা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় উষ্ণ । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর গর্ভে যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ।

জার্ম্মাণ দেশীয় কাপ্তান হায়েছেন (Captain Huyssen) ১৮৭৭ গজ গভীর একটী গর্ত্ত করিয়াছিলেন । আপার সিলিসিয়া (upper silesia) আর একটী গর্ত্ত খনিত

হইয়াছিল উহার গভীরতা হইয়াছিল ২১৯০ গজ অর্থাৎ প্রায় সোয়া মাইল। কাপ্তেন হায়েছেন পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ভূগর্ভে প্রতি ৬৬ ফিট নিম্নে উত্তাপের পরিমাণ প্রায় এক এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর নিম্নে প্রতি ৬০ ফিটে ১ ডিগ্রি করিয়া উত্তাপের বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে উহার কেন্দ্র প্রায় ৪০০০ হাজার মাইল। সুতরাং ভূপৃষ্ঠে এক মাইল কি দেড় মাইল গর্ত্ত খনন করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের কথা কিছুই বলা যায় না।

পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে ভূগর্ভের ৫০ মাইল নিম্নে এত উত্তাপ যে কঠিন প্রস্তর সকলও তথায় দ্রব হইয়া যাইবে। ভূগর্ভের চার হাজার মাইল নিম্নে যে কিরূপ ভীষণ উত্তাপ হওয়ার সম্ভাবনা তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। অগ্ন্যুৎপাত কালীন আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত অত্যুষ্ণ ধাতব নিঃস্রব প্রত্যক্ষ করিয়া সেকালের পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ৩০। ৩২ মাইল নিম্নে সমগ্র ভূগর্ভ অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত তরল পদার্থ রাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া মনে করেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যে ভীষণ উত্তপ্ত অবস্থায় আছে তাহা সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। ভূপৃষ্ঠের পঞ্চাশ মাইল নিম্নে যে তাপ বর্ত্তমান আছে তাহাতে লৌহাদি ধাতু ও কঠিন প্রস্তর সকল অত্যল্প সময়ে দ্রব হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং সাধারণতঃ ইহাই ধারণা হইবে যে ৫০ মাইলের নিম্নে ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল তরল অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বাস্তবিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বিপক্ষে কতগুলি কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাই বৈজ্ঞানিকগণ এই সহজ কথাটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে যেমন তাপ তেমনি চাপও বর্ত্তমান আছে। ভূপৃষ্ঠের পাহাড় পর্ব্বত ও মৃত্তিকা স্তরের চাপ অতি ভীষণ। ১০ ফিট পুরু পাথরের চাপ গড়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৮ সের হয়। এক মাইল উচ্চ পাথরের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১০৫ মণ হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে উহার কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৪০০০ হাজার মাইল। সুতরাং তথায় উপরিস্থ প্রস্তরের চাপ যে কি ভীষণ তাহা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য। এই ত গেল ভূস্তরের চাপের কথা। ইহা ছাড়া আরও একটী চাপ কেন্দ্রের দিকে কাজ করিতেছে। তাপ ক্ষয় হেতু পৃথিবী অবিশ্রান্ত সংকুচিত হইতেছে। এই সংকুচন জনিত চাপও অতি ভীষণ। আমাদের ধরিত্রীর দেহ সঙ্কুচনের ফলেই ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া হিমালয় আল্‌স্ প্রভৃতি শত শত গিরিমালার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর দেহ সঙ্কুচন চাপ যে কল্পনাতীত প্রচণ্ড সে বিষয় সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ যে অতি ভীষণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই প্রচণ্ড তাপে কঠিন প্রস্তর ও ধাতু সমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্রব হইয়া বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর দেহ সঙ্কুচন জনিত চাপ ও প্রস্তরময় ভূস্তরের চাপ এই উভয়ে মিলিত হইয়া প্রতিকূল কার্য্য করিতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। এইরূপ অচিন্তনীয় প্রচণ্ড চাপের অধীন কোন পদার্থ উত্তাপের প্রভাবে দ্রব হইতে পারে কি না সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এখন পর্য্যন্ত কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ভীষণ তাপ যেমন পদার্থ সকলকে দ্রব করিয়া বাষ্পে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে তেমনি ঐ প্রদেশের প্রচণ্ড চাপ উহাদিগকে কঠিন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই দুই প্রতিকূল শক্তির সংগ্রামের ফলে কি হইতেছে তাহা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কঠিনও হইতে পারে তরলও হইতে পারে অথবা বাষ্পাবস্থায়ও থাকিতে পারে, নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। তবে কতগুলি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই এখন আলোচনা করিব।

সুবিখ্যাত গণিত বিশারদ পণ্ডিত লর্ড কেলভিন্ বলিয়াছেন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কঠিন হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীর পৃষ্ঠের জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে জোয়ার ভাটা হয়। স্থলের উপর এই আকর্ষণের কাজ আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ

করিয়াছেন যে পৃথিবীর মৃত্তিকা স্তরেও চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হইতেছে। পৃথিবীর মৃত্তিকা স্তর (crust) চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে পাহাড় পর্ব্বত ও জীবজন্তুসহ ২৪ ঘণ্টায় দুইবার প্রায় ৮ ইঞ্চি উঠিতেছে ও নামিতেছে। যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে সমগ্র লণ্ডন সহরটী বহু সহস্র সমুচ্চ অট্টালিকাদি এবং জন মানব সহ প্রতিদিন প্রায় ৮" ইঞ্চি উঠিতেছে ও নামিতেছে।

সুতরাং পৃথিবীর উপর চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বড় সাধারণ নয়। নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যদি তরল পদার্থ পূর্ণ থাকিত তাহা হইলে ভূগর্ভস্থ সেই সুবিশাল ও সুগভীর সমুদ্রেও জোয়ার ভাটা হইত এবং চন্দ্র সূর্য্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে তাহাতে শত শত ফুট উচ্চ ঢেউ উঠিত। কেল্‌ভিন গণিত সাহায্যে পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন যে পৃথিবী অভ্যন্তর ভাগ কঠিন পদার্থে গঠিত না হইলে উহার ৫০। ৬০ মাইল পুরু কঠিন আবরণ (Crust) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভিতর হইতে তরল পদার্থসমূহ বেগে বাহির হইয়া আসিত। এই কারণে লর্ড কেল্‌ভিন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণ কঠিন উপাদানে গঠিত।

ভূমিকম্পের সময়ে মৃত্তিকার কম্পনের তরঙ্গ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই কম্পনের বেগ পরিমাণ করিবার একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম 'সিস্‌মোগ্রাফ' (Seismograph) এই যন্ত্র সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মৃত্তিকার ভিতর দিয়া ভূমিকম্পের তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল গতিতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইস্পাতের ভিতর দিয়াও তরঙ্গ এত দ্রুত গমন করিতে পারে না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইস্পাত হইতেও অধিক।

পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে (orbit) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যপ্রদক্ষিণ কালে পৃথিবীর মেরুদণ্ড (Axis) নিজ কক্ষে ঠিক সোজা হইয়া থাকে না। পৃথিবী লাঠিমের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া চলে। পৃথিবী এককালে কাদার ন্যায় কোমল ছিল। তখন ইহা নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে অধিকতর দ্রুত বেগে আবর্ত্তন (rotate) করিত। একটা কাদার গোলকের মধ্য স্থলে একটা শলাকা ঢুকাইয়া উহাকে ঘুরাইলে গোলকের মধ্য ভাগ যেমন ফুলিয়া উঠে আর দুই প্রান্ত চাপা হইয়া যায়, এইরূপ নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তনের জন্য পৃথিবীর মধ্যভাগ অথবা বিষুবরেখার সন্নিকটবর্ত্তী অংশ অনেকটা স্ফীত হইয়াছে এবং দুই মেরুপ্রদেশ সমতল হইয়াছে! পৃথিবীর মধ্যস্থল স্ফীত হওয়ায় ঐ অংশে সূর্য্যের আকর্ষণ অধিক হয়। তজ্জন্য পৃথিবী নিজ কক্ষে লাঠিমের ন্যায় একটু হেলিয়া দুলিয়া আবর্ত্তন করে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন পৃথিবীর গর্ভ যদি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকিত তবে উহা নিজ কক্ষে ভ্রমণ কালে লাঠিমের ন্যায় আরও অধিক হেলিয়া দুলিয়া চলিত।

ভূগর্ভের প্রতি ৬০ ফিটে যদি ১ ডিগ্রি (ফারেণহিটের) তাপ বৃদ্ধি হয় তবে ১০০ মাইল নিম্নে তাপের পরিমাণ ৮৮০০ ডিগ্রি হইবার সম্ভাবনা। এই উত্তাপে যাবতীয় জানা পদার্থই সাধারণ অবস্থায় দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর কঠিন আবরণ (crust) ৫০ হইতে ৬০ মাইল পুরু। এই কঠিন আবরণ গলিত ফুটন্ত পদার্থের উপর ভাসমান রহিয়াছে। সেকালের পণ্ডিতগণ প্রস্তরময় স্তরের চাপের কথা হিসাবে ধরেন নাই। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কঠিন পদার্থে পূর্ণ অধ্যাপক হব্‌স্ অনুমান করেন পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী অংশ কঠিন লৌহময়। আমেরিকার কর্ণেগী ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাক্তার হেনরি ওয়াশিংটন বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ লোহা, তামা, রূপা ও সোনা প্রভৃতি কঠিন ধাতুদ্বারা গঠিত।

অধ্যাপক অরেনিয়াস্ (Professor Arrhenius) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন স্তর ৩০। ৪০ মাইল পুরু। এই স্তর সমষ্টি ৬০ হইতে ১০০ মাইল গভীর ফুটন্ত তরল পদার্থের (liquid magma) উপর অবস্থিত। তার নিম্নে ভূগর্ভের সমগ্র অভ্যন্তর ভাগ বাষ্প রাশিতে পূর্ণ। এই বাষ্প সাধারণ বাষ্পের মত নয়। এই বাষ্পরাশি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ভীষণ চাপে কঠিন পদার্থের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কঠিন প্রস্তর স্তর হইতে তিন গুণ বেশী এবং উহার দার্ঢ্য (rigidity) ও সংকোচনহীনতা (incompressibility)

ইস্পাত হইতেও অধিক। সম্ভবতঃ এই বাষ্পের অর্দ্ধেক ভাগই বিভিন্ন ধাতব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মতই আধুনিক সময়ের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে অচিন্তনীয় তাপ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। সুতরাং তথায় কোন পদার্থেরই কঠিন কিম্বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না। সকল পদার্থেরই বাষ্পে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূগর্ভের চাপও কল্পনাতীত প্রচণ্ড। এই তাপ ও চাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ বাষ্পপূর্ণ হইলেও সেই বাষ্পরাশি ইস্পাতের ন্যায় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে যে সকল কথা বিবৃত হইল তাহা বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ভূগর্ভের নিম্নতম প্রদেশে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসাধ্য।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাচীন কাহিনী।

(২)

একবার বরিশালের অন্তর্গত রায়ের কাঠীগ্রামের জমিদার-দিগের মধ্যে জমিদারীর অংশ নিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, আমার পিতৃদেব ইহার একপক্ষের জমিদারের বাড়ীর নায়েব ছিলেন। মোকদ্দমায় তাঁহারা ডিক্রী পাইয়া বাড়ীতে নৃত্যগীত বাদ্যাদি আনন্দোৎসব আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপর পক্ষে একজন টর্নী মোক্তার ছিল, সে বড়ই ধূর্ত্ত এবং সে কালের পক্ষে সুচতুর ও পাকা পোক্ত লোক। সে বেগতিক দেখিয়া মৎস্য মাংস ফজলি আম প্রভৃতি বিবিধ উপঢৌকন নিয়া পেস্কার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া লম্বা সেলাম ঠুকিল। খাঁ সাহেব বলিলেন, কিহে এতক্ষণে উপস্থিত হইলে, এখন আর আমার হাতে আছে কি, ফয়সলা (রায়) বাহির হইয়া গিয়াছে।

মোক্তার বাবু আবার সেলাম ঠুকিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, এখন হুজুর! আপনার অসাধ্য কি আছে, এখনও আপনি ইচ্ছা করিলে আমার মুনিবকে রক্ষা করিতে পারেন। এই বলিয়া (কি, কৌশলে জানি না) তিনি চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া দিলেন।

পেস্কার সাহেব কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করিয়া বলিলেন, হঁা! পথ আছে বটে, আমাকে দেবে কি ঠিক কর।

মোক্তার বাবু বিনীত ভাবে তিন হাজার টাকা ঘুশ স্বীকার করিয়া এক হাজার টাকা তখনই শ্রীপাদপদ্মে দাখিল করিলেন। তখনকার ফয়সলা (রায়) পার্শী অক্ষরে লেখা হইত, আর সেই লেখাও পেস্কার সাহেবের নিজের। ঐ অক্ষরে বহু শূন্যে বহু রেখায় বহু অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্থান বিশেষে কয়েকটী রেখা ও শূন্য বসাইয়া দিলে নাকি বিপরীত অর্থ হয়।

এক পক্ষের ডিক্রী নাকি অপর পক্ষের ঘাড়ে গিয়া চাপায়। পেস্কার সাহেব তাহাই করিলেন, এবং তাহাতেই মোক্তারের মক্কেলের পক্ষে ডিক্রী সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বের ডিক্রী বরবাদ হইয়া গেল।

মোকদ্দমায় যাহারা হারিয়াছিল দুই দিন পরে তাহাদের বাড়ী নৃত্য গীত বাদ্যাদি চতুর্গুণ আরম্ভ হইল। অনেকে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, ইহারা মোকদ্দমায় হারিয়া এরূপ পাগলামি করিতেছে কেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলেন আফিসে গিয়া দেখ, কে হারিয়াছে আর কে জিতিয়াছে। অপর পক্ষ ত্রস্তভাবে আফিসে গিয়া ফয়সলা দেখিয়া বুঝিলেন যে তাহাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের পক্ষের ডিক্রী অপর পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়াছে।

এই তো গেল আদালতের নমুনা, এখন ফৌজদারির নমুনা "তথৈবচ" নয়, ততোহধিক বলিলেই ঠিক হয়।

সে কালের দারোগাই একপ্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ ছিলেন। কোনও গ্রামে বিবাদ বিসম্বাদে খুন হইলে কিংবা সন্দেহজনক মৃত্যু হইলে পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে নিরীহ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইত। পুলিশের দল শূন্য গ্রামে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিয়া খাইত, গাই দোহাইয়া দুগ্ধ নিয়া যাইত, তরি তরকারী লুণ্ঠন করিত। বাড়ীতে দুইটী লোক থাকিলেও ভয়ে লুকাইয়া থাকিত। কথা বলিলে বিপদ, প্রাণ নিয়া টানাটানী। কাজেই "যঃ পলায়তি স জীবতি" পুলিশের ক্ষমতা ম্যাজেষ্ট্রেটের

উপরে। গ্রামের নিরক্ষর লোকে মনে করিত লাট সাহেবের পরেই পুলিশ। তখনকার পুলিশ উপযুক্ত পূজা পাইলে সমস্ত কাজ করিয়া দিতে পারিতেন। পুলিশের বিরুদ্ধে অনেকেই আদালতে উপস্থিত হইত না।

একবার কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর সীমা নিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকের দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, শান্তিরক্ষার জন্য দারোগা সাহেব ২ জন প্যাদাকে সেখানে মোতায়েন রাখিয়া ছিলেন। অপর পক্ষ ঐ প্যাদাকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দিল। প্যাদা সাহেব চাপরাশ দারোগার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল এই নেও তোমার চাপরাশ, ইহার কোন মূল্য নাই। আমরা শান্তিরক্ষার জন্য কোম্পানীর দোহাই, মহারাণীর দোহাই, শেষে তোমার দোহাই পর্য্যন্ত দিলাম, তাহাও আসামীরা মানিল না, আমাদিগকে প্রহার করিয়া সেখানে হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

দারোগা সাহেব শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, হুকুম দিলেন এখনই পাঁচ প্যাদা যাও, যেরূপে পার ইহার প্রতিশোধ দিয়া আইস। পঞ্চ প্যাদা কয়েকজন লাঠিয়াল নিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, আসামীগণ অতর্কিত ভাবে ছিলেন, পলাইবার অবসর পাইলেন না, এদিকে লোকজনসহ পঞ্চপ্যাদা আসামীর ঘরে ঢুকিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। বাড়ীর লোকজনকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল, মহিলাদিগের অঙ্গ হইতে গহনা পত্র কাড়িয়া নিল, শেষটা বাহির বাড়ীর একখানা ঘরে আগুন দিয়া চলিয়া গেল।

এই যে দিনে দুপরে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গেল, ইহার বিরুদ্ধে কেহই আর রাজ দ্বারে উপস্থিত হইতে সাহস পাইল না। পুলিশের বিরুদ্ধে কেহ পরামর্শও দিল না। গ্রামে যাহারা বৃদ্ধ নেতা ছিলেন তাহারা বলিলেন, এরূপ হইবে তাহাতো জানা কথাই, নির্ব্বোধেরা পুলিশের গায় হাত দিয়া অপরিণামদর্শিতার কাজ করিয়াছে। রাজার সঙ্গে বিরোধ, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ভোগকরিল।

বলা বাহুল্য যে তখন কনেষ্টবলের গায় হাত দিলেও লোকে রাজদ্রোহিতা মনেকরিত।

ডাকাতি।

আমি বাল্যকাল হইতে ডাকাইতির কথা শুনিয়াছি। শত বর্ষ কি ইহারও অধিক পূর্ব্বে নানা স্থানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়া (বন্দুক নিয়া নহে) মশাল জ্বালিয়া ডাকাইতগণ লোকের বাড়ীতে ডাকাইতি করিত, ডাকাতির ভয়ে লোকে প্রকাশ্য স্থানে বাড়ী ঘর করিত না, এক শ্রেণীর ডাকাইত ছিল তাহারা একটী পয়সা গ্রহণ করিলেও প্রাণে বধ না করিয়া নিত না ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম। আর এক শ্রেণীর ডাকাইত ছিল তাহারা পথিককে আশ্রয় দিয়া অতিথিরূপে ভোজন করাইয়া প্রাণে বধ করিয়া সমস্ত আত্মসাৎ করিত। প্রাণে বধ না করিলে ইহাদের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে বলিয়াই খুন না করিয়া নিত না।

অতিথি যতক্ষণে আহার না করিবে ততক্ষণ কিছু করিবে না, আহার করিলেই প্রাণে বধ করিবে, ইহাও ধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমায় তৎকালে "শালপ্রাংশু-র্মহাভুজঃ" অসীম সাহসী অমিত বলশালী ভীম দর্শন একটী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে তাহাকে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি তিনি যৌবনে একাকী তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন তৎকালে পদব্রজে ভিন্ন যাওয়ার সুবিধা ছিল না, তিনি পথক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পরে এক প্রসিদ্ধ ডাকাইতের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডাকাইতেরা পঞ্চ ভ্রাতা অতি সমাদরে অতিথি ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিল এবং ভোজ্য দ্রব্যাদি উপস্থিত করিয়া বলিল, ঠাকুর মহাশয়! বড় ভাগ্যে আজ আপনার চরণ দর্শন পাইলাম, আপনি সমস্ত দিন অনাহারী, শীঘ্র ২ পাক করিয়া আহার করুণ, আর বিলম্ব করিবেন না।

ঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া একটু জল খাইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আরও ২। ৪ টী লোক লাঠি নিয়া তাহাদের বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং ফুস্ ফুস্ করিয়া কি যেন গুপ্ত পরামর্শ করিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ডাকাইতের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছেন, আজ আর বাঁচিবার আশা নাই তাই পাকের কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ডাকাইতগণ পাক করিতে মৃৎপাত্র দিয়াছিল, ঠাকুর মহাশয় কাষ্ঠের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, জলে উনান ভিজিয়া গেল। ডাকাইতেরা আর একটী মৃৎপাত

আনিয়া ছিল, কিছু কাল পরে তিনি তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ইহার পর ডাকাইতেরা বিরক্ত হইয়া একটী বহুগুণা আনিয়া পাক করিতে দিল। ঠাকুর মহাশয় পাক করিয়া আহার করিতে বসিলেন। ইহার মধ্যে ডাকাইতেরা ২।৩ বার তাগাদা করিতে আসিল, তাহারা সজ্জিত ভাবে শেষ বার আসিয়া যখন বলিল ঠাকুর মহাশয়ের আহার হইয়াছে, তখন ঠাকুর মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন আহার হইয়াছে, কে কে যমের বাড়ী যাইবে আইস এই বলিয়া তিনি ভাঙ্গা হাড়ীর চাড়া বহুগুণা ঘটী বাটী প্রভৃতি যাহা কিছু পাকের ঘরে ছিল তাহা সমস্তই ডাকাইতের দেহে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ২।৩ জন আহত হইয়া ভূতল শায়ী হইল; তৎপর ঠাকুর মহাশয় ভীমগর্জ্জনে ঘরের বাহির হইয়া লাঠী ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। ৪ হাত লম্বা পরিপক্ক বাঁশের একখানি লাঠী ঠাকুর মহাশয়ের নিত্য সহচর ছিল। লাঠী বহু দিন তৈল খাইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, ঠাকুর মহাশয় বিদ্যুৎ বেগে সেই লাঠী ঘুরাইতে আরম্ভ করিবেন। ডাকাইতদিগের অস্ত্রশস্ত্র লাঠীর আঘাতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল লাঠীর আঘাতে ডাকাইতের অস্ত্রই ডাকাইতের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। ইহার পর যখন লাঠীর আঘাতে আরও ২।৩ জন ভূতল শায়ী হইল তখন ডাকাইতের সরদার অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের পদতলে লোটাইয়া পড়িল।

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন কিরে সাধ মিটিয়াছে, না আর কিছু চাও। সরদার বলিল গুরুদেব! আজ হইতে আপনাকে ওস্তাদ মানিলাম, অপরাধ ক্ষমা করুন।

সেই রাত্রি ঠাকুর মহাশয় সেখান থাকিয়া প্রাতে ২৫৲ টাকা প্রণামী লইয়া ঠাকুর মহাশয় গন্তব্য স্থানে চলিলেন। তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিবার সময় ঠাকুর মহাশয় সেই দস্যু শিষ্যের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে আহারান্তে আরও কিছু প্রণামী নিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন।

এই সকল ঘটনা আমার জন্মের পূর্ব্বে বা অতি শৈশবে।

মশাল জ্বালিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়া দস্যু দল গ্রামে ঢুকিয়া লোকের ধন প্রাণ হরণ করিত ইহা কর্ণে মাত্র শুনিয়াছি মধ্য সময় এরূপ ঘটনা কোথাও ঘটে নাই অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বের মধ্য সময় এত সুশাসন ছিল যে গ্রামে কি নগরে ডাকাতি ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি মনে করি না।

বাঙ্গালা নদীমমাতৃক দেশ। এখানে মধ্যে মধ্যে জলপথে ডাকাতি হইত বটে কিন্তু ডাকাতেরা জনবহুল গ্রামে কি নগরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না।

বর্ত্তমানে ডাকাতির মাত্রা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল কলিকাতার মত মহানগরীতেও দিনে দুপরে লোকের ধন নাশ প্রাণ নাশ ঘটিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নারী হরণের মাত্রাও বেজায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকের ধন প্রাণ পরিবার নিয়া বাস করা সাধ্যাতীত হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে বাণিজ্যাদি উপলক্ষে বিদেশবাসী মানবগণের পরিবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত না ইহাতে ব্যাভিচার ব্যভিচারিণীর মাত্রা অল্প ছিল না বটে কিন্তু তাহাতেও কেহর মাতা ভগিনী স্ত্রী নিয়া কেহ টানাটানী করিত বলিয়া প্রমাণ, কি কিম্বদন্তী পাওয়া যায় না; মুসলমান রাজত্বের সময়ও এরূপ অত্যাচর ছিল না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

ছোট লোক

—এক—

"বিদ্যালঙ্কার মশাই, পেন্নাম হই!"

"আরে কিহে পাচু? খবর কি? হাঁ হাঁ—পায়ে হাত দিতে হবে না—ঐ দূর থেকেই প্রণাম কর—তা এত ভোরে কি মনে ক'রে?"

"আজ্ঞে বিন্দাবন মারা গেছে!"—

"কি হয়েছিল রে?"

"আজ্ঞে, মা মনসা দয়া করেছেন।"

"সর্পাঘাত!" এই বলিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"বিন্দাটা ত বড় ফাঁকি দিল হে!"

"আজ্ঞে সে কি রকম! ওত খুব ভাল মানুষ ছিল!

"এই পরশু দিন আমার কাছ থেকে একটা টাকা আগাও নিয়ে গেল; মাত্র একদিন কাজ করেছে,—এখনও বার আনা পাওনা!! আর আদায়ের আশা নাই!!

"আজ্ঞে, একটা মানুষই গেল! তা ওর বৌকে বল্‌ব। কর্ত্তা, তা'—হ'লে অশুচটা কি রকম হ'বে?"

বিদ্যালঙ্কার মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "অপমৃত্যু ঘটেছে তিন রাত্রি অশৌচ হ'বে।" তারপর মুখভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে একটা বিষম ঘৃণারভাব ব্যক্ত করিয়া কহিলেন :—

"ছোট লোকে এসব মানেও ভারী! তা আবার এত ব্যবস্থা! দেখিস্ মাছ খায় না যেন! হবিষ্যি কর্‌তে হবে!"

"আজ্ঞে, বিন্দাবনের বউকে ষা' বলে দিবেন, সে সব্ ঠিক মত মান্‌বে। লেখাপড়া জানা বৌ ও সব্ ঠিক্ কর্‌বে। আমি এতটা বুড়া হলেম সব্ চুল পাক্ ধর্‌ল—দাঁতগুলি পড়তে সুরু হয়েছে—কিন্তু এমন ভাল বৌ আমি দেখিনি।"

"হুঁ! লেখাপড়া জানে! তা বিধবা ত হবেই!

"সে কি রকম কর্ত্তা?"

"তোরা ছোট লোক্ বেটারা—বুড়া হ'লে কি হ'বে? এসব কী বুঝবি? লেখাপড়াটা হ'ল পুরুষের কাজ—ওটাতে পুংশক্তি জন্মে। এখন স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখে পুংশক্তি-লাভ কর্‌লে স্বামীর সহিত মিলনে প্রলয়শক্তি উৎপন্ন হয় সুতরাং সেই স্ত্রী বিধবা হয়! শাস্ত্রেই বলেছে স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী! অর্থাৎ কি না স্ত্রীলোকের বুদ্ধি হলেই প্রলয় হবে। এজন্য লেখাপড়া নিষেধ। বুঝলি?"

পাচু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে—বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিদ্যালঙ্কার তাহাকে নীরব দেখিয়া নিম্নস্বরে বল্লেন :—

"বিন্দার বৌর বয়স কত হবেরে?"

"আজ্ঞে, সোমত্ত বৌ, মাত্র একটী ছবছরের ছেলে কোলে।"

"হুঁ" এই বলিয়া বিদ্যালঙ্কার ধুমপান করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—

দেখ পাচু; তুই বুড়া হয়েছিস্ এখন কিছু ধর্ম্ম কাজটাজ করা উচিত!"

"আজ্ঞে, তা'ত ঠিক্ কথা। কিন্তু কর্ত্তা আমরা ধর্ম্মের কি জানি?"

"দেখ শাস্ত্রে লিখেছে গুরু ব্রহ্ম অর্থাৎ কিনা গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বর—বুঝলি?"

"আজ্ঞে, সে কথা ঠিক্। আমরা ত ঈশ্বর দেখি না আমরা গুরুকেই দেখতে পাই।"

"গুরু বাক্য মান্‌লেই মহাধর্ম্ম। মহাপুণ্য! বুঝলি? রাত্রে কৃষ্ণলীলা হ'বে কিশোরী ভজন হ'বে, বিন্দার বৌকে নিয়ে আস্‌বি? বুঝলি?"

"বিন্দাবনের বৌত কোথাও বের হয় না।"

"বুঝিয়ে বলবি। আমার পাওনা টাকা দিতে হ'বে না। বুঝলি?"

পাচু বিরক্ত হইয়া বলিল "এখন যাই কর্ত্তা, অনেক কাজ আছে। এই বলিয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হলেই বিদ্যালঙ্কার সভয়ে পিছাইয়া বলিলেন—"দেখ বেটার স্পর্দ্ধা! এখনি ছুঁয়ে দিয়ে ছিল আর কি! ঐ অমনি দূর থেকে প্রণাম কর। আবার আসিস্ অনেক কথা আছে।"

"আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া পাচু দূর হইতে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

দুই

বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী হইতে পাচু বরাবর কুঞ্জময়ী বৈষ্ণবীর কুঞ্জে উপস্থিত হইল। কুঞ্জ তখনও নিদ্রামগ্ন। পাচু ডাকিল "কুঞ্জ! অ কুঞ্জ!" কোন সারা নাই।

পাচু নলের বেড়ার ফাক দিয়া গৃহের মধ্যে কি দেখিল। পাচুর মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইল। সে আঙিনা হইতে সরিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গন্ধরাজ ফুল গাছের পিছনে পলাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জময়ীর গৃহদ্বার খুলিয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইলেন গ্রামের মাতব্বর ঘনশ্যাম চাটুর্য্যে মহাশয়! তিনি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বাড়ীর পিছন্ দিক্ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার অন্তর্দ্ধানের পর কুঞ্জময়ী "রাধে-কৃষ্ণ" ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইল।

পাচু লুকায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া কহিল—"কি দিদি, একেবারে রাঘব গিলেছ?"

কুঞ্জের ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া পাচুর দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"মর্ পোড়ারমুখো! এত সকালে মর্‌তে এলি কোন্ চুলায়?

পাচু নরম হইয়া কহিল "রাগ কর কেন দিদি, বড় খারাপ খবর! বিন্দাবন মারা গেছে! মা মনসা দয়া করেছেন! বিন্দাবনের বউর এই বিপদ্ তার উপর বিদ্যালঙ্কারের কথা শুনে গা টা জলছে!"

"কেন কি বলেছে ঐ মিন্সে? ভজন কর্‌তে চায় বুঝি?

"হুঁ, বউ মরেছে, এখন যত মাগী নিয়ে রাত্রে ভজন করে। বিন্দার বৌর দিকে নজর!"

"বটে! তাহ'লে ত দেখছি চাটুয্যের সাথে ঝগড়া লাগবে। সে আমাকে ধরেছে অনেক দিন। যত টাকা লাগে দিতে রাজী।"

পাচু কুঞ্জের কথায় স্তব্ধ হইয়া বিবর্ণ মুখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুঞ্জ বলিতে লাগিল—

"কিন্তু কী তেজ ঐ এতটুকু বৌর! মাগো! আমাকে দুইবার ঝাটা মার্‌তে এসেছে! কিন্তু এখন যাদুকে নরম হ'তে হ'বে। বিন্দাটা ছিল একটা জানোয়ার একটা বিলাতি কুত্তা—ওর ভয়ে এতদিন চুপচাপ ছিলাম।"

পাচু কহিল "কেন দিদি, তুমি বিন্দাবনের বউকে মন্দ বলছ? ও বড় ভাল মেয়ে বড় লক্ষ্মী বৌ! প্রায় বিকেলে রামায়ণ পড়ে, পাড়ার বুড়ীরা শোনে তারা কত সুখ্যাতি করে আমাদের বুড়া গোসাই ঠাকুর বলেন বিন্দাবনের বউ আর জন্মে বামুনের মেয়ে ছিল, কোন্ শাপে ভুইমালীর ঘরে এসেছে!"

কুঞ্জ মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল—"ভারী ত ভুইমালীর বৌ! তার আবার এত দেমাক্! একটু লেকা পড়া জানে তা মাটীতে পা পড়ে না! দেখতে একটু সুন্দর তা মানুষকে গ্রাহ্যই করে না! তা এখন? এখন বৈষ্ণবী হ'য়ে এই কুঞ্জের পায়ে তেল দিতে হ'বে!

"সে কেন বৈষ্ণবী হ'তে যাবে?"

"কি ক'রে খাবে শুনি? জল-চল নয় যে বামুন কায়েতের বাড়ী ঝি গিরি কর্‌বে!" একটু থামিয়া আবার বলিল—ত্রিশ চল্লিশ বছরের মিন্সে আটদশ বছরের মেয়ে বিয়ে কর্‌বে। তা বৌ সোমত্ত হ'তে না হ'তে মিন্সে পটল তোলে! তারপর বিধবাগুলি যা করার তাই করে!

পাচু কাঁদ কাঁদ হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল "কুঞ্জ দি, আমি বুড়া মানুষ বলি, দোহাই তোর গুরুর; বিন্দার বৌর পিছনে লাগিস্ না। ও আমাকে ধর্ম্মের বাপ ডেকেছে। ওর আর কেউ নাই। ওকে রক্ষা কর—এই জন্যই তোর কাছে এসেছি!"

কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া বলিল "ভাল, আমি না হয় থাম্‌লাম—করিম মিঞাকে রাখবে কে?"

পাচু অবাক্ হ'য়ে বল্‌ল—"করিম মিঞা!" তবে উপায়? কুঞ্জ বলিল—"এখন বেলা হ'ল, এখন যাও, অন্য সময় এস" এই বলিয়া সে ঘটী লইয়া পায়খানার দিকে প্রস্থান করিল। পাচু আবার কয়েকবার তার গুরুর দোহাই দিয়া আস্তে আস্তে কুঞ্জের আখড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন

বৃন্দাবন ভুইমালীর বৌ নয়নতারার একটু ইতিহাস আছে। নয়নতারার বাপ ব্রজনাথ সহরে এক হাকিমের আর্দ্দালী ছিল, হাকিম ব্রজনাথকে খুব ভালবাসিতেন! তাহার নিজ বাসার এক ধারে একখানি ঘরে ব্রজনাথকে সপরিবারে থাকিতে দিতেন। ব্রজনাথের একমাত্র কন্যা নয়নতারা হাকিমের পুত্রকন্যাগণের সহিত খেলা করিত, তাদের সহিত একত্র স্কুলে যাইত। বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় নয়নতারা হাকিমের অনুগ্রহে তাঁহার নিজ কন্যার মতই পোষাক পরিচ্ছদ পাইত। নয়নতারা যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে তখন হঠাৎ ব্রজনাথ মারা যায়। ব্রজনাথের স্ত্রী নয়নতারাকে লইয়া দেশে আসে, সেখানে নয়নতারার উপযুক্ত কোন বর মিলিল না। বাধ্য হইয়া ব্রজনাথের স্ত্রী নয়নতারাকে বৃন্দাবনের হস্তে সমর্পণ করিয়া হঠাৎ মারা যায়। বৃন্দাবন লেখাপড়া জানিত না কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল। গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ, আর গোঁয়ারও ছিল তেমনি। শারীরিক পরিশ্রমে বৃন্দাবন যাহা উপায় করিত তাহাতে অতি কষ্টে সংসার চলিত।

বৃন্দাবন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। নয়নতারা দুই বৎসরের ছেলে লইয়া বিধবা হইয়া অকূল সমুদ্রে পতিত হইল। লেখাপড়া শিক্ষার ফলে সে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। বাড়ীঘর তার অতি জীর্ণ কুটীর হইলেও নয়নতারার যত্নে তাহা ঝক্ ঝক্ করিত। পাড়াপ্রতিবেশীর অনেকে চিঠি লিখাইতে ও পড়াইতে তাহাকে ডাকিত কিন্তু সে কাহারো বাড়ী যাওয়া পছন্দ করিত না এজন্য গর্ব্বিতা বলিয়া অনেকে তাহার নিন্দা করিত। অনেকে তাহার বাড়ী যাইয়া চিঠি লিখাইত, চিঠি পড়াইত। বিকাল বেলা নিম্ন শ্রেণীর অনেক বৃদ্ধা আসিয়া তাহার রামায়ণ পাঠ শুনিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়েস্থেরা ইহা ভুইমালী বৌর অসহ্য স্পর্দ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিত।

নয়নতারা দেখিতে সুন্দরী ছিল। অনেকের পাপদৃষ্টি পড়িলেও বৃন্দাবনের ভয়ে এতদিন কেউ কিছু সাহস পায় নাই। মাতব্বর চাটুয্যে মশয় কুঞ্জময়ী দ্বারা গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কুঞ্জময়ীর ঝাটাপ্রহারই লাভ হইয়াছিল। বৃন্দাবনের হিতৈষী পাচুকে নয়নতারা পিতা বলিত। পাচু জাতিতে নমঃশূদ্র কিন্তু খুব ভাল মানুষ। বয়স পঞ্চাশের উপরে।

বৃন্দাবনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে একদিন দুপুর রাত্রে তাহার বাড়ীতে একটা হৈ চৈ শোনা গেল। "চোর" "চোর" বলিয়া পাচু একজনকে ধরিয়া অন্ধকারে খুব প্রহার করিতেছিল। পাড়ার লোকজন আলো লইয়া বৃন্দাবনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। একজন চোরের মুখের কাছে আলো ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ!! করেছিস্ কি? শীগ্‌গীর ছেড়ে দে! পাচু কাহাকে প্রহার করিতেছে হুস্ ছিল না। এখন চিনিতে পারিয়া সে প্রহার ত্যাগ করিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নয়নতারা ঘরে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। প্রহৃত লোকটী মাটী হইতে উঠিয়া গা ঝাড়িয়া আস্ফালন করিয়া কহিল—"আমার পাওনা টাকার জন্য এসেছি, টাকা দেওয়ার নাম নেই উল্টা আমাকে প্রহার! দেখাব বেটাকে একবার!!" গুরুচরণ সর্দ্দার চক্ষু গরম করিয়া কহিল, "দুপুর রাতে একলা মেয়ে মানুষের বাড়ীতে কিসের টাকার তাগিদা?"

সে গর্জ্জিয়া কহিল—"বটে! কিসের টাকা!! দেখাব মজাটা!!! ভিটে বাড়ী উচ্ছন্ন কর্‌ব তবে ছাড়ব!!! এই বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে ২ চলিয়া গেল।

পাচু গুরুচরণ সর্দ্দারকে কহিল, দাদা এখন এই মেয়েটাকে রক্ষা করি কেমন করিয়া। চার্ দিক থেকে লোকে পাগল করে তুলেছে!

"আর কি হয়েছে পাচু?"

সে অনেক কথা বলি শোন—"রহিম মিঞা কাল এসে বিন্দাবনের বৌকে বলেছে"--পাচু থামিয়া গেল।

নয়নতারা এতক্ষণ ঘরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে ২ কাঁপিতেছিল। পাচুর কথায় সহসা বাহিরে আসিয়া পাচুর পা ধরিয়া কহিল" চুপ কর্। এসব কথা শুন্‌তে মাথা কাটা যায়! গলায় দড়ি দিয়া মরা ছাড়া আমার উপায় নাই!! এই বলিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সর্দ্দার কহিল—"কি কর্‌বে মা? যারা আমাদের রক্ষা কর্‌বেন তারাই আমাদের খুন কর্‌তে চান।"

পাঁচু কহিল—"এখন বড় ভাবনার কথা হইল। রহিম মিঞা বলে গেছে সে ওকে নিকা কর্‌বে। যদি রাজী না হয় জোর করে নিয়ে যাবে! এদিকে চাটুয্যে মশয় কুঞ্জ বোষ্টমীকে লাগিয়াছে। তার পরে আবার এর কাণ্ডটা নিজেই দেখ্‌লে!!

সর্দ্দার কহিল—"এগাঁয়ে আর থাকা যাবে না। ভদ্দর লোক সব এমন কাজ করে!! ছি! ছি!! চল রাত হয়েছে।"

নয়নতারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"মা—কোন ভয় নাই সাবধানে থাক। আমরা আছি ডাক্ দিও।" এই বলিয়া পাচু ও সর্দ্দার প্রস্থান করিল।

চার

আজ দুদিন যাবৎ নয়নতারা উপবাসী। পাচুর মাথা রাত্রে কে ফাটাইয়া দিয়াছে সে শয্যাগত। নয়নতারা কাহারও বাড়ীতে যাজ্ঞা করা ঘৃণা বোধ করিত। ছেলেটাকে দুটী মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। নয়নতারার বাড়ীর উত্তরদিকে বড় দীঘী। পশ্চিম পাড়ে ঘোষদের বাড়ী। ঘোষদের বাড়ীর ছোট বৌ সুরবালার সহিত নয়নতারার ভাবছিল। সুরবালার অনেক চিঠি নয়নতারা লিখিয়া দিত। সুরবালার শাশুড়ীর শুচিবাই খুত খুতে স্বভাব, এজন্য নয়নতারা ২।১ বার যাইয়া বড় অপমানিত বোধ করিয়াছে। আজ দুপুরের সময় নয়নতারা ছেলে লইয়া ঘাটে আসিয়াছিল। সুরবালাও আহারের পরে ঘাটে গিয়াছে। সুরবালা নয়নতারাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকসুলভ মামুলী আলাপ করিল "কি ভুই মালীবৌ, কি রাধ্‌লে? কি খেলে?"

সুরবালার প্রশ্নে নয়নতারা কোন উত্তর করিল না, তাহার সুন্দর কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ছেলেটা বলিয়া উঠিল "মা খাব"! আজ নয়নতারা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দর বিগলিত ধারে নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল। সুরবালা বুঝিতে পারিয়া ব্যথিত হইল, সমবেদনায় তাহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইল। "ছি! ভাই আমাকে জানাওনি কেন?" এই বলিয়া সুরবালা নয়নতারার হাত

ধরিয়া টানিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। ঘোমটা টানিয়া ছেলে কোলে করিয়া নয়নতারা ধীরে ২ সুরবালার সহিত তাহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সুরবালা নয়নতারাকে আঙ্গিনার ছায়ায় বসাইয়া ভাত আনিয়া দিল। নয়নতারা দুটী একটী ভাত ছেলের মুখে দিয়াছে, এমন সময় সুরবালার বড় জা ওখান দিয়া ঘাটে যাইবার বেলা নয়নতারাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া একটু চাহিয়াই সুরবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেল—

"ছোট" গিন্নির বুঝি খয়রাত হচ্ছে"। কথাটা শুনিয়াই নয়নতারার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সুরবালা তাহা লক্ষ্য করিয়া খুব লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদির কথা গ্রাহ্য করো না। তিনি ঐ রকম। কিন্তু নয়নতারা খায় না, কেবল কাঁদে। কান্না শুনিয়া সুরবালার শাশুড়ী নিরামিষ ঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"এই দুপুরের সময় আমার বাড়ীতে এই মরা কান্না কেন? বলি ছোট বৌ, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?" সুরবালা ব্যস্ত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া নয়নতারাকে বলিল, বৌ, আমার মাথা খাস কাঁদিস্ না, এক্ষুণি মা এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেও লক্ষ্মী আমার।

নয়নতারা সুরবালার অনুরোধে দুই এক গ্রাস মুখে দিল, কিন্তু বিষম বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া গোবর দিয়া লেপিয়া থালাটা ধুইবার জন্য নয়নতারা পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। ছেলেটীকে সুরবালার সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়া গেল। কিন্তু তাহার ছেলের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সুরবালা মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়াছিল, এদিকে নয়নতারার ছেলেটী হামাগুড়ি দিয়া সরিয়া নিরামিষ ঘরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেই সুরবালার শাশুড়ী কাদম্বিনী চেঁচাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বিষম উত্তেজনায় নয়নতারাকে লক্ষ্য করিয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। ছেলেটীও নামিয়া আসে না; কাদম্বিনী অবেলায় ভুঁইমালী ছুঁইয়া স্নান করিতে রাজী নয়, তাহার ভোজন শেষ হয় নাই, ছেলেটী ঘরে ঢুকিবে আতঙ্কে আহার ত্যাগ করিয়াই উঠিয়া আসিয়াছে। সুরবালার মুখে কথা নাই, অবাক্ হইয়া শাশুড়ীর গর্জ্জন শুনিতেছিল। এবার কাদম্বিনী আর সহ্য করিতে পারিল না সুরবালার বোকামিতে একটী ভুঁইমালীর ছেলে তার নিরামিষ ঘরে ঢুকিয়া কি সর্ব্বনাশ ঘটাইল—অসহ্য ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া কাদম্বিনী উচ্ছিষ্ট হস্তেই একটী লাঠি লইয়া অজ্ঞান শিশুর পৃষ্ঠে সপাং সপাং করিয়া কয়েক ঘা বসাইয়া দিল।

ছেলেটী একটী অব্যক্ত শব্দ করিয়াই ঐ খানে ঢলিয়া পড়িল। "হায়! হায়! খুন্ করে ফেল্লেন' বলিয়া সুরবালা দৌড়াইয়া গিয়া ছেলেটীকে উঠাইয়া কোলে করিয়া বসিল। কাদম্বিনী ঝঙ্কার দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—" ওরে আমার পীরিতরে! যত ছোট জাতের সঙ্গে পীরিত! এখন জাত, ধর্ম্ম সব গেল, হতচ্ছাড়া ছেলে আমার খাওয়া নষ্ট কল্লে, তার উপর ঘরের সব জিনিষ ফেলে দিতে হ'বে এখন! আবার এই অবেলায় চান্ কত্তে হ'বে কী মুস্কিলে ফেল্লে!" নয়নতারা চীৎকার শুনিয়া পুকুরের ঘাট থেকে দৌড়িয়া আসিয়া ছেলের অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সুরবালার কোলে শিশুটী নীলবর্ণ হইয়া গেছে। সেই যে লাঠির ঘা খাইয়া একটু অব্যক্ত শব্দ করিয়া ছেলেটী নিস্তব্ধ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে আর শব্দ করিতে পারে নাই। সুরবালার চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। হায় কি কুক্ষণে সে নয়নতারাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, রোষে, অনুতাপে সুরবালার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া সুরবালা কহিল—"মা, ছোট লোক ছুঁয়ে স্নান করার ভয় কচ্ছেন, এখন যে থানায় যেতে হবে, পুলিশ আসবে, হাতে হাতকড়ি দিবে। হায় হায় আপনার প্রাণে একটু দয়া নাই. এই অজ্ঞান শিশু, তাকে আপনি মেরে খুন্ করে ফেল্লেন।"

এতক্ষণে কাদম্বিনীর চৈতন্য হইল। শিশুর দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সুরবালার কথায় সে ভয়ে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাইত একী সর্ব্বনাশের কাজ মুহূর্ত্তের মধ্যে করিয়া ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি সুরবালার কাছে আসিয়া শিশুর মস্তকে ফুৎকার দিতে আরম্ভ করিল। নয়নতারার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে সে পাগলিনীর মত ছুটিয়া মৃত ছেলেটীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া—বুক-ফাটা কান্নায় দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিজের কুড়ে ঘরে চলিয়া গেল।

"পাঁচ"

কাদম্বিনীর সমস্ত আক্রোশ সুরবালার উপরে পড়িল। অনর্থক এই ছোট লোকের বৌটাকে ডাকিয়া আনিয়া সুরবালাইত এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। সে সন্ধ্যাপূজায় জপে একপ্রহর সময় কাটায়, একাদশী দিন নিরম্বু উপবাস করে, আর স্নান—সেত প্রাতঃকাল থেকে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক দশমির নিয়মে চলিতে থাকে। কত বার যে সে অশুচি ও ছোট লোকের স্পর্শে অপবিত্র হয় তাহার সংখ্যা নাই।

পরদিন গ্রাম্য চৌকীদার থানা হইতে পুলিশ লইয়া আসিল। দারোগার কাছে উঠানভরা লোকের সামে কাদম্বিনী অবলীলাক্রমে সাক্ষ্য দিলেন সুরবালাই এই খুনের জন্য দায়ী, সেই লাঠি দিয়া ছেলেটাকে মারিয়াছে। ঘরে তিনি খেতে বসেছিলেন, তিনি বরং বৌকে বলেছিলেন, "ছোট শিশু, সে কিছু বোঝে না তাকে মার কেন? ঘরে ঢুকেছে না হয় ভাতগুলি ফেলে দিলেই হ'বে, আর স্নান কল্লেই ত সব গোলমাল মিটে যাবে। সে কি তা শোনে? সে গর্জ্জিয়া এসে লাঠি নিয়ে ছেলেটার পিঠে ঘা কতক বসিয়া দিলে, আহা অতটুক শিশু, লাঠি খেয়ে অমনি ঢলে পড়ে গেল। দারোগা বাবু! আমার বৌ ত নয় যেন একটা রাক্ষসী, আমি শাশুড়ী বলে রক্ষা, নইলে অন্য হ'লে কবে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিত। ওরে আমার বাছারে"—এই বলিয়া কাদম্বিনী দরবিগলিত ধারে রোদন করিতে লাগিল। নয়নতারা এক উঠান লোকের ভিড়ের মধ্যে ঘুমটা দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সে কাদম্বিনী সাক্ষ্য দেওয়া শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। দারোগার নিকট অগ্রসর হইয়া সে বলিল—"দারোগা বাবু, আমার ছেলেকে আমি নিজ হাতে মেরেছি। খোকা ঘরে ঢুকে তাঁর খাওয়া নষ্ট করতে গিয়েছিল, আমি রাগে অন্ধ হ'য়ে জোরে মেরে ছিলুম্—আর কারো দোষ নাই।" এই বলিয়া নয়নতারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িয়া গেল।

উপস্থিত সমস্ত লোক নয়নতারার সাক্ষ্য শুনিয়া বিস্ময় অব্যক্ত শব্দ করিয়া উঠিল। কেহ কেহ ফিস ফিস করিয়া বলিল—ছেলের শোকে বৌটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু লাসের সঙ্গে কাদম্বিনী, সুরবালা ও নয়নতারা তিনজনকেই সদরে চালান দিলেন।

সুরবালার স্বামী ত্রৈলোক্য বাড়ী আসিয়া জোর তদ্বির করিতে লাগিল। গ্রাম্য বৃদ্ধেরা ত্রৈলোক্যকে বুঝাইল বৌ গেলে বৌ পাওয়া যাবে, মা গেলেত মা পাওয়া যাবে না। সুতরাং যাতে মা রক্ষা পায় তাহাই করিতে হইবে। সাক্ষী সংগ্রহ হইল পুলিশ পূজা পাইয়া নয়নতারার গলায় ফাঁস দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিল।

মোকদ্দমা ক্রমশঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট পার হইয়া সেসন জজের কোর্টে উপস্থিত হইল। কাদম্বিনীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই সুতরাং সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতেই খালাস পাইল। সুরবালা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জিদ করিয়া বলিল যে সেই হত্যাকারী, নয়নতারা মারে নাই। ত্রৈলোক্যের কোন তদ্বিরই টিকিল না সুরবালার জিদ দেখিয়া সে আতঙ্কিত হইল।

সেসনে দুইজন লোক সাক্ষ্য দিয়া গেল যে তাহারা নিজ চোখে দেখিয়াছে নয়নতারা নিজ হাতে লাঠি দিয়া ছেলেটাকে মারিয়াছে। নয়নতারা সর্ব্বত্রই এক কথা বলিয়াছে। জুরীরা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নয়নতারাকে দোষী সাব্যস্ত করিল। জুরীর মন্তব্য গ্রহণ করিয়া জজ সাহেব পুত্র হন্তাকারিণীকে বিশেষ নিন্দা করিয়া দশ বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। সুরবালা খালাস পাইল। নয়নতারা আণ্ডামানে যাত্রা করিল। গ্রামে একথা রাষ্ট্র হইলে বিজ্ঞেরা বলিলেন ত্রৈলোক্যের মা ও স্ত্রী যে সসম্মানে রক্ষা পেয়েছে এই যথেষ্ট। ভূঁইমালী বৌ আণ্ডামানে গিয়েছে তা ওদের মত ছোট লোক ত ঐ সব জায়গায়েই থাক্‌বে!

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় পরমেশপ্রসন্ন রায়।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশে ১৮৬৯ সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে পরমেশপ্রসন্ন রায়ের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ১৮৯০ সনে সিটী কলেজ হইতে তিনি বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সবডেপুটি কালেক্টরের পদে ১৮৯৩ সনে পরমেশবাবু সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। তৎকালে তাঁহার

জ্যেষ্ঠ সহোদর রমাপ্রসন্ন রায় বরিশালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরমেশপ্রসন্নও শিক্ষানবীশভাবে বরিশালেই সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ১৯০৩ সনে ডেপুটী কালেক্টর পদে উন্নীত করা হয়। সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে তিনি বাঙ্গালা, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার নানাস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন, সে সকল দেশের স্থানীয় জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯০৫ সনে তিনি প্রথমবার ময়মনসিংহ নগরে ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ময়মনসিংহে অবস্থানকালেই তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সহিত অতি সুসময়ে পরমেশপ্রসন্নের মিলন হইয়াছিল। উঁহাদের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে মণিকাঞ্চন সংযোগ বলা যাইতে পারে। কেদারনাথের উত্তেজনায় ও ময়মনসিংহ নগরের সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে পরমেশপ্রসন্নের হৃদয়ে সাহিত্য চর্চ্চার স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠে। তাঁহাকে সভাপতি পদে বৃত করিয়া কেদারনাথ ময়মনসিংহের শাখা সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন করেন। পরিষদের মাসিক সভায় যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইত, সভাপতি স্বরূপ পরমেশবাবু সে সকলের সারগর্ভ সমালোচনা করিতেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "আরতি", "প্রবাসী", "মানসী", প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, পরমেশপ্রসন্ন উহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। উড়িষ্যা অবস্থানকালে তিনি তৎপ্রদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলের মনোজ্ঞ রচনা "সৌরভে" প্রকাশিত হইয়াছিল। চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত তাঁহার "অকৃষর বিভীষিকা" নামক সুচিত্রিত ও সরস প্রবন্ধ শিক্ষিত সমাজে ও বিবিধ সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। রস রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সরকারী কার্য্যের অবসরে সাহিত্যচর্চ্চাই তাঁহার একমাত্র আনন্দের সামগ্রী ছিল। তাঁহার "মেয়েলী ব্রতকথা", "বিয়ের বই", "পঞ্চামৃত" প্রভৃতি পুস্তক সুধী সমাজে বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছে। শোভাবাজার রাজবাটীস্থিত "সাহিত্য সমাজ" তাঁহাকে "বিদ্যানন্দ" উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সনে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণে ঢাকা নগরীতে বাস-ভবন তৈয়ার করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। রোগশয্যায় থাকিয়াও তিনি স্থানীয় সংবাদ পত্রাদিতে বহু রস রচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

ম্যাজিক বা যাদু বিদ্যায় তিনি অতিশয় পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত কৌশল এরূপ আশ্চর্য্য ছিল যে সমাগত বন্ধু বান্ধবকে অতি সামান্য ব্যাপার লইয়া কৌতুক বিতরণ করিতে পারিতেন। বহু উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার যাদু বিদ্যায় কৌতুক দর্শনে আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ময়মনসিংহ আসিলে পর ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে যে প্রীতি সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে পরমেশবাবু সমাগত বিশিষ্ট অতিথিগণকে ম্যাজিক দেখাইয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে অবস্থানকালে কোনও এক মোকদ্দমা বিচারকালে একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করার সময়ে হস্ত কৌশল দ্বারা সাক্ষীর মনে বিস্ময় উৎপাদন করাইয়া তাহাকে সত্যকথা প্রকাশ করিতে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই বিস্ময়কর উপাখ্যানটী এই—

কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটা জলাভূমির পথকর কমাইবার জন্য সেই মহালের মালীক প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার হেতু এই যে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই সেই মহাল জলগর্ভে নিমজ্জিত থাকে তদ্দরুণ ফসলাদি কিছুই হয় না। পথকর বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর রূপে সেই দরখাস্ত সম্বন্ধে স্থানীয় তদন্ত করার জন্য পরমেশবাবু নৌকারোহণে সেই মহালে গমন করেন। নৌকায় বসিয়া তিনি একে একে বহু সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখেই এক কথা—সেই অঞ্চল সারা বৎসর জলে ডোবা থাকে, ফসল জন্মে না। একজন বৃদ্ধ মুসলমান সাক্ষীও এইরূপ উক্তি করিলে পর পরমেশবাবু তাহাকে বলিলেন,

"দেখ মিঞা, তোমরা সকলে যদি বল যে এই মাঠে ফসল হয় না, তবেত সরকারী খাজানা মাপই পাওয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বুড়া মানুষ আমাকে খাঁটী কথা বল, ফসল হয় কি না?"

উঃ—না বাবু, কোনও ফসলই হয় না।

প্রঃ—দেখ, মাটী হইতে সরকারী টাকা আসে। তোমরা জমিতে ফসল কর. তাহা হইতেই খাজানা আদায় কর। যদি ফসল না জন্মে তবে টাকা কিরূপে হইবে?

এই বলিয়া তিনি নৌকার মাঝিকে আদেশ করিলেন, লগির গুঁতায় তীর ভূমি হইতে কতক মাটী তুলিয়া আনিতে। মাঝি কিছু মাটী আনিয়া দিলে পর সেই মাটীদ্বারা পরমেশবাবু একটা ডেলা তৈয়ার করিয়া সেই বৃদ্ধ সাক্ষীর হাতে দিয়া তাহা মুঠা করিয়া ধরিয়া রাখিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর মুঠ খুলিতে বলিলে দেখা গেল মাটীর ডেলার পরিবর্ত্তে একটী টাকা বৃদ্ধের হাতে রহিয়াছে। বৃদ্ধ বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, চক্ষু রগড়াইয়া পুনঃ পুনঃ হাতের মুঠার ভিতর টাকাটাকে দেখিতে লাগিল, এবং "ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা" বলিতে লাগিল। পরমেশপ্রসন্ন তখন বলিলেন, "সরকারী খাজানা কমাইবার জন্য কখনও মিথ্যা বলা উচিত নয়। এই দেখ, মাটী হইতেই টাকা হয়।" বৃদ্ধ তখন উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, "না বাবু, আর মিথ্যা বলিব না। আল্লার কুদ্রত বুঝিয়াছি; এই বিলে বোর ফসল জন্মে, সময় ২ বাওয়া ধান্যও প্রচুর হয়।" এই ঘটনার পর সত্য নির্ণয় করিতে আর অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রাকালে খুলনা অবস্থিতিকালে, পরমেশবাবুর বাসার দেওয়ালে সিঁধ কাটিয়া চুরি হয়। সেই সময়ে ঢাকা নগরীতে বাড়ী করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ব্যাঙ্ক হইতে ৪০০০৲ টাকা তুলিয়া একটা ট্রাঙ্কে রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নীর কতক অলঙ্কারও ছিল। চোর ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে পাঁচ হাজার টাকার উপর লইয়া অন্তর্ধান করিল, মূল্যবান্ বস্ত্রাদি যাহা ছিল তাহা স্পর্শও করিল না। খুলনা সহরে সিনিয়ার ডেপুটীর বাড়ীতে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এই ভীষণ চুরি ইহা লইয়া সহরে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। পুলিশ সাহেব হইতে থানার জমাদার পর্য্যন্ত তদন্তে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কেহই কিছু কিনারা করিতে পারিলেন না। শেষ সিদ্ধান্ত হইল, ক্যাসকাটা গ্যাংএর এই কাণ্ড, ইহা আস্কারা করিবার উপায় নাই।

পুলিশের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন পরমেশপ্রসন্ন স্বীয় মানসিক শক্তি বলে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। নিজ বাসার এক কুঠরীতে পুজা ও হোমের আয়োজন করিলেন, সেই কক্ষের প্রাচীরে দুইটী বৃহৎ চক্ষু অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। পুরোহিত স্বরূপে তথাকার সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় আসনে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রচালিতবৎ পরমেশবাবুর কথামত সকলেই চলিতে লাগিলেন। থানার দারোগা সেই সহরের সমস্ত দাগী ও সন্দিগ্ধচরিত্র ব্যক্তিগণকে উপস্থিত করিলেন এবং সেই বাসায় বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ভৃত্যগণকেও আনয়ন করা হইল। পুজা কক্ষের সংলগ্ন একটী নিভৃত কক্ষে তৈল ও কালি মিশ্রিত করিয়া একটা পাত্র রাখা হইল। পরমেশবাবু সমাগত ব্যক্তিগণকে এবং দাগী আসামীগণকে একে একে আনিয়া পূজার স্থান, প্রাচীরে অঙ্কিত চক্ষুদ্বয় এবং তৈল কালি মিশ্রিত পাত্র সমস্তই দেখাইলেন। এই পূজা হোমের ফলে দোষী ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে, দৃঢ়ভাবে এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। কথা হইল, পুজার ঘর হইতে এক একজন বাহির হইয়া অপর কক্ষে তৈল কালি মিশ্রিত পাত্রে হাত দিবে, তথা হইতে তৃতীয় কক্ষে গমন করিবে। যে ব্যক্তি সাধু তাহার হাতে কখনই তৈল কালির চিহ্ন লাগিবে না, যে চোর তাহার হাতে কালির দাগ থাকিবে। দাগী ব্যক্তিরা একে একে এই প্রক্রিয়া করিয়া যাইতে লাগিল, সকলের হাতেই কালির দাগ দেখা যাইতে লাগিল। যাহাদের হাতে কালির দাগ পাওয়া গেল, তাহাদিগকে পরমেশবাবু তৃতীয় কক্ষে বসাইয়া রাখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক ভূতপূর্ব্ব চাকর আসিয়া হাত দেখাইয়া বলিল—"এই দেখুন বাবু, আমার হাতে দাগ লাগে নাই। আপনি বৃথা আমাকে সন্দেহ করিয়া এখানে আনাইয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়াই পরমেশবাবু তাঁহার বিরাট ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে বজ্র নির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন—"তুইই চুরি করিয়াছিস্"। সঙ্গে সঙ্গে সকলে লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল, কেহ কেহ তাহাকে আক্রমণও করিল। পরমেশবাবু তাঁহাকে

ধরিয়া পূজার স্থানে লইয়া গেলেন। সে তখন থরহরি কম্পমান্। ভৃত্য কাঁদিয়া ফেলিল, সকল কথা অকপটে স্বীকার করিল। তাহার স্বীকারোক্তি তখনই পুরোহিত অনাথবন্ধু লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহার নির্দ্দেশ মত একটা বৃক্ষের তলদেশ খনন করিয়া ৪০০০৲ টাকার নোট্ পাওয়া গেল, অন্যান্য স্থান হইতে অলঙ্কারাদিও বাহির করিয়া দিল। মাত্র ১০৲ টাকার কয়েকখানা নোট্ পাওয়া গেল না, তাহা চোর পূর্ব্বেই খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে উপস্থিত বুদ্ধিবলে এবং প্রবল ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে গুরুতর ক্ষতি হইতে পরমেশপ্রসন্ন উদ্ধারলাভ করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় ক্রমে তিন বার তিনি নিযুক্ত হইয়া আইসেন এবং সর্ব্বসাকুল্যে ১২।১৩ বৎসর কাল বাস করেন এ জন্য এ জেলার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছিল। ঢাকা নগরীতে তিনি কালরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সাড়ে তিন মাসকাল রোগ যন্ত্রণা ভুগিয়া বিগত ১লা আষাঢ় তারিখে তিনি চারি পুত্র, তিন কন্যা এবং পত্নী প্রভৃতি আত্মীয় বান্ধবজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে পূর্ব্ববঙ্গের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের তিরোধান হইল। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা অমায়িক পুরুষ অতি বিরল। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

ইশা খাঁর মহত্ত্ব।

সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত প্রজা আকুল প্রাণে আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইত এবং এক একজন পুরুষ সিংহের পতাকা নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। এই সকল পুরুষ সিংহই বাঙ্গালার বারভূঁইয়া। ইঁহাদের ইতিহাস বাঙ্গালীর গৌরব। আমাদের ইশা খাঁ তাঁহাদের অন্যতম। সে সময় যশোহরে প্রতাপাদিত্যের বিজয় দুন্দুভি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে, শ্রীপুরের দুর্গে চাঁদ রায় কেদার রায়ের স্বাধীন পতাকা পত পত করিয়া মোগলের বিজয় গৌরব খর্ব্ব করিয়া উন্নতশীর্ষে বিরাজ করিতেছিল। তখন বাঙ্গালার সৌভাগ্য আপন মনে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনার বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মোগল শক্তিকে উপহাস করিত। তখন বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ছিল, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব ছিল, হৃদয়ে শক্তি ছিল সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীর ঘরে শান্ত ছিল—আত্ম সম্মান জ্ঞান ছিল দেশে বাস্তবিক একটা প্রাণ ছিল।

বাঙ্গালার সেই সুখ সমৃদ্ধির দিনে, দিল্লীশ্বর তাঁহার সেনাপতি রাজপুত কুলকলঙ্ক মানসিংহকে বাঙ্গালা মুলুকে মোগল আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কূটচরিত্র মানসিংহ ছলে বলে কৌশলে সকলকেই নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস নূতন ভাবে লিখিত হইতে চলিল।

এইবার মানসিংহ পুরুষ সিংহ ইশা খাঁর বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ইশা খাঁ স্বীয় এগারসিন্ধু দুর্গে বসিয়া এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এগারসিন্ধু ময়মনসিংহ জেলায় নদ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখনও দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। তখন অগাধ জলসম্ভারে কূলপ্লাবী ব্রহ্মপুত্র ও বানার দুর্গের পাদ দেশ ধৌত করিয়া যৌবনের পুলক চাঞ্চল্যে দেশের গৌরবময় ইতিহাস গাহিয়া গাহিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে লহর খেলিতে খেলিতে বহিয়া যাইত, কিন্তু হায় এখন তাহা কঙ্কালসার। তাহার বক্ষে এখন চৈত্র বায়ু বিতাড়িত বালুকারাশি কেবল ধূ ধূ করিতেছে মাত্র। এক দিন ব্রহ্মপুত্র তটে যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীক বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব প্রদর্শনের অবকাশ পাইয়াছিলেন আজ তাহার নিদর্শন পর্য্যন্ত নাই।

সেই করালরূপ ব্রহ্মপুত্র এখন স্বল্পতোয়া জলধারা প্রবাহিত হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সুদৃঢ় দুর্গে বসিয়া ইশা খাঁ, সম্রাট সৈন্যের বিপক্ষে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন চলিতে লাগিল। মানসিংহ বানারের দক্ষিণ পারে স্বীয় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। উভয়পক্ষে সাজ সাজ ডাক পড়িয়া গেল। একদিকে মোগলের জয়ধ্বনি অপরদিকে, বাঙ্গালী সৈন্যের গভীর গর্জ্জন। ব্রহ্মপুত্রের বিশাল হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মানসিংহ সহসা ব্রহ্মপুত্রের বিশাল তরঙ্গে ভাসিতে সাহসী হইলেন না—দিন ও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইশা খাঁ চারি-

দিকে গুপ্তচর নিয়োজিত করিলেন এবং স্বীয় দুর্গে বসিয়াই নিত্য নব নব কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। দিন যতই যাইতে লাগিল মানসিংহ ততই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গভীর রাত্রে বানার অতিক্রম করিলেন। এইবার ব্রহ্মপুত্র পারি দিতে হইবে, মানসিংহ প্রমাদ গণিলেন। রাত্রে রাত্রে ইশা খাঁর চর দুর্গ মধ্যে সংবাদ আনিয়া দিল। ইশা খাঁ নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। মানসিংহ তীরে পৌছিতে পারিলেন না। অরুণ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগার সিন্ধুর দুর্গ হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। মোগলের সম্মুখে চাঁদপুরের অরণ্যের মধ্যে কামানের ধ্বনি তাহার উত্তর দিল। সেই প্রতিধ্বনিতে মোগল বাহিনীর প্রাণে এক কাল ছায়া নিপতিত হইল। মানসিংহ চমকিত হইলেন, বুঝিলেন; শত্রুপক্ষের গুপ্তচর তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা ইতিপূর্ব্বেই শত্রু শিবিরে পৌছাইয়া দিয়াছে। এইবার বুঝি ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে মোগল বাহিনী নিমজ্জিত হয়। ক্রমাগত এগারসিন্ধু দুর্গ হইতে কামানধ্বনি উত্থিত হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। মোগল বাহিনীর কোন সারাশব্দ পাওয়া গেল না।

অবশেষে ইশা খাঁ মানসিংহের সহত শক্তি পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজপুতবীর ইহাতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘটনাস্থলে দেখা গেল প্রথম যুদ্ধে মানসিংহ নিজে না আসিয়া তাঁহার জামতাকে প্রেরণ করিলেন এবং ইশা খাঁর সহিত সম্মুখ সমরে জামতা নিহত হইলেন। ইশা খাঁ মানসিংহের ঈদৃশ কাপুরুষোচিত ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন এবং শিবিরে প্রস্থান করিলেন কিন্তু অবশেষে যখন শুনিলেন মানসিংহ অসি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন তখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মানসিংহের বিশেষ পরিচয় না পাইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে বিরত রহিলেন।

এগারসিন্ধু দুর্গের বর্ত্তমান স্থান।

এই বিষয়ে ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন—

When Man Singh invaded Bengal about 1595, he advanced to Igarah Sindhu and besieged the garrison of the fort. Isa Khan hastened to its relief, but his troops were disaffected and refused to fight. He, however, challenged Man Singh to single combat, stipulating that the survivor should receive peaceable possession of Bengal. Man Singh accepted the challenge and its conditions, but when Isa Khan rode into the lists, he recognized in his opponent a young man, the son-in law of the Raja. They fought and the latter was slain. Upbraiding Man Singh for his cowardice, Isa Khan returned to his camp. Scar-

cely had he done so, when word was brought to him that Man Singh himself was in the field. He again mounted and galloped to the ground, but refused to engage with his oppo-

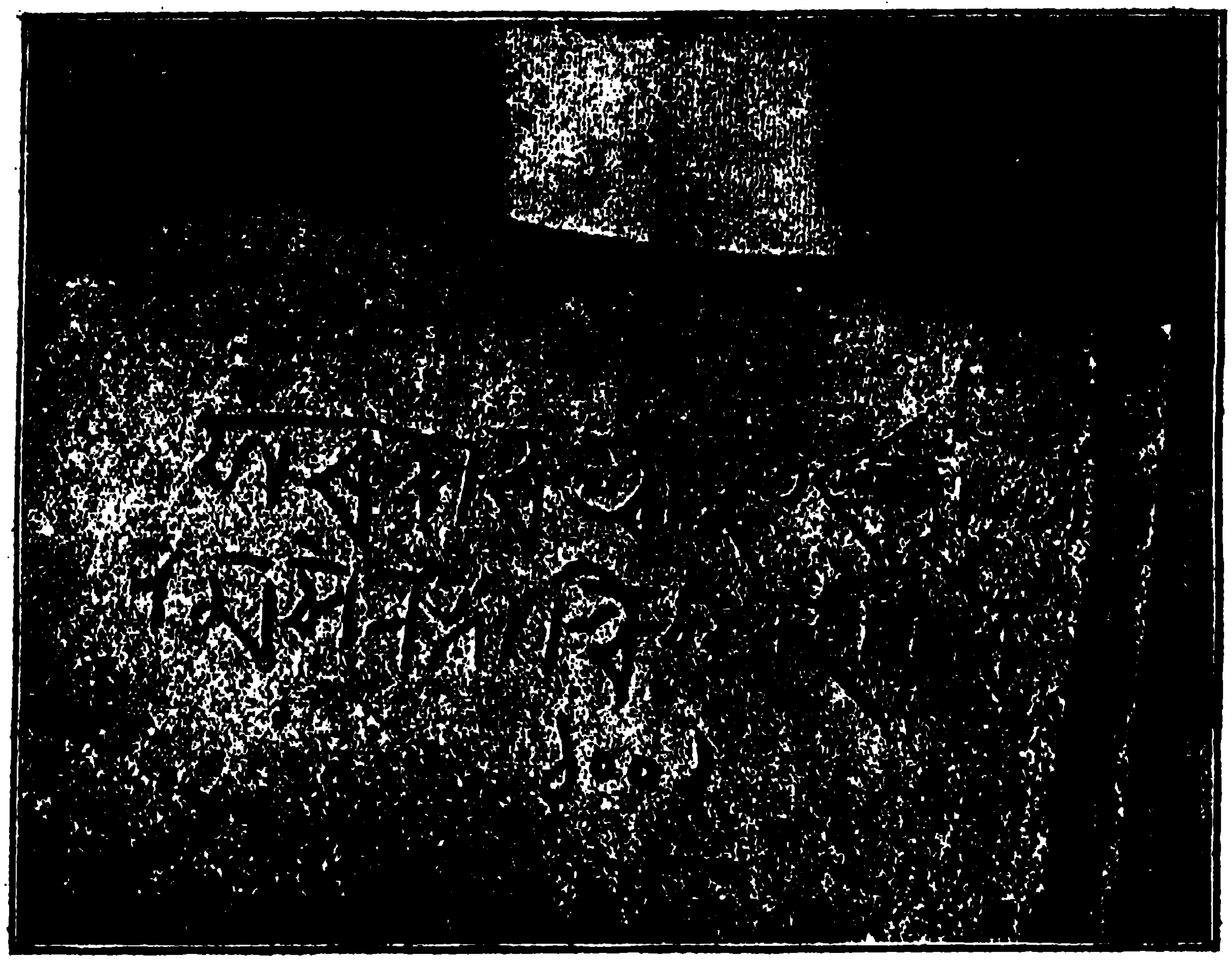

ইশা খাঁর ব্যবহৃত কামান।

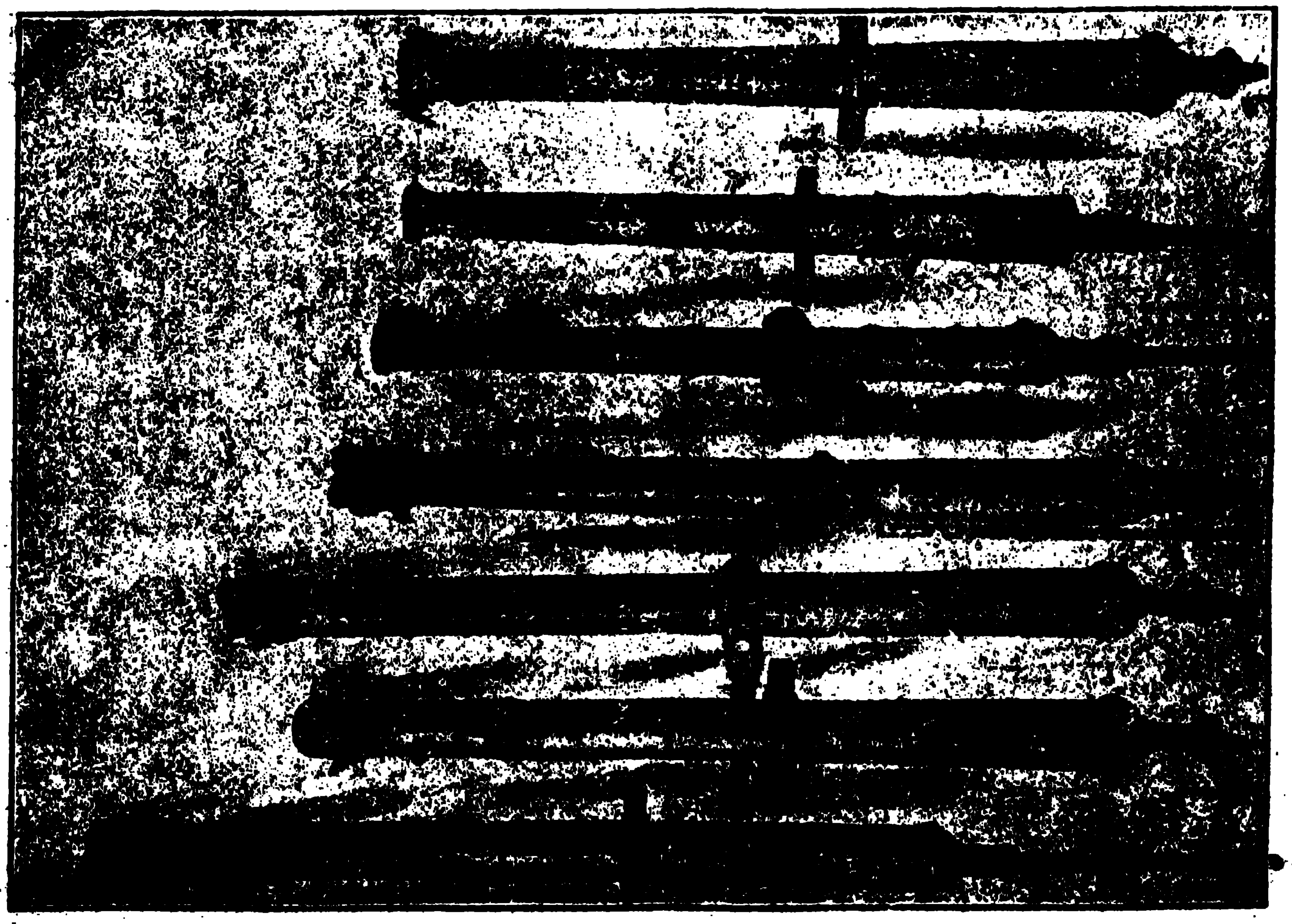

nent until satisfied of his identity. Being assured that Man Singh was opposed to him, the combat began. In the first encounter Man Singh lost his sword. Isa Khan offered

his, but without accepting it Man Singh dismounted. His adversary did the same, and dared him to have a wrestling bout. Instead of acceding to his wish, Man Singh, struck by the generosity and chivalry of the man, embraced him and claimed him as a friend. After entertaining Isa Khan, he loaded him with presents on his taking leave.

অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম যুদ্ধেই ইশা খাঁ মানসিংহের তরবারি ভগ্ন করিলেন। তখন ইচ্ছা করিলে ইশা খাঁ মানসিংহকে হত্যা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বলিলেন—"মহারাজ অস্ত্রশূন্য করিয়া আপনাকে আঘাত করিব না; আপনি প্রাণের মায়ায় জামতাকে যুদ্ধে পাঠাইয়া নিহত করিয়াছেন। এখন এই অস্ত্রগ্রহণ করুন।" বলিয়া স্বীয় অস্ত্র সম্মুখে ধরিলেন। মানসিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ও ইশা খাঁর উদারতা লক্ষ্য করিয়া মোগল সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং ইশা খাঁর বন্ধুত্ব ভিক্ষা চাহিলেন। ইশা খাঁ মানসিংহকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিলেন।

অভিভাষণ। *

সমবেত সভ্যবৃন্দ!

আপনারা যে আমাকে আজ সাদর অভ্যর্থনায় সভাপতির আসনে বরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে কোনও বিশেষ মৌলিক গবেষণা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সমস্যা সম্পর্কে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই আপনাদের সমীপে সংক্ষেপে নিবেদন করিব।

হিন্দু-আন্দোলন বলিতে আজকাল যাহা বুঝায় তাহা বঙ্গদেশের বাহিরে কিছুকাল যাবত প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গালায় তাহার সূচনা বেশী দিন হয় নাই। বহুদিন বঙ্গবাসী হিন্দু সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় ছিল। তাহার গৃহে যে অগ্নিদাহের সূচনা হইয়াছে, নিদ্রালস নয়ন মেলিয়া তাহা দেখিবার অবসর তাহার হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, অদূরদর্শী বাঙ্গালী হিন্দু আমরা আপন ভাইকে পর করিয়া দিয়াছি। সমাজ শাসনের কঠিন নিগড়ে নিজদের বাঁধিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া নিজদের অমোঘ শক্তিকে ধর্ম্মের পবিত্র নামে অপচয় হইতে দিয়াছি। তাহারই ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পাবনা, বরিশাল, ময়মনসিংহে পৈশাচিক লীলার বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। মনে হইতেছে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব পূর্ব্ববঙ্গে আর বুঝি বেশী দিন রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুর পক্ষে বর্ত্তমান সমস্যার স্বরূপ কি, তাহা আপনারা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। কাজেই ইহার অধিক বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতে এই সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিবে।

সেন্সাস বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৮৮১ সালের অর্থাৎ প্রথম সেন্সাসে সমগ্র বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। অথচ ১৯২১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় মুসলমান শতকরা ৫৩ জনেরও বেশী এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৪ এরও কম। ইহার কারণ, মুসলমানের সংখ্যা ৪০ বৎসরে বঙ্গদেশে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা ৬৭ জন। কেবল ঢাকা বিভাগে শতকরা প্রায় ৬২ জন বৃদ্ধি হইয়াছে? কিন্তু যদি কেবল ময়মনসিংহ জিলা ধরা যায় তবে দেখিতে পাই যে, গত ৪০ বৎসরে মুসলমানগণ শতকরা ৭৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে আজ ময়মনসিংহ জিলার সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫ জন মুসলমান। মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বগুড়া জেলায়। সেখানে শতকরা ৮২ জনের বেশী মুসলমান। নোয়াখালীতে শতকরা ৭৭ এর উপর মুসলমান। রাজসাহীতে শতকরা ৭৬ এর উপর, এবং পাবনাতে শতকরা ৭৫ এরও উপরে মুসলমান। মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হিসাবে ময়মনসিংহ জেলা বঙ্গদেশের জেলা সমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। যদি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ধরা যায় তবে দেখি তাহারও গত ৪০ বৎসরে বঙ্গদেশে দ্বিগুণেরও বেশী

* ঢাকাইল হিন্দু সভার অভিভাষণ।

হইয়াছে। কেবল হিন্দুর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৫ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জনের দেহে হিন্দুরই রক্ত প্রবাহিত। এ কথা নিরপেক্ষ ইংরাজ লেখকের দ্বারাও স্বীকৃত। যতদূর জানা যায় পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাবের অবসানে বহু বৌদ্ধমতাবলম্বী হিন্দু সমাজের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে থাকে। হিন্দু-সমাজে প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক হইয়াও যখন তাহারা উপযুক্ত স্থান লাভে অসমর্থ হইল তখন তাহারা দলে দলে তৎকালীন রাজশক্তির প্ররোচনায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু নামে মুসলমান হইলেও ইহারা অনেকে বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের প্রতি বিশেষ বৈরিতা সাধনের চেষ্টা করে নাই। পরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে দেখা যায় তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের প্রভাবে বহু মুসলমান বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেকে আবার সাক্ষাত সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে ফিরিয়া না আসিলেও বংশ পরম্পরায় প্রকাশ্যে মুসলমান থাকিয়াও কতক পরিমাণে বৈষ্ণব মতানুযায়ী আচরণাদি করিতে থাকিল। এইরূপে মুসলমানগণ হিন্দু রীতিনীতি কতকটা বজায় রাখিয়া, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ তদানুসঙ্গিক আমোদ আহ্লাদে অকপট হৃদয়ে যোগদান করিতে লাগিল। তেমনি আবার হিন্দুগণও মুসলমানের উৎসবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে আরম্ভ করিল। এই সেদিনও দেখিয়াছি হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীকে মুসলমান সম্মান করিতেছে, আবার মুসলমানের পীর ফকিরের নিকট হিন্দু শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। আজ যে মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর বাদ্য মুসলমানের ধর্ম্মহানিকর হইয়া উঠিয়াছে, সেই মস্‌জিদের জমি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার তাঁহার মুসলমান প্রজার হিতার্থে বিনা মূল্যে অথবা নামমাত্র খাজানায় দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মস্‌জিদ নির্ম্মাণের অর্থ সাহায্যও হিন্দু করিয়াছেন। আবার এমন মুসলমান জমিদারকেও জানি যিনি নিজ হিন্দু প্রজার হিতার্থে দেবমন্দির স্থাপন ও তথায় পূজা পার্ব্বনাদিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই ভাবে বহুকাল পাশাপাশি বাস করিয়া একই রক্ত মাংসে গঠিত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মমত লইয়া বিরোধ কাহাকে বলে জানিত না। গোঁড়ামির আতিশয্যে সামাজিক মতের সঙ্কীর্ণতা ও বর্জ্জননীতির ফল-স্বরূপ হিন্দু যে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ এই কারণে এতদিন হইয়া উঠে নাই। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার প্রথম উন্মেষ হয় বলিয়া অনুমান করি। সে সময়ে কোন কোন রাজ কর্ম্মচারীগণও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সৃজনে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণের ধারণা; এবং তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে কতিপয় মুসলমান নেতা বিরোধের বিষবৃক্ষ রোপণ করেন। ময়মনসিংহ জিলাবাসী সেই বৃক্ষের প্রথম ফলের আস্বাদ আজও ভুলিতে পারেন নাই কালপ্রভাবে সেই বিষবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কতিপয় মুসলমান নেতা কিছুকাল যাবত ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের বিচারশক্তিহীন শিষ্যদিগের উষ্ণ রক্ত উত্তেজিত করিয়া আমাদের এই পুণ্যভূমিকে নরকে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক সুসংঘর্ষে সুহৃদের সহৃদয়তা লুপ্ত, প্রতিবেশীর প্রীতি সম্পর্ক ছিন্ন, অনুচরের বিশ্বস্ততা অসম্ভব হইতে চলিল। তাই আজ সহিষ্ণুতার অবতার, ক্ষমাশীল বাঙ্গালী হিন্দু তাহার স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা পরিহার করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"অমঙ্গলই মঙ্গলের প্রসূতি"। তাই মনে হয় আজ বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ত্তমান দুরবস্থার পশ্চাতে মঙ্গলময় বিধাতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আজ তিনি আমাদিগের সামাজিক দুর্ব্বলতা ও অতীত মূর্খতার দিকে চোখ খুলিয়া দিয়াছেন। যে ধ্বংসের পথে মোহান্ধ হিন্দু বাঙ্গালী দ্রুতপদ নিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল তাহা হইতে ফিরিবার এখনও সময় আছে। যদি আমরা প্রকৃতই জাতির কল্যাণ কামনা করি তবে প্রত্যেকের নিজ নিজ হৃদয় খুঁজিয়া দেখিতে হইবে কি কি সামাজিক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। এবং যতই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হউক না কেন সাহসের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

আমাদের নেতাগণ হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, শুদ্ধি ও সংগঠন। অস্পৃশ্যতা বলিতে মান্দ্রাজ বা অন্যান্য স্থানের যে অমানুষিক অবিচারের চিত্র মনে জাগিয়া উঠে, ঠিক তাহার

তুলনায় বাঙ্গলা দেশে অস্পৃশ্যতা দোষ খুবই কম। তথাপি বাঙ্গালী অনাচরণীয় জাতির অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। ভাবিয়া দেখুন সমগ্র বঙ্গদেশে অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা মোট হিন্দুর সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী। যখন আমরা হিন্দুর সংখ্যা, হিন্দুর স্বার্থ, হিন্দুর অধিকার প্রভৃতি কথা ব্যবহার করি, তখন এই বিরাট আচরণীয় জাতিকে হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই। কিন্তু এই হিন্দু সমষ্টির মধ্যে তথাকথিত উচ্চ-বর্ণের মুষ্টিমেয় আমরা অধিক সংখ্যক অনাচরণীয়দিগকে অনেক প্রকার মনুষ্যত্বের দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। কালাপাহাড়ের হাত হইতে যখন আমাদের বিগ্রহমূর্ত্তি রক্ষা করিবার আবশ্যকতা হয় তখন আমরা নমঃশূদ্র বা ঐ শ্রেণীর অন্য লোকের বাহুবল ও হিন্দু-ধর্ম্মপরায়ণতার উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু যে মন্দিরের পবিত্রতা তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইল, সেই মন্দিরে তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র তাহা কলুষিত হইবে, এই ব্যবস্থার তাৎপর্য্য আমার ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে বুঝিতে অক্ষম। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি যে তাঁহাদের পথে চলিতে থাকিলে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব পূর্ব্ববঙ্গে কতদিন স্থায়ী হইবে? সামাজিক অবহেলা ও উৎপীড়নের ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু— মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের দলপুষ্টি করিতেছে। এইরূপে বর্জ্জননীতি কিছুকাল চলিলে হিন্দুধর্ম্মে পবিত্রতা রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশেষে হিন্দু নামধারী লোক কতজন অবশিষ্ট থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি?

শুদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এতদিন হিন্দু-সমাজ গৃহের দ্বার বাহির হইতে খোলা যাইত না। সমাজ-গণ্ডীর ভিতর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্যই দরজার একমাত্র প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা বলি কেবল বাহির হইবার পথ না রাখিয়া যাহাতে বাহির হইতে হিন্দু-সমাজের ভিতরে আসিবার পথটীও উন্মুক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন হিন্দু বা আর্য্য সমাজ-দেহে প্রাণ ছিল ততদিন বাহির হইতে আগত অনার্য্য জাতিকে হিন্দু আপনার করিয়া লইয়াছে। আজ যাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে কত সংখ্যক যে অনার্য্য-বংশসম্ভূত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই পূর্ব্ব প্রচলিত উদার প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, যাহারা স্বেচ্ছায় হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে তাহাদিগকে সাদরে সমাজে তুলিয়া লইতে হইবে। ছলে বলে কৌশলে বহু হিন্দু পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে হিন্দুধর্ম্মচ্যুত করিয়া খৃষ্টান বা মুসলমান করা হইয়াছে। হিন্দু সমাজে তাহাদের কখনও ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইবে এরূপ তাহারা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। এজন্য অনন্যোপায় হইয়া অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আজ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধির বার্ত্তা জানাইয়া দিতে হইবে।

সংগঠন অর্থে হিন্দু-সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া ঐক্য সাধন বুঝিতে হইবে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া হিন্দুদিগের অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। প্রত্যেক হিন্দুর অপর প্রত্যেক হিন্দুর বিপদ আপদে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সমাজদেহের ব্যাধি ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। এই সম্পর্কে দুই একটী সামাজিক কুপ্রথার উল্লেখ করিব। কন্যাশুল্ক প্রথা ও বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, নিম্নজাতীয় হিন্দুর-সংখ্যাহ্রাসের দুইটি প্রধান কারণ। ইহা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। হিন্দু সভার আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে রীতিমত প্রচারকার্য্য করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কথকতা, রামায়ণ মহাভারত পাঠ এবং তৎসঙ্গে যুবকদের জন্য ব্যায়ামশালা স্থাপন করিতে হইবে। দেবমন্দির রক্ষা ও নির্য্যাতিতা হিন্দু নারীর উদ্ধার সাধনের জন্য যুবক-সমিতি গঠন করিতে হইবে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের সহিত বিরোধ করিবার জন্য আমাদের এই আয়োজন করিতেছি না। বিরোধ সাধন শান্তিপ্রিয় হিন্দুর স্বভাব-বিরুদ্ধ। অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ বলসঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকিয়া হিন্দুর পক্ষে দুর্ব্বলতা পরিহারের আয়োজনে আপত্তি করিতে পারেন না। আমাদের এই প্রচেষ্টা জাতীয়তার পরিপন্থী হওয়ার আশঙ্কাও অমূলক। কারণ ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে যথাসম্ভব সকলকেই শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, কারণ সবলের সহিত দুর্ব্বলের মিলনের ভিত্তি কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন আমাদের

অভিমত গোঁড়া হিন্দুয়ানীর সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাহার উপর—সমাজ যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয় সেরূপ স্থলে কালোপযোগী ব্যবহারই প্রশস্ত, তহাতে ধর্ম্মের হানি হয় না, বরং তাহা না করিলেই ধর্ম্মের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রেরই মর্ম্ম। আমরা ইহাকেই শিরোধার্য্য করিয়া সমাজ রক্ষার চেষ্টায় নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিব। ভগবানের কৃপা ও আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে।

শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

রামগতির টপ্পা।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ মহাশয় রামগতি সরকারের টপ্পা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের "সৌরভে" কয়েকটী প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেদার বাবু যথার্থ উপযুক্ত লোকের উপরই কার্য্যভারটী সমর্পণ করিয়াছিলেন আজ তিনি জীবিত থাকিলে এই টপ্পা দৃষ্টে তাঁহার কত যে আনন্দ হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি টপ্পা সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য, আমাদের দেশে পূর্ব্বে কবিগণের যেরূপ আদর ছিল এখন আর তেমন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের ময়মনসিংহ জেলার প্রায় গ্রামে গ্রামেই ২। ৪ জন কবিগানের সরকার ছিল, তাহাদের অভাবের পর নূতন আর দেখা যায় না। এই গানটী প্রায় বিলোপের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত কবিভূষণ মহাশয়ের প্রতিশ্রুতির আংশিক ভার লওয়ার ইচ্ছায় এই কয়েক মাস যাবৎ খুব চেষ্টাই করিয়াছি, ফলে যে কয়েকটী সংগৃহীত হইয়াছে তাহা এবারের সৌরভে পাঠাইলাম। কবিভূষণ মহাশয়ের উপর অর্পিত ভারের লঘুতা করিয়া যদি স্বর্গীয় কেদার বাবুর আত্মারও ক্ষণিক তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে সেইটী আমার আয়াস সুলভ সাফল্য মনে করিব।

রৌ, কাত্‌লা আর মির্‌কা-মাগুলে
সকলে করেছে একদল।
তা'তে নানিদ্ পুঠা কাইলারা,
শিঙ, মাগুর আর বাইলারা,
লাটি ভেদেরা ঘুইঙ্গারা সকল।
ঘাগটে গায় নিখাদ সুরে, চিতলে চিতানে,
কাটুয়া যে হয় ইন্দ্রের নাটুয়া,
জগতে আর এমন কথা কে না জানে?
এলং আর ল্যাদী পাব্যা,
তারা সবে মইল ভাব্যা,
আমরা বা বা ধরব কোনখানে, ইচা, বচা
খলসা পুঁঠি মিল ঘরেতে জাল টানে।
কাটুয়া যে হয় * * * ইত্যাদি।

কোন এক জায়গায় কবিগানের আসরে রামগতি সরকার গিয়া নূতন একটী কবির দল দেখিতে পাইল। সেই দলের লোকগুলির মধ্যে প্রৌঢ়, যুবক ও কয়েকজন বালক ছিল। গানের সময় রাগিণীর সামঞ্জস্য না থাকায় একটা বিকট শুনা যাইতেছিল। গানটী প্রথমে যে উঠাইতে চাহিল অমনি যুবকেরা বলিয়া উঠিল, "আর একটু নীচু হওয়া ভাল; এদিকে আবার ছেলেরা চায় আরও উচু, কাজেই গানটী সর্ব্বসম্মত না হওয়ায় কেহ কেহ গান ধরিল, কেহ বা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসরের বাহিরে এদিক্ সেদিক্ ঘুরিতে লাগিল। ছিন্নতন্ত্রী বীণার ন্যায় লয়বৈষম্যে গানের শ্রুতি কটুতা হইতেছে দেখিয়া পরের আসরে উল্লিখিত টপ্পাটী রচিত হইয়া গীত হয়।

তোমার আসল পতি বীর ধনঞ্জয়,
আর সকলে গাঁজার নকল ভাং।
যেমন চাঙ্গের নকল হাত মাচাং,
টালার নকল কাচা রাং—
পুত্রের নকল পোষ্যপুত্র, পতির নকল *।
দিলে নৈবেদ্য বিষ্ণু পূজায়, থাল ভরা মাখন ছানায়,
এসব তোর বিষ্ণু * * খায়,
উপস্থিত দেবতা যা'রা তা'রা
কেবল চাউল চাবায়, দ্রুপদ মেয়ে
রাখালে ধর্ম্মকে তুই ফাকি দিয়ে বাজে সেরেস্তায়।

একবার নেত্রকোণা মোকামে তথাকার বাসিন্দাদিগের উৎসাহে খুব জাঁক জমকের সহিত ৺অন্নপূর্ণা দেবীর অর্চ্চনা হয়। তখন ময়মনসিংহের কবিওয়ালা ছাড়া অন্য স্থান হইতে বড় বড় কবির দলসহ সরকারের বায়না হয়। দেশী সরকারগণ উপেক্ষিত হইলেও গান শুনিবার ইচ্ছায় শ্রোতা

হইয়া তথায় উপস্থিত হয়। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া গান গাহিবার জন্য নিবেদন করার ফলে, উপরিতন কর্ম্মচারী ও উকীল মোক্তারগণের মত হওয়ায়, বিদেশী সরকারগণ একপক্ষে আর স্থানীয় সরকারগণ একপক্ষ হইয়া গান গাহিবার হুকুম পাইল। তখন স্থানান্তরাগত এক সরকার দ্রৌপদীর ভূমিকা গ্রহণ করিলে অন্য ভূমিকাধারী রামগতি সরকার উক্ত টপ্পাটী দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

বন্ধুর কথা সভার হেতা আমার বলতে লজ্জা হয়।
তিনি করলেন একখান কবির দল,
মনেতে তাই ভাবী হয়েছে সম্বল,
বুদ্ধি আছে তিন ডবল,
বিবেচনা নাই,
যেমন ভাঙ্গা নায়ে গঙ্গা মাঝি
বাদাম দিছে তিন খণ্ডী,
ভীষ্মদেবের যুদ্ধে যেমন
অর্জ্জুনের রথে শিখণ্ডী।
বন্ধু আমার নাচে গায়,
হাত লাইয়া বাতায়,
যেমন সোনার করণ্ডী,
হিসাব নিকাশ করে দেখি
ঘটে নাই আসল চণ্ডী।
ভীষ্মদেবের যুদ্ধে ইত্যাদি।

বামের ৺শ্যামাকান্ত মজুমদার একজন কবিগান প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি একখান সখের দল গঠিত করিয়া প্রথম প্রথম বাড়ীতেই গান গাহিতেন। তারপর দলটি বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করায় গ্রামান্তর গিয়াও গান করিতেন। তাঁহার দলে একজন তালজ্ঞ সমজদার গায়ক ছিল। অধিকাংশ সময়েই তাহার হাতে কাঁশ বাজিত। ঢুলীকেও কাঁশদ্বার তালের পথে নিয়া যাইবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ ছিল। লম্বাচড়া ছিপ্‌ছিপে লোকটি দ্বারাই গানের আগাগোড়া রক্ষিত হইত। কিন্তু লোকটির মুদ্রাদোষ থাকায় গানের সময় অঙ্গ ভঙ্গিমায় শ্রোতৃবর্গের প্রাণে বিরক্তি আনিয়া দিত। তাহার মুখ বিকৃতি ভঙ্গী দেখিলে না হাসিয়া থাকা যাইত না। রামগতি সরকার তাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিত। এক আসরে উল্লিখিত টপ্পাদ্বারা প্রিয় বন্ধুবরের সম্মান বাড়াইয়া দিল।

শ্রী দেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

নিমিষের ভুল।

আমার ও কানন ছায়ে
রাখাল গাহিত গান।
মনে মোর শোনা যেত'
কোকিলের কুহু তান।
বসন্ত শরতে বন
হাসিত প্রফুল্ল ফুলে,
ম্লান হয়ে গেছে সব
সুধু নিমিষের ভুলে।

শ্রী রাসবিহারী বসাক।

সমালোচনা।

নির্ঝরিণী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। একখানা খণ্ড কবিতা পুস্তক, মূল্য আট আনা।

নির্ঝরিণীর জল শীতল হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এর উৎপত্তি স্থান অভ্রভেদী তুষারাচ্ছন্ন তুঙ্গশৃঙ্গে কিন্তু রচয়িতা স্বয়ং এর স্নিগ্ধত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান; আমরা তো পাঠক!

উৎসর্গ পত্র হইতে বুঝা যায়, কবি স্বরচিত নির্ঝরিণীকে দুঃসহ তপ্ত বারির সঙ্গে তুলনা করিয়া ভদ্রতার রুচি রক্ষা করিয়াছেন।

প্রথম প্রস্রবণের কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু প্রাঞ্জলতার অনাধিক্য বশতঃ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয়। একটু যোগ বিয়োগের দরকার। কবির কবিত্বশক্তি আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু স্থানে স্থানে টানাছিঁচড়া করে কতকগুলি অপ্রচলিত দুষ্ট শব্দ যোগে পদ মিলাইয়াছেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

সাহিত্য সংবাদ

সহযোগী "বীণা" আগামী আশ্বিন হইতে মাসিকে পরিণত হইবে। ঢাকার বুড়ীগঙ্গার জলবায়ুতে মাসিক সাহিত্য পুষ্ট হয় না এই অপবাদ দূর করিয়া স্বাস্থ্যকর শীতলক্ষ্মীর জলে অবগাহন করিয়া "বীণা" দীর্ঘজীবী হন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের "উলট পলট" নামক গল্প গ্রন্থ পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

কেশরঞ্জন তৈল

=কারণ=

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

[illegible] গৌরাঙ্গ প্রেস—সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh--Reg. No. C. 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ ১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস ১॥০
ঢাকার বিবরণ ১॥০
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ॥০
সাময়িক সাহিত্য ৩৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ।৵০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৮০
লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে” আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲
“একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।” নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০
স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲
ব্রতকথা ৸০
শৈব্যা ।৵০
মহরম ॥০
কালের ডায়রী (সচিত্র) ॥০
রংকথা (যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। ভাদ্র—১৩৩৪ অষ্টম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the
LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children
whom you would love so much? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest
way to create an estate.
WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Represe tative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকার বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৷৵ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।০

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

ওয়ারলী রোড, পোঃ কেডেল রোড, বোম্বে, নং ১৪

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউয়াসাপুর" বোম্বে।

সৌরভের নিয়মাবলী

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং যে বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	...	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	„	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	„	...	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা	„	...	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা	„	...	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধাবাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫॥০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

সূচী।

রামায়ণের কাল ...	৺কেদারনাথ মজুমদার	১৮৭
সংসার চিত্র (গল্প) ...	...	১৯০
প্রবাদের আবাদ ...	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	১৯৪
পৃথিবীর বয়স ...	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল	১৯৭
অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ...	২০১
রবীন্দ্র-জয়ন্তী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	২০৪
টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	২০৫
রামগতির টপ্পা ...	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ...	২০৮
সংগ্রহ ...	... ...	২১১
অভিসারে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	২১৪
সংবাদ ...	... ...	২১৪

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম্

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

পুঃ ময়মনসিংহের অধিবাসী যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহাদের ঠিকানা জানা প্রয়োজন।

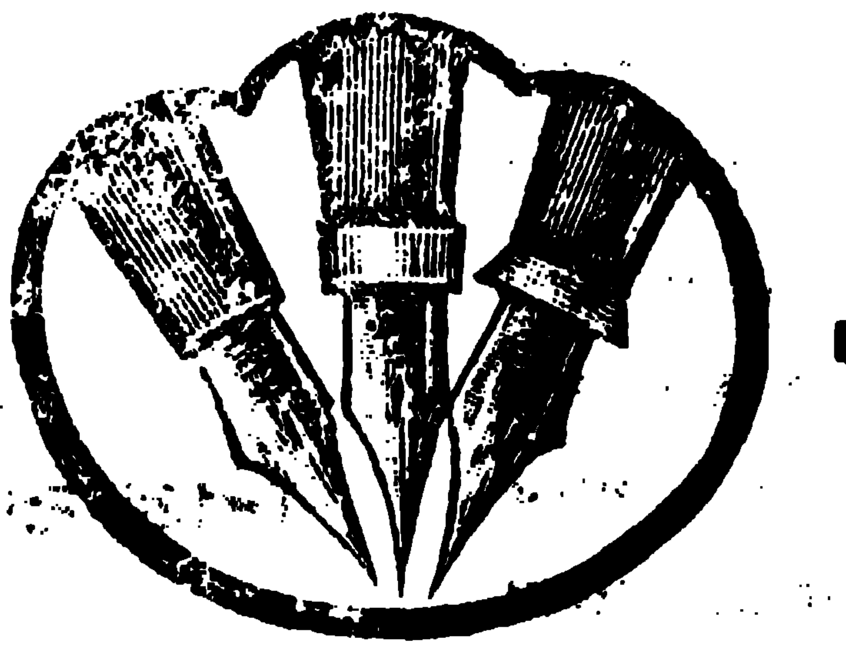

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার একমাত্র ষ্টল।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান !

এবার নব কলেবরে কলির কল্পতরু—"হর-পার্ব্বতী সংবাদ," এবং ডাক্তার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়ের "মানবের দশ দশা," রায় ডাঃ শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুরের "ডান-হাতের ব্যাপার," কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শরীর-চর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমারের "বিসমার্কের তিনটি বোমা", রায় সাহেব শ্রীযুত দিবাকর দে'র "গো-রোগের চিকিৎসা," শ্রীযুত নির্ম্মল দেবের "বীজ"···প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ-রাজী ! নূতন নূতন অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নক্সা, ছবি ও ব্যঙ্গ-চিত্র !! "সংবাদ কোষ" বিভাগে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সৎ-কর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানজনিত তথ্যের অফুরন্ত সমাবেশ !!! তা'ছাড়া "দিন-পঞ্জিকা" ভাগে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সাধনোচিত নির্ভুল, সুবোধ্য ও বিশদ গণনা-ব্যবস্থাদি !

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আকার দেড়গুণ বাড়িয়াছে। পাঁচ টাকা দিয়াও যাহার পাঁচখানি পৃষ্ঠা জ্ঞান-লিপ্সু পাঠক কিনিতে দ্বিধাবোধ করেন না, দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার কামনায় মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রাখা হইল। ডাকমাশুল প্রতিখানিতে চারি আনা। তিনখানির কমে ভিঃ পিঃ যায় না।

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী কৃত

বিশ্ব-বীণা

বালক বৃদ্ধ যুবা নারী—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই এই বীণার ভিতরে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুনিতে পাইবেন। হাই স্কুল ও মাইনার স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার দেওয়ার উপযোগী। পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ উভয় পক্ষের উপকারী। দক্ষিণা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
গ্রন্থ সং
কলিকাতা

যুবক-সম্মিলনীর সভাপতি
"প্রবাসী" সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সৌরভ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩৩৪। ৮ম সংখ্যা।

রামায়ণের কাল।

রামায়ণের সমাজ ঠিক কোন্ সময়ের সমাজ—বৈদিক সমাজ হইতে কতকাল পরের ও মহাভারতের সমাজ হইতে কতকাল পূর্ব্বের অথবা পূর্ব্বের কি পরের,—এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে চিন্তা করিলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া একবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল মহাশয় আমাকে খুব উৎসাহ প্রদান করেন এবং রামায়ণের সময় নিরূপণ না করিয়া সমাজ আলোচনা করিলে যে তাহা অঙ্গহীন হইবে তাহা বুঝাইয়া ঐ কার্য্যটীও করিতে অনুরোধ করেন। ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে সেরূপ চেষ্টা ছিল না; রামায়ণ যে সময়ই লিখিত হইয়াছিল—ঠিক তখনকারই সমাজ—এই ভাব লইয়াই তখন প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলাম। এ বার অবিনাশবাবুর উপদেশটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু রামায়ণ রচনাও ঠিক বয়স' নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। আমার মনে হয় সেরূপ চেষ্টা সম্ভবপরও নহে।

বেদের সময় নির্ণয় হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কোন বৈদেশিক পণ্ডিতই বেদকে খৃঃ পূঃ ১৫০০—২০০০ বৎসরের অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে তিলক মহোদয়ের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক জেকবি, ওলডেনবার্ক প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার পর এসিরিয়া বগোচ্কোই খনন ব্যাপারের পরে এবং আধুনিক ভারতসীমান্তের আলোচনায় বৈদিকযুগের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় সমাজ পূর্ব্বে বাইবেলের উক্তির প্রতি সম্মান রাখিয়া মানব সভ্যতার কাল নিরূপণ করিতেন, এখন ডাঃ কলভিন প্রভৃতির ভূতত্ত্ব নিরূপণের ধারা হইতে সে সকল উক্তি অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বেদের কোন একটী বা দুইটী সূক্তের বা ঋকের ভাব গ্রহণ করিয়া যে সময় নিরূপিত হইবে—যেরূপ তিলক মহোদয় করিয়াছেন—তাহাকে সমগ্র বেদ রচনার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সে নির্দ্দেশ অভ্রান্ত হইবে না। কেননা বেদ কোনও এক যুগের রচনা নহে। ইহাতে হাজার হাজার বৎসরের বিরোধী ভাবেরও সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গো-বধ ও গো-রক্ষার কথাই উল্লেখ করা গেল। ঋকবেদের সমাজে দেখা যায় এক স্থানে গো-বধ্য অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় গো অঘ্ন্যা। সমাজে এরূপ বিরুদ্ধ ভাব কত দিনে স্থাপিত হইতে পারে প্রাচ্য রক্ষণশীল সমাজের বর্ত্তমান ভাব হইতেও তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। সুতরাং এ অবস্থায় কোন অভ্রান্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন সমাজের সময় নির্ণয় পন্থা যে সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বেদ সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা বেদ রচনার সময় ২০।২৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনে করেন। এরূপ অনুমানেরও বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে বেদ যে কোন এক অতীত যুগ হইতে রচিত হইতে হইতে আসিয়া প্রাক্ বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত ভাষা প্রচলনের সময়ও লিখিত হইয়াছিল দশম মণ্ডলের বহু ঋকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা রাত্রি পরিশিষ্টের যে ঋকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে

প্রাচীন অর্ব্বাচীনযুক্ত রচনার দৃষ্টান্ত খুব স্পষ্ট। কেহ যদি এই রচনা বা ঋকবেদের পুরুষ সূক্তের রচনা (১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্ত) দেখিয়া তাহাকে বৈদিক সংস্কৃত রচনা বলিয়া মহাকাব্য যুগের সমসাময়িক সময়ের রচনা বলিয়া অনুমান করেন তবে তাহার অনুমান যে খুব ভিত্তি শূন্য হইবে, তাহা মনে হয় না।

ব্রাহ্মণ রচনার কাল লইয়াও অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। তিলক মহোদয়ের মতে শতপথ ব্রাহ্মণের রচন কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০।

এই সময় আমাদের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণের যে শ্রুতিটী হইতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সেই নির্দ্দিষ্ট শ্রুতিটীর সময় সম্পর্কে আমাদের কোনই মত ভেদ নাই। প্রকৃত সমস্যা সেই শ্রুতিটী কোন গ্রন্থ হইতে শতপথে গৃহীত হইয়াছে? শতপথ শুক্ল যজুর মধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। তবে কি যজুর্ব্বেদের শ্রুতিটীই উড়িয়া আসিয়া শতপথে জুড়িয়া বসিল। এগুলি সমস্যা বটে। বেদের সমাজ বিভাগ ও শাখা বিভাগ প্রাচীন হইলেও শতপথ ব্রাহ্মণ এত প্রাচীন নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত সমাজ আলোচনায় বিবৃত হইয়াছে।

মহাভারতের সময় নিরূপণেও এইরূপ একটী অভ্রান্ত (?) রীতির আশ্রয় গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা—মঘানক্ষত্র সম্বন্ধীয় উক্তি।

এ উক্তি বৈজ্ঞানিক বটে কিন্তু উক্তির মূল সূত্রকে অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

আমাদের মত ভারতে লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার পরে, বিভিন্ন বেদগুলি যেমন জনগণের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদগুলিও সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই লিপি বিজ্ঞান প্রচারের যুগ খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়।*

রামায়ণ লিপিযুগের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সমগ্র রামায়ণের একস্থানেও লিখাপড়া চর্চ্চার কোন আভাস নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনার সুযোগ হয় নাই। "রামায়ণের সভ্যতা" গ্রন্থে লিপি বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে তাহা প্রদত্ত হইবে।

রামায়ণ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে—ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে রচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সহজ সংস্কৃত ইহার কারণ ইহা জনসাধারণের বোধ্য গীতরূপে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। গীতে প্রচারিত আখ্যায়িকার ভাষা ব্রাহ্মণ বা উপনিষদের ভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইবে ইহা অবশ্যই আশা আশা করা যায় না; সুতরাং যে যুগের সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বা উপনিষেদে বিবৃত তাহাই যে সে যুগের সংস্কৃতের নিদর্শন হইবে এবং রামায়ণের সহজ সংস্কৃতকে সেই সময়ের রচনা রীতির নিদর্শন বলিলে তাহা ভুল হইবে—তেমন বলা সঙ্গত নহে।

বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষার উদ্ভব হইয়া তাহাই জনসাধারণের ব্যবহারিক ভাষায় এবং শেষটা অশোকের সময় রাজভাষায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভাষার কোন ইঙ্গিত রামায়ণে নাই। পরন্তু এই যুগে ঐতিহাসিক জগতে যে সকল নূতন চিন্তার বিষয় সঞ্চিত হইয়াছি, যুগ সাহিত্য তাহার প্রভাব হইতে দূরে রক্ষিত হইতে পারে নাই। রামায়ণে এই বৌদ্ধযুগের প্রভাব অযোধ্যা কাণ্ডের ১৮ ও ১৯ অধ্যায় দুটী ব্যতীত আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। এই দুইটী অধ্যায় যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আমরাও তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি।

রামায়ণের দেবতা প্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতিকে পৌরাণিক দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

---

* গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে
রামায়ণ সংগ্রহ কাল ৫র্থ—১ম খৃঃ পূঃ (১৮ পৃঃ)
অধ্যাপক জেকবী প্রভৃতি অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ যুগে সংস্কৃত ভাষা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং রামায়ণের মত কোন সংস্কৃত কাব্য ঐ যুগে লিখিত হইতে পারে অধ্যাপক জেকবীর এই মন্তব্য ঠিক নহে। বৌদ্ধ যুগে যে সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই তাহা নহে। গৃহ্য সূত্রগুলি ও দর্শন এবং উপনিষদ এই সময় লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভাল কবির কাব্য নাটকগুলিও খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ যুগের (খৃঃ পূঃ) ২৩ শত সংস্কৃত পুস্তক চীন ও জাপানে আছে। নেপালে এই সময়ে বহু সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এবং তিনি নিজে তাহাদের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক ঐ যুগে যে রামায়ণ রচিত হয় নাই তাহা ঠিক। অধ্যাপক জেকবীর এই মতের সহিত আমাদের মতভেদ নাই।

এই নির্দেশ দ্বারা আমরা এই শ্রেষ্ঠ দেবত্রয়ের লঘুতার দিকটা বিশেষ করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি না। দেবতাকে যদি জন্ম রহিত এবং আদি সৃষ্টিরও অচিন্ত্য শক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে কোন দেবতাই যে নূতন নহেন ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

"মধ্যাকর্ষণের" শক্তি চিরদিনই আছে, তাহার শক্তি মানুষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মাত্র সেদিন, তাই বলিয়াই মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্ম নিউটনের জন্মের পরে নহে। সেইরূপ ব্রহ্মই চিরদিনই আছেন; বৈদিক সমাজে তিনি জনগণের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু উপনিষদের যুগে তিনি জ্ঞানীগণের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিলেন। ইহার আড়াই হাজার বৎসর পর এক মহাপুরুষের চেষ্টায় তাহার আলোচনার ও উপাসনার পথ মুক্ত হইয়া যায়। তিনি সমাজের দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন এইরূপ হইলেও ব্রহ্মকে ব্রাহ্ম সমাজের সমসাময়িক দেবতা বলা সঙ্গত হইবে না।

মনুষ্যের চিন্তাই এই সকল স্থলে অর্ব্বাচীন; প্রকৃতির শক্তি বা দেবতা অর্ব্বাচীন নহেন। আমরা ঐ সকল স্থলে কেবল দেখাইয়াছি প্রাকৃতিক শক্তিকে যুগে যুগে মানুষ কিরূপভাবে দেখিয়াছে ও চিন্তা করিয়াছে। এবং সেই চিন্তার স্রোত কিরূপ ভাবে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে অযোধ্যা সাকেত নামে পরিচিত ছিল; অযোধ্যার নাম বৌদ্ধ সাহিত্যে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না; এদিকে সাকেতের নামের কোন আভাসই রামায়ণে নাই। পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তি, কপিলাবস্তু, বারাণসী প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধযুগে-উন্নতির উচ্চ চূড়ে আরূঢ় ছিল। রামায়ণে পূর্ব্ব ভারতের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে—রামায়ণ বৌদ্ধযুগের বা বৌদ্ধযুগের পরের রচনা হইলে আমরা তাহাতে এই সকল স্থানের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাইতাম। উত্তর কাণ্ড বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী কালের রচনা। এই রচনায় শ্রাবস্তির উল্লেখ আছে। লব এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাশীর বারাণসী নামটী বৌদ্ধ সাহিত্যেই প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে কাশী রাজ্যের উল্লেখ আছে—বারাণসী নগরের কোন উল্লেখ স্বীকৃত হয় নাই।

কোন গ্রন্থে কোন স্থানের বা কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেই তাহা হইতে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য সমীচীন নহে কিন্তু এগুলি সেরূপ নহে। রাম মিথিলায় আসিতে সেই পথের ও সেই অঞ্চলের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে—পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তি, কপিলাবস্তু, বারাণসী প্রভৃতি স্থান দেশ প্রসিদ্ধ স্থানরূপে বিরাজিত থাকিলে তাহার বর্ণনা রামায়ণের ঐ স্থানে নিশ্চয় থাকিত। তখন রামায়ণে বিশালা নগরের বর্ণনা আছে, তখন তাহা মিথিলার পার্শ্ববর্ত্তী একটী রাজ্য ছিল। বৌদ্ধযুগে মিথিলা ও বিশালা এক হইয়া বৈশালী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

এ সকল বর্ণনায় বাল্মীকির বর্ণনার পরবর্ত্তীতার নিদর্শনই বেশী বিরাজমান।

আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপেই রামায়ণের রচনার কাল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের নির্দ্দেশিত বিষয়গুলি যে সময় নিরূপণ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ তাহা নহে; তাহা চিন্তনীয় বিষয় মাত্র, সময় নিরূপণ বিষয়ে ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত "ঋষিযুগের" সমর্থন যোগ বিষয়গুলির প্রতি পাঠক একটু বেশী দৃষ্টি রাখিবেন, অবশ্য প্রক্ষিপ্ততার চাপে ঐ গুলির ভাব অনেকটা সন্দেহজনক হইয়াছে তথাপি এই প্রাচীন স্তরের ভাবগুলি উপেক্ষার বিষয় নহে।

প্রক্ষিপ্ত বিচার সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থেরই করা হইয়াছিল। উহা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় এবং যে অর্থ আনুকূল্যের আশা চিন্তা করিয়া তাহা বিস্তৃত করিয়াছিল উহাও বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় অসম্ভব হওয়ায় তাহা অধিকাংশ আপাততঃ পরিত্যক্ত হইল। যাহা হউক, আমরা এইরূপ বিষয়গুলির ভাব চিন্তা করিয়াই আপাততঃ একটী সময় নিরূপণ করিলাম; সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমরা যে ধারায় চিন্তা করিয়াছি এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি বিষয় আলোচনায়ই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে, এবং পাঠকগণের দৃষ্টি তাহাতে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৺কেদারনাথ মজুমদার।

সংসার চিত্র।

রমানাথের মা রমানাথের জন্য একটী চাঁদপানা বউ ঘরে আনিয়া, মনাগুনে পুড়িতে লাগিলেন। তাহার একটা বিষম ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল যে রমানাথ পাছে বউএর টুকটুকে মুখখানা দেখিয়া মাতৃ সেবা ভুলিয়া যায়।

ফলে তাহাই হইল। মায়ের অহেতুক মনোভাব রমানাথের নিকট অজ্ঞাত রহিল—সে লক্ষ্মীর রাঙ্গামুখ দেখিয়া একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রমানাথ এখন প্রতি শনিবার বাড়ী আসে এবং সোমবার ভোর বেলায় যাইয়া মহকুমায় আফিস করে। পূর্ব্বে সে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিত না। যখন আসিত, মায়ের নিকট বসিয়া মায়ের পাখার বাতাসে শরীর শীতল করিত, তারপর মায়ের পার্শ্বে শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করিত, মার স্নেহ হস্ত নিজ মাথায় তুলিয়া দিয়া মায়ের গল্প শুনিত—মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কত কথা বলিতেন ছেলে শুনিয়া শুনিয়া মাতার স্নেহ শীতল হস্তস্পর্শ-সুখানুভব করিতে করিতে নিদ্রা যাইত।

এখন রমানাথ বাড়ী আসিয়া আর তাহা করে না। পিতামাতার পা'র ধূলা লইয়া একবারে রান্না ঘরে যাইয়া আহার করে, তারপর শুইবার ঘরে যাইয়া শুইয়া থাকে। পুত্রের ভাব দেখিয়া মাতা বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্রবধূই এইরূপ পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ বলিয়া স্থির করিলেন।

রমানাথের মা'র স্থির বিশ্বাস যে বউটা ঘরে আসিয়া তাঁহার প্রাণের ছেলে রমানাথকে "অযুদ" করিয়াছে নতুবা এমন মাতৃভক্ত ছেলে দুদিনেই এরূপ "পাগলা" হইয়া যাইবে কেন?

ভাবিয়া চিন্তিয়া রমানাথের মা ছেলের জন্য শ্যামার মার নিকট হইতে একটা "টোট্‌কা" লইলেন এবং শনিবার দিন তাহা রমানাথের কোমরে বাঁধিয়া দিলেন।

"টোট্‌কায়" ফল হইল না। রমানাথ যথারীতি শনিবার বাড়ী আসিল।

এবার রমানাথের মা আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। রমানাথকে শনিবারে মহকুমায় কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য কতকগুলি "ফরমাইস" পাঠাইলেন।

মাতার ফরমাইস বাহুল্য রমানাথকে মহকুমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। মাতৃভক্ত পুত্র আপ্রাণ চেষ্টায় মাতৃ-কার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিয়া গভীর নিশীথে গৃহে পঁহুছিল। রমানাথ-জননী নিরাশ হইলেন। শেষ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণ মানসে মাতা আপাততঃ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শনিবার রমানাথ গৃহে আসিয়া দেখিল গৃহ শূন্য।

রমানাথ স্নেহময়ী জননীর আগ্রহে সে দিন জননীর পার্শ্বেই শয়ন করিল। প্রাতে উঠিয়া আফিসে অনেক কাজ "মুলতবি" আছে" বলিয়া মহকুমায় চলিয়া গেল। মা অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন—রমানাথ থাকিতে পারিল না।

রমানাথের মা বউ আনাইলেন না; রমানাথও আর ঘাড়ে মুলতবি চাপ লইয়া বাড়ী আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করার কোন আবশ্যকতা বুঝিল না। আপাততঃ এ অবস্থা ছেলের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য করিয়া রমানাথের মা সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন।

রমানাথের বৃদ্ধ পিতাকে বউ বড়ই যত্ন করিত। বধূর অভাব বৃদ্ধ প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিলেন। রমানাথের মাও যে সে অভাব অনুভব না করিতেছিলেন তাহা নহে; তিনি সংসারের প্রতি কার্য্যে বিশৃঙ্খল ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন—লক্ষ্মীর অভাবে বাস্তবিকই গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উঠিয়াছিল—বুঝিয়াও পুত্রের কল্যাণ কামনায় মাতা সাধ্যানুসারে সে সকল অসুবিধা বক্ষ পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানিতেন না। কষ্টে পড়িয়া বউকে বাড়ী আনিতে জেদ করিলেন। লক্ষ্মী গৃহে আসিল। শনিবার রমানাথও আসিয়া পিতামাতার পায়ের ধূলা লইল।

মাতা পুত্রের কল্যাণ কামনায় অনেক টুট্‌কা, রক্ষাকবচ, মাদুলী ব্যবহার করাইয়া, অনেক ঠাকুর দেবতার মানসিক করিয়াও যখন কিছুতেই পুত্রবধূর কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন বধূর উপর অগত্যা "আম হুকুম" প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "তুমি রাত বরাবর" আমার সঙ্গে থাকিও কর্ত্তা ৩। ৪ বার বাহিরে উঠেন, আমার কি আর শক্তি আছে যে—ইত্যাদি।

মা বউকে চ'খের উপর রাখিলেন।

* * * *

(২)

রমানাথের পিতা গৃহিণীকে বলিলেন ছেলেটা বাড়ীতেও আইসে না, খরচপত্রও দেয় না, তার কি কোন খবর লইতে নাই ?

গৃহিণী বলিলেন—"ছেলে এত ঘরমুখো হওয়া কি ভাল ? বাইরে দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই ভাল, নতুবা চোখ মুখ ফুটে না। কত ছেলে কত রকম 'খেয়াল' করে, আমার রমানাথের কি সেই সকল কিছু আছে ? একটু এদিক ওদিক্ দেখ্‌লেও মনে সুখ হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন—"ও সকল সেকালের ধাত তোমার যায় নাই। আজই তা'কে খবর দাও। যে লোক মহকুমায় যাইবে, তাহার সঙ্গে আমার পেন্‌সনের কাগজটাও পাঠাইও।

গৃহিণী মহকুমায় লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক যথাসময়ে মহকুমা হইতে আসিয়া জানাইল সে রমানাথের বাসায় যাইয়া পায় নাই। তিনি বাসায় থাকেন না। কোথায় থাকেন কেহ বলিতে পারে না। বারংবার ঘুরিয়া সে তাঁহাকে আফিসে একবার পাইয়া পেন্‌সনের কাগজ দিতে পারিয়াছে। তিনি বলিয়া দিয়াছেন পেন্‌সনের টাকা লইয়া শনিবার আসিবেন। ইত্যাদি।

ইহার পর শ্যামার মা আসিয়া গৃহিণীর নিকট হাসিমুখে বিস্তৃত মুখবন্ধের সহিত জানাইল যে তাহার অব্যর্থ টুটকার গুণ দু দিন আগেই হউক আর দু দিন পরেই হউক প্রত্যক্ষ দেখা যায়। রমানাথের ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ দেখা গেল। এই টুটকা দ্বারা সে আরও দুই কুড়ি সাত জন লোককে ডাইনীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। লোকের আশীর্ব্বাদ থাকিলে ভবিষ্যতের আশাও সে পোষণ করে ইত্যাদি ইহার পর স্বর নিম্ন করিয়া রমানাথের মার কানের কাছে শ্যামার মা আরও ২। ১টী কথা বলিয়া তাহার এই সুদীর্ঘ মুখবন্ধের উপসংহার করিল।

শ্যামার মার মুখে রমানাথের বিশেষ সংবাদ শুনিয়া গৃহিণী পরম আনন্দিত হইলেন। আনন্দের কারণ পুত্রের মুখ চোখ ফুটিয়াছে, এখন কর্ত্তার অভাবে জাতি গুষ্টির সঙ্গে ও দশের সঙ্গে "জুঝিয়া বুঝিয়া" চলিতে পারিবে।

যাই হউক গৃহিণী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, হাসিমুখে ঘরে আসিয়াই কর্ত্তাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান এবং তাঁহার বহুব্যয় আয়াসসাধ্য চেষ্টাতেই যে ছেলের চোখ মুখ ফুটিয়াছে, মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আভাসও প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ ক্রোধে ও দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—"তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমার বংশের দুলালকে জাহান্নামে দিয়াছ। এ ইতর প্রবৃত্তি তোমায় কে দিল ? মা হইয়া তুমি সন্তানের সর্ব্বনাশ করিলে তাহার পরকালটা নষ্ট করিলে ?

গৃহিণী হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন। ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে এইরূপ অপ্রত্যাশিত তিরস্কারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি বলিলেন "আমি ত ভালর জন্যই করিলাম। ছেলে যেরূপ 'ঘরমুখো' হইয়া যাইতেছিল, এ অবস্থায় আমাদের অভাবে কি এই ছেলে সংসার করিয়া দশের সহিত বুঝ প্রবোধ" করিয়া থাকিতে পারিত।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন তোমাদের বুদ্ধিই প্রলয়ংকরী। তুমি কৈকেয়ীর ন্যায় সোণার সংসার ছারখার করিলে, পেটের ছেলেকে নির্ব্বাসিত করিলে, কচি বউটাকে চোখের জলে ভাসালে, শেষে বুড়া বয়সে আমাকেও ঘরে বাসিমরা করে নরকে ডুবাবে।

গৃহিণী কর্ত্তার মুখে নিজ সংসারের এইরূপ পরিণাম শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি সরলভাবে বলিলেন—আপনারা সহরে থাকিয়া যখন চাকুরী করিতেন, তখন এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেন না। ন মাসে ছ বছরে আসিলেও আমরা চোখ দিয়া দেখিতে পাইতাম না। শাশুড়ীর মুখে কথাই শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন এইরূপ না করিলে লোকে সম্মান করে না। সংসার করিয়া খাইবার বুদ্ধি হয় না।"

কর্ত্তা ঘৃণার সহিত বলিলেন—সেকালের কথা ছাড়িয়া দাও। আমাদের সে দিন এখন নাই। আমাদেরই মা খুড়ী কি বাড়ী আসিলে বউ লুকাইয়া রাখিতেন ? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার ফল হাতে হাতে পাইবে। এখন যাও নিজে যাইয়া ছেলেকে লইয়া আইস।

গৃহিণী বলিলেন—আমার রমানাথ তেমন ছেলে নয়। সে শনিবার নিশ্চয়ই আসিবে।

কর্ত্তা বলিলেন "নিশ্চয়ই না।"

(৩)

শনিবার রমানাথ বাড়ী আসিল না। কর্ত্তা গৃহিণীকে বলিলেন এখন দেখ্‌লে তোমার রমানাথ কেমনটি হয়েছে?

গৃহিণী পুনরায় মহকুমায় লোক পাঠাইলেন। সে লোক যাইয়া রমানাথের খোঁজই করিতে পারিল না। রমানাথ এখন প্রায়ই আফিসে যায় না।

সংবাদ পাইয়া গৃহিণী কাঁদিয়া অস্থির হইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন "এখন কাঁদিলে কি হইবে? ঘরে আগুণ দিয়া হা হতোস্মি করিলে পুড়িয়া মরণ ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের সেকালের অবস্থা ভাবিয়া আমি ছেলেকে বিবাহ করাইয়া মহকুমায় চাকুরী দিয়া ঘরে রাখিলাম—তুমি কি না আমার পাকা ধানে মই দিলে।"

পরদিন পাল্কি করিয়া গৃহিণী নিজেই ছেলে ধরিতে গেলেন। একজন আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া তাহার দ্বারাই রমানাথকে ডাকাইলেন। সংবাদ আসিল রমানাথ অফিসের পর আসিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রাণাধিক পুত্রের চাঁদমুখ দর্শন আশায় বসিয়া রহিলেন। রমানাথ আসিল না।

পরদিন পুনরায় লোক পাঠাইলেন। সে দিন আর তাহাকে পাওয়াই গেল না।—আফিস কামাই, এ বিষয় অধিক জানাজানি হইলে চাকুরী থাকিবে না। মাতা অনন্যো-পায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর দুই তিনজন ভদ্রলোকের চেষ্টায় রমানাথ ধৃত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মাতা আকুল হইয়া পড়িলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুটীর ন্যায় নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়া শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন। রমা-নাথের কর্ণে তাহার একটী বর্ণও প্রবেশ করিল না। রমানাথ তখন জ্ঞানলুপ্ত মাতাল।

পরদিন রমানাথ পুনরায় পলাইল অনন্যোপায় দেখিয়া আত্মীয়স্বগণ সকলেই রমানাথের মাকে বউ লইয়া মহকুমায় যাইবার পরামর্শ দিলেন। অগত্যা তিনি কর্ত্তার পরামর্শ গ্রহণ জন্য বাড়ী আসিলেন।

(৪)

কর্ত্তা বলিলেন—এখন কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর। দুই-দিন যাইতে না যাইতেই দেখিতেছি অনাহারে মরিবে। ছেলের কামাই বন্ধ করলে। পেনসনের যে টাকাটা জমিয়াছিল তাহা গোল্লায় গেল। এখন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া গিয়া মহকুমায় পড়িয়া মর।"

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি কি জানি দুই দিনেই আমার রমানাথ এমন বিগড়াইয়া যাইবে। হায়, হায়, আমি কুলক্ষণে বউ ঘরে আনিয়া এমন ছেলে হারাইলাম"।

গৃহীনীর রাগটা এখন বউর উপর ষোল আনা মাত্রায় চাপিয়া পড়িল। বালিকা লক্ষ্মী যাতনার উপর যাতনা পাইয়াও কর্ত্তব্য ভুলিল না। আপ্রাণ চেষ্টায় শ্বশুর, শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি সাধনে যত্ন করিতে লাগিল।

(৫)

একদিন মস্ত রাত্রে রমানাথের ডাক শুনিয়া মা জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে আনন্দ ধরে না। বউ উঠিয়া রান্না ঘরে গেল। কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন।

রমানাথ বলিল আহার হইয়াছে, রান্নার প্রয়োজন নাই। সে দিন রমানাথ মার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিল, শেষে ঘরে যাইয়া শয়ন করিল।

লক্ষ্মী বহুদিন পরে স্বামীকে পাইয়া অশ্রুজলে বক্ষ বিধৌত করিয়াছিল। রমানাথ হাস্য করিয়া বলিল কাঁদিয়াই কি রাত পোহাবে নাকি? কথাই কও না ভাল আছ ত?

লক্ষ্মী বলিল "যেমন রাখিয়াছ, তেমনই আছি। তুমি কেমন আছ?

রমানাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বড়ই অশান্তিতে আছি। লক্ষ্মী তুমি থাকিতে আমার এ অশান্তি।" রমানাথের কথায় লক্ষ্মীর প্রাণে আঘাত লাগিল। লক্ষ্মী অধিকতর আবেগের সহিত বলিল "তোমার কি অশান্তি আমি তাহার কি করিতে পারি বল? আমি প্রাণ দিলে যদি তোমার মনে শান্তি হয় বল, যাহা করিতে বল তাহাই করিব।

রমানাথ চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী বলিল—"চুপ করিয়া রহিলে যে, তোমার মনের কথা আমাকে বলিতে বাধা আছে কি?"

রমানাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "কিছুই না"। লক্ষ্মী "তবে বল"।

রমানাথ লক্ষ্মীর মুখের দিকে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল "লক্ষ্মী বড়ই অভাবে পড়িয়াছিল। পাওনাদারের তাগাদায় আফিসে পর্য্যন্ত থাকিতে পারি না। লক্ষ্মী উপায় কি?

লক্ষ্মী "কত টাকা তোমার দেনা? আমাকে কি করিতে হইবে বল?

রমানাথ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আপাততঃ একশত টাকা হইলে খুচরা দেনা শোধ করিতে পারি।"

লক্ষ্মী বলিল—টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার হাতের বালা, গলার হার লইলে যদি ঋণ শোধ হয়—লইয়া যাও। এর জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় আমি করিব।"

রমানাথ তাহাই চায়। তাহারই জন্য সে আজ গৃহে আসিয়াছে। লক্ষ্মীর হাত হইতে জোর করিয়া রমানাথ বালা লইয়া যাইবে ইহা সে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে এতদূর যাইতে হইল না, ইহাতে সে বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

ভোরে উঠিয়া গৃহিনী আর রমানাথকে দেখিতে পাইলেন না। লক্ষ্মীর হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সোণার বালা নাই। তখন তাঁহার আর অবস্থা বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। তিনি লক্ষ্মীকেই সকল অপরাধের মূল বিবেচনা করিয়া তীব্র তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী স্বামীর জন্য সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

কর্ত্তা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "পাষণ্ডকে আর বাড়ীর ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে দিও না।"

(৬)

পুত্রের এই জঘন্য ব্যবহার বৃদ্ধ পিতার মনে প্রচণ্ড আঘাত প্রদান করিল। এই আঘাতে বৃদ্ধ শয্যা লইলেন। রমানাথের নিকট পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ গেল। রমানাথ আজ কাল করিয়া আসিতে আসিতে বৃদ্ধের পরমায়ু দ্রুতবেগে ক্ষয় হইতে লাগিল। লক্ষ্মী সারাদিন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া শ্বশুরের সেবা করিয়া শাশুড়ীর অবিরত তিক্ত বর্ষণে লক্ষ্মী বিচলিত হইল না। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ লক্ষ্মীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা, তুমি যথার্থই লক্ষ্মী, তুমি আমার গৃহ উজ্জ্বল ও শান্তিময় কর।

পিতার মৃত্যুর পর রমানাথ গৃহে আসিল। আসিয়া সে মহা-অশান্তিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীকে তাহার মা একেবারেই দেখিতে পারেন না। লক্ষ্মী অনবরত সংসারে খাটিতেছে আর শুধুই ভৎর্সনা শুনিতেছে—সে ভৎর্সনার কোন মূল্য নাই।

দেখিয়া শুনিয়া একদিন রমানাথ বলিল "তোমাদের এই অপ্রীতিকর অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এখনই বাড়ী ত্যাগ করি।

মা রাগ করিয়া বলিলেন "কেন আমি কি সংসারের কেউ নই। সকলই যার তার ইচ্ছা মত চলিবে। একটু মুখের কথাও বলিতে পারিব না।"

রমানাথ বলিল "আমাদের এমন কি দশ পাঁচ গণ্ডা জমিদারী আছে, যে এ দিকে নষ্ট হলো ও দিকে নষ্ট হলো সারাদিন "বকাবকি" না করিলে চলে না।"

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার কান্নার মর্ম্ম—কর্ত্তার মৃত্যুর দুদিন যেতে না যেতেই পেটের ছেলে পরের হলো।

দেখিয়া শুনিয়া শ্রাদ্ধের পর রমানাথ বউকে পিত্রালয়ে ও মাকে বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির সুবিধা বিস্তার করিয়া লইল।

(৭)

পতির মৃত্যু এবং পুত্রের তীব্র ব্যবহারে রমানাথের মা মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে দেখিয়া তাঁহার অন্তরও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রমানাথ তাঁহার সংবাদও পাইল না।

লক্ষ্মী লোকমুখে শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। শাশুড়ী তাহার সংবাদ না লইলেও সে নিজ হইতেই আসিয়া শাশুড়ীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল।

লক্ষ্মীর আপ্রাণ চেষ্টায় শাশুড়ী আরোগ্য লাভ করিলেন। এতদিনে শাশুড়ী বুঝিলেন বউ যথার্থই লক্ষ্মী তিনি ঘরের লক্ষ্মীকেই এতদিন পায়ে ঠেলিয়াছিলেন—তাই তাঁহার আজ এ দুর্দ্দশা তাই লক্ষ্মীর সংসার আজ লক্ষ্মীছাড়া।

শাশুড়ী আরোগ্য লাভ করিলে পর লক্ষ্মী নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া পতির স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া আর সঙ্গত মনে করিল না। লক্ষ্মী স্বামীকে সুপথে আনিবার জন্য শাশুড়ীকে লইয়া মহকুমায় যাইবার প্রস্তাব করিল। শাশুড়ী লক্ষ্মীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

(৮)

রমানাথ ধরা দিল না। লক্ষ্মীও ছাড়িবার মেয়ে নহে। সে শাশুড়ীকে প্রবোধ দিয়া মুন্সেফ বাবুর বাসায় যাইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইতে অনুরোধ করিল। রমানাথের মা আত্মীয় স্বজনের সম্মতি লইয়া তাহাই করিলেন।

মুন্সেফ দেবেন্দ্রবিজয় বাবু একজন দার্শনিক পণ্ডিত লোক; যথাসময়ে তিনি রমানাথকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া উপদেশচ্ছলে জীবনের কর্ত্তব্য, পুত্রের কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য, গৃহীর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন।

মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হইলে কিরূপ জঘন্য হয়, নীচাশয় হয়, প্রবঞ্চক হয়, চোর হয়; পুত্রের অযত্নে মায়ের কিরূপ দুর্গতি হয় দেখাইলেন। স্বামীর অনাদরে ও হতাদরে সংসার কিরূপ নরকে পরিণত হইতে পারে তাহা বুঝাইলেন। রমানাথ তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ করিল।

মুন্সেফ বাবু রমানাথকে মিষ্ট ভাষায় এই সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন—রমানাথ দেখ, ভ্রান্তি মানুষেরই হয়, এবং অনুতাপই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। গত কার্য্যের জন্য অনুতাপ কর। লজ্জিত হইও না, কিন্তু দেখিও ভ্রান্তি যেন দ্বিতীয়বার না আইসে। এখন গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রতিদিন এই সময়ে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

রমানাথ গৃহে আসিয়া মাতৃ চরণে প্রণাম করিল। লক্ষ্মীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া প্রেমের অজস্র উপহার বর্ষণ করিল।

মাতা উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন "কর্ত্তা মৃত্যুকালে যথার্থ ই বলিয়াছিলেন—এ আমাদের লক্ষ্মী"।

প্রবাদের আবাদ।

(৬ষ্ঠ চাষ)

রসাল ও মোলায়েম ফসলের তদ্বির করিতে অগ্রসর হইয়া যা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহার কতক বিলি বন্দোবস্ত করিয়াছি। আরও কিছু আবিষ্কারের আশায় মন দিয়াছি। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ সিংহ আমার দোসর হইয়া আবাদে সাহায্য করায় আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের দেশে চাষা মহলে "হামুর চাষ" বলিয়া একটা কথা চলিত আছে, এর অর্থ চাষের অদল বদল করা, অর্থাৎ আজ আমি এক জনকে জমি চাষ করিয়া সাহায্য করিয়া দিলাম তৎপরিবর্ত্তে সে আমাকে অন্য একদিন চাষের সাহায্য করিল। আগেই বলিয়াছি 'আফিংখোরের গাঁজায় মৌতাত হয় না:—আমারও অন্য নেশায় আর মন বসিতেছে না। তাই পুনরায় চাষে মন দিয়াছি। দেখা যাক কি পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী দাদা মহাশয় প্রত্যেক প্রবাদের যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অসুবিধাগুলি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইয়া উঠার মত শক্তির কণাও আমার নাই, তাই এখন হইতে যথাসম্ভব প্রত্যেক প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিব।

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য।"

১। "ছাবড়া বিলাই লেঙ্গুর চাটে।"

ছাবড়া = অসংযত জিহ্বা (গ্রাম্য শব্দ)

যখন চুরি করিবার কিছুই থাকে না তখন নিজের লেজই চাটে।

২। "অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে
খালি ঘরে সিঁধ খোঁড়ে।"

অর্থ—অভ্যাস বজায় রাখা।

৩। "হাতে না গোতে, চুঙ্গা ভইরা মুতে।"

অর্থ—অসম্ভবে সম্ভব বোধ ও বিস্ময়।

৪। "সভার মধ্যে অপমান,
লজ্জার সমান।"

উপহাসচ্ছলে বলা হয়।

৫। "রায় মহাশয়ের পুষ্করিণী
বাড়ীত পাইক্যা ডাক শুনি

নিত আঙ্গুল্যা এক ঘাট।
উঠ্‌তে নামতে জান্ ফাট্ (প্রাণ যায়)
শেওড়া পাতার বর্ণ জল,
বেঙ্গে করে খল খল
জাঁইত্যা বুগাইলে সোডা
জল না উঠে এক কোজ্রা।"

অর্থ—জনৈক সমৃদ্ধিশালীর পুষ্করিণী স্বরূপ বর্ণনা এখনো লোকপ্রবাদ রূপে শুনিতে পাওয়া যায়।

৬। "গঙ্গা গঙ্গা ভাগীরথী পাপ নাই এক রতি।"

যে সব গ্রামে পুকুরে জল থাকে না, সেই সব গ্রামের বিষয় প্রবাদ।

৭। "বাজারে শুনছি বেলা নাই।"

শোনা কথায় বিশ্বাস করা স্থলে এ প্রবাদ প্রযোজ্য।

শ্রীমান শচীন্দ্র ডাক্তার বহুদিন যাবৎ সিলেট প্রবাসী সেখানে যে সব প্রবাদ বাক্য আছে সে তার অনেকগুলি আনিয়া আমাকে দিয়া চাষের সাহায্য করিয়াছে এবং আরও দিবে বলিয়াছে—আশীর্ব্বাদ করি সে দীর্ঘজীবী হইয়া আমার সহায়তা করুক। নিম্নের প্রায় ১০। ১৫টী প্রবাদ শ্রীহট্টে প্রচলিত।

৮। "কিবা দেশের কিবাগুণ
একই গাছে পান সুপারী, একই গাছে চূণ।"

অর্থ—একটা সুপারি গাছে পানগাছ উঠিয়াছে, তাহাতে শকুনের বিষ্ঠা চূণের মত দেখা যাইতেছে।

৯। "খাতিরের বাপের নাম খেসারত।"

ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গিয়া খাতির করিয়া জিনিষ কম দামে বিক্রী করিলে খেসারত (লোকসান) অবধারিত।

১০। জোঁকারে যদি পোঁনা মরে এমন পোনার কাজ কি?

১১। "লংলস্ত 'কুলাউড়া'
ইটস্ত 'ননজোড়া'
ইন্দ্রেশ্বর 'খলাগ্রাম'
কপাল পোড়া তিনই গ্রাম।"

লংলা পরগণার কুলাউড়া গ্রাম, ইটা পরগণার ননজোড়া গ্রাম, এবং ইন্দ্রেশ্বর পরগণার খলাগ্রামের লোক নাকি খুব ধূর্ত্ত ও জাঁহাবাজ!

১২। "ভানুগাছ স্থানি বিপ্রা সন্ধ্যাপূজা বিবর্জ্জিত
মধ্যাহ্নে দারুক বৃত্তি, সায়াহ্নে সুটকি ভোজনম্।"

অর্থ—ভানুগাছ পরগণার অনেক ব্রাহ্মণ নাকি মধ্যাহ্নে দারুকবৃত্তি (কাষ্ঠ সংগ্রহ) ও বিকালে সুটকি ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভোজনও করেন।

১৩। "কামড়াঙ্গা গাছ, নষ্টের মূল।"

জনৈক প্রবাসী শুনিল তাহার বাড়ীর কামড়াঙ্গা গাছের নীচে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শুনিয়া মহারাগ; "কামড়াঙ্গা গাছ! এবার বাড়ী যাইমু, কামড়াঙ্গা গাছ কাটমু। নাও বানাইমু জলে হেছরাইমু। তবে ছাড়মু—হালার কামরাঙ্গা গাছ! তুমি নষ্টের মূল! অর্থাৎ নিজ পরিবারস্থ লোকের দোষ অনেকে না দেখিয়া একটা বাজে কথার ঝোঁক দিয়া অনেকে নিজ দোষ হাল্‌কা করে।

১৪। "রাজার মধ্যে মুরারীচান্দ আর যত কূয়া
(আর) হাওরের মধ্যে হকোলকি আর সব ভূয়া।"

শ্রীহট্টে রাজা মুরারীচান্দ ছাড়া আর যাহারা বড় লোক তাহারা কূয়া (কুমার) হকোলকির মত বড় হাওরও আর নাই।

১৫। "লখার কান্ধের ভারও নামতো না;
মুরারীবচান্দের দেনা কমতো না।"

এই পর্য্যন্ত আপাতত সিলেটী অঞ্চলের প্রবাদ আবাদ করিয়াছি।

১৬। "শুদ্ধি ব্রাহ্মণী ডাইল ভাত খায়
হইল্ (শোল) মাছের মুড়া লইয়া উগার তলে যায়।

অর্থ—অনেক বিশিষ্ট পরিবারের বিধবা নীতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখান, কিন্তু অপকর্ম্মেরও আত্মশ্রাদ্ধ করিতে বাকী রাখে না।

১৭। "কন্ধি পুড়া দিয়া দাগ
সাউগার করে নিজেরে ... ...।"

সাউগার = সাধু, নির্দ্দোষ।

১৮। "আপনা নাক কাইট্যা পরের যাত্রা।"

১৯। "চিৎ হইয়া ছেপ ফাল্‌লে বুকেই পড়ে।"

২০। "নাতিপুত্রা'র গোষ্ঠী
নাই ঠিকুজী—নাই কোষ্ঠী।"

অনেকে উচ্চ বংশ মর্য্যাদা পাইতে চাহেন কিন্তু কোষ্ঠী ঠিকুজী দেখাইতে পারে না।

২১। "জনে জনে পরামাণিক
গরু মরে ঘাসে।"

যার বাড়ীতে চাকর অনেক, আর প্রায় সবই মাতব্বরীর করে, সে বাড়ীর গরু উচিত মত ঘাস পায় না।

২২। "বরাবর সরাসর পরাশর গোত্রে,
রামজয়ের বড় পুতে বিয়া করে বড়হিতের ভিতরে"

অর্থাৎ এমন দিন সমাজে ছিল যখন বিশিষ্ট পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধারণ স্থানে বিবাহ করিলে "মুখ" দেখাইতে পারিতেন না, কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তান টাকার লোভে নিম্ন গোত্রে বিবাহ করায় এই প্রবাদটী রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য কন্যাদায় ও অহেতুকী পুত্রদায় (?) সমাজকে যথেচ্ছগমনের পথে দাঁড়া করাইয়াছে, মুড়ি মিশ্রি সমান দর হইয়াছে।

২৩। ডাইলের মধ্যে খেঁসারী,
দেবতার মধ্যে বিষরি (বিষহরি)

২৪। ঠেলাঠেলির ঘর
খোদায় রক্ষা কর।

২৫। হুগল জোয়ানের মেল (দল)
বুড়ারে কয় আগুণ ঠেল।

অর্থ—শ্মশানে গিয়া অনেক সময় যুবকগণ বৃদ্ধের বহুদর্শিতার দোহাই দিয়া নাড়াচাড়ার কাজটা করাইয়া লয়।

২৬। মঙ্গলচণ্ডী পূজা পায় না সুবচনাই হাত বাড়ায়।

২৭। উচিতই মিলে না—আবার পিষ্টক।

এই দুইটীই এক অর্থ প্রকাশ করে।

২৮। ত্বরিত দান মহাপুণ্য।

দান করিতে হইলে টালবাহানা না করিয়া শীঘ্র করাই ভাল।

২৯। বাঙ্গারামের মন্দাগ্নি, অন্তের ক্ষুধা।

৩০। বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া
বহুত না হোক্ থোড়া থোড়া।

৩১। "মরদের পুত মরদ"।

উপরি লিখিত দুইটীরই সমান অর্থ।

৩২। "অয়ে সেয়ান, অধিকে আজ (বোকা)।

৩৩। "বাজাইত ভেলা (বেহালা) লুটিত ভাণ্ডার।

অর্থাৎ কাজ করি ত ভাল কাজই করিব।

৩৪। "বল বল তিন বল,
ভোজনে 'অম্বল', শয়নে 'কম্বল',
মরণে 'রাম' বল।

৩৫। "দানছে ধরম, পাতনছে নরম
গাওছে গরম, কমলীকো করম।

অর্থাৎ কম্বল দান পুণ্য, গায় দিলে বেশ গরম, বিছানায় পাতিলে বেশ নরম।

৩৬। "বার মাসের বার ফল,
যে না খায়, সে যায় ঠেঙ্গের তল।"

প্রত্যেক মাসের উৎপন্ন ফল খাওয়াই উচিত। নিম্নলিখিত প্রবাদটীই ইহার সাক্ষ্য দিবে। কেবল প্রবাদ নহে ইহাতে শাস্ত্রের কথাও আছে।

"চৈত্রে 'গিমা' তিতা, বৈশাখে 'ঘিরত নালিতা', জেঠে 'খই', আষাঢ়ে 'দই', শাওণে 'ঘোল-পান্তা', (মাঠা ও পান্তা ভাত) ভাদ্রে 'তালের পিঠা,' আশ্বিনে 'শশা' মিঠা, কার্ত্তিকে 'ওল', আঘণে 'খলিসা'র ঝোল, পুষে (পৌষে) 'কাঞ্জি', মাঘে 'তেল', ফাল্গুনে 'গুড়', 'আদা', 'বেল'।

৩৭। "বাজারের আগ, দরবারের পাছ"।

প্রথম বাজারে ভাল জিনিষ বিক্রী হয়, দামও কিছু সুলভ। দরবারের শেষটায় গেলে ফলাফল জানা যায়। কিন্তু অনেকেই সামাজিক দরবারের ইস্তক প্রথম লাগায়ত শেষ ওয়ারীশান সহ থাকিয়া দরবারের সৌষ্ঠব (?) সম্পাদন করেন।

৩৮। 'গু' পাইড়া গেলেও দরবার পাইড়া যাইতে নাই।"

এইটী অতিশয় বুদ্ধিমানের উক্তি। অনেকেই খামাকা দরবারে গিয়া হাজির হইয়া মিছামিছি তর্ক করে. দরবারে অনর্থক গিয়া কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হয় তাই পারতপক্ষে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দরবারের নিকটে ছায়াও মাড়ান না।

৩৯। "এক মায়ের এক পুত
খাইয়া না খাইয়া যমদূত।"

৪০। "ধার নাই দায়ের আছাড় ছনছন্।

৪১। আকত্তোয়া কাঁঠালের মুলি বড়।

৪২। খাজনা খাইক্যা বাজনা বেশী।

৪৩। আসলের লগে দেখা নাই
সুদের পটপটি।

৪৪। "বুদ্ধির টিপাই হাতিয়ার ছাড়া সিপাই।"

৪৫। "সুপণ্ডিতের চাইর গুত
একটা মাতাল— দুইটা ভূত
যেও একটা কিছু ভালা
সেও বাপেরে ডাকে শালার শালা।

৪৬। "মানষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত্ত
পক্ষীর মধ্যে কাউয়া
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত্ত
যায় না ধরা পাওয়া।

৪৭। "নাপ্তের আই, সুতারের কাইল
দুইজনের একই ভাইল।

আই—আসিতেছি। কাইল—কল্য। ভাইল—বজ্জাতি। টালবাহানা।

৪৮। "এক তাড়ি তেল, ঢাইল্যা দিলেই গেল।"

৪৯। "কেবল তাবিজের ভরসায় চলে না।"

অর্থাৎ কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া পুরুষকারেরও আরাধনা কর্ত্তে হয়।

৫০। "পুঁথি, কলম, ঘড়ি, নারী নষ্ট করে আনাড়ী।

যে জিনিষের মূল্য বোঝে না। তাহার হাতে তাহা দেওয়া উচিত নহে।

৫১। "গৌরাং কাইত"।

৫২। শুয়রে ঠাকুরের ক্ষেত চিনে না।

৫৩। "হলার মানুষ বোলে সিধা হয় না"

কীল গুঁতা খাইয়া যাহার অভ্যাস, কথায় তাহার সংশোধন হয় না।

৫৪। "বাবু মরে শীতে আর ভাতে।"

৫৫। "অদৃষ্টে করলা ভাজা বীচি ঘস্ ঘস্
কচু হইতে লতা ভাল, যায় ফস্ ফস্।"

৫৬। "পোলার মুতে ঠেকান পরে।"

অর্থাৎ নির্ব্বোধ বেকুবের নিকট বুদ্ধিমানও লজ্জিত হয়। ঠেকান=আছাড় পড়া।

৫৭। "ষাঁড়, রাঁড়, সিঁড়ি তিনই কাশীর বৈরি।"

কাশীর রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহারা প্রথম যায় তাহাদের ত চক্ষু "চড়ক গাছ!" প্রত্যেক মঠ মন্দিরে ঘাটে হাটে কত সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয় সীমা নাই। রাঁড় রাঁড়ী অর্থাৎ অধিকাংশ অপবিত্রা নারী কাশীর মত পুণ্য স্থানকেও কলুষিত করে।

৫৮। "কাশীতেই ভূতের বাসা।"

অর্থাৎ কাশী একদিকে যেমন পবিত্র স্থানের সেরা অপর দিকে পাপের প্রশ্রয় দিতে জিনিষেরও অভাব নাই।

৫৯। "তীর্থের কাউয়া।"

৬০। "দড়ি আগ্‌লা বাছুর পাগলা।"

নির্ব্বোধকে স্বাধিনতা দেওয়ার কুফল।

৬১। "শয়তানের চরকি।"

অনেকে থামাকা থামাকা ঘুরিয়া বেড়ায়। আর এখানের কথা সেখানে বলিয়া বলিয়া শয়তানি করে।

শ্রাবণের চাষকে আমাদের দেশে 'পৈকি চাষ' বলে, এ চাষের পরে রবিশস্যের চাষ আরম্ভ হয়। পাঠকগণের আশীর্ব্বাদে ভালয় ভালয় যদি অগ্রসর হইতে পারি তবেই মঙ্গল।" দশে মিলি করিলে মহৎ কর্ম্ম হয়" দশজন আমার সহায় হউন।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পৃথিবীর বয়স।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক সকল আমরা আকাশে যেমন দেখিতেছি অনাদি কাল হইতে উহারা এই ভাবেই আকাশে দীপ্তিমান আছে এই কথা আধুনিক সময়ের কোন বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন না। আকাশের সকল জ্যোতিষ্কই এক কালে বাষ্পাবস্থায় ছিল। কালক্রমে বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশের ফলে কোটি কোটি বৎসরে উহারা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে।

সৌর জগতের সূর্য্য এবং পৃথিব্যাদি যাবতীয় গ্রহ একটী নীহারিকার (Nebula) উপাদান হইতে গঠিত হইয়াছে। একই সময়েই উহাদের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং এই হিসাবে সূর্য্য এবং বুধ, শুক্র, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহকে পৃথিবীর যমজ ভ্রাতা বলা যাইতে পারে। সকলই এক নীহারিকা জননীর সন্তান। এই প্রবন্ধে আমাদের জননী বসুন্ধরার বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের জননী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এত দিন পরে নির্দ্ধারণ করা সন্তানের পক্ষে যে অতি

দুরূহ কার্য্য এই কথা বলাই বাহুল্য। কোন গণকই পৃথিবীর কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায়ে জননী বসুন্ধরার একটী কোষ্ঠী প্রস্তুতকল্পে বহু দিন যাবত চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তারেরা যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ লক্ষ্য করিয়া মানুষের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৈজ্ঞানিকগণও পৃথিবী দেহের নানা অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার বয়স নির্ণয় করিয়াছেন।

এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমাদের দেশের 'পুরাণ' রচয়িতারাও জগতের পরমায়ু কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই জগৎ চিরস্থায়ী নহে। উহার যেমন জন্ম আছে তেমনি মৃত্যুও আছে। আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসর পর পর একবার মন্বন্তর হয়। এক মন্বন্তর পর্য্যন্ত জগতের স্থিতি। তারপর প্রলয়ে জগতের ধ্বংস হয়। পৃথিবীর কোষ্ঠী বিচার করিয়া কি উপায়ে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আমাদের বলা অসাধ্য এবং তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কতটা মূল্য আছে তাহাও আমরা বলিতে অক্ষম।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নানাদিক দিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান বয়স নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিৎ, প্রাণীতত্ত্ববিৎ এবং পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ সকলই পৃথিবীর নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহারা সকলই হিসাব করিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও সহিত অন্যের হিসাবের মিল হয় নাই। প্রাণীতত্ত্ববিৎ ও ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে পৃথিবীর বয়স ২০ কোটি বৎসরের কিছুতেই ন্যূন হইতে পারে না। কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে পৃথিবীর বয়স ১০ কোটি বৎসরের ও বেশী হইবেই না; কম হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

পৃথিবী আদিতে অনন্ত বাষ্পাবস্থায় ছিল। অনন্ত আকাশে তাপ বিকিরণ করিয়া উহা ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন পৃথিবীর দেহের তাপ যখন হ্রাস হইয়া ফারেণহিটের ২০০০ দুই হাজার ডিগ্রীতে নামিল তখনই উহার দেহের চারিদিকে একটী কঠিন আবরণ (crust) গঠিত হইয়াছিল। ইহাই পৃথিবীর প্রথম স্তর। অতঃপর পৃথিবীর দেহে উপর্য্যুপরি বহু সংখ্যক স্তর বিন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল স্তর বিন্যাসের সময় গণনা করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:

পেঁয়াজের খোসার ন্যায় পৃথিবীর মৃত্তিকা স্তরগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ধরিত্রীর যে কঠিন পৃষ্ঠদেশ অগণিত জীবগণের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক স্তর। ইহার নিম্নে একটীর পর একটী করিয়া পৃথিবীর পুরাতন স্তরগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। পুরাতনের উপরই নূতন স্তর দিন দিন গড়িয়া উঠিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বায়ু, বৃষ্টি এবং নদ নদীর স্রোতই এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। বায়ু এক স্থানের বালুকারাশি স্থানান্তরিত করিয়া অন্য স্থানে স্তূপাকার করে। বৃষ্টির জলরাশি সঞ্চিত হইয়া নদ নদী ও প্রস্রবণ সকলের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি প্রভাবে অনেক পার্ব্বতীয় প্রদেশের বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড স্খলিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন স্থানে পতিত হয়। নদ নদী সকলের তরঙ্গে ও স্রোতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের মৃত্তিকারাশি ভাঙ্গিয়া জলে মিশ্রিত হয়। নানা দেশ হইতে কর্দ্দম, বালুকা এবং কঙ্করাদি বহন করিয়া নদী সকল বহু দূরে গিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। নদীর স্রোত যখন সমুদ্রের জলে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন নদীর জলে মিশ্রিত কর্দ্দম ও বালুকাদি গুরুভার পদার্থ সকল ধীরে ধীরে নীচে পড়িয়া সমুদ্র গর্ভে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। এইরূপে উচ্চ প্রদেশ সকল ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইয়া নিম্ন হইতে থাকে এবং সুদূর সমুদ্র গর্ভে লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একটী নূতন দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের নদ নদী সকল ভূভাগের অসামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। নদ নদীর স্রোতে মৃত্তিকারাশি নীত হইয়া কত বড় বড় হ্রদ ও বিল ভরাট হইয়াছে। নদ নদী গর্ভে বড় বড় চরা পড়িতেছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত মৃত্তিকাদি বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া তদীয় উপকূল ভাগের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। ২৫।৩০ বৎসরে যদি এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে তবে ২৫।৩০ হাজার বৎসরে যে স্থলভাগের অসামান্য রূপান্তর সাধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। দুই তিন লক্ষ বৎসরে আরও অধিক

পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন এককালে সমগ্র বঙ্গদেশ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। নদী নিক্ষিপ্ত পলিমাটি স্তরে স্তরে পতিত হইয়া কানন কুন্তলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশ কেন, সুবিশাল ভারতবর্ষও এইরূপে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে।

পলি পড়িয়াই যে ক্রমে ক্রমে ভূস্তর গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সম্বন্ধে মত ভেদ নাই। পলি পড়িয়া ভূস্তর গঠিত হইতে যে সময় লাগিবার সম্ভাবনা সেই সময় ধরিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিয়াছেন।

বৃষ্টি ও নদ নদীর জল যে পরিমাণ মাটি বহন করিয়া নিয়া সমুদ্র গর্ভে স্তর নির্ম্মাণ করে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ মোটামুটি হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ষোল কোটি মণ কর্দ্দম বহিয়া বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে। মিসিসিপি নদী প্রতি বৎসর ইহার ছয় গুণ কর্দ্দম সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। সুতরাং এই পরিমাণ মৃত্তিকা প্রতি বৎসর সমুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হইলে যে লক্ষাধিক বৎসরে হিমালয়ের ন্যায় পর্ব্বত গড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পলি পড়িয়া যে সকল পাহাড়ের সৃষ্টি হইয়াছে (Sedimentory rock) তাহাদের স্তরের সংখ্যা এবং স্তরগুলি কত পুরু তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ নহে। কত-দিনে পর্ব্বত দেহের স্তরগুলি গঠিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিলে মোটামুটি পর্ব্বতের বয়স জানিতে পারা যায়। এইরূপে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তরের সংখ্যা ধরিয়া পৃথিবীর বয়সের আনুমানিক পরিমাণ বাহির করিয়াছেন।

পৃথিবীর পলি গঠিত স্তরের গভীরতা প্রায় ৫০ মাইল হইবে। পণ্ডিতের হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রায় ১০০০ এক হাজার বৎসরে গড়ে এক ফুট পুরু ভূস্তর গঠিত হয়। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স হয় প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ কোটি বৎসর।

আচার্য্য হাক্সলি (Huxley) একটী দৃষ্টান্ত দিয়া পৃথিবীর বয়সের কতকটা আভাস প্রদান করিয়াছেন। কঠিন ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পর যখন ভূপৃষ্ঠ শীতল হইল তখন উহার উপরে বিরাট দেহ উদ্ভিদ সকল জন্মিল। কালক্রমে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ মহারণ্যে সমাচ্ছাদিত হইল। অতঃপর তাপক্ষয় হেতু পৃথিবীর দেহ সঙ্কুচিত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভূমি উন্নত হইয়া পর্ব্বতের সৃষ্টি হইল আর কোথাও ভূমি নিম্ন হওয়ায় সমুদ্রের উৎপত্তি হইল। মহাবনরাজি যখন সমুদ্র গর্ভে পরিণত হইল তখন চতুর্দ্দিক হইতে সুবৃহৎ নদ নদী সকল অবিশ্রান্ত মৃত্তিকারাশি আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আব-রণের উপর স্থাপন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র গর্ভ উন্নত হইয়া আবার সমতল ভূমিতে পরিণত হইল। তখন তাহার উপর আবার মহারণ্যের উৎপত্তি হইল। নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে এরূপে বারংবার বনরাজির উপর ভূস্তর এবং ভূস্তরের উপর বনরাজির উৎপত্তি হইতে লাগিল। উদ্ভিদ সকল দীর্ঘকাল মৃত্তিকা স্তরের নিম্নে থাকিলে পাথর কয়লায় পরিণত হয়। এই জন্য পৃথিবীর স্থানে স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে পাথর কয়লার স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়লার খনি খনন করিলে দেখা যায় যে ৫০।৬০ ফুট পুরু এক একটা কয়লার স্তর ৩৪ মাইল কি অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এক একস্থানে এইরূপ পুরু দুই তিন শত কয়লার স্তর উপর্য্যুপরি সজ্জিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এক ফুট কয়লার স্তর গঠিত হইতে পাঁচ শত বৎসরের কম লাগিবার সম্ভাবনা নাই। এই হিসাবে ৫০ ফুট পুরু তিন শতটী উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত কয়লার স্তর গঠিত হইতে প্রায় ৭৫ লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। পৃথিবীর জন্মের কোটি কোটি বৎসর পরে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কয়লার স্তর গঠিত হইবার পরও কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে পৃথিবীর বয়স ২০ কোটি বৎসরেরও বেশী বলিয়া অনুমান করেন তাহা অত্যধিক মনে হয় না।

গভীর পুকুর কিম্বা ইন্দারা খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় নানা বর্ণের মৃত্তিকা স্তরগুলি একটীর উপর আর একটী সজ্জিত রহিয়াছে। ভূগর্ভে মৃত্তিকা স্তরে সমাহিত নানা প্রকার জীবজন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে স্তরে যে সকল জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সেই স্তরেই উহারা বিচরণ করিয়া জীবন লীলার অবসান করিয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভাগে কোন জীব কঙ্কাল দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিলে উহা জল বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপের প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষয় হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু কোন জীব কঙ্কাল

মাটির নীচে চাপা পড়িলে প্রকৃতির বিধ্বংসী উপাদান সকল আর উহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। নৈসর্গিক কারণে সমুদ্র গর্ভ উন্নত হইলে মৃত্তিকার নিয়ে নানাপ্রকার স্থলজ ও জলজ প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। স্থলজ প্রাণীর মৃতদেহ নদ নদী সকল বহন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এই সকল স্থলজ প্রাণীর মৃতদেহ স্থলের নিকটেই সমুদ্র গর্ভে পতিত হয়। জলজ ও স্থলজ প্রাণীর কঙ্কালের উপর ধীরে ধীরে নদ নদী আনীত পলি মাটি পড়িতে থাকে। পলি মাটির নীচে জীবজন্তুর কঙ্কাল সমূহ লক্ষ লক্ষ বৎসর অবিকৃত থাকে। আমরা যেমন এল্‌বামের (album) এর ভিতর আত্মীয় স্বজনের "ফটো" রক্ষা করি তেমনি জননী ধরিত্রী ভূস্তরের মধ্যে মধ্যে আপন সন্তানের কঙ্কাল মূর্ত্তি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির কার্য্যে বেশ শৃঙ্খলা আছে। যে স্তর গঠনের সময় যে যে জীব জীবিত ছিল, সেই সকল জীবের কঙ্কাল সেই স্তরে রক্ষিত থাকে। সেই সকল জীব-কঙ্কাল দেখিয়া কোন্ সময়ে কোন্ পলিস্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ পুরাতন স্তরই নিয়ে থাকে এবং নূতন স্তর উপরে থাকে। কিন্তু ভূমিকম্প আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও উপরিস্থ স্তরের ক্ষয় ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে নিম্ন স্তরগুলি সময় সময় ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিলে জীব-কঙ্কালের অবস্থিতি দেখিয়া প্রাণীতত্ত্ববিদগণ স্তরের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন জীবের ক্রমবিকাশ হইতেছে। এক কালে যখন সমগ্র ভূভাগ জলমগ্ন ছিল, তখন সর্ব্বত্র অসংখ্য কীট জাতীয় জলজ প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তারপর শম্বুকাদি কঠিন খোসা বিশিষ্ট জলজ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। খোসা বিশিষ্ট জলজ প্রাণীর পুঞ্জীভূত অস্থি কোটি কোটি বৎসরে চুণ ও খড়িমাটির পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। শম্বুকাদির পর নানা জাতীয় মৎস ও সরীসৃপ জাতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদেরই বিবর্ত্তনের ফলে নানাবিধ স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন একটি স্তন্যপায়ী জীবের পরিণতি হইতে বানরজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। বানর হইতেই ক্রমবিকাশ ফলে নাকি উন্নত মানবের জন্ম হইয়াছে। কত কোটি বৎসরে ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে বানর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। বানর হইতে বহু কোটি বৎসরে মানুষের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। মানুষও লক্ষ লক্ষ বৎসর এক ভাবেই পৃথিবীতে বিরাজিত আছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন ১০ কোটি বৎসরের কমে কীটাণু হইতে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের উৎপত্তি হইতে পারে নাই। পৃথিবীর প্রথম স্তর ইহারও কোটি বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং ভূতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বৎসরের ন্যূনতো নয়ই বেশী হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

কোন কোন পণ্ডিত সমুদ্রের জলের লবণের পরিমাণ দ্বারা পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক কালে সমুদ্র-জল লবণ শূন্য ছিল। এখন সমুদ্র জলে প্রায় ১৪৪.০০০০০০.০০০.০০০ টন লবণ মিশ্রিত আছে। ২৭ মণে এক টন হয়। এই লবণ যদি সমুদ্র জল হইতে পৃথক করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দেওয়া যাইত তবে চারি শত ফিট পুরু একটী স্তর গঠিত হইত। নদ নদী সকল এই লবণ পর্ব্বত ও ভূমি হইতে নিয়া সমুদ্রে ফেলিয়াছে। ডাবলিন্ ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক জলি (Professor Joly) হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রতি বৎসর নদ নদী সকল ৬৫২৪ ঘন মাইল পরিমাণ জল সমুদ্রে বহন করিয়া নেয়। তিনি ১৯টী প্রধান নদীর জল পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্রগামী নদী সকল দ্বারা প্রতি বৎসর গড়ে মোট ১৬ কোটি টন লবণ সমুদ্রে নীত হয়। এই হিসাবে সমুদ্রজল লোণা হইতে নয় হইতে দশ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ ও প্রাণীতত্ত্ববিদগণের সহিত অধ্যাপক জলির হিসাবের অনেকটা ঐক্য হইয়াছে।

পদার্থবিদ পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(১) পৃথিবী এক কালে জ্বলন্ত বাষ্পাবস্থায় ছিল। দিন দিন তাপ ক্ষয় হেতু পৃথিবী পৃষ্ঠ শীতল হইয়া প্রাণীগণের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূগর্ভ এখনও অত্যুষ্ণ রহিয়াছে। লর্ড কেলভিন স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে দুই কোটি হইতে দশ কোটি বৎসর লাগিয়াছে।

(২) সূর্য্য অবিশ্রান্ত আকাশে তাপ বিকিরণ করিতেছে। তাপ বিকিরণ হেতু সূর্য্যের তাপও হ্রাস পাইতেছে। সূর্য্য হইতে কি পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হইতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে হ্রাস পাইতেছে এই অনুমান করিয়া অধ্যাপক টেইট (prof. Tait) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্য দুই কোটি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া পৃথিবীকে বর্ত্তমান হারে তাপ বিতরণ করিতে পারে না।

(৩) সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হয়। চন্দ্র পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহার আকর্ষণই অধিকতর প্রবল। পৃথিবী যখন নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে (rotate) তখন জোয়ারের স্ফীত জলরাশির সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হয়। চলন্ত গাড়ী কিম্বা সাইকেলের ব্রেক্ ধীরে ধীরে টানিলে যেমন উহার গতি মন্দীভূত হয় তেমনি জোয়ারের জলরাশি পৃথিবীর উপর ব্রেকের ন্যায় বাধা দেওয়াতে উহার আহ্নিক গতি হ্রাস পাইতেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মনে করেন যে পৃথিবী যে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে পূর্ব্বে ইহার ৪ গুণ বেগে আবর্ত্তন করিত। লর্ড কেলভিন্ বলেন পৃথিবী যদি দশ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে জমাট বাধিয়া গোল পিণ্ডে পরিণত হইত তবে দ্রুত ঘূর্ণন হেতু উহার মধ্যভাগ অধিকতর স্ফীত এবং মেরুদ্বয় অধিকতর চেপটা হইত। কারণ পৃথিবী তখন কাদার ন্যায় নরম ছিল।

রেডিয়াম (Radium) আবিষ্কারের পর পদার্থবিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে তাঁহাদের হিসাব সংশোধন করা আবশ্যক বোধ করিতেছেন। রেডিয়ামের তাপ বিকিরণ করিবার অসাধারণ শক্তি। রেডিয়ামের একটী অতি ক্ষুদ্র কণিকা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাপ বিকিরণ করিলেও উহার এক বিন্দুও কম লক্ষিত হয় না; রেডিয়াম সূর্য্যেও আছে পৃথিবীতেও আছে। রেডিয়াম সংশ্লিষ্ট তাপ বিকিরণশীল কতগুলি পদার্থ (Radio active substance) পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য ও পৃথিবী যে পরিমাণ তাপ বিকিরণ করিতেছে রেডিয়াম দ্বারা যে তাহার কতক ক্ষতিপূরণ হইতেছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। রেডিয়াম আবিষ্কারের পূর্ব্বে পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা যে ২। ৪ কোটি বৎসরেই পৃথিবী শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নয় বলিয়া এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন।

সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে প্রাপ্ত ইয়েনিয়াম সংশ্লিষ্ট কয়েকটী ধাতুর বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সকল ধাতুর বয়স ২৪ হইতে ১৩২ কোটি বৎসরের মধ্যে হইবে। এই হিসাবে যে পৃথিবীর বয়স ১৫০ কোটি বৎসরের চেয়েও বেশী হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিন দিন যতই অভিনব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে ততই জননী বসুন্ধরার বয়সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ধরিত্রী যে কত প্রাচীনা তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

অভিভাষণ।

আপনারা আমার দেশের মানুষ, দুঃখের বিষয় আমি দেশ দেখি নাই। বঙ্গদেশ দেখিবার পূর্ব্বে আমি বিদেশ দেখিতে গিয়াছিলাম। গত বৎসর আহ্বান আসিয়াছিল বিদেশ হইতে; আমি দেশকে জানি না। আমার উচিত ছিল যৌবনের কার্য্যকুশলতা ও উৎসাহ থাকিতে আমাকে একবার নিজের দেশকে চিনিয়া নেওয়া। আজ বার্দ্ধক্যের প্রাপ্ত সীমায় আসিলেও ভাল কাজ সকল সময়ই ভাল। যদি দয়া করিয়া কেহ আমাকে আহ্বান করেন। আজকাল আমি সেখানে যাই, কেন না এতে আমি নিজের দেশ ও দেশবাসীদের ভাল করিয়া জানার সুযোগ পাই। আমি বৃদ্ধ, যে সময়ে বয়স ছিল ও কষ্ট সহ্য করার শক্তি ছিল তখন ইহা করি নাই অথচ নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার পূর্ব্বে আমাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইয়াছে।

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম জেলা, এখানে অনেক বিখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের খ্যাতি বাংলাদেশ ও ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া আমি ময়মনসিংহের আর একটা দিক দেখাব। এখানে আসিয়া যে প্রাণ দেখিলাম, যে উৎসাহ দেখিলাম তাই আমি বলিতেছি আপনাদের আদর্শকে বড় করে দেখাতে হবে। ভগবান যাঁদের বেশী দান করেছেন তাঁদের কাছ থেকেই বেশী আশা করা যায়। সুতরাং ময়মনসিংহবাসীকে একটা বড় আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।

ময়মনসিংহ জেলাটা বড় হইলেও গত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে শিক্ষা বিষয়ে ময়মনসিংহের নাম কেবল একটা জেলার উপরে। বগুড়া জেলা শিক্ষা বিষয়ে বাংলার সর্ব্বনিম্ন স্থানে—তার উপরেই ময়মনসিংহ। হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ২৩ জন শিক্ষিত কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা অতি কম। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের গুরুতর দায়িত্ব আছে কারণ প্রতিবেশীরা উন্নত না হ'লে সকলকেই তার ফল ভোগ করতে হয়।

পৃথিবীতে অনেক স্বাধীন ও উন্নত দেশ আছে যাদের লোক সংখ্যা ময়মনসিংহ হইতে কম, কিন্তু তবু তাহারা স্বাধীন ও দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সর্ব্বাগ্রে আফগানিস্থানের কথা উল্লেখ করা যায়। আপনারা জানেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আফগানদের কেমন ভয় করেন ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী রাখার জন্য কেমন ব্যগ্র। অথচ এই আফগানিস্থানের লোক সংখ্যা মাত্র ৪৬ লক্ষ। এই ময়মনসিংহের লোক সংখ্যা হইতেও কম!

পৃথিবীর এক অংশ এসিয়া মহাদেশ, তাহার এক অংশ ভারতবর্ষ, তাহার এক অংশ বাংলা, তাহার এক একটী অংশ জেলা, এই ভাবে বিবেচনা করিলে আমাদিগকে নগণ্য স্থানের অধিবাসী বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি যে, অনেক স্বাধীন দেশের লোক সংখ্যা আমাদের জেলাগুলির সমান, জেলাগুলির চেয়েও কম, তাহা হইলে আমাদের এই আশা হইতে পারে যে তাহারা যখন শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, কৃতিত্বে এত বড়, তখন আমাদেরপক্ষেও মহত্ব ও কৃতিত্ব দুর্লভ নহে।

চিলি দক্ষিণ আমেরিকায় একটী ছোট দেশ, লোক সংখ্যা মোটে ৪২ লাখ, অথচ ইহাদের পুরুষনারী শতকরা ৬০ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আমাদের একটী জেলার চেয়েও কম লোকদের জন্য দুইটী সাধারণ ও দুইটী শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া নানা রকম বিদ্যালয় চারি হাজারের উপরে আছে। চিলির এই ৪২ লক্ষ লোকের জন্য ১৯২১ সালে সরকার দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন; আর বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৫ কোটী লোকের জন্য ১৯২৬ সালে মাত্র ১ কোটী ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এখানে সাপ্তাহিক কাগজ তিনখানা, মাসিক একখানা আর চিলিতে মাসিক পত্রিকা চলে ৯১১খানা ও সাপ্তাহিক ৬০০খানা এবং দৈনিকে সংখ্যাও কম নয়।

কয়েকটী স্বাধীন দেশের লোক সংখ্যা বলিতেছি—

আরমেনিয়া	২০ লক্ষ	লোক
বলিভিয়া	২৪ লক্ষ	,,
ডেনমার্ক	৩০ লক্ষ	,,
আয়র্লণ্ড	৪৩ লক্ষ	,,
সুইট্জলণ্ড	৪০ লক্ষ	,,

ইহার সবগুলিই ময়মনসিংহ হইতে ছোট। তবুও তারা স্বাধীন। লুক্সেম্বর্গ বলে একটী স্বাধীন দেশ আছে তাহার লোক সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার। বাংলার একটা বড় টাউনের লোক সংখ্যা হ'তেও কম অথচ তাহারা জগতে স্বাধীন জাতির অন্যতম। সুইট্জলণ্ডে সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লাইব্রেরী আছে ছয় হাজার এবং বহি আছে ৯৪ লক্ষ।

এরূপ বলা হয় যে বাংলার কৃষির জমি ছোট ছোট, এজন্য উন্নতি হয় না, কিন্তু ডেনমার্কে আইন করিয়া কৃষির জমি টুক্‌রা২ করিয়া দেওয়া হয়। ডেনমার্ক বাংলার মত কৃষি-প্রধান দেশ। এই কৃষি দ্বারা তাহারা দেশকে সম্পদশালী করিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার যারা তরুণ তাদের কর্ত্তব্য, লোক সংখ্যায় ময়মনসিংহ পৃথিবীর অন্য যে সব ভূখণ্ডের সমান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যে ময়মনসিংহকে ঐ সকল ভূখণ্ডের সমতুল্য করতে চেষ্টা করা।

আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমাদের যে সব কাজ করতে বাকী রয়েছে বাংলার তরুণেরা তা করবে। আমি অনেক দেশ দেখলাম আমার মনে হয় না যে অন্তর্নিহিত শক্তিতে বাংলার ছেলে-মেয়ে নিকৃষ্ট। আমি সমালোচনায় অনেকের মনে কষ্ট দেই কিন্তু আমার মনে দেশবাসী সকলের প্রতি আমার প্রীতি ও বিশ্বাস আছে।

কালিদাসের সেই প্রসিদ্ধ "জগতঃ পিতরৌ বন্দে" এই শ্লোকটীতে পিতরৌ পদ দ্বারা পিতা ও মাতা উভয়কে বুঝান হইয়াছে, সেইরূপ তরুণ শব্দ দ্বারা কেবল পুরুষ জাতিকে

লক্ষ্য করি না। মাতৃ জাতিরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা শক্তিরূপিনী জ্ঞানের শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারী, সুতরাং মাতৃ জাতিকে বাদ দিলে চলিবে কেন?

যাদের বয়স বেশী ও প্রাণটা নূতন, যাদের আধ্যাত্ম রাজ্যেও চির বসন্তের বাতাস বয়, যাহারা কখনও মনে বুড় হন না তাহাদিগকেও তরুণ বলা যায়।

ময়মনসিংহবাসীরা ময়মনসিংহের সমান ভূখণ্ড বা লোক সমষ্টির মত বড় একটা কিছু করবে তাহার দাবি আমি করি। এমন কিছু নাই যাহা অসম্ভব বা অসাধ্য। পুষ্পকরথ এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। যে দিন এই এরোপ্লেনরূপী পুষ্পকরথ হতে ভারতবাসীর পিঠের উপর বোমা পড়ে, অন্ততঃ পুষ্পকরথ যে কল্পনা নয় সেটা ভাল করেই সে দিন উপলব্ধি হইয়াছে।

"যুবৈব ধর্ম্মসীলঃস্যাৎ"। ইংরাজীতে আছে "Glory of a young man is his strength" যুবকদের শক্তিই তরুণ ধর্ম্মের লক্ষণ; গাছটা সুপোথিত করলে যেমন গাছটা ভাল হয়, বড় বাড়ী করতে গেলে যেমন ভিটটা পাকা করতে হয়. তেমন শক্তি সতেজ দেহ, শরীরই ধর্ম্ম সাধনের সহায়। রুগ্ন দুর্ব্বল জাতি বড় একটা কিছু করতে পারে না। তাই Herbert Spencer বলেছেন শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে "Good human animal" তৈয়ারী করা।

তরুণ যারা তাদের শরীর তাজা রাখতে হবে। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে ব্যায়াম ভাল বাতাস ঘরবাড়ী আহার বিহার ভাল চাই। আর চাই অব্যসন ও অবিলাসিতা। ঋষিরা এই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করেছিলেন। সংযত আহার বিহার চাই তার সঙ্গে আনন্দও চাই।

গ্রীসের ইতিহাসে স্পার্টা ও গ্রীস দেশের শিক্ষার দুটী স্বতন্ত্র ধারা ছিল স্পার্টাতে মানুষকে কঠিন শক্তিশালী করে তুলত আর আথেন্‌বাসীরা রেখে গেছে ললিত-কলা-শিল্প সৌন্দর্য্যের অমূল্য ইতিহাস।

আমাদের আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ বিকাশ। এমন আনন্দ চাই না যাতে মানুষকে অমানুষ করে। ও বিলাস মানুষকে মেকি করে।

আনন্দের ভিতর দিয়া শরীর যেমন রস গ্রহণ করে—ভাল সুস্বাদু খাদ্য যেমন সহজে পরিপাক হয় আনন্দের ভিতর দিয়া তেমনি আত্মা ও শক্তি লাভ করে।

ছেলেরা যাতে জ্ঞাতব্য বিষয়ে আনন্দ পায় তেমন শিক্ষা দিতে হবে। নিজের উপর বিশ্বাস নির্ভর চাই—সেটা কিন্তু দাম্ভিকতা বা আত্মম্ভরীতা নয়।

তরুণের আর একটা লক্ষণ হচ্ছে শ্রদ্ধাবান হওয়া "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং"। বিদ্রূপের ভাব বা অকালপক্কতার ভাব থাক্‌লে তার শিক্ষা লাভ হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি মাথা পাকা ছেলে আছে।

তরুণের আর একটী লক্ষণ, তাদের মৃত্যুর চিন্তা আসে না। এই অন্তর্নিহিত অমরত্বে বিশ্বাসই তরুণের লক্ষণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই তরুণ প্রচেষ্টা বা youth movement চলছে। যাদের মনটা তাজা তারাই তরুণ। জরা গ্রস্তদের কীর্ত্তি দেখতে চাও ত দেখবে হিংসা, গলা কাটাকাটি কে কারে মারবে, কি কারে জব্দ করবে।

তরুণদের নূতন কিছু করতে হবে। শিশু সব নূতন করে দেখে। শিশু কতবার পড়ছে তবুও দমে না; তাকে কোলে রাখা যায় না সে নেমে পা ফেলবে। শিশুর সব মন নিয়ে প্রাচীন সভ্যতাকে নূতন করে দেখতে হবে। পুরাতনকে পুরাতন বলে না দেখে নূতন করে দেখতে হবে। পুরাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রদ্ধার সমিত নূতন করে দেখতে হবে। কিন্তু নিজের চক্ষু নিজের জ্ঞান বাদ দিলে চলবে না। তরুণের আর একটী লক্ষণ Idealism। Fact কিন্তু truth নয়, Fact ক্রমশঃ লোপ পায় আর সত্যের ক্রমশঃ বিকাশ হয়। Idealism fact জিনিসটা সত্য।

পাশ্চাত্য লোকের fact দেখিয়ে যে বলে তোমরা দুর্ব্বল লোকেরা বা অসভ্য, সেটা fact হতে পারে সত্য নয়।

জ্ঞানের দ্বারা কি হওয়া উচিত তার উপাসনা করা তরুণের ধর্ম্ম।

মানসী মূর্ত্তিকে বাস্তব করা, তাকে রূপ দেওয়া তরুণের ধর্ম্ম। তরুণের ধর্ম্ম আশাশীলতা। আমরা নিরুপায় কোন উপায় নাই এটা কখনও ভাবতে পারি না। বাধা বিঘ্নকে পরাজয় করব, সব বিপদ বাঁধাকে লঙ্ঘন করতে পারব, এই আশা নিয়েই কাজ করতে হবে। মানুষের গৌরব মনুষ্যত্ব লাভ হয়—শক্তির বিকাশে বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করে।

তরুণের পঞ্চম লক্ষণ—অমরত্বে বিশ্বাস, তাদের মধ্যে চিরবসন্তের হাওয়া চলছে। যে আগুন কখনও নিবে না সে আগুন তাদের মধ্যে আছে। তরুণরা সে আগুনে ঝাঁপ দেয়, আত্মবিসর্জ্জন করে।

সেবা অমর, সেবার শক্তি অমর। যাদের মধ্যে তরুণতা আছে তাদের তরুণতাকে নমস্কার, আর যিনি চির তরুণতার অনন্ত উৎস, সেই চিরন্তন তরুণ পুরুষকে নমস্কার।*

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী †

বাঙলার রবি, তুমি প্রাচ্যের গর্ব্ব!
উদ্ধত জাতিদেরে করিয়াছ খর্ব্ব!
সঙ্গীতে কাব্যে সবে তোমা ভাব্‌বে!
ভাব ভাষা ছন্দে করেছ যা সৃষ্টি,
বিশ্বের লোক তা'তে বিস্ময়-দৃষ্টি!

আজি তব গৌরবে সারা দেশ ফুল্ল!
হয় নাই, হবে কি গো কেহ তব তুল্য?
প্রতিভার স্পর্শে প্রাণ জাগে হর্ষে!
তাই আজি ছুটে' আসে নরনারী লক্ষ!
কারো মুখে কথা নাই, কাঁপে সুখে বক্ষ!

পশ্চিমা কত জাতি মাতি' মহারঙ্গে,
ধেয়ে আসে একে একে পরাধীন বঙ্গে!
করি' জ্ঞান লক্ষ্য যাচে আজি সখ্য;
ভক্ষক ও ভক্ষ্য ভুলে, হয় শিষ্য!
হেরিলাম অপরূপ অদ্ভুত দৃশ্য!

আজি মোরা নবীনেরা তোমারেই বন্দি!
পুজিবারে পচা মত, আঁটো নি তো ফন্দি!

তুমি চির পান্থ ঘুচায়েছ ধ্বান্ত!
মাতায়েছ পথে পথে রূপ রস গন্ধে!
হেরিয়াছে কত শোভা কত শত অন্ধে!

দেখায়েছ অরূপেরে, বিন্দুতে সিন্ধু!
শত শত কচি মুখে পুলকিত ইন্দু!
তব সুর-ভঙ্গে অসীমের সঙ্গে
মেলামেশা করি' মোরা হইয়াছি উচ্চ।
গভীর গুণ্ডারে করিয়াছি তুচ্ছ!

সমাজের স্বদেশের সব বাধা লঙ্ঘি'
মৈত্রীর মিতা মোরা, সাম্যের সঙ্গী!
সত্যই পূজ্য, ধন তাই গুহ্য,
মৃত্যুরে জয়-করা শাশ্বত চিত্ত
লভিয়াছি, পেয়ে তব গুপ্ত সে বিত্ত!

তব যুগে জন্মানো সে-ই মহাভাগ্যি!
সঙ্গের সুখ তবু মোটে নহে মাগ্‌গি!
থাকো যদি হর্ম্ম্যে, লভি মোরা মর্ম্মে;
ধরা দাও হাতে-নাতে হৃদয়ের ধর্ম্মে!
চির-যুবা, খাটো সাথে জগতের কর্ম্মে!

তবু তোমা চিনিল না দেশ-জনসঙ্ঘ!
হিংসার জলে আজো অনেকের অঙ্গ!
রহি' তবু মূর্দ্ধে বিচরিছ ঊর্দ্ধে.
করে শুধু কোলাহল কত মৃত কঙ্ক!
রবি দিল পেচকেরে দুঃখ কি অল্প?

বাঙালীর গৌরব! ওগো কবি মস্ত
আজীবন নমি তোমা জোড় করি' হস্ত!
তব হৃদি-দীপ্ত দেহে বল তৃপ্তি;
যাচি' তাই দীর্ঘায়ু, জীবনের স্বর্গ!
বাঙলাকে করো তুমি বিশ্বের স্বর্গ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

* ময়মনসিংহ যুবক সম্মিলনী সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

† ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রের জন্মোৎসবে ময়মনসিংহ-টাউন হলে পঠিত।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

(৫)

অল্পদিন হইল বাঙ্গালের ভাষায় বাঙ্গালের লিখিত একখানি 'নিমাই সন্ন্যাস" যাত্রার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুথি খানায় সন তারিখ কিছুই নাই, কাহার রচনা তাহাও একবারে নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাষা ও রচনার রীতিতে: বুঝা যায় ইহা খুবই প্রাচীন এবং টাঙ্গাইল মহকুমার কোন বাঙ্গাল কবির রচিত।

টাঙ্গাইল মহকুমার 'বৈষ্ণবপাড়া' একখানি পুরাতন গ্রাম। এই গ্রামের 'বৈষ্ণব' উপাধিধারী দাস বংশীয় কায়স্থগণ, পুরুষানুক্রমে গুরুতা ব্যবসায়ী। ইঁহাদের গৃহদেবতার নাম "শ্যামরায়"। এই শ্যামরায় বিগ্রহ লইয়া এই বংশের আদিপুরুষ, যাদবেন্দ্র রায়, রাঢ় হইতে বঙ্গে আগমন করে এবং আটীয়া পরগণার পাঠান জমিদারদিগের নিকট হইতে নিষ্কর ও দেবত্র ভূমি পাইয়া ভাদগ্রাম নামক সুবৃহৎ গ্রামের একাংশে বসতি স্থাপন করেন। বৈষ্ণব গুরু দিগের 'গোস্বামী', 'মহান্ত', 'বৈষ্ণব' ও 'অধিকারী' উপাধি হইয়া থাকে। যাদবেন্দ্র রায় এবং তদ্বংশীয়গণ 'বৈষ্ণব' উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বসতি বলিয়া গ্রাম খানি 'বৈষ্ণবপাড়া' নামে পরিচিত হইয়া উঠে। গুরুতা ব্যবসায়ী বলিয়া এই দাসবৈষ্ণব মহাশয়দিগের অনেকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশের ৺গতি গোবিন্দ বৈষ্ণব, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, এই মহকুমার তিনিই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একমাত্র পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিল। সেই টোলে ব্যাকরণ ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা হইত। গতিগোবিন্দের টোলে পড়িয়া অনেকে বিখ্যাত কবিরাজ হইয়াছেন। নববিধান সমাজের "কবিরাজ মহাশয়" (৺কালীশঙ্কর কবিরাজ) গতিগোবিন্দের ছাত্র। এই বংশের ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। সকলের শ্রদ্ধাস্পদ এই চিরকুমার আচার্য্য মহাশয়, অল্পদিন হইল ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গতিগোবিন্দের ছোট ভ্রাতা গুরুগোবিন্দ, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বহু শাস্ত্রজ্ঞতার জন্য মুক্তাগাছা প্রভৃতি হিন্দু জমিদারদিগের গৃহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। ইনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ ও ছিলেন। প্রবাদ, এই গুরুগোবিন্দ বৈষ্ণবই, "নিমাই সন্ন্যাস" রচয়িতা। পুথি খানি বৈষ্ণব মহাশয় দিগের গৃহে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এ প্রবাদ সত্য বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, গুরুগোবিন্দ বা অন্য যিনিই ইহার প্রণেতা হউন, তিনি যে এই মহকুমারই লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সরল প্রাণ স্বভাব কবি আপনার কথ্য ভাষাতে গ্রন্থ খানি লিখিয়া টাঙ্গাইল মহকুমার সে কালের ভাষার একটি অবিনশ্বর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

নিমাই সন্ন্যাসের আরম্ভ এইরূপ:—

"জে জন ভকত হও সোন দিয়া মন।
জেরূপে হইলা নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ॥
আনন্দে সচীর দ্বারে নানা কেলি করে।
ভক্তগণ সঙ্গে গৌর নানা সাস্ত্র পড়ে॥
ভাগবত আদি সতেক পুরাণ।
পাঠাইলা সকল গউর গুণমান॥
ভাবিলা সংসার ধর্ম্ম অনার্থ কারণ।
কি মতে করিব ত্যাগ ভাবে মনে মন॥
সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু মনে হবিলাস।
সচীর কারণে গউর না করে প্রকাস॥
আর দিন গঙ্গাস্নানে গেলা নদীতটে।
ভারতীর সঙ্গে দেখা হৈল সেই ঘাটে॥
ভারতী বোলেন প্রভু সব পাশরিলা।
কলির জীব নিস্তারিতে অবতীর্ণ হৈলা॥
প্রভু বোলেন ভারতী করহ অঙ্গিকার।
তুমি জেহি আজ্ঞা কর উচিত আমার॥
ভারতী বোলেন প্রভু সোনহ বচন।
মস্তক মুড়াইয়া কর সন্ন্যাস গ্রহণ॥
গউর বোলে সন্ন্যাস তবে মায় নাহি জানে।
তোমার সহিত জাব রাখির নিগমে॥

ভারতীর সঙ্গে গউর কহিলা সত্যবানী।
নিকটে থাকিয়া তাহা সুনিল মাল্যানী॥
গঙ্গাস্নান করি গউর আসিলেন ঘরে।
সদা মন উচাটন হরি হরি বোলে॥"

দিশা—

গৌর হরি বল মুখে।
ব্রজে জাবো কোন রূপে॥
আসিলাম বানিজ্য আসে।
ঠেইকা রইলাম মিছা পাশে॥

পদ—

একদিন শচীরাণী গৃহকর্ম্ম করে।
হেন কালে মালিআনী আসিলা সত্তরে॥
মালিআনী বোলে শচী সুনিয়াছ আর।
তোমার গৌরাঙ্গচান্দ ছারিবে সংসার॥
আমি গঙ্গাতীরে যখন গিয়াছিলাম স্নানে।
ইকথা সুনিলাম আমি গৌরাঙ্গ বদনে॥

তৎকথা—

হেনকালে গৌরাঙ্গচান্দ রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন অহে ভারতী আমার ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে। আমি নিতান্ত ব্রেজের পথে গমন করিব। আমাকে সন্ন্যাস দিবা গ

দিশা—

ইকথা ভারতী সনে।
সুনিয়াছি শ্রবণে॥
শুনিয়া মালি আনীর কথা।
সচির মনে লাগল বেথা॥

তৎকথা—

এতশুনি সচিমাতা রোদন করিতেছেন। অ নদিয়াবাসি হে আমার গৌরাঙ্গের ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে। অ নদিয়াবাসি হে।

দিশা—

আমি হেন অনুমান করি।
নৈদা ছারিহে গৌর হরি॥
গউর মোরে ছাইরা গেলে।
কাঙ্গাল হব একই কালে॥

তৎকথা—

গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া কহিতেছেন। অমনি দুইঠা নেত্রের জলধারা পতন হৈয়াছে।

দিশা—

মা বলিয়া কোলে চড়।
তাপিত আনি শীতল কর॥
নৈদা ছাইরা জাবা তুমি।
অনাথিনী হমু আমি॥

তৎকথা—

তখন গৌরাঙ্গ অতি কাতর হৈয়া কহিতেছেন। আর সচীমা গ রোদন কৈরনা গ। অ সচীমা গ আমার জৈন্যে রোদন কৈর না গ। আমাদ্দিগের ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে। আমি ব্রেজের পথে গমন করিব।

দিশা—

আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
ব্রজনাথ যেন দয়া করে॥

তৎকথা—

তখন সচীমাতা কহিতেছেন তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল বিশ্বরূপ নাম। সেহ মোরে ছাইরা গেল হৈয়া অতি বাম।

দিশা—

অহি ভয় মনেতে পড়ে।
স্বপ্নে জেন হারাই তোরে॥
জিয়তে পুত্রে ছাড়ে জারে।
সে কেননা জিয়তে মরে॥

তৎকথা—

তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন। অহে সচীমাগ আমি তোমাক্ ছারিব না গ।

এইরূপ "পদ", "দিশা" ও "কথা"য় পালাটি রচিত। পদ ও দিশা যে গান, তাহা না বলিলেও চলে। 'কথা' গদ্য হইলেও গেয়। গদ্য, কিরূপে গান করা যায়, তাহা যাঁহারা স্বপ্নবিলাস যাত্রার "সুরের কথা" অথবা কথক ঠাকুরদিগের রাগিণী-বদ্ধ বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার কিছু নাই। যাঁহারা উহা শুনেন নাই বা শুনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহাই মাত্র বলা যায় যে, গদ্য ও গান করা যাইতে পারে।

'পদ' 'দিশা' ও 'কথা' এ তিনই গান হইলেও পদ ও দিশায় তাল আছে, কথায় তাল নাই কেবলই 'সুর'। অনেকগুলি কথাই যাত্রার দলের সূত্রধার বা অধিকারীর

ময়মনসিংহ যুবক-সম্মিলনীর সভাপতি ও কর্ম্মিবৃন্দ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উক্তি। নূতন পাত্রের অবতারণার সময়, তাহার পরিচয় দিতে এবং ঘটনার শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত কিছু বর্ণনা করিতে অধিকারীকে 'কথা' বলিতে হয়। পাত্রেরাও আবশ্যক মত 'কথা' বলিয়া থাকেন। পদ ও দিশায় যাহা ব্যক্ত হয় নাই, "তৎকথা"য় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

নিমাই সন্ন্যাসের প্রথম দৃশ্য গঙ্গাতীরে ভারতীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎ, নিমাই ও শচীর কথোপকথন এবং শচীর নিকট নিমাইর বিদায় গ্রহণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট নিমাইর বিদায় গ্রহণ। এ দৃশ্য বড় করুণ।

তৃতীয় দৃশ্য—জাহ্নবীতীরে ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ।

চতুর্থ দৃশ্য—ভিক্ষা। সন্ন্যাসী হইলেই ভিক্ষা করিতে হয়। কাজেই গুরুর আজ্ঞায় দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া নবীন গৌর সন্ন্যাসী নগরে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন :—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণ বলি ফিরে ঘরে ঘরে।
নবীন সন্ন্যাসী আমি ভিক্ষা দেও মোরে॥

কিন্তু নগরের লোক ভিক্ষা দিবে কি,—

কণ্টক নগরের লোক প্রভুকে দেখিয়া।
রোদন কর এ সবে চান্দ মুখ চাইয়া॥

নিমাই সন্ন্যাসের পঞ্চম দৃশ্য—অদ্বৈতগৃহে সম্মেলন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নিমাই ব্রজে যাইবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান রহিল না দ্রুতপদে বৃন্দাবন-অভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক হইলেন, উন্মত্ত নিমাই, নিত্যানন্দের পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনের পথে না যাইয়া কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে ভুলাইয়া নিমাইকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে লইয়া আসিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া উন্মত্ত সন্ন্যাসীর বাহ্যজ্ঞান হইল, বুঝিলেন ছলনা করিয়া নিত্যানন্দ, তাঁহাকে ব্রজধামে না নিয়া শান্তিপুরে আনিয়াছেন। চৈতন্য নিতাইকে এ ছলনার জন্য প্রেম ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ নিমন্ত্রণ করিলেন। চৈতন্য সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন মহাআড়ম্বরে অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী রন্ধন আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে অদ্বৈত নবদ্বীপে শচী দেবীর নিকট নিমাইর আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া শচীমাতা বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া শান্তিপুরে আসিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী-দর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আসিতে পারিলেন না।

ভোজনের পরে মাতা পুত্রে দেখা হইল। নিমাই কান্দিতে কান্দিতে শচীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শচী, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, অশ্রুজলে স্নান করাইলেন কিন্তু বুক ফাটিয়া গেলেও "আবার দেখা দিও'—বলিয়া বিদায় দিতে হইল। এই বিদায়ের করুণ দৃশ্য শ্রোতা ও বক্তার অশ্রুজলে পূত। নিমাই সন্ন্যাসের পঞ্চম দৃশ্য বড়ই পবিত্র। ভাগ্যবান্ শ্রোতারা ততোঽধিক ভাগ্যবান্ ভক্ত অধিকারীর মুখে এই করুণ রসের কথা শুনিয়া করুণ অভিনয় দেখিয়া পবিত্র হইতেন। এখন সে অভিনেতা এবং সে বক্তাও নাই, তেমন তদ্‌গতচিত্ত শ্রোতাও নাই।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, বিদ্যাবিনোদ।

রামগতির টপ্পা।

বিগত শ্রাবণ মাসের সৌরভে রামগতির টপ্পা শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। এই গুলি একটু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া কেহ প্রকাশ করিলে সমগ্র ময়মনসিংহবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর সংগ্রহকে শিক্ষিত সমাজ যতই অবজ্ঞার চক্ষে দেখুন না কেন এ সব চেষ্টা তাঁহাদের কাছে যতই কেন না অকিঞ্চিৎকর হউক আমরা ইহাকে সফল চেষ্টাই বলিব।

আজ কবি রামগতি বাঁচিয়া নাই তিনি তাঁহার অনন্ত সাধারণ কবি প্রতিভা নিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সুমধুর টপ্পাগুলি মানুষের মুখে মুখে আজও চলিয়া আসিতেছে একদিন এমন এক কঠিন স্তর আসিয়া মুখের উপর আবরণ টানিয়া দিবে, সহস্র চেষ্টায়ও তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না হয়ত এই অল্পদিন মধ্যেই সেদিন ঘনাইয়া আসিতেছে। দেশবন্ধুগণ সে গুলি সংগ্রহ করিয়া কবির স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে অঞ্জলি দিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালাগণের টপ্পা পাঁচালী পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ময়মনসিংহ তাঁহার দাওয়ায় বা

নিধু বাবুর জন্ত কতটুক চেষ্টা করিয়াছেন বলিতে পারি না ময়মনসিংহবাসীকে তাঁহাদের এই প্রবল উপেক্ষার জন্ত হয় একদিন অনুতাপ করিতে হইবে। আলস্ত অথবা উপেক্ষা বশতঃই হউক এরূপ নিশ্চেষ্টতাকে আত্মহত্যা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ময়মনসিংহের ভাষা সাহিত্যের একখানা সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস লিখিতে হইলে এই নীরক্ষর রামগতিকে বাদ দেওয়া চলিবে না। হেলায় রত্ন হারাইলে শেষে আমরা খুঁজিয়া পাইব কোথায়?

সৌরভে এই টপ্পাগুলি ধারাবাহিক বাহির হইলে হয়ত দেখাদেখি বহু লোকের সংগ্রহে আগ্রহ জন্মিতে পারে। আমরা জানি ৺রামগতির টপ্পাগুলি নাকি কবি শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয় ইচ্ছা করিলে বহুল পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি আজকাল অন্তিমত প্রায়, রোগশয্যায় শয়ন করিয়া শেষ হরিধ্বনি শুনিবার প্রতীক্ষায় আছেন। সংগ্রহকারীগণ তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিলে অনেক পরিমাণে তাহা চয়ন করিতে পারেন। কবির অন্তিমত অশ্রুজল ধৌত হইয়া সে গুলি হয়ত আরও পবিত্রতর রূপেই আমাদের বাণীপূজার মন্দিরে স্থান পাইতে পারে।

সে অনেক দিনের কথা মনে হয় সৌরভে কবি রামগতি সম্বন্ধে আমি দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহার একটি (মালীর যোগান) বিগত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

অন্যটি ছিল ময়মনসিংহের দাশুরায় ময়মনসিংহের দাশুরায় বাহির হইলে কয়েকজন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন কবি রামগতিকে দাশুরায় না বলিয়া নিধুবাবু বলা সঙ্গত কারণ টপ্পা রচনাই রামগতির ওস্তাদি। যাহা হউক উপমায় যে রামগতি দাশুরায়ের সমতুল্য আমরা তাহা সৌরভে তুলিয়া দেখাইয়াছি।

যেমন সুগৃহী আর সবিতা
সুরভী আর সুমাতা
কুলের কন্যা কমলে
সৎপুত্র আর বেলফুলে।

একমাত্র দাশুরায় ছাড়া এরূপ উপমা আর পাওয়া যায় না।

টপ্পাগুলির অধিকাংশই অশ্লীল কিন্তু এই অশ্লীলতার জন্ত আমরা কবিকে ততটা দায়ী করিব না যতটা দায়ী সমাজ। পরমুখাপেক্ষী কবিকে অনেক সময় তার আশ্রয়দাতা গণের মুখের পানে চাহিয়া চলিতে হইত। দেশকাল পাত্র যাহা চায় কবি তাহাই সৃষ্টি করিয়া দেখান এই পরমুখাপেক্ষিতার জন্য রায় গুণাকরের জগজ্জয়ী প্রতিভা অতটা খাটো হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়াও আজ তিনি অধোমুখে— আজ তিনি অশ্লীলতার কবি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র ততটা দায়ী নাও হইতে পারেন—যতটা দায়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা তাহার সভাসদ।

কবিত্ব যাঁহাদের প্রাণের জিনিষ তাঁহারা অশ্লীলতার দিক্‌টা ততটা চাহিয়া দেখেন না। তাঁহারা দেখেন শুধু ভাব পদার্থটিকে, কারণ ভাবই ভাষার প্রাণ। কবিতা যতই সুরুচি পূর্ণ হউক না কেন তাহাতে যদি ভাব পদার্থ বিদ্যমান না থাকে তবে তাহা মৃতদেহের মত শ্মশানের উপযোগী মাত্র। আর এই শ্রেণীর মুন্সিয়ানা টুকু বিদ্যমান থাকিলে হোক তা অশ্লীল, আমরাত মনে করি প্রাণময় নগ্ন সৌন্দর্য্যের মত তাহা বুকে স্থান দিবারই উপযুক্ত। এই ভরসায় আজ কবি রামগতির কয়েকটি টপ্পা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রতিদ্বন্দ্বী রামকানাই সরকার জাতিতে যুগী। কবি রামগতি টপ্পার গাহিলেন।

"যুগী কখন হিন্দু নয় সে সন্দে কি আছে
হইল মহারাণীর আমলে
মিলি সব যোগী দলে,
দরখাস্ত দেয় সাহেবের কাছে,
পাচশ টাকা নজর দিয়ে যুগী পোড়ার সনদ লয়
হইল না যোগী পোড়া দেশ ভরা আছে পরিচয়,
সুথার পাড়ার রাম দয়াল
কাট্যা দিল চিতাশাল
আগুন দিতে কয়
গইর দিয়া যুগী পইড়া গেল
আর কি যুগী পোড়া হয়॥ ইত্যাদি

পরাণ সরকার জাতিতে কর্ম্মকার কবি তাহার জন্য টপ্পা বাধিলেন—ঃ

মাইয়া তা ভবানী তা ভুইন দেতা দেন্তা
দেখলাম তাদের কার্য্যতা

জগতে বাক্ত ও কথা
লোহার কামরায় গরুর চামড়ায় তা
নিয়ে পাও দিয়ে তা
মারছে উক্কা
বাঁশের চূলায় বাতাস বয়
কামারের মরা, হয় না পোড়া, আধাপোড়া রয়
অন্য বস্তু তেমনি প্রায়
কিছু পোড়া গেলে পড়ে কামার পোড়াই কয়
কামার অৰ্দ্ধেক খানি পুইড়া গেলে
মাটীর নীচে গাইরা থয় ইত্যাদি *

আজ এই জাতীয় ভেদ বিরোধের দিমে আমি পাঠকবর্গের নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিতেছি আমি সংগ্রহকারী মাত্র, কবি রামগতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দী রামু সরকার। রামু জাতিতে মালী। কোনও এক বিশিষ্ট আসরে রামু একখণ্ড শাল পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহা গায়ে পড়িয়া রামু আসরে নামিলে রামগতি টপ্পা বাঁধিলেন

"সব ইংরাজে যুক্তি করে করছে কলের ঘর
কাপড় সস্তা হইল সংপ্রতি,
দশ আনা পাইড়ের ধুতি,
চৌদ্দ আনা ঢাকাইয়া চাদর,
রাজার সঙ্গে নাই তুলনা
দশ টাকা শালের জোরা,
কলিতে কাপড়ের মান মারছে মালীরা।
যত আছে ভদ্রলোক
তারা পিন্ধে নয়ানসুখ
শিমলাই পিন্ধে বিষয়ী যারা
ভাগা ভাগ কাপড় পিন্ধে আধা গইয়া ভদ্রেরা
কলিতে কাপড়ের মান ....

তদানিন্তন আঠারবাড়ীর জমিদার সরকারে ৺কৃষ্ণদাস চৌধুরী ছিলেন নায়েব। দেওয়ান ছিলেন ৺মহিমবাবুর শ্বশুর। নায়েব মহাশয়ের ফরমায়েস মত কবি মহিমবাবুর শ্বশুরের স্মৃতে উহা বাঁধিয়া গাহিলেন।

মহিমবাবুর শ্বশুর বলি বলতে করি ডর,
দেখ্‌লাম আইসে
মনের হরিষে
নৃত্য গীত প্রেমরসে মত্ত অতিশয়,
চাইয়া শশীমণির বদন পানে
চক্ষে চক্ষে ইসারা,
দান করগো শশীমনি তর পাক্‌না আধুরা
দেইখে তোমার চাঁদ বদন
কেমন কেমন করে মন
না যায় পাশুরা
বাবু ফক্‌ণা ঘরে শুইয়া থাকেন
বালিশ টানেন রাইত ভরা
দান করগো........................

অতঃপর দেওয়ানজির ফরমায়েস পড়িয়া নায়েব কৃষ্ণদাস চৌধুরীর নামে টপ্পা বাঁধিলেন।

চন্দ্রশেখর নায়েববাবুর বলি সুখ্যাতি
তিনি ছিলেন চৌধুরী হইলেন মজুমদার
বর্ণনা কি করব আর
আমি লেংড়া রামগতি,
শ্বশুর বাড়ীর গাই পাইয়াছেন
শিং ভাঙ্গা তার চোখ কানা
লোকেতে শাশুরিয়া বইলে করে ঘোষণা
যেমন আত্ম তত্ত্ব পাশরিয়া
রাম হইয়াছেন শাশুরিয়া
জানে দশ জনা
তেমনি নায়েববাবু দখল করলেন
গৌরমজ্জারের মালখানা *

উল্লিখিত গানের টিপ্পনী এইরূপ। নায়েব মহাশয় ভাগ্যগুণে শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি (মর শাশুড়ী) লাভ করিয়াছিলেন।

---

* কেহ ইহার প্রত্যুত্তরগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সাগ্রহে মুদ্রিত হইবে।

* কবি রামগতি সম্বন্ধে ভিন্ন পত্রিকায় আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতেও এই টপ্পাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে শশীমণি মহিমবাবুর শাশুড়ীর নাম, আমাকে যে একপ পরিচয় দিয়াছিল সে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। এক্ষণে বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম তা নয়, শশীমণি একজন প্রসিদ্ধ ঝুমুরওয়ালী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মারাত্মক ভুল সংশোধন জন্য এই কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

তাঁহার শ্বশুরের নাম গৌর মজুমদার তাই গৌর মন্দারের মালখানা দখলের কথা হইতেছে "আর ছিলেন চৌধুরী হলেন মজুমদার" ইহা বুঝান অনাবশ্যক। তবে গাভীর কথা শিং ভাঙ্গা অর্থে বিধবা। নায়েব মহাশয়ের শ্বশুর তখন স্বর্গে। চোখ একটি নাকি তাঁহার (নায়েব মহাশয়ের শাশুড়ীর) সত্যই কানা ছিল সুতরাং শ্বশুরবাড়ীর গাইটি কে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সে কালের সমজদার-গণকে ধন্যবাদ, যে এই অম্ল মধুর রস তাঁহারা অকপটে পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

আর একটি টপ্পা তারকেশ্বরের ব্যাপার নিয়া। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গয়ার পাণ্ডা হাতে দণ্ড, পাপীর দণ্ড সংসারে
আমি ভ্রমণ করি সর্ব্বদায়,
দেখবে বলে আজ তোমায়,
উদয় হইলাম তারকেশ্বরে,
ঠাকুর বাড়ীর ঠাকুর তুমি,
পায়ে বেরী কোন ফেরে,
মোহান্ত ঠাকুর—
কথা জান্‌তে চাই সুধাই তোমারে,
লোহার বেড়ী সোনার পায়,
কে ঘটালো এমন দায়,
ভাবছি অন্তরে।
বুঝি পূজা থুইয়া
মজা পাইয়া সিদ কাইটাছ কার ঘরে
মোহান্ত ঠাকুর.......... ....

নবীন এলোকেশীর ব্যাপার নিয়া মোহান্ত হইয়াছিলেন রামু মালী, রামগতি পাল্লায় তাঁহার টপ্পাটি এইরূপ দিয়াছিলেন।

রামু মালীকে কবি আর একটি টপ্পা দিয়াছিলেন যথা

"যেমন জাজের নকল হয় ডুঙ্গা
বোতলের নকল চুঙ্গা
জুতার মুখ তলি;
ঘোড়ার নকল গাধা বটে,
বাঘের নকল ফেউয়ালী,
কবিতে তেমনি নকল রামচান মালী।

ময়মনসিংহের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্যকে রামগতি এক টপ্পা দিয়াছিলেন।

"মোক্তারীতে হইয়া ফেল,
মাথায় দেয় কেরোসিন্‌ তেল্‌,
কবি গাইত কয়
হুতুম পুইড়া খাইত যদি কোকিল হইত পরাজয়,
বাংলাতে সরকার হইয়াছে আচার্য্য বিজয়।

বিজয়নারায়ণের অপরাধ তিনি কোকিল কণ্ঠ—রামগতির কণ্ঠস্বর তেমন উচ্চ ছিল না; শ্লেষ করিয়া কবি তাই এই টপ্পাটি গাহিয়াছিলেন। উপসংহারে আবার আমরা দেবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি আশাকরি তিনি এই শ্রেণীর লুপ্তরত্ন উদ্ধারে বরাবর সচেষ্ট থাকিবেন।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

সংগ্রহ।

* * * * *

সেকালের ইতালি ও একালের ভারত।

১৮৬০-৬৫ সন। ইতালির তখনকার অবস্থা কতকটা যেন আজকালকার ভারতবর্ষের অনুরূপই ছিল। শিল্প—বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষালাভের কোনো ব্যবস্থাই সেকালে ছিল না। এদেশে যেমন আজকাল মোটা মোটা খরচায় এক একটা ডিপার্টমেণ্ট অব্‌ অ্যাগ্রিকালচার (কৃষি-দপ্তর) ইণ্ডাষ্ট্রিস বিল্ডিংস (শিল্পভবন) প্রভৃতি পোষা হচ্ছে (এগুলির দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে দেশের কাজ হোক বা না হোক সেইরূপ ইতালিতেও সেকালে ঐ ধরণের কতকগুলি কেতা-দুরস্ত অকেজো কৃষি শিল্প দপ্তর সরকার কর্ত্তৃক পোষা হইত। তখনকার দিনে শিল্পব্যবসা ও বাণিজ্যের দিকে লোকের ততটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় নাই। শিল্প-শিক্ষা তখনকার দিনে মামুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করাও সহজ সাধ্য ছিল না। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল শিল্প ব্যবসা কখন ইস্কুল কলেজে পড়ে শিক্ষালাভ হয় না। যেমন এদেশের অনেক চাষী ও ব্যবসায়ী বলে থাকে চাষবাস ব্যবসা আবার যদি ইস্কুলে পড়ে শিখিতে হয় তবেই হয়েছে! যার যে ব্যবসা তার পক্ষে সেইটাই খাটে। কামারের ছেলে কোনদিন কুমোর হয়ে হাঁড়ি গড়তে যাবে না বা জোলা

কোন দিন মন্ত্রীগিরি পাবে না। যার যার বাপদাদার ব্যবসা তার তার থাকবে।" ইতালির তিনদিকে সমুদ্র। দেশটার বড় বড় বিখ্যাত সহর সবগুলিই এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর। ব্যবসায়ী ইতালীয়ানরা সকলের আগে ব্যবসা বাণিজ্যের বিদ্যালয়ের অভাব উপলব্ধি করেন।

ইতালিয়ান অধ্যাপক লুৎসাত্তি।

মামুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহিরে এই ধরণের ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ স্থাপনের চিন্তা সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক লুৎসাত্তির মাথায় খেলে। তিনি তখন একজন উদীয়মান ছোকরা ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত। পরে ইতালির সমবায় আন্দোলনে ইনি খুব নাম করে ফেলেছেন।

ইনি সেকালে ইয়োরোপের ফিনান্সের একজন প্রধানতম অথরিটি ছিলেন। দেশের আর্থিক জাগরণের পক্ষে ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ যে খুব দরকারী এই মতটা সর্ব্ব প্রথম ইনিই দেশের মধ্যে প্রচার করেন। গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়েছে।

ভেনিসের বাণিজ্য-বিদ্যালয়।

ভেনিস তখন ইতালির সব চাইতে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। ভেনিসের মত সহরে একটা ব্যবসা বাণিজ্যের বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং ইস্কুলের একটা মোসাবিদা প্রস্তুত করে ফেলেন। ভেনিসের নগর-সভা (মিউনিসিপ্যালিটি) ও বাণিজ্য সভা (চেম্বার অব কমার্স) এবং সরকার এই মহদনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মতি প্রদান করেন। ভেনিসের এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদে এই ইস্কুল স্থাপন করবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনুমতি করেন। এই কাজের ভার দেওয়া হয় সেনেটার ফ্রান্সিস্কো ফেরেরার উপর। ইনি একজন সিভিলিয়ান— তাঁহার সময়কার ইতালির শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞান পণ্ডিত। ১৮৬৮ সনে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়।

* * * * *

বাণিজ্য-কলেজের অধ্যাপক।

কেউ মস্তবড় ব্যবসায়ী, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার। এইরূপে সমাজের বিভিন্ন বিভাগের লোকের সাধনা নিযুক্ত আছে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায়।

* * * * *

জেনোআ বনাম ভেনিস।

জেনোআ ইতালির অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর। এ সহরের লোকের অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যতরণী বাঁধা থাকে জেনোআর ঘাটে। অতীতের এই বাণিজ্য কেন্দ্র, জেনোআ নগরের অধিবাসীরা বুঝিতে পেরেছিল যে, উচ্চ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় না হলে আধুনিক ব্যবসা মহলে টিকে থাকা সম্ভবপর হবে না। জেনোআর ইস্কুল কিন্তু ভেনিসের ইস্কুলের মত পণ্ডিতগণের চেষ্টায় গড়ে উঠে নাই। পরন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকেরা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বাস্তবের দিকে এঁদের বেশী ঝোঁক ছিল। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করা বা তথ্যসংগ্রহ করা এঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। হাতে কলমে ব্যবসা করবার শিক্ষা দান করা ও উপযুক্ত ব্যবসায়ী তৈয়ারী করা ছিল এঁদের উদ্দেশ্য।

* * * * *

বারির বাণিজ্য বিদ্যালয়।

বারি নামক সহরে ইতালির তৃতীয় কমার্শ্যাল ইস্কুল স্থাপন করা হয় ১৮৮৬ সনে। এটি নেপল্‌সের পরে দক্ষিণ ইতালির সর্ব্বপ্রধান সহর। বারির বন্দর আদ্রিয়াতিক সাগরের কূলে অবস্থিত। ইতালির অন্যান্য সহরগুলির তুলনায় এর জন-সংখ্যা সব চাইতে বেশী দ্রুত বেড়ে চলেছে। এটি দক্ষিণ আদ্রিয়াতিক প্রদেশ ও আপুলিয়া অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ঐ সকল প্রদেশের ছাত্ররা এখানে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায়।

রোমের বাণিজ্য কলেজ।

রোমের প্রতিষ্ঠানটি ধনবিজ্ঞানের একটা দিক গ্রহণ করেছে। ভেনিসের চাইতেও এর মাপ কাঠি কিছু উঁচু করা হয়েছে। সেকেণ্ডারি গ্রেডের উচ্চ বাণিজ্য বিদ্যালয়ের মধ্যে এর স্থানই সকলের উপরে এবং এই হিসাবে ইহাই

রোমের এই বিদ্যাপীঠেই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণে অধ্যাপক ও ছাত্র লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৩ সনের আইন মোতাবেক এটাকে ইতালির অন্যান্য ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের সমান শ্রেণীতে স্থাপন করা হয়, যদিও ইহার অনেক বিশেষত্ব এখনও অক্ষুন্ন আছে। অন্যান্য বিষয়ের পঠন পাঠন ছাড়া রসায়ন ও দ্রব্যতত্ত্ব বিভাগে দুই বৎসরের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এটা বিজিনেস ফ্যাকাল্টির বাইরে এবং এতে সরকারী চাকুরে এবং সেনাদলের লোক যোগ দিতে অধিকারী। রাজধানীতে বিদ্যাপীঠটি স্থাপিত হওয়ায় ইতালির বিভিন্ন স্থানের বড় বড় অধ্যাপক এখানে অধ্যাপনা করবার জন্যে স্বতই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এবং বাস্তবিক পক্ষে খুব নাম করা অধ্যাপক ও ধনবিজ্ঞানপণ্ডিত এখানকার শিক্ষকতা করে থাকেন। আর্থিক ইতালির বড় বড় ব্যাঙ্ক, বীমা আফিস, সরকারী আফিস আদালত প্রভৃতি রাজধানীতে থাকার ফলে রোমের এই বিদ্যাপীঠে ভাল ভাল অধ্যাপক সহজেই মিলে।

ইতালির আর ছয়টা বাণিজ্য বিদ্যালয়।

তুরিণ শিল্প বাণিজ্যের একটি বড় সহর। অ্যাকাউণ্টেন্সির শিক্ষক সৃষ্টিকরা তুরিণের বড় বিশেষত্ব। উল্লিখিত ৫টী ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ ছাড়াও কাতানিয়া, নেপ্‌লস (১৯২০) ও ত্রিয়েস্তে প্রভৃতি ইতালির অন্যান্য বন্দরে উচ্চাঙ্গের বাণিজ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত মিলান ও পালেরমো সহরে দুইটী অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে।

এইস্থানে ইতালির আটটী ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের ছাত্র সংখ্যার হিসাব দেওয়া গেল। এই তালিকা থেকে সহজেই ঐ বিদ্যালয়গুলির কিঞ্চিৎ বুঝতে পারা যাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ৫০০০ ইতালিয়ান ছাত্রছাত্রী

১৯১৪-১৫ সনে ভেনিসের বিদ্যাপীঠের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৮৬; ১৯২৩-২৪ সনে ছিল ৬৬০।

১৯০৬ সনে রোমের বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩৮৩। ১৯২৩—২৪ সনে ছিল ৮৭৯ জন। বারি স্কুলে ঐ দুই সনে যথাক্রমে ১২৯ ও ৫২৬ জন ছাত্র ছিল। তুরিণে ছিল যথাক্রমে ১১৯ ও ৬২১ জন। জেনোআর বিদ্যাপীঠে ১৯০৪—৫ সনে ছিল ১০৭, ১৯২৩—২৪ সনে ছিল ৪৩২। নেপল্‌স, কাতানিয়া ও ত্রিয়েস্তের বিদ্যালয়ে ১৯২৩-২৪ সনে যথাক্রমে ৬৬৩, ২৩১ ও ২৯৭ জন ছাত্র ছিল। ১৯২৩-২৪ সনে মিলান ও পালেরমো অবৈতনিক বিদ্যালয়ের যথাক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৭৯, ও ৯৮ জন। বর্ত্তমানে ইতালির ধনোৎপাদনের এই ১০টী বিদ্যাপীঠের মোট ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর।

বর্ত্তমান জগৎ ও বাণিজ্য-বিদ্যালয়।

ইতালি খুব বড় ব্যবসায়ী জাত। তা সত্ত্বেও আজকালকার প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসা জগতে টিঁকে থাকবার জন্য ইতালিকে এতগুলি বাণিজ্য বিষয়ক ইস্কুল গড়ে তুলতে হয়েছে। ব্যবসায়ীর ছেলে হলেই সে বড় ব্যবসায়ী হবে তার কোনো মানে নাই। কিংবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টা ডিগ্রিধারী যুবক সহজেই ব্যবসা বাণিজ্যে নাম কিনে ফেলবে এরূপ আশা করা যায় না। আজকালকার দিনে প্রত্যেকটা লাইনে বিশেষজ্ঞের আদর। যে-সে লোক পাটের দালাল বা মরিচের বেপারীও হতে পারে না। এ সব হতে হলে ঐ সব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা চাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বহির্গত যুবক একটা গঞ্জি ও মোজার বা মনোহারি জিনিষের দোকান খুললে পস্তাইতে বাধ্য হবে।

আজকালকার দিনে ব্যবসাবাণিজ্য করতে হলে যেন তেন প্রকারেণ ভাবে চলে না। ব্যবসা-বুদ্ধি অর্জ্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন জিনিষ ও হাটবাজারের সঙ্গে ভালরকম পরিচিত হওয়া চাই। এই জন্য দেশের মধ্যে চাই নতুন ধরণের বিদ্যাপীঠ। সাধারণ শিক্ষালাভ ছাড়াও এই সমস্ত শিক্ষালাভার্থ বিশেষ ইস্কুল কলেজে কিছুদিন কাটান আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতের বেকার সমস্যার দিনে ঐ ধরণের বিদ্যাপীঠের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার করে না। আশা করি ইতালির উল্লিখিত ১০টি ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ ভারতের স্বদেশ-সেবকদের চোখের সামনে একটা নতুন রাস্তা খুলে দিতে সমর্থ হবে। (আর্থিক উন্নতি)

অভিসারে।

জল্‌কে চল সই, বাজিল বাঁশী ওই,
পরাণ থই থই—
আকুল লাজে ;
শোন্ লো শোন্ কানে, কত করুণ গানে,
সে ডাকে প্রাণে প্রাণে -
শ্যামল সাঁঝে !
কি যে ব্যথা সমীরে, ভেসে আসে অধীরে,
আঘাতি যায় ফিরে—
কাঁদায়ে হৃদি ;
বেদনা গলে গলে, ঝরে নয়ন জলে,
মরণ পলে পলে—
অন্তর মুদি !
ধৈরজ কত আর, থাকেলো অবলার,
যৌবন রাখা ভার—
কত কি জাগে ;
তেয়াগি কুল মান, আয় লো সঁপি প্রাণ,
জলের পথে শ্যাম—
মিলন মাগে !
রেখেদে প্রসাধন, কাজ কি আভরণ,
খুলেদে দেহ মন—
আপনা ভোলা ;
কাঁচুলি খসে পরে, বসন বায়ে উড়ে,
চল্‌লো অভিসারে—
যমুনা বেলা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মজুমদার।

সংবাদ

গত ২১শে ও ২২শে শ্রাবণ ময়মনসিংহ যুবক সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন।

মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য গত ২৩শে শ্রাবণ তাঁহার বাসভবনে সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের এক সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নূতন কবিতা গ্রন্থ "নভো-রেণু" ছাপা হইতেছে।

কেদারনাথের সিকি শতাব্দীর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল "রামায়ণের সমাজ" বাহির হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "নীতিকল্প লতিকা" বাহির হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "সইদ খাঁ" নামক একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন।

"কালের ডায়রী" বাহির হইয়াছে। ইহাতে ২০ খানা হাফটোন ব্লক প্রদান করা হইয়াছে।

আগামী ১২ই আশ্বিন আশ্বিন সংখ্যা বাহির হইবে।

নিবেদন -

পূজা সমাগত প্রায়। এখন দেনা পাওনা শোধ করিতে হইবে। সে জন্য গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা তাঁহাদের দেয় সাহায্য সত্বর পাঠাইয়া মাতৃভূমির সাহিত্য চর্চ্চার সহায়তা করিবেন। নতুবা আগামী সংখ্যা হইতে ভিঃ পিঃ ডাকে সৌরভ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্য মূল্য গ্রহণ করিব। বলা বাহুল্য ভিঃ পিঃ ডাকে ।০ আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্তি করে আস্‌ছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে—মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি সুরমা ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"স্নিগ্ধ অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দূর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলভ্য বিলাসভোগ। বড় শিশি ১, মাঝারি ৷৵৹ ছোট—৷৷৹ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখবে। রুমালে একটু ঢাললে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৷৵৹ আনা, ছোট—৷৷৹ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌,

১৯।২ লোয়ার-চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Shourabh--Reg. No. C. 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ৷

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৷৹
ঢাকার বিবরণ	১৷৹
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস	৷৷৹
সাময়িক সাহিত্য	৩৲
রামায়ণের সমাজ (যন্ত্রস্থ)	
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	।৶৹

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷৹

লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে ” আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

“একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।” নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।৹

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই)	১৲	মহরম	৷৷৹
ব্রতকথা	৸৹	কালের ডায়রী (সচিত্র)	৷৷৹
শৈব্যা	।৶৹	রংকথা	(যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

B... rch House, ...nensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। আশ্বিন—১৩৩৪ নবম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children whom you would love so much? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest way to create an estate.

WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Representative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস্, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৵ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।০

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,
দায়ানী রোড্, পোঃ ক্যেডেল রোড্ বোম্বে, নং ১৪
টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউয়াসাগর" বোম্বে।

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	৪৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
" ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	১০৲
" ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	১৫৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম ন. ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্র বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও প কনকনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি
দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

সূচী।

আগমনী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	২১৫
ভোগ সরাও (গল্প)	শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত গুপ্ত ...	২১৬
গ্রাম্য-শনি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ...	২২১
গণ্ডিকার দেশ (কথিকা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	২২২
ছায়া-ছবি (কথিকা)	শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ রায় ...	২২৫
মধু-ভাণ্ড	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী	২২৬
দিবাস্বপ্ন (কথিকা)	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	২৩০
লছমনিয়া (গল্প)	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ...	২৩১
চিত্র পঞ্চক	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	২৩৬
পুরস্কার (গল্প)	শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ভৌমিক ...	২৩৮
চোখের বালু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানাথ দত্ত ...	২৪১
বাবু ও কেরাণী (ব্যঙ্গচিত্র)	...	২৪২
শোক সংবাদ	...	২৪২

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—সৌরভ।

ময়মনসিংহ।

পুঃ ময়মনসিংহের অধিবাসী যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহাদের ঠিকানা জানা প্রয়োজন।

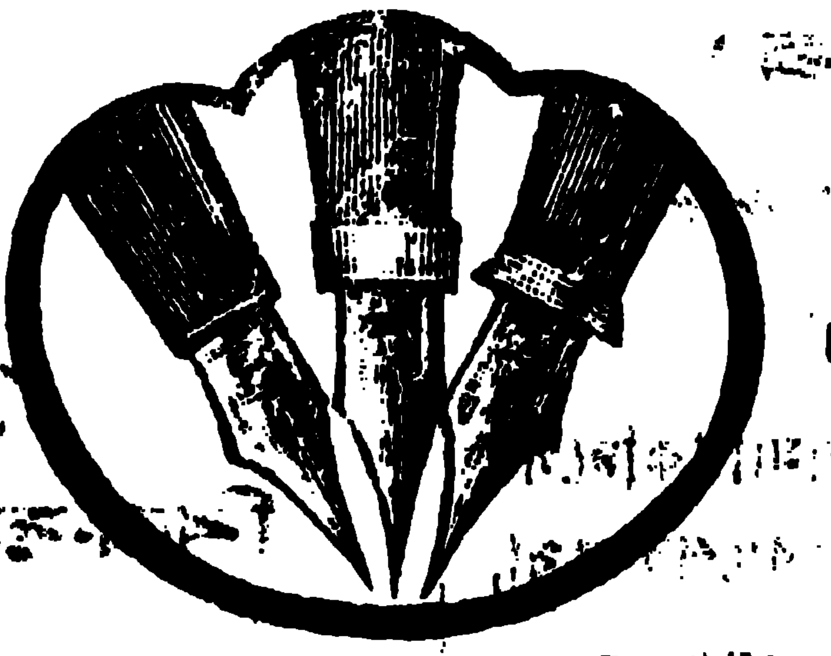

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার একমাত্র স্থল।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত,
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত.

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঞ্চয়ন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পত্রিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সমস্বরে একই বিরূপ ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে!', এ সেই পঞ্জিকা, এ প্রেক জাতীয় জীবন-বাজারে অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, আশ্চর্য্যজনক, অমূল্য অবদান!

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৫২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রণীত

"কালের ডায়রী"

(ঐতিহাসিক গল্প)

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রচলিত জনপ্রবাদ লইয়া চারিটী গল্প রচিত হইয়াছে।

প্রথম গল্প—কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের উত্থান পতনের কথা, ২য়—সুসঙ্গ রাজবংশের কথা, ৩য়—ইশা খাঁর কথা, ৪র্থ—দস্যু কেনারামের কথা।

যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ভাবে পড়িতে চান, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল। ইহাতে ২ খানা হাফটোন চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা মাত্র। সৌরভ কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী কৃত

বিশ্ব-বীণা

বালক বৃদ্ধ যুবা নারী—কি হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান—সকলেই এই বীণার ভিতরে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুনিতে পাইবেন। হাই স্কুল ও মাইনার স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার দিবার উপযোগী। পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ উভয় পক্ষের উপকারী। দক্ষিণা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৩৯নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত
প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

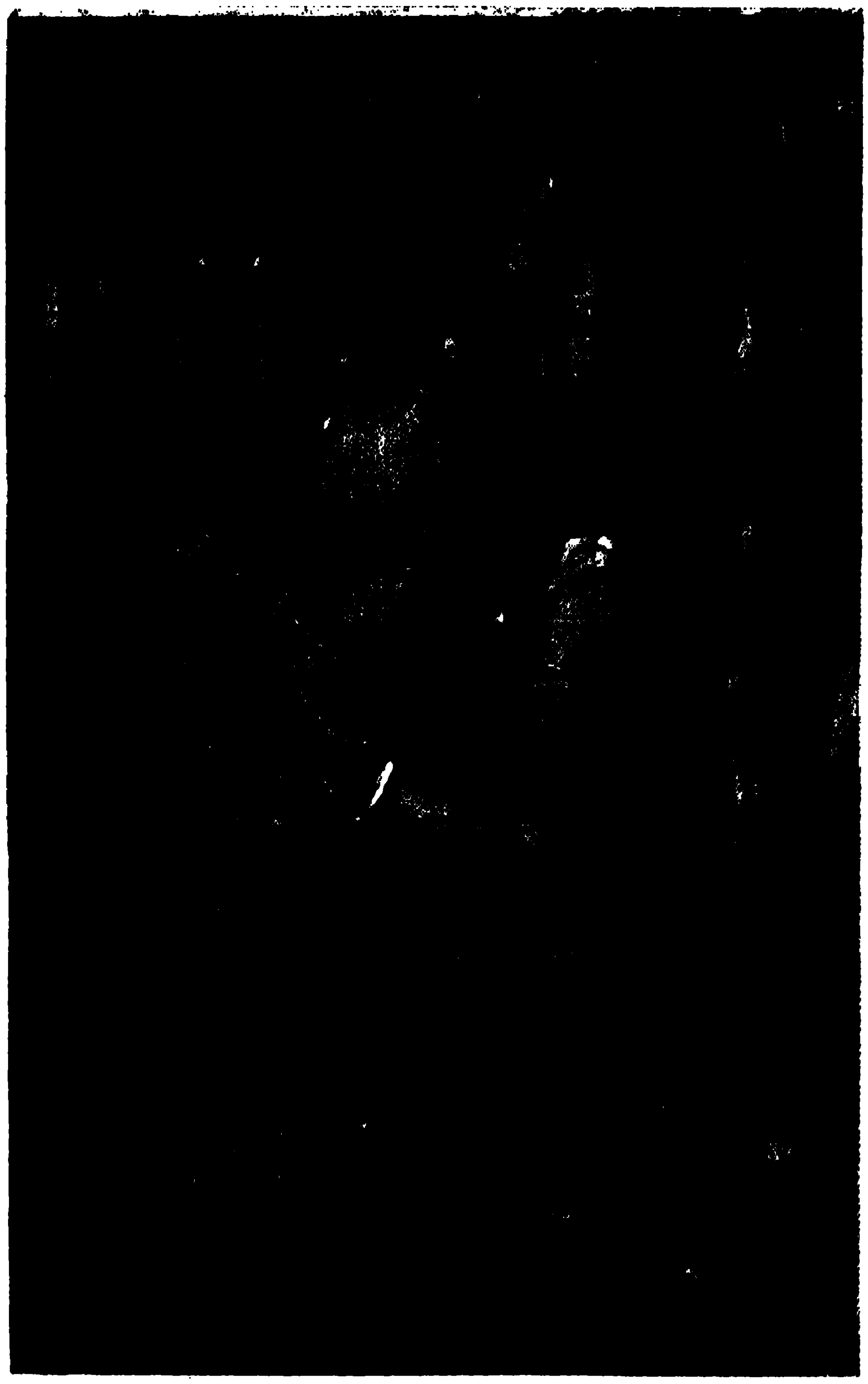

কুলেরকাঁটা শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩৩৪। | নবম সংখ্যা।

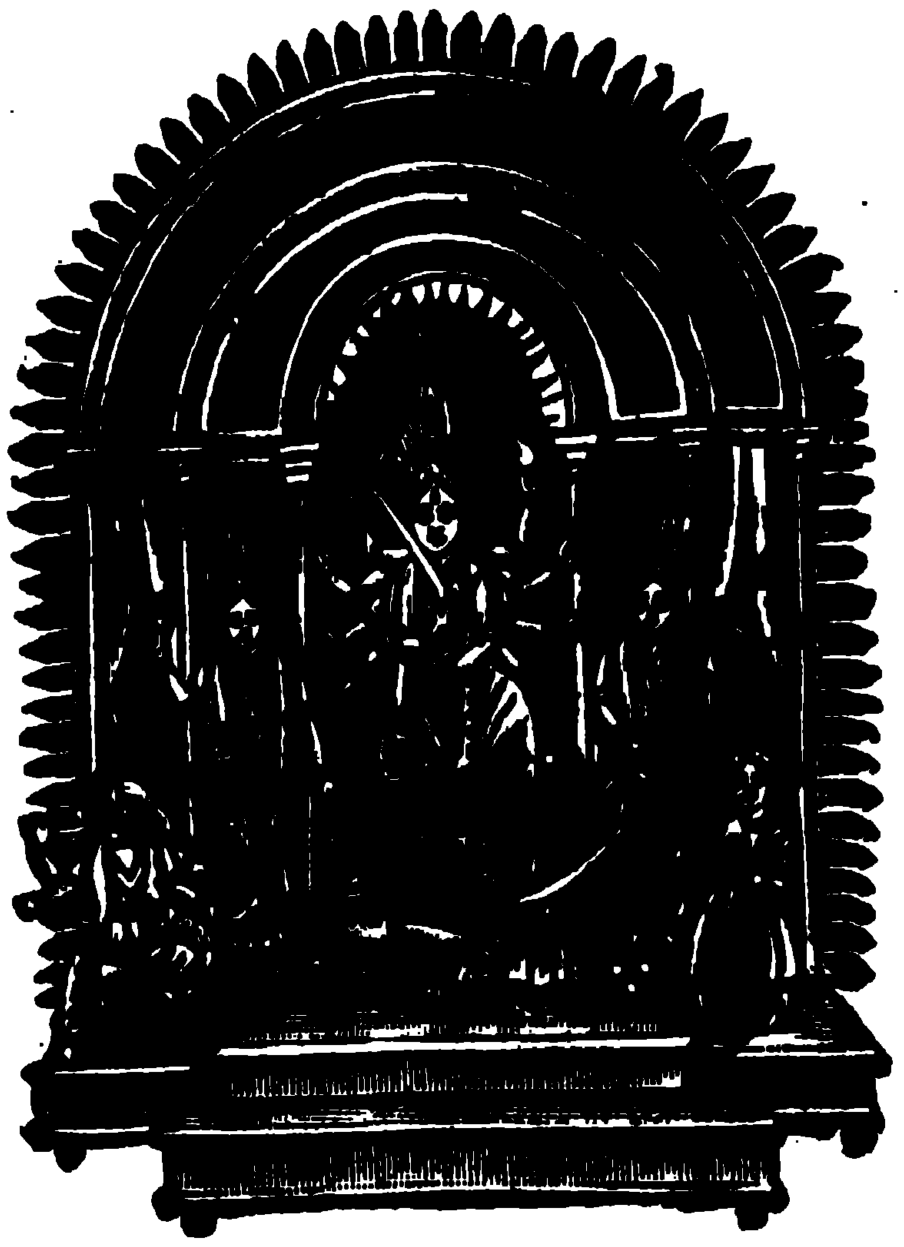

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

আগমনী।

আজি,—দীর্ঘ বরষ পরে ;
হাসিল বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
অশ্রু মুছিল ধীরে !
দিকে দিকে মার বন্দনা গান,
উৎসবে মাতি লাঞ্ছিত প্রাণ,
বাংলার ঘরে ঘরে ;
দীন নয়নে, ছিন্ন বসনে,
মাতৃ আরতি করে।
শরতে সারদা আসিল ফিরে,—
দীর্ঘ বরষ পরে।

আজি,—নীল নীলিমা বুকে ;
জলদ টুটি, উঠিল ফুটি
শান্ত গরিমা মুখে !
ভুবন ভরিয়া শেফালি গন্ধ,
পদ্ম—সায়রে অধীর ছন্দ,
ভক্ত পূজিবে মাকে ;
শারদ স্তুতি, গাহে প্রভাতি,
ভুলি সকল দুঃখে
স্বাগত জননী নবীনালোকে ;—
তাপিত বঙ্গ বুকে !

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ মজুমদার।

ভোগ সরাও

'ও নরেশ ! ওঠ, ওঠ, বেলা হ'য়েছে. রোদ উঠেছ'—বারকয়েক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর নরেশচন্দ্র দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিছানায় উঠিয়া বসিল ও শেষে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া ফক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, এ কি ! বঙ্কিম যে ! এমন হঠাৎ ! কবে এলে কল্‌কাতায় ? কোথায় উঠেছ ? বসো, বসো।

বঙ্কিম শয্যা প্রান্তে বসিতে বসিতে উত্তর করিল, উঠেছি আমার এক পিশতুতো বোনের বাসায়, দর্জ্জিপাড়ায়, প্রায় দিন সাতেক হ'লো এসেছি, হাইকোর্টে মক্কেলের একটা case আছে সেই সম্পর্কে ; কাল খগেনের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা, সে বল্লে, তুমি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে এই বাবাজী মিশনে আছ, খুঁজে খুঁজে বের ক'র্‌তে হ'লো। কি কচ্ছো এখন, অনেকদিন দেখা নেই।

নরেশ উত্তর করিল, আর কি ? সেই সনাতন প্রাইভেট্ টিউটারী করেই দিন গুজরাচ্ছি। তোমরা তো ভাই বেশ করলে ! কেমন প্র্যাক্‌টিস্ হয়েছে বারে ? শুনেছি, ভালই না কি হচ্ছে ; তোমরা তো ভুলেছ, আমরা কিন্তু সকলের খবরই রাখি ; আমার তো একবার বি, এলে ধাক্কা খেয়ে ওদিকে আর মনই গেল না।

বঙ্কিম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হচ্ছে এক রকম মন্দ নয়, তবে জানোই ত যে Hard struggle, কিছু করবার কি জো আছে, তার উপর আমাদের বরিশালের বার, over crowded, over crowded !

'ভালই যে হচ্ছে, তা চেহারার চক্‌মকি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খালিহাতে খালিপেটে এমনটি খোলানো যায় না। তা যাই হোক্, আমি বলছি ও সব পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসো না ; আমার বিশ্বাস. আলিপুরে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না। কল্‌কাতা ! কল্‌কাতা ! এমন জায়গা কি আর কোথাও আছে ? এখানে আর কিছু না হোক্, শুধু চৌরঙ্গীতে যেয়ে গড়ের মাঠের দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পেট ভরে শুধু বাতাস খেয়ে আসতে পারলেও সুখ, —ভূ-স্বর্গ !

বঙ্কিম বলিল, Private Tuitionই করে জীবনটা কাটানো, সেই বা কি রকম ? তুমি কি আর কোন দিকে যাচ্ছই না ?

'দেখা যাক্ না, একটা কিছু করা যাবেই, এতটা তাড়াহুড়ার কি দরকার, তবে ঠিক্ বলতে গেলে এমন irresponsible দায়িত্বশূন্য কাজ ছেড়ে, অন্য আর কোনও কাজে হাত দিতে মন যায় না। দোষের মধ্যে শুধু জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তা' না হ'লে উপার্জ্জনই বা মন্দ কি আমার মত scholarএর পক্ষে।'

'কত ? শুনি।'

'এই ধর না, সাড়ে তিন', চার শ' মাস।'

বঙ্কিম চোখ বড় করিয়া বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, এঁ্যা, বলো কি ? রসিকতা কচ্ছ না কি ?

'রসিকতা নয়, সত্যি, ঠিক্। এই জন্যই তো বলি, কলকাতায় চলে এসো, টাকার ছড়াছড়ি, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে হিম্মৎ দেখিয়ে কুড়িয়ে নিতে পারলেই হ,লো। তোমাদের

ওসব পাড়াগাঁয়ে যেখানে পয়সাটা, সেখানে কলকাতায় টাকা, মোহর—মোদ্দা-কথা এই জেনে নাও। বি, এ-সি ফেলের পরবৎসর Botanyতে Honours পাশ করি; নরেশচন্দ্র এখন সে subjectএ ছাত্রছাত্রী মহলে Specialist। তুমি বোধ হয় খবর রাখো না, এখনকার দিনে যে সব মেয়েরা আই, এস-সি, বি, এস সি পড়ে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই Botany নিয়ে থাকে—পাশ করা অনেকটা সোজা। আমার Tuition fee ও তাই পঁচাত্তর টাকার কম কোনটাই নয়। এখনো চারিটি চলছে, তার মধ্যে যেটা Boy সে দেয় ঐ টাকাটা, আর বাকী তিন জন Lady student, প্রত্যেকে এক শ' টাকা।

'বা! আছো তা হ'বে দিব্বি! Lady student পড়িয়ে আনন্দও আছে।'

কেমন একটু সয়তান-সুলভ হাসি বঙ্কিমের চক্ষে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল।

নরেশ উত্তর করিল, আছে বৈ কি? মেয়েদের সব কাজে কেমন একটু কমনীয়তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আর কেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান! হাতের লেখা, চালচলন, সবই কেমন সুন্দর! সত্যিই আমি তাদের পড়িয়ে যেমন সুখ পাই, বেটাছেলেদের পড়িয়ে তেমন নয়।

বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, কোন Love matter তো নেই গোড়ায়? এতদিন ধরে কলকাতায় পড়ে থাকা, বলো, খুলেই বলো না?

নরেশ হাস্যবদনে উত্তর করিল, সে সব কি হওয়ার জো আছে? সে বিষয়ে নরেশ বাবু পূর্ব্বাপর মহা সাবধান। বেশ জানে যে, তা হ'লে এ ব্যবসা ছাড়তে হবে। আর এদিকেও তো দু' তিনটী ছেলেমেয়ের বাপ হ'য়ে পড়া গেল, ওসব কাব্যের দিন কি আর আছে? সে সব হচ্ছে তোমাদের—দিব্বি ফুটফুটে চেহেরা, হাসিমুখ, সোণার চশমা, গিলে করা পাঞ্জাবী, ধপ্‌ধপে কাপড় চোপড়—বাঃ! বাঃ! যুবতী মনোমোহনকারী সব!

কক্ষ হাস্যে বিকম্পিত করিয়া বঙ্কিম উত্তর করিল, আরে রাখো, তুমিই তো বলছিলে আমরা তো হ'লাম পাড়াগাঁয়ে ভূত, কে পোঁছে আমাদের?

'বলো কি? তোমার সম্বন্ধে এ সব কথা খাটেই না। কেমন দিব্যি চেহেরা! এও দেখে যদি যুবতীরা না ভুলবে তবে কাকে দেখে ভুলবে? চলে এসো কলকাতায়, পাড়াগাঁয়ের বেরসিকাদের মধ্যে পড়ে এমন চেহারা নষ্ট করা চলে এসো এখানে।'

বঙ্কিম বলিল, সে যা হোক্, এখন কথা হচ্ছে তুমি এখানে কেন? আর মনে কিছু করো না—বিরাট ভুঁড়িরই বা যোগাড় হ'লো কি করে, কলেজের দিনে তো এর কোনও ইঙ্গিতই দেওনি তুমি।

দেবো কি করে তখন? Calcutta Universityর দৌরাত্ম্যে কি তখন এক মুহূর্ত্তের শান্তি ছিল? পরীক্ষা! পরীক্ষা! ও কথা মনে করে মাঝে মাঝে এখনো আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সত্যিই বি, এস-সি ফেলের পরবৎসর Senate Hallএ ঢুকতে যেয়ে আমার বুক কাঁপছিল, আর কেবলই মনে হচ্ছিল, আহা! আমি কেন অন্ততঃ হিন্দুঘরের মেয়েছেলে হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলাম না, তা হ'লেও তো এ সব যম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'তো না, ভগবান কেন আমায় মেয়েছেলে করে জন্মালেন না।

বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, সে দিকেও শান্তি নেই—গর্ভযন্ত্রণা!

'অরে রেখে দাও ভাই, গর্ভযন্ত্রণা; একটু সাবধান হ'য়ে চলতে পারলে, চার পাঁচ বছর পরে না হয় একবার, তাও কি তার যন্ত্রণা এর তুলনায়? আমি এখনো মাঝে মাঝে পরীক্ষার স্বপ্নে হুড়মুড় করে জেগে উঠি, বুক্‌টা তখন ধড়াস্ ধড়াস্ করে কাঁপতে থাকে। কি ভয়ঙ্কর দিনই গেছে! ওর মধ্যে আবার শরীরে কিছু নূতন মাংস যোজনা করা! পৈতৃক কাঠামটাকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। তা' ছাড়া আরো একটা কথা আছে—টাকা। কিছু টাকা হাতে পড়লেই দেখতে পাচ্ছি, শরীরটা আপনা হ'তেই ফুলকো লুচির মত সোঁ করে কেমন যেন ফুলে উঠে, যদিচ অবশ্য আমার শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।'

বঙ্কিম বলিল, এ যে ঠাকুরঘরে কে রে, আমি কলা খাইনে-র মত উত্তর হ'লে। কত? দশ হাজার?

'আরে রাম বলো। দশ হাজার! তার অর্দ্ধেকটা জমাতে পারলেও কি নরেশ বোস এই বাবাজী-মিশনে এমন একা পড়ে থাকে? আর তা হ'লে গিন্নী ঠাকুরনই বা

কবে চলে আস্তেন স্বামীর বিরহ-তাপের উপশম করতে।

'তাই তো, তুমি নরেশ, এখানে কি করে? এতো শুনেছি বৈষ্ণব বাবাজীদের আশ্রম। তুমি কি করে এখানে এসে জুটলে? সাধু হ'লে নাকি? আর নেহাৎ যে কষ্টে আছো, তাও তো বোধ হয় না।'

নরেশ উত্তর করিল, কষ্ট-চিন্তা এই বাবাজী-মিশন আশ্রমে থাকতে পারে না। মিশনের মূল সব Principles এর বিরুদ্ধে। আমার বিশেষ অনুরোধ বঙ্কিম, তুমি বারান্দা দিয়ে ঘুরে সব সাধু বাবাজীদের ঘরে একটা করে ঢুঁ মেরে ফিরে এসো।

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেনর কোনও উত্তর নেই, তুমি একবারটা ঘুরেই এসো না, সাধুদর্শনে পুণ্য হয় জান তো শাস্ত্রের কথা; তার পর বসে বসে গল্পস্বল্প করা যাবে, আজ রববার, Tuition এর বালাই নেই।

নরেশের আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা বঙ্কিম পরিদর্শনে বাহির হইল। সম্মুখে প্রশস্ত বারেন্দা, তাহার পাশে পাশে গুটী পনর কক্ষ। কোনটীতে দুটী, কোনটীতে তিনটী সাধু বাস করেন। বাবাজীদের মধ্যে কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিয়াছেন, কেহ বা বিছানায় উপবিষ্ট, কেহ মধুপানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত, অধিকাংশই শয্যা-শায়িত। বাবা! একি? কে কাহার অপেক্ষা কম মোটা? কে বলে বাঙ্গালী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মরা জাতি? দেখিয়া যাউক্ না আসিয়া নিন্দুকের দল। বঙ্কিম ঘুরিয়া হাসিতে হাসিতে বন্ধুর কোণের কক্ষে ফিরিয়া আসিল; তখন তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে হইতেছিল, নরেশ নিতান্তই কাহিল।

নরেশ বলিল, কি, দেখে এলে বাবাজীদের?

বঙ্কিম হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, হাঁা। তোমাদের আশ্রমের Membersদের একটা Group Photo করে সং জায়গায় পত্রিকায় পাঠানো উচিত।

'সে ব্যবস্থা যে নেই মনে করো না। কেন, এই দেখেই ভড়কে গেলে দেখছি। আমাদের বাবাজী-মিশনের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস্ প্রেসিডেন্টকে তো তাও এখনো দেখনি, তাঁরা তেতালার ঘরে আছেন, ভুঁড়ি একজনের তিন মণ, আর একজনের আড়াই মণ। মিশনের নিয়মানুসারে Minimum দু'মণের কম হ'লে ওসব গৌরবময় পদের বা সেক্রেটারীর জন্য Candidate হবারও যো নেই।'

'তাতো হ'লো, কিন্তু এ সব সম্ভবপর হ'লো কি করে? কি করে কি করে ভারতের মুনি-ঋষিদের মাথা হ'তে কত সব দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার হ'য়েছে, জানো? এ ব্যবস্থাও তাঁদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফল! কিছু নয়—'ভোগ সরাও', তবেই এমনটী হ'তে পারবে।'

বঙ্কিম বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে হা করিয়া বলিল, সে কি?

নরেশ হাসিয়া বলিল, বসো, এত অস্থির হ'লে চলবে কেন? সব টের পাবে সময় মত, বসো।

(২)

অন্য বিষয় সম্বন্ধে আলাপ সালাপ হইতে লাগিল। নরেশ মাঝে হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় জোড়াসন করিয়া ভুঁড়ি বাহির করিয়া বসিল। আটটা বাজার পনর মিনিট বাকী, এমন সময় ঢনাঢন্ শব্দ করিয়া মিশন-আশ্রমের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আশ্রমের সেবক মুখে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে-তিলকধারী হরিদাস ত্রস্তসহকারে নরেশের ও অন্যান্যের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, প্রাতর্ভোগ হ'য়ে গেল, সাধুদের শীগ্‌গির করে আসতে আজ্ঞা হয়—'ভোগ সরাতে।'

নরেশ বন্ধুবরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, এসো বঙ্কিম, এসো তুমিও, এ-সব ধর্ম্ম-কার্য্যে লজ্জা নেই, ভক্তদের আহারে-বিহারে লজ্জা থাকতে নেই, তবে জুতোটা ছেড়ে এসো।

দুজনে নীচে নামিয়া আসিল। সেখানে প্রকাণ্ড বারেন্দা, তাহার উপর লম্বা টেবিলের দুইধারে চেয়ার-সাজানো, অন্য-পার্শ্বে একদিকে প্রেসিডেণ্ট ও অন্য-পার্শ্বে ভাইস প্রেসিডেণ্টের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট। হাটু পর্য্যন্ত-গেরুয়া বসনধারী শুভ্র কাছা লম্বোদর বিরাটবপু গলায় মালাধারী সর্ব্বাঙ্গে তিলক চিহ্ন মুণ্ডিত-মস্তক সাধুর দল আসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন, কেমন নাদুস্ নুদুস সব চেহারা! তাহারা দুজনেও তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান পাইল।

কিছু পরেই চা আসিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গরম লুচি, নিম্‌কি, পানতোয়া, হালুয়া মিহিদানা, ও ধপ্‌ধপে সীতাভোগ। সাধুরা হাসিয়া হাসিয়া গল্পস্বল্প করিতে করিতে

দুতিন পেয়ালা করিয়া চা খাইতে লাগিলেন; Finest Darjeeling Tea, তাহার উপর সঙ্গীয় জল খাবারের এমন সুবন্দোবস্ত, বঙ্কিমও দুই পেয়ালা লইয়া খাইল। কিন্তু ওখানে বসিয়া সে যেন তেমন সোয়াস্তি পাইতেছিল না; নরেশ তাও কোন প্রকারে পাশের সার্টিফিকেট পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু সে নিজ চেহারার দিকে চাহিয়া এমন সব বিরাট মহাপুরুষদের পাশে কেমনই দুর্ভিক্ষের কাকের মত আপনাকে একেবারেই মানানসই নয় মনে করিতেছিল।

'ভোগ সরাইয়া'—পান চিবাইতে চিবাইতে ও সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বন্ধুদ্বয় কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

আধঘন্টাটেক্ পরে হরিদাস আবার আসিয়া বলিল, আসুন্ প্রভুরা, ঠাকুরের নাম গান।

সুবৃহৎ বাটীর ভিতরের খণ্ডে 'মদনমোহন' বিগ্রহ স্থাপিত সম্মুখে মারবেল পাথরের খচিত প্রশস্ত আঙ্গিনায় বাবাজীর দল সঙ্কীর্ত্তনের জন্ত জমায়েৎ হইয়াছেন। নরেশ বঙ্কিমকে বলিল চলো, চলো, হজমেরও তো দরকার, একটীর সঙ্গে আর একটীর বিশেষ সম্পর্ক, Physical Exercise কিছু না কর্‌লে শরীর থাক্‌বে কি করে, 'ভোগ সরাবে' কি করে? বাবাজীদের ধর্ম্মের মত এমন Scientific বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম আর দুটী আবিষ্কার হয় নি এ পর্য্যন্ত, হাল আমলের শিক্ষিতদের ধর্ম্ম, সব দিকে দৃষ্টি রেখে তৈয়ের করা, কোনও ভুল-ভ্রান্তি পাবে না খুঁজে, এমন নিখুঁৎ ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে!

তাহাই হইল। নরেশের সঙ্গে বঙ্কিম ও আসিয়া সেই আঙ্গিনায় সমবেত হইল। একসঙ্গে আধ ডজন মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। নানা স্থান হইতে আগত নানা লোকে আঙ্গিনা ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বাবাজীরা গান ধরিলেন,

হরির নাম বিনে,
বল এ সংসারে,
সম্বল কি আছে আর?

সে কি চিত্ত উন্মাদক গান! মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ঘণ্টা করতাল সংযুক্ত গগন বিদারী বাজন! কি তাণ্ডব নৃত্য! ভুঁড়িসমূহের দোলন! নরেশ গায় চমৎকার, বাবাজীদের সঙ্গে মহোৎসাহে সে তাহাতে মাতিয়া গেল, বঙ্কিমও সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার অশ্রাব্য গলা লইয়া তাহাতে যোগ দিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্রতপ্ত প্রাতঃকাল, বাবাজীদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই কাহারও—নাম প্রচার, কলিতে নাম প্রচারের মত এমন ধর্ম্ম নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

ঘণ্টা দেড়েক এভাবে লাফাইয়া ঝাপাইয়া ও চীৎকার করিয়া দুই বন্ধু কক্ষে ফিরিয়া আসিল। অনেকটা ঘর্ম্ম নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার দরুণ দেহটা বেশ হালকা বোধ হইতে লাগিল এবং ক্ষুধার তখন বেশ উদ্রেক হইয়াছে।

নরেশের আগ্রহাতিশয্যে বঙ্কিম তাহার ওখানেই সে বেলা থাকিয়া গেল।

নরেশের উপদেশ মত বঙ্কিম কতক্ষণ পরে আচ্ছা করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়া সাবান-সহযোগে গামছা দিয়া গা রগড়াইয়া স্নান শেষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাথার চুল আঁচড়াইতেছে, এমন সময় আশ্রম-সেবক আসিয়া বলিল, সাধুরা আসুন, ঠাকুরের দুপুরের 'ভোগ সরাতে' হবে।

সে কি আহারের ব্যবস্থা! এ যেন কাশিমবাজারের রাজবাড়ীর বিবাহের নিমন্ত্রণ! পোলাও, ধপ্‌ধপে মিহি চাউলের ভাত, নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জন, দলাদলা টাট্‌কা মাখন, নানাবিধ ভাজা, তরকারী, চাটনি, আবার তাহার উপর দৈ, ক্ষীর, জিলাপী, রসগোল্লা, সন্দেশ, রাবড়ি, কত কি? আহারের ভারে বঙ্কিমের ক্ষুদ্র পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল, বারবারই তাহাকে কাপড় ঢিলা করিয়া পরিতে হইল, এবং তাহার মনে হইতে লাগিল, একদিনেই বা তাহার ভুঁড়ি ডবল হইয়া উঠে!

'ভোগ সরাইয়া' তাহারা আবার কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

পাঁচটা বাজিতেই আবার 'ভোগ সরাইবার' জন্ত আহ্বান! কি বিপদ! বঙ্কিম কাতর নয়নে চিন্তাকুল-মুখে নরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ভাই, আমার তো ক্ষিদেই পায় নি একেবারে। এতও কি খাওয়া যায়? প্রাতঃকালের মত এ বেলাও 'ভোগ সরাবার' আগে যদি অন্ততঃ একটু কীর্ত্তনের ব্যবস্থা থাক্‌তো, তা হ'লে বড্ড ভাল হ'তো।

নরেশ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোমার আমার মত কাণাকড়ির বুদ্ধি নিয়েই এই আশ্রম চালানো হ'চ্ছে কি না?

শুধু Exercise নয়, Varietyরও যে Healthএর পক্ষে দরকার। এ বেলাও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে, তবে 'ভোগ সরাবার' পরে। আমাদের ঠাকুর 'মদনমোহনের' লীলা ছুঞ্জে'র। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যে তাঁর Afternoon tiffin শেষ হওয়া দরকার। এ সময় হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁর ঘর বন্ধ থাকে, তখন তিনি সুন্দরীর সঙ্গে বসে বসে বিশ্রাম আলাপ করেন।

আবার 'ভোগ সরাইতে' সেই প্রান্তের টেবিলের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইল। এবেলা ভোগের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ধরণের। চা'র স্থলে বরফসংযুক্ত নানাবিধ সুশীতল সরবৎ—ঘোলের, লাইমজুস কর্ডিয়ালের, নারেঙ্গীর ডাবের জলের—যাহার যেটী ইচ্ছা পান কর। এ বেলা ফলেরই প্রাদুর্ভাব বেশী; Fruits Fruits, আম, আঙ্গুর, নেশপাতি বেদানা, লিচু, জামরুল কত কির সমাবেশ! দৃষ্টিমাত্রেই বঙ্কিমের কেমন করিয়া আপনা আপনিই ক্ষুধার উদ্রেক হইল।

জলযোগ শেষে আবার কক্ষে প্রবেশ। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, আবার তেমনি বা তদপেক্ষা অধিক উৎসাহের সঙ্গে বাবাদের তাণ্ডব উল্লম্ফন। তাহার কিছু পরে গরম গরম লুচি, কচুরী, পরেটা সংযোগে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সমেত রাত্রির 'ভোগ সরানো।'

শেষ 'ভোগ সরাইয়া' কক্ষে ফিরিবার পথে নরেশ গম্ভীর ভাবে বঙ্কিমকে বলিল, বুঝতে পারলে বোধ হয় কতকটা, এখন ভুঁড়ির জন্ম ও ক্রমবর্দ্ধন মাহাত্ম্য। দেখলে কেমন Scientific Religion, চারিদিকের Spiritual ও Medical pointsএর দিকে কেমন দৃষ্টি রেখে একে তৈয়েরী করা হ'য়েছে। শরীর মন আত্মা সবই এ ধর্ম্মের চর্চ্চায় উন্নত হয়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আচ্ছা, এঁরা কি কোনও কাজ করেন না?

নরেশ বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে চক্ষু বিস্তার করিয়া বলিল, আরে রাম! কাজ! বলো কি? যে কাজ দেখলে—এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হ'তে পারে? প্রভুর নাম প্রচার, এর চেয়েও বড় কাজ জগতে আছে কি? কলিযুগে এই একমাত্র ধর্ম্ম, শাস্ত্রেই তো বলে গেছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ নিক্রিয়ানন্দ বাবাজী, ভগবান্! দীর্ঘজীবি কর তাঁকে, আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেন, এই শ্রীহরির দেওয়া শরীরকে কি প্রকারে সুস্থ সবল অবস্থায় রাখা যায়, তা তাঁহাদের ধর্ম্মের একটী প্রধান Tenet অঙ্গ, দেহ সুস্থ না থাকলে নাম প্রচার করবে কে? এঁদের ফটো নানা Exhibition এ প্রেরিত হ'য়ে প্রাইজ পেয়েছে। এই যে সব বাবাজী দেখছো, এঁরা সব আদর্শ মহাপুরুষ। কাজ! কাজ তো করবে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে নিতান্ত সাংসারিক বাজে লোকে; এঁরা যে যোগীপুরুষ যোগাভ্যাস ও কীর্ত্তনই এদের একমাত্র সহায়, যোগীপুরুষেরা আবার কবে কাজ করেন? কেন কাজ করবেন? এই তো শেষ ভোগ সরানো হ'য়ে গেল, এখন সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে ইঁহারা সকলে বসে বা শায়িত হ'য়ে যার যার বিছানায় যোগাসনে ধ্যান করতে থাকবেন, সারাদিনের এমন কঠোর পরিশ্রমের পর Body দেহকে Rest বিশ্রাম দেওয়া যে দরকার।

বঙ্কিম হু করিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বুঝলেম সব, তবে দুটী বিষয় ছাড়া,—তুমি এসে এখানে জুটলে কি করে, আর বাবাজীদের এমন খরচ যোগায় কে?

আমি এলাম কি করে? আমার ছোট ভাই, সেই তারিণী ছোড়াটা, যে সেভেও ক্লাস থেকেকে রাষ্টিকেট হ'য়ে হেড মাষ্টার কালীনাথ চন্দের বেতের ভয়ের বরিশাল জেলা-স্কুল ছেড়ে ছিল, সেই যে হচ্ছে বাবাজীর মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট; দেখেছ তো তাকে টেবিলের পাশে, কিন্তু বুঝেছি চিনতে পারোনি, দেখেছ তো কেমন চেহারা হয়েছে, নাম অবশ্য বদলে গিয়ে এখন গুরুদত্ত নাম নিয়েছেন—শ্রীমৎ ভোগানন্দ বাবাজী। মহা সাধু! মহা সাধু! তাঁর বড় দাদার কেন মিশনে স্থান, বোধ হয়, বলে দিতে হবে না। বিনে পয়সায় এমন চলে যাচ্ছে, মন্দই বা কি, কি বলো? আর এই লাফানো ঝাপানোর দরুণ শরীরটাও আছে ভাল। জিজ্ঞাসা করছিলে, এদের খরচ যোগায় কে? বাবাজী মিশনের আবার টাকার অভাব! মদনমোহনের, স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টার টাকার অভাব! নেহাৎই পাড়াগাঁয়ে কি না, তাই এমন সব প্রশ্ন কচ্ছ। কলকাতার সা, শুঁড়ি, তিলি, গন্ধবণিক, এত সব বেনে ব্যবসায়ীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

টাকা রোজগার করছে কার জন্যে? কাদের কল্যাণে? জান না কি, একটী সাধু পালন করতে হাজার বাকুবের দরকারী, It requires a thousand fools to maintain a Sadhu ?

বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, বেশ আছ দেখছি ভোগ সরিয়ে, আর ক'দিন এখানে থাক্‌বে ?

'শীগ্‌গির যাবার তো কোনই তাড়া পাচ্ছিনে মনের ভিতর হ'তে। এক সেট্‌ গেরুয়া বসন, আল্‌খাল্লা, পাগড়ী ও মালার অর্ডার দিয়েছি সম্প্রতি, তা না হ'লে কেমন কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকায়, আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রীশ্রীশ্রীমৎ বাবাজীর উপদেশ মত ; আমার গানের তিনি বড়ই প্রশংসা করেন, ভগবান দীর্ঘজীবী করো তাঁকে।'

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজীরা কি কেউ বিয়ে করেন নি, সকলেই কি সংসার হ'তে স্বেচ্ছায় Rusticate নাম-কাটা হয়ে এসেছেন ?

উত্তর হইল, মহা কঠিন প্রশ্ন করে বসলে হে! বিয়ে করবে বাবাজীরা ? তুমি দেখছি নিতান্তই আনাড়ি। ঠাকুর মদনমোহন কি রাধিকার সঙ্গে কোনও বিবাহ ঘটিত সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন ? বিবাহ ! বিবাহ ! ওসব তো তোমার আমার মত Baser metals বাজে ধাতুতে তৈয়েরী সাধারণ লোকজনের জন্যে। আমিও তো প্রেসিডেন্টের উপদেশ মত মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাবি, স্ত্রীটাকে ত্যাগ করে ফেলি। স্ত্রী! ভাবতে গেলেই কেমন একটা নিতান্ত স্থূল দেহজ সাধারণ সম্পর্কের কথা মনে জেগে যায় না কি ? যত সব Botheration বকমারি False Tie মিথ্যা বন্ধন। ঐ স্ত্রীটার জন্যই তো কিছু করা গেল না। Free! Free! স্বাধীন!—জানই তো, কি জাতি, কি মানুষ, সকলেরই পূর্ণ বিকাশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দরকার, তা না হ'লে কি বাড়বার যো আছে—এই তো যুগশিক্ষা; যাকে ভাল লাগে, যাতে মন বসে, তার দিকে নির্ভীকচিত্তে দৌড়িয়ে যাওয়া। স্ত্রীর সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে একযোগে ঘেনর ঘেনর করে সারাটা জীবন গরুর গাড়ী চালানো—এমন কবিত্বশূন্য ব্যবস্থা বাবাজী মিশন ইহার সম্পূর্ণ বিপক্ষে।

'বেশ, বেশ, আছো ভাল।'

'খুব যে ভাল আছি, তাই বা বলি কেমন করে? দেখলেই তো, চার বারের মধ্যে এক বেলাও মাছমাংসের সম্পর্ক নেই। এতটা নিরামিষ আমার সহ্য হয় না ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট একবার প্রস্তাবও করেছিলেন ডিম চালাইতে, কারণ ওটা মাছমাংস কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না, তা শেষটায় প্রেসিডেন্ট Casting Voteএর জোরে পণ্ড করে দিলেন, ভাবি কড়া লোক কি না। তাই মাঝে মাঝে আমাকে Delkhosa Restaurantএ যেয়ে মুখ বদলিয়ে আসতে হয়

'তা যাই কর, এই 'ভোগ সরানো' ছেড়ো না।'

'ভোগ সরাও', 'ভোগ সরাও'—বলিতে বলিতে হাসিতে হাসিতে রাত্রি এগারটার পর বঙ্কিম স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

গ্রাম্য-শনি

হাতীর মত বিশাল দেহ ভুরিটা তার মোটা,
পোড়া পাতিল সম কালো করেন তিলক ফোটা।
কুমন্ত্রণার গুরু ঠাকুর বদের চূড়ামণি ;
ভয়ে ডরে সবাই মরে নাম রেখেছে 'শনি'।
কোপ দৃষ্টি উপরে যার, রক্ষা নাই যে তার,
বসত ভিটায় ঘুঘু চরায় জ্বালায়ে ফেলে হাড়।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলে লোকের সবই লোটে,
আদালতে 'জেরা' হলে সত্য কথা ওঠে!
জাল, জোচ্চুরি, প্রতারণা, সব করেছে পাশ,
সবাই থাকে সশঙ্কিত সবার প্রাণে ত্রাস!
দিবানিশি লোকের কত করেছ সর্ব্বনাশ,
নিরুপায় হয়ে তারা ফেলছে দীর্ঘ শ্বাস!
সিদ্ধি, মদ চরস গাঁজা, কিছুই বাকী নাই,
গাঁজাখোর শিষ্য তাহার অনেক আছে ভাই।
কল্কে টেনে করো চখে সরিষার ফুল ফোটে,
কেউবা বলে আঁধার রেতে সূর্য্য ঠাকুর ওঠে।
নিশা রেতে ফিরে এরা, কতই কুকাজ করে,
অশিষ্ট ও দুষ্ট বলে জানে ঘরে ঘরে!
এমনি একটী অপদার্থ যে গ্রামেতে থাকে,
নামে লোকে 'থুথু' ফেলে সঙ্কোচে মুখ ঢাকে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

গঞ্জিকার দেশ

(কথিকা)

সুদীর্ঘ উনিশ বছর পর জন্মভূমিতে, সরু কল্‌কির দারুময় বারুদের চারু জন্মস্থানে গিয়ে উপস্থিত। সেই কুমিরা গাঁয়ের পথের ধারের বড় মুসলমান-বাড়ীটি, হাঁপানিয়ার চামার-বাড়ীটি, চক্‌গৌরীর কাছেকার সেই আমগাছে আঁধার-করা উঁচু পাড়ওয়া'লা বড় পুকুরটা আজো তেম্‌নি আছে! তবে আমার, নাই সেই প্রাণ, আর নাই সেই সময়ই শুধু! তবু বাল্‌কে মাটির এই বড় চওড়া রাস্তায় চলতে চলতে, যখন চক্‌গৌরীতে রাঙা আঁঠাল মাটির খাঁটি বরেন্দ্রভূমে পা দিলাম, তখন হর্ষহিল্লোলের তাল সামলাতে প্রাণ বান্‌চাল হোলো যেন। তখন সত্যি সত্যিই কাবুলের গজনী জেলার জর্‌কন্‌কোট নিবাসী, এই প্রবাসী বস্ত্রবিক্রেতা বাবুখান্‌ কাবুলীর মতো আকুল হোলাম আমি! সে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় সে দিন বলছিল আমায়, বাবু, দেশ ইয়াদ্‌ হইছে! দেশ ইয়াদ্‌ হইছে, বাবুজী! হায়, এই পাহাড়ে অসুর জাতিও দেশের প্রেমে মাতোয়ারা! আর আম্‌রা?

উত্তুরে দেশ। রাঙা ধুলাময় চওড়া রাস্তা। তার দুধারে সুবিশাল দিগন্তব্যাপী সবুজ ধান ক্ষেত। সেই সব অসীম খেলো মাঠের মাঝে মাঝে, আম, তাল, খেজুর, কৎবেলগাছে জমাট্‌বাঁধা ঘন সবুজের ফাঁকে ফাঁকে, এক একটি পল্লী কী চমৎকার! ঠিক যেন ছবিটি! এক একটি জলাশয়ের চার পাশে উঁচু তালগাছগুলি, রাজবাড়ীর খাড়া-পাহারাওলার মতো, যেন পাহাড়া দিচ্ছে, মাথা তুলে, সটান দাঁড়িয়ে থেকে! অতি তৃষাতুর পথিকের আকুল হয়ে জল পান করার মতো, উনিশ বছর পর আমিও, জন্মভূমির সব রকম মন্‌-মাতানো দৃশ্য, একটানা চুমুকে, পান কর্‌তে কর্‌তে চলেছি, দুচোখ দিয়ে। এই চলাতে আনন্দ যত অধিক, ক্লান্তি তত কম।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, কেবলি ঘুরে বেড়ানোই কাজ হোলো কিছুকাল। সরস্বতীপুরের কুসুম দীর্ঘিকার শান্‌-বাঁধানো ঘাটে বসে', এক মজার ব্যাপার দেখলাম, এক উদাস্‌ সন্ধ্যেবেলা। আমি একাকী। ভারী নির্জ্জন ঘাট। দীঘির চার পাড় আম্রকুঞ্জে গুলজার। কিছু আলো, অধিক আঁধারে ঠাঁইটা থম্‌ থম্‌ করছে তখন। দখিণ পাড়ের ছায়া সুশীতল আঁধার আলোর আবছায়ায় দেখি, এক এক করে, গুঁড়ি সুড়ি মেরে, বহু ইঁদুর, ছুছুন্দর, খরগোস, কাঠবিড়াল এসে, দল পাকাতে সুরু করে দিলে। ওদের রকম সকম দেখে মনে হলো, ওরা যেন গুপ্ত সভা আহ্বান করেছে এখানে, কোনো একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা কর্‌তে। তখন গাছের উপরে একটি ঝিঁঝি টানা সুরে তান্‌পুরা বাজাচ্ছিল আপন মনে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই-ই। চঞ্চল জীব-সভায় চাঞ্চল্য থামেনি তখনো। একটা জাদ্রেল খরগোস, উইয়ের ঢিবির উপর বসে, সাম্‌নের দুই ঠ্যাং দিয়ে, বার কয়েক মুখ রগড়ে, গোঁপ চুমড়ে, কি যেন বলছিল ওদের দেশী ভাষায়, খুব ধীরে ধীরে, বিড়বিড় করে। তখন আর সবাই চুপ করলো বটে, কিন্তু অনাগত ভীতির ভূতের ভয়ে, ঘন ঘন চারদিকে

তাকানো থামলো না তবু। পুঞ্জীভূত গল্পিকার জন্মভূমের চট্‌কা হাওয়ায়, মগজ চাঙ্গা হোলো চট্ করে। ক্রমে বুঝলাম ওদের ভাষা।

মাতব্বর খরগোসটা দাবড়ি দিয়ে আগে ঝিঝি পোকাকে বললে, এই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুর্দিনে, তুমি সুখে কেমন করে একনাটি গান গাও, বন্ধু হে! জীবকুলের দুর্দশায়, তোমারও সহানুভূতি থাকা চাই। এখানে কতকগুলো বিষয়ের আলোচনার জন্তে জড়ো হয়েছি আজ। সময় সঙ্কীর্ণ, একটু চুপ করো না তুমি এখন!

ঝিঁঝিঁ তার ঝাঁঝালো গলায় বললে, কী বুদ্ধিমানই তুমি! সব জানা আছে আমার। তুমি যেখানে সভাপতি, সেখানে মীমাংসাও তেম্‌নিই হবে। তোমার বুদ্ধির দৌড় কদ্দূর শোনো একবার। এই যে সে দিন এক শিকারী, বন্দুক হাতে তোমায় তাড়া করে ছিল, তা তোমার মনে আছে বোধ হয়! তুমি সেই তাড়া খেয়ে, কান খাড়া করে দৌড়ে এসে, ওই ঝোপের ভিতরে একটা বাঁয়ার খোপে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে, সারা গা বাইরে রেখে যখন গা ঢাকা দিয়ে ভাবছিলে, তখনই বুঝেছিলাম, তুমি কি দরের বুদ্ধিমান্। তা যাক্, তোমাদের দুর্দিন দূর হবে না কিছুতেই, যদ্দিন বুদ্ধির চুল চেরা অবস্থাটা না আসে তোমাদের। তুমি চোখ মুখ গুঁজে, শরীরটা বাইরে রেখে, মনে ভেবো না, দুনিয়ার কেউ দেখতে পায় না তোমায়। তুমি কি করছো, না করছো, তার হদিস্ জানা আছে দুনিয়ার সবারই। তারপর, মনে রেখো, সহানুভূতি হয় সমানে সমানে। তোমরা ভূচর, হেটে মাটি জরিপ করতেই জন্মেছ; খাবেও খুঁটে খুঁটেই। আর আমরা, খেচর, জন্মেছি উড়বার জন্তেই; যদ্দিন বাঁচি, রূপে মস্‌গুল; গানে বিলকুল প্রাণ আকুল। তোমরা ছোট লোক কি না, তাই নিঃসঙ্কোচে বন্ধু বলে' দলে টেনে নেবার চেষ্টা হচ্ছে আমাকে! কী যুগই পড়েছে, বাবা! ছোট লোক গুলো পর্য্যন্ত ঘাড়ে উঠে চেপে বসবার সুযোগ খুঁজছে এখন। তা, আমার গানে যদি তোমাদের কানে ভালা লাগে, তো, রবারের গাছটিতে গিয়ে আশ্রয় নিই আজকের মতো।—এই বলে' ঝিঁঝিটা উড়ে গেল সেখান থেকে।

একটা নেংটে ইঁদুর তার লোমহীন মসৃণ ল্যাজটা, সাম্‌নের দুপাশে কাঁধের উপর দিয়ে টেনে এনে, পেছনের দুই ঠ্যাংয়ের উপর দাঁড়িয়ে, তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে, বক্তৃতা করতে লাগলো,—হে মাতব্বর অধিনায়ক এবং উপস্থিত বন্ধুবর্গ! এই দাম্ভিক ঝিঁঝিঁপোকাটার কথা শুনলেন? ওঁর বিবেচনায়, ছোটলোক হোলাম কিনা, আমরা সব্বাই! আর উনি বুঝি হলেন বড়লোক, কেমন? উনি যদি খেচর হন, তবে চিল শকুন কি হবেন? বড় গায়ক বলেও গর্ব্ব আছে আবার! দয়েল, কোকিল, বৌ-কথা-কও তো, অমন দেমাক্ দেখায় না ওঁর মতো। গান করেন কারা? না যাঁরা নেহাৎ দীনহীন, তাঁরা আর যাঁরা বিলাসী সৌখীন, 'সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ', তাঁরা। এর মাঝামাঝি যাঁরা, তাঁরা তো চাল চুলার চাপে, চোখে সর্ষেফুল দেখে' দিনরাতে কাঁপে। গান করার ফুরসৎ-ই বা কই তাঁদের? আর মন ঢেলে দিয়ে গানই বা শোনেন কখন্? সুতরাং চরাচরের শ্রেষ্ঠ পাখী, খেচর ঝিঁঝিঁপোকার ঝাঁঝালো কথায়, তীব্র প্রতিবাদ করছি আমি। অইটুকু বলেই, চট্ করে চার ঠ্যাঙে ভর দিয়ে, উপুড় হয়ে ঘন ঘন হাঁক্ ছাড়তে লাগলো, তীব্র উত্তেজনার অবসাদে।

মূষিক কুলতিলকের বক্তৃতার শেষ শব্দটির রেশ হাওয়ায় মিশিতে না মিশিতেই, শ্রোতৃবৃন্দ সমস্বরে চেঁচিয়ে বললে, লজ্জা লজ্জা! কী অপমান! প্রতিহিংসা!

অতি বুদ্ধিমান্, সভাপতি খরগোস, সোরগোলে ভড়কে গিয়ে আপশোস্ করতে লাগলেন; ভীতও হলেন—পাছে কোনো কুকুর এসে সভা ভাঙবার ব্যবস্থা করেন, এই জন্তে। তাই, উঁইয়ের ঢিঁবির উপর থেকে, সাম্‌নের দুই ঠ্যাং যুগপৎ উত্তোলন করে'— সভ্যগণ, থামুন! থামুন! বলে, চেঁচাতে লাগলেন্, অতি চাপা সুরে। আরো বললেন, সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সভ্য গুপ্তচর! সাবধান! কে কোথায় কি বলছে, তার দৈনিক সংবাদ বিকৃত হয়ে সেখানে পৌচাচ্ছে। নিজেদের কৈফিয়ত দেবার সুযোগ নাই সেখানে! গোঁফ দেখে কুকুর বেড়ালকে দোস্ত ভেবো না কক্ষণো! ওরা আমাদের মতো চারপেয়ে গোঁফওলা বটে, তবু স্বজাতীয় নয়, জেনো। কুকুর অনুসন্ধান বিভাগের পাণ্ডা, আর বেড়াল ওদেরই সহায়কারী এক একজন! সময় থাকতে হুসিয়ার হৌন্! চুপ করুন!

কথাগুলো শেষ হতে না হতেই, উপস্থিত সভ্যগণ, কে কোন্‌দিকে কখন যে পালাবেন, সে জন্য একেবারে তৎপর আর কি! থেকে থেকে বারবার চারদিকে চাওয়া হচ্ছে আবার। চাঞ্চল্য একটু কমলেই ছুছুন্দর দণ্ডায়মান হয়ে, সুন্দর বিনীত কণ্ঠে বল্লেন, আমি মূর্খাধম এই বিদ্বজ্জন সভায় দু কথা নিবেদন করতে বাসনা করি। আমি শোনা-কথা বেশ অতিরঞ্জিত করে বলতে অভ্যস্ত আছি। আমার গায়ের ভোটকা গন্ধেই, আমার উপস্থিতি অনুপস্থিতিটা, মালুম হয় বেশী করে সকলের। আমার সম্প্রদায়, এই এক কারণেই, সকলের কাছে ধরা পড়ে মারা যেতে যেতে, বিলুপ্ত হতে বসেছে জগৎ থেকে। নরলোকেও দুঃখ কম জাগেনি। আমাদের ধ্বংসকাহিনী জগৎকে শোনাবার জন্য, "ছুছুন্দর বধ কাব্য" পর্য্যন্ত লিখে গেছেন মহাপণ্ডিতেরা। এখন কথা এই, আমরা সম্প্রদায় হিসেবে টিকে থাকতে চাই এই ভূমণ্ডলে, যাবৎ চন্দ্র দিবাকর। এখন সমস্যা, কেমন করে টিকবো, বলুন। সভ্য নরজাতির নিয়মে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় রীতি নীতি লঙ্ঘন করে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বৈবাহিক আদান প্রদান করাই হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু আমরা এই জগাখিচুড়ী জাতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত হতে চাইনে, কিছুতেই। মানুষের মধ্যে, যোগ্যতা না থাকিলেও, শতকরা ৭৫ জন চাকুরীর এবং কেউ না কেউ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মন্ত্রিত্বের মসনদ পর্য্যন্ত দাবী করছে আজকাল। তা, মানুষগুলার এক সম্প্রদায় করুকগে, আমরা তা চাইনে। খাই, না খাই, যেন তেন প্রকারেণ চাই বংশ বৃদ্ধি করা। এই তাঁতিকুল বোষ্টমকুল রক্ষা হবে কি প্রকারে, এই তো সমস্যা! আমাদের গুরুদেব কাঠবিড়াল এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর সদুপদেশ শ্রবণ করে কর্ণকুহর পবিত্র করতে সমুৎসুক হয়েছি এইক্ষণ।

প্রভুপাদ কাঠবিড়াল মহোদয় এইটুকু কথাতেই আহ্লাদে গলে গেলেন একেবারে। তোষামোদে দেবতা তুষ্ট, কাঠবিড়াল তো কোন্ ছার। তোষামোদের এমনি মহিমা, যে, বিচক্ষণ বুদ্ধিমানেরও বিলক্ষণ মতিভ্রম হবে, এতো জানা কথা। অতঃপর ওই কাঠবিড়াল কতক্ষণ মাথা নত করে থেকে, মোটা লোমশ লাঙুল, ফুলিয়ে আরো মোটা করে, একটু ভারিকি চালে বলতে লাগলেন, ভো, ভো সেবকবর্গ! তোমাদের কল্যাণ হোক! তোমরা গুণী জ্ঞানীর সমাদর করতে শিখে উন্নত হয়েছ, এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে আজকে।—

এই কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে, মোটা ল্যাজটাকে উঁচু করে তুলেই, মাটিতে আছাড় মারলেন একবার। তারপর আবার বললেন, হে বৎস ছুছুন্দর! তুমি তো আমিষাহার পরিবর্জ্জন করেছ। তথাপি কেন যে দৈহিক দুর্গন্ধ বিদূরিত হচ্ছে না তোমার, ইহাই ঘোর পরিতাপের বিষয়। তা, যা হোক্, একদা এ সকল দুর্গন্ধ আর থাকবে না তোমার। শুধু ধর্ম্মপথে থেকে, সাত্বিক আহার বিহার করে, সাধন মার্গে অগ্রসর হতে থাকো, ইহাই ভগবৎ সমীপে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি আমি। আশীর্ব্বাদ করছি আরো, তোমরা ধ্বংস পেতে পেতেও, কৈবল্যধামে পৌছতে পারবে একদিন। সেদিন গগনে দুন্দুভি বাজবে, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করবেন, নর-নারীবৃন্দ আনন্দসহকারে, ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরের বাহনরূপে, তোমাদের পূজা-অর্চ্চনা করে কৃতকৃতার্থ হবে। তোমাদের সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করে, শুধু সাংসারিক মঙ্গলের জন্য, চিরন্তন বিধি-ব্যবস্থার অমর্য্যাদা কোরো না। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র—এসব তো জলবৎ বোধগম্য হচ্ছে। সুতরাং বেশী বাগাড়ম্বর একান্তই বর্জ্জনীয়। আমার মতো অভ্যুদয় পথে চলো, চলতে থাকো বিদ্যুৎবেগে, নিঃশ্রেয়স করামলকবৎ প্রাপ্য বটে। আমরা নিরীহ নশ্বর জীব। আমোদ-প্রমোদ, হাস্যালাপ, সঙ্গীত চর্চ্চা আমাদের আদৌ শোভনীয় নয়। অসার সংসারে কয় দিনের জন্য এই সব! আমরা জন্মেছি শুধু মরবার নিমিত্ত। নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। বেঁচে আছি, তার প্রমাণ,—নিশ্বাস টান্‌ছি বলেই। মৃত্যু, সে তো কায়া-পরিবর্ত্তন। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।—বাবাজী, এ সব তো জানোই। তোমাদের কল্যাণার্থেই তো আমি সাধন-মার্গে উর্দ্ধগামী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করেছি। মনে রেখো, সাংসারিক ভোগ-বিলাসের জন্য, এই ভোগায়তন দেহের জন্য, তুচ্ছ বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বৈবাহিক আদান প্রদান, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে অনুষ্ঠিত হলেও, অধুনাতন অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য; অত্র সন্দেহ নাস্তি। তৎপর বর্ত্তমানে

দশদিকেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাসুরের যে প্রকার বাড়াবাড়ি, তাতে আর কিছু বিশেষ হোক্ বা, না হোক্, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন অনিবার্য্য। ক্ষীণজীবী আমরা। প্রতিযোগিতায় শক্তিহ্রাস করা অধর্ম্মোচিত কার্য্য বলেই তো, আমি তমোর তিমিরে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব জীব-জন্তুকে থাকবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। এই তমোময় জগৎই তোমাদের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ স্থান। এখানে না থাকলে তলাতল রসাতলে যেতে হবে। সুতরাং, অতএব অত্যধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। উপসংহারে আশীর্ব্বাদ করি, বৎস ছুছুন্দর, তোমরা পুত্র কলত্রাদি সহ সজ্ঞানে, সুস্থচিত্তে, শান্তিতে যাবজ্জীবন ভোগ দখল করতে থাকহ। কৃষ্ণে অচলা রতি হোক্ তোমাদের—ইহাই আমার অন্তকার মতো শেষ সদুপদেশ। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি। হরি ওঁ।

মূষিকপ্রবরের গা কিস্‌মিস্ করছিল, এই কথাগুলো শুনে! সে সটান্ লাফিয়ে উঠে বল্লে, ভণ্ডামি, ভণ্ডামি, ! এসব বিনা-বিচারে, যুক্তির সাথে পরখ্ না করে, গ্রহণ করতে পারবো না আর। প্রাচীনের নজীর আর বরদাস্ত হয় না আজকাল! এই কাঠবিড়াল-বংশ সমূলে ধ্বংস না হোলে, আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই, জেনো। শ্রোতৃবর্গের কি অভিমত, আজ তা সোজাসুজি জানতে চাই এইখানে।

অম্‌নি, আর কথা নাই, উপস্থিত সভ্যগণ সমস্বরে "নিশ্চয়। নিশ্চয়!" বলে' চেঁচাতে লাগলো।

প্রদোষের ফিকে অন্ধকার থিতিয়ে জমজমাট হয়েছে তখন। অদূরে কয়েকটি শৃগাল, মাঠের ভিতর তীব্র হুক্কা-হুয়া রবে নীরবতার মৌন মহিমাকে নষ্ট করলো আবার। সাথে সাথে অনুসন্ধান-বিভাগের, লোকালয়বাসী কুকুরগুলো একসাথে "ঘেউ ঘেউ" সুরু করে' দিলে। তখন বলবো কি আর!, সদা-হাসিয়ার সাত্ত্বিক কাঠবিড়াল মশাই, আমগাছের এক আগ্-ডালে, ঘন পাতার আবডালে, গা-ঢাকা দিলেন সকলের আগেই। ক্ষুদ্র চারপেয়ে জানোয়ারদের এমন যে মধুর জল্‌সা, তা এক নিমিষেই ভেঙে গেল অকস্মাৎ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ছায়া-ছবি।

কলেজে যাইতেছিলাম। রাস্তায় দেখি এক আধপাগলা ভিক্ষুক, আপন মনে কি কি বির্ বির্ করিয়া পথ চলিতেছে। ঠিক আমরই গন্তব্য পথে। পরণে বিশেষ কিছুই নাই একখানা নেকড়া—তাও আবার শতছিন্ন।

কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া একটা স্কুলের সামনে আসিয়াছি—হঠাৎ ভিতর হইতে বাইর হইয়া আসিল এক রাশ ছেলে। দেখিলাম সেই ভিখারীটাই ওদের লক্ষ্য। কেউ গালিগালাজ পাড়িল, আর কেউবা ইট পাটকেল ছুড়িয়া করুণভাবে তার সম্বর্দ্ধনা করিল। সে বিশেষ কিছুই বলিল না, আঘাত পাইয়া দুই একবার হাও হাও করিয়া কাঁদিয়া উঠিল মাত্র।

তারপর আসিল দুইটী যুবক, সিগারেট ফুঁকিয়া গল্প গুজবের স্ফূর্ত্তিতে পথ চলিতেছিল। নজরটা পড়িল আমার পাশের সেই লোকটার উপর। এক নিমিষে তাহাদের চোখ মুখ ফাঁফা হাসিতে ভরিয়া গেল। বেশ বুঝিলাম ওর কতকটা উলঙ্গতাই এদের হাসির কারণ।

আর কতদূর আসতেই দেখা হলো কোটপেণ্ট পরা কয়েক জন আফিসগামী বাবু। ভিক্ষুকটা ঠিক আমারই পাশ দিয়া চলিতেছিল। ভদ্রলোকদের দেখিয়া মিনতির ভাষায় বলিল "একটা পয়সা বাবু।" এত বড় একটা অকাজে মন দেওয়ার সময় তাঁহাদের ছিল না। এ অনুচিত প্রার্থনায় ব্যথিত হইয়া তাঁরা দেশের ভিক্ষুক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বলিলেন "বেগার্ হাউস না করলে এর প্রতিকার অসম্ভব।

সহরের প্রান্তে একটা ছোট বাড়ী। মলিন চেহারা দেখিয়া বেশ মনে হয় অসচ্ছলতার একটা আবর্ত্ত চাপিয়া সে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। আমি সে পর্য্যন্ত গিয়াও দেখিলাম—ভিক্ষুকটা আমার সাথে সাথেই আসিতেছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময়, সেই বাড়ীটার ভিতর হইতে একটা স্পষ্ট আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। "এই ভিক্ষুক, এদিকে এস বাছা, দুটী খেয়ে যাও।" উৎসুক চোখ্ দুটী ফিরাইতেই দেখিলাম, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া এক স্নেহবিগলতা মাতৃমূর্ত্তি। করুণার সেই সাদর আহ্বান ভিক্ষুকের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রবাহ ঢালিয়া দিল। আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ছুটীয়া চলিল তাঁর দিকে।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মধু-ভাণ্ড।

বর্ত্তমান যুগের অল্পশিক্ষিত মধ্যশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত—সকল শ্রেণীর শিক্ষিতই বাঙ্গলা গল্প ও উপন্যাস পাঠে মস্‌গুল। ইহা যে কোন অংশে নিন্দার বিষয় তাহা বলা হইতেছে না, বরং পাঠক শ্রেণীর পিপাসা দেখিয়া চতুর লেখকগণ তদনুযায়ী পানীয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন, হুহু করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের ঊষর মরুভূমি সুপেয় ও অপেয় পানীয়ে পরিপূর্ণ হইয়া প্রথমতঃ কূপ, তারপর পুকুর, তারপর সরোবর, পরে দিঘী ও হ্রদে পরিণত হইতেছে; কে কত জলপান করিবে কর। কবে যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বিশাল পদ্মায় পরিণত হইবে বা বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিশিয়া গল্প ও উপন্যাসের বিশাল সাগররূপে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার উত্তর দিবে কাল।

কালে কালে যে সমস্ত রচনা আমাদের হস্তগত হইতেছে, মাসে মাসে যে সমস্ত মাসিক পত্রিকা ও বাহিরের বই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঐ সমস্তের অধিকাংশের ভিতরেই যেন কালোপযোগী লঘুতা বিদ্যমান—বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে এই অনুযোগের ভাগ বেশী পরিমাণেই দেওয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন গল্প ও উপন্যাসের লেখকগণ সকলেই যদি গুরু গম্ভীর রচনায় লেখনী পরিচালিত করেন কিম্বা সমাজকে উপদেশ দেওয়ার জন্য শুধুই "সাধু" চরিত্রের বর্ণনা করেন তবে তাহা বাজারে কাটবে না, পাঠক শ্রেণী পুছবে না, সাহিত্যের দ্রুতগতিতে বাধা পড়বে; হয়ত বা যে বাঙ্গলা সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতে চলিয়াছে, মাঝ পথেই তাহার বিজয়াভিযান বন্ধ হইবে। যুক্তি এক রকম মন্দ নয়।

আপনারা সকলেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বিবিধ রচনা লহরীতে পরিপূর্ণ কোনও মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র পাঠকদের হস্তগত হইলে, পাঠকেরা বাছিয়া বাছিয়া গল্প ও উপন্যাসগুলি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলে, ঐ গুলির জন্য বন্ধুতে বন্ধুতে কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়, এমন কি "ক্রমশঃ" প্রকাশ্য উপন্যাসের অংশগুলিও বাদ যায় না। নিজের পছন্দসই গল্প হইলে উহা পাঠান্তে পাঠক মহানন্দে মন্তব্য প্রকাশ করেন "বাঃ, তোমরা, যেন এক গ্লাস মিষ্টি সরবৎ। কে খাবে খাও, কাশ্মীরী সরবৎ হে কাশ্মীরী সরবৎ।"

যে সাহিত্য এতটা আনন্দ দিতে পারে সে সাহিত্য রচনায় কার না স্পৃহা হয়? গল্প ও উপন্যাস অংশ ভিন্ন অপরাপর প্রবন্ধগুলি যদি পাঠকবর্গ বিলকুল বাদ দিয়া যায়, তবে সেই শ্রেণীর লেখকগণ কাহার জন্য লিখিবেন?

কোনও এক সাধারণ বা বিশেষ লাইব্রেরীতে যান; কি দেখিবেন? দেখিবেন লাইব্রেরীর গল্প ও উপন্যাসের বইগুলি নানা হাতে ঘুরিয়া অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে, একই পুস্তক দুই কপি তিন কপি রাখা হইয়াছে। ডিপুটিবাবুর স্ত্রী অসুখের সময় বইখানা নিয়ে ছিলেন, একশিশি ঔষধে বইখানা নষ্ট করে' দিয়েছে। আর্দ্দালী পুস্তকের দাম নিয়ে উপস্থিত। রায়দের খোকাবাবু স্কুলের পড়া লুকিয়ে গোপনে এক নির্জ্জন স্থানে ঐ বইখানা পড়ছিল, পাঁচ সাতটি ডানপিটে ছেলে ঐ

স্থানের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে' পুস্তকের অঙ্গ ভঙ্গ করে' দিয়েছে; টানাটানি রাহাজানির চূড়ান্ত! মণিদের ছোট বৌ রঙ্গিলা পুস্তকখানা পাকের ঘরের লঙ্কা হরিদ্রার বিমিশ্র রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া তাতে একটু কেরোসিনের কালী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি। গল্প ও উপন্যাস পাঠে দেশবাসীর স্পৃহা যে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বে অল্পশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত উভয়ের নাম একই শ্রেণীতে ফেলিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছি কি না বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারিব "কিছু ইতর বিশেষ।" অর্থাৎ অল্পশিক্ষিতগণ গুরু গম্ভীর প্রবন্ধের মর্ম্ম বুঝে না বলিয়া পড়ে না, উচ্চশিক্ষিতগণ মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও সময়াভাবে বা ইচ্ছার অভাবে অথবা কালের স্বভাবে গুরুপথে পদক্ষেপ না করিয়া লঘুপথেই বিচরণ করিতে প্রয়াসী হন। এই কারণেই—আমাদের মনে হয় বঙ্গের বহু শক্তিমান্ লেখক ভালো ভালো প্রবন্ধ না লিখিয়া গল্প ও উপন্যাস রচনায় মক্‌স করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি অনেক খ্যাতনামা লেখকও গল্প রচনার লোভ সামলাইতে পারেন না।

এইরূপ ভণিতা অবতারণা করিবার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে; সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে একটু তুলনামূলক আলোচনা করা। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের ন্যায় গল্প উপন্যাস কমই আছে. যাহা আছে তাহা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনার যোগ্য। তবে পুরাণ উপপুরাণ ও মহাপুরাণ প্রভৃতিতে যে সমস্ত গল্প ও সত্যকাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে মিলিবে না। বেদ-বেদাঙ্গ, উপনিষদ, স্মৃতি. সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিতে যে অমৃত মধু রহিয়াছে তাহার এক কণার আস্বাদ সমগ্র জগতের অপর কোনও সাহিত্যে মিলিবে না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব এই স্থানে।

আজ আমরা বৈদেশিক শিক্ষার মোহে স্বাদেশিক শিক্ষার অমৃত রসে বঞ্চিত হইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিগ্রহে ভবিষ্যতে আচণ্ডাল সমস্ত হিন্দু বুঝি সংস্কৃত ভাষা আর পড়িতে পাইবে না! বাঙ্গালার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে যে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর অবশ্য-পাঠ্য ছিল সেই সংস্কৃত ভাষা নাকি এখন ছেলেদের স্বেচ্ছাপাঠ্য, হইবে, অর্থাৎ ছাত্রগণ ইচ্ছা হয় উহা পড়িবে, না হয় না পড়িবে।

একসময় স্ত্রী, শূদ্র ও অন্ত্যজ-জাতিগণ ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিত ব্রাহ্মণেরা নাকি উহাদিগকে বেদপাঠে বঞ্চিত রাখিয়াছে! কিন্তু কালের স্বাভাবিক স্রোতে আজকাল কি স্ত্রী, শূদ্র কি অন্ত্যজ সকল শ্রেণীর হিন্দুই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই ক্ষণ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ব্রাহ্মণদের উপর টেক্কা মারিয়া 'মহা ব্রাহ্মণ' সাজিতে বসিয়াছেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের সমক্ষে প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অথচ দেশের লোক চীৎকার করিয়া মরিতেছে "দেশ গেল, বিদ্যালয়ে এখন Godless Education দেওয়া হইতেছে, ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা, ধর্ম্মহীন শিক্ষা।" অধিকন্তু প্রকারান্তরে প্রায় সেই শ্রেণীর লোকগণই ধর্ম্মমূলক সংস্কৃত ভাষার পাঠ্য পাঠন বিদ্যালয় সমূহ হইতে একেবারে তুলিয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচেন! নিজের দেশের সমস্ত বিশিষ্টতা ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়া স্বরাজ্যভক্তগণ কি প্রকারে যে স্বরাজ লাভ করিবেন তাহার আকার প্রকার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সংস্কৃত ভাষা ঝুনো নারিকেলের মত। উপরিভাগটুকু ছোবড়ায় পরিপূর্ণ, নীরস। ছোবড়া দূর করিয়া শক্ত মালাটী ভাঙ্গিলেই বাঃ বাঃ কি সুন্দর টল টল জল, কিবা সুন্দর অফুরন্ত মধু! ব্যাকরণের শুষ্ক কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী 'কৌমুদীর' সাহায্যেই ছাত্রগণ ব্যাকরণের গণ্ডী পার হইয়া সাহিত্যের বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তখন ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রসিন্ধুর ভিতর কত যে অমৃত কত যে মণি, কত যে কৌস্তুভ, পারিজাত, হরিচন্দন, উচ্চৈঃশ্রবা, রহিয়াছে তাহার খবর করিতে পারে। কাঁটা দেখিয়া ক্ষান্ত হইলে কমল লাভ হয় না, ঢেউ দেখিয়া সমুদ্রে না নামিলে কমলা-লাভও হয় না।

আমি এই স্থানে বলিতে চাই, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ন্যায় নব্য ধরণের গল্পোপন্যাস না থাকিলেও অন্য ধরণের প্রচুরগল্প, প্রচুর রস, প্রচুর রঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার এক বিন্দু রস "এক গ্লাস মিষ্টি সরবৎ" হইতে অনেক মিষ্টি, অনেক উপাদেয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন কবি ও পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত নানা শ্রেণীর যে সমস্ত উদ্ভট শ্লোকও রসাত্মক কবিতা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সমস্ত কবিতার এক এক একটি পঙক্তি বাঙ্গালার এক একটি গল্প হইতে বেশী

আর্ট বেশী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেয়। এক একটি পঙক্তি নহে এক একটি শব্দই, এক একটি বৃহৎ উপন্যাসের মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিকতর মর্য্যাদা ও গৌরব পোষণ করে।

ঐ শ্রেণীর একটি শ্লোকের রচয়িতা বর্ত্তমানকালের একটি গল্প লেখক অপেক্ষা বেশী রসিক, বেশী পণ্ডিত, বেশী শিক্ষিত, অথচ সমাজের রক্ষক। দু'একটি নমুনা বলিতেছি; এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের নিপীড়নে ভিক্ষার্থ বাহির হইয়া জনৈক বদান্য রাজন্য সভায় উপস্থিত। তখনকার সকল ব্রাহ্মণই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণও সংস্কৃত ভাষাতে শ্লোক রচনায় অথচ গল্পভাষণে ওস্তাদ ছিলেন। স্বয়ং রাজাও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন করিলেন কাতে প্রার্থনা? আপনার প্রার্থনা কি? ব্রাহ্মণ নানা ব্যক্তির নিকট নানা রকমের সাহায্য প্রার্থনা করেন; ভাবিলেন এই রাজার নিকট নূতন কিছু করিতে হইবে। তখন শীতকাল, ব্রাহ্মণ বলিলেন মহারাজ আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিতেছি এই প্রশ্নগুলির উত্তরের ভিতরেই আমার প্রার্থিতব্য পদার্থের নাম খুজিয়া পাইবেন? বলুন দেখি মহারাজ! (১) পাখী কোথায় উড়ে? (২) শতবার ধৌত করিলেও কাহার ময়লা দূর হয় না? (৩) পণ্ডিত ব্যক্তি নিজকে কেমন ভাবিয়া বিদ্যার আরাধনা করিবে? (৪) সংসারে নিন্দনীয় কে? (৫) ইন্দু কাহার পতি? (৬) অমৃতভাষী কাহারা (৭) জাতি শ্রেষ্ঠ কে? (৮) পৃথিবীর ভার সহ্য করে কে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যে যে শব্দ হইবে সেই সমস্ত শব্দের আদি ও অন্ত বর্ণ বাদ দিয়া পাঠ করুন।

পক্ষী কোড্ডয়তে মলং ন শতধৌতেনাপি কো মুঞ্চতি?
বিদ্যার্থং পরিচিন্তয়েদ্ বুধগণঃ কীদৃক্ চ কো গর্হিতঃ?
কস্যা ইন্দুরিনোঽপি কেঽমৃতগিরঃ কো জাতিচর্য্যো নৃপ!
কো বা ভারসহো বিচার্য্য মতিমন্নাদ্যন্ত লোপাৎ পঠ।

উঃ—১। গগনে ২। অঙ্গারঃ ৩। অজরঃ ৪। বালিশঃ (মূর্খ) ৫। নিশায়াঃ ৬। বালকাঃ ৭। ভূদেবঃ (ব্রাহ্মণঃ) ৮। অনন্তঃ।

শ্লোকের কৌশলে বুঝা যাইতেছে যে প্রার্থী ব্রাহ্মণ "গন্নাজলি শাল দেন" প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সময় যে বাঙ্গালা ভাষাও অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ ও ঐ উত্তর বাক্যদ্বারাই বুঝা যাইতেছে। যেমন একটী শ্লোক রচনা ব্যাপারে কোন্ কোন্ বিষয়ে কতটুকু হুসিয়ার হইতে হয় কোন্ পঙ্ক্তি রচনার কতটা অক্ষরের হিসাব করিতে হয় তাহার খবর জানেন কবিতা লেখকেরা। প্রচলিত ছন্দঃ সমূহের মধ্যে স্রগ্ধরা ও শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দই সুদীর্ঘ। উক্ত শ্লোক শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত। ইহার নিয়ম এই, চারি পাদে এক শ্লোক, প্রত্যেক পাদে ১৯ অক্ষর। প্রথম তিন অক্ষর গুরু (দীর্ঘ) চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর হ্রস্ব, ষষ্ঠ গুরু, সপ্তম হ্রস্ব, অষ্টম গুরু, নবম দশম ও একাদশ অক্ষর হ্রস্ব, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ গুরু, পঞ্চদশ হ্রস্ব, ষোড়শ ও সপ্তদশ গুরু, অষ্টাদশ হ্রস্ব, ঊনবিংশতি গুরু বা হ্রস্ব।

এতগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ ঠিক রাখিয়া অথচ যতি বিরাম প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হয়, পরন্তু উহার ভিতরেই ভাব, ভাষা, আর্ট (কৌশল) ও বক্তব্য বিষয় বিশদরূপে থাকা চাই। একটু এদিক্ সেদিক হইলে শ্লোক হইবে না; সেই পণ্ডিতের মধ্যে কবিত্বশক্তির অভাব দৃষ্ট হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কত শ্লোক ও কত গল্প যে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আজকালকার বাঙ্গালা পাঠকেরা উলঙ্গ অশ্লীলতা ভাল বাসেন; সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা খুবই আছে বটে কিন্তু তেমন ধারা উলঙ্গতা নাই; সুন্দীয়ানার আবরণে প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা গম্ভীর পাঠকের পর্য্যন্ত গুম্ফতলে হাস্য রেখা অঙ্কিত করে। একটা মাঝামাঝি নমুনা দেই—

এক বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত। যুবা পুরুষ, সুন্দর চেহারা। রাত্রিতে আহারের পর অতিথি শুইয়া আছেন। বর্ষাকাল, ঘন জলদজালে গগন আবৃত। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার। বাড়ীর কর্ত্তা সারাদিন চাকরি জীবনের কঠোর খাটুনি খাটিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, বরফের জল গায়ে ঢালিলেও চৈতন্য আসিবে না। চোরের উৎপাতে গ্রামের লোক রাত্রিতে বাড়ী হইতে বাহির হয় না। বাড়ীর কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা কামের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের গৃহ ছাড়িয়া অতিথির গৃহের দরজার ধারে যাইয়া ডাকিতেছে "ওগো পথিক জাগো জাগো, আমার বড় ভয় হ'য়েছে। এই

ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, আমি একাকিনী জেগে আছি, স্বামী আমার চেতনাহীন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যামিন্যেষা গহনজলদৈর্ লব্ধভীমান্ধকারা
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখৈঃ।
বালা চাহং মনসিজ ভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ় প্রকম্পা
গ্রামশ্চৌরৈ র্মুষিতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি॥

শ্লোকের ভিতরে কবি এমন চতুরতার সহিত ভাষা বিন্যাস করিয়াছেন, যাহাতে অভিসারিকার উক্তি অতিথিকে জাগাইবার উদ্দেশ্যেই প্রতীতি হইতে পারে। অথবা কামাতুরার কামপ্রার্থনা ও হইতে পারে। বুঝ লোক যে জান সন্ধান। এই শ্লোকের ছন্দ—'মন্দাক্রান্তা,। ১৭ অক্ষরে পাদ।

লোকে যদি এই শ্রেণীর শ্লোক বা এতদপেক্ষা রসাত্মক শ্লোককেই মিষ্টি মধুর বলিয়া মনে করেন তবে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অন্ত নাই। ইহা ছাড়া সমস্যা-পূরণ, মনসিপূরণ, গূহপূরণ, শ্লেষ, দ্ব্যর্থক শ্লোক পদ্মবন্ধ, মুরজবন্ধ, চক্রবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধভ্রমক, গতপ্রত্যাগত, গূঢ়-চতুর্থ, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, অসংযুক্ত, অতালব্য, নিরোষ্ঠ, প্রভৃতি লক্ষণান্বিত নানা রকমের কবিতার পরিচয় আছে। এক এক শ্লোকে এমন বাহাদুরী যাহার তুলনায় বাঙ্গালার গল্প অতি নিম্নেই স্থান পায়। সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের নাগপাশটুকু ছিন্ন করিয়া উঠিতে পারিলেই ব্যস্, তখন আর সেই ধনুর্দ্ধরকে নাগাল পায় কে? ইনি তখন যেদিকে বাণ লক্ষ্য করিবেন সেই দিকেই সিদ্ধিলাভ।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান নমুনায় আর একটী সংস্কৃত গল্প বলিয়াই আজকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব। 'এক বড়লোকের মেয়ে। বিবাহের পর স্বামী ঘরজামাইর মত শ্বশুরালয়েই প্রতিপালিত হইতেছেন। জামাই পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র, কিন্তু খুব বিদ্বান্ বলিয়াই কন্যার পিতা উহাকে জামাতৃ পদে বরণ করিয়াছেন। জামাই বাবু অষ্ট প্রহর পুঁথি পুস্তকের ভিতরেই তন্ময় হইয়া থাকিতে ভালবাসেন। নারীরক্ষা বনাম গৃহরক্ষা করিতে কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিতে হয় সেই খেয়াল তার কম ছিল। বিশেষতঃ দরিদ্রের সন্তান হইয়া ধনবতী পত্নীর সমক্ষে সময় সময় সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেন। পত্নীটী প্রতিবেশী অপর এক বিলাসী বাবুর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন; গুণে নহে, শুধুই বাহ্য আড়ম্বরে। একদিন নিদ্রিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া উপপতির নিকট যাইতে ক্ষণকাল বিলম্ব হওয়ায় তাহার কারণ তাহাকে না বলিলে সে তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে ভীতা কুলটা ক্ষমা চাহিল; উপপতি বাবু সেই রাত্রিতেই উহাকে বাড়ীতে যাইয়া উত্তম বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া আসিতে বলিল। তদনুসারে কার্য্য হইলে উভয়ে মিলিয়া দে চম্পট। যেতে যেতে এক নদীর তীরে উপস্থিত। লম্পট চূড়ামণি ধনি কন্যার ধন রত্ন ও 'সর্ব্বস্ব' সমস্ত অপহরণ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইল এবং ছলবাক্যে মূল্যবান্ অলঙ্কার প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া পলাইল। এদিকে রাত্রি প্রায় ভোর হয়, পরিধানে অসম্পূর্ণ বস্ত্র, কাজেই ধনি-কন্যা নদীর জলে নামিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে এক শৃগালী একটুকরা মাংস মুখে করিয়া সেই পথে যাইতেছিল। হঠাৎ দেখিল কি, একটা মাছ নদীর জলে লাফ দিয়াছে। যেই দেখা, অমনি মুখের মাংস খণ্ড জলে ফেলিয়া দিয়া মাছ ধরিবার জন্য জলে ঝাপাইয়া পড়িল। হায় হায়, মাংসের টুকরাও গেল, মাছও পালাইল। ইহা দেখিয়া সেই ধনি কন্যা এত দুঃখের সময়েও একটু মুচকি হাসিল। তখন কবি যেন ব্যঙ্গচ্ছলে শৃগালীর পক্ষ হইয়া শ্লোক রচনা করিয়া বলিতেছেন "ওগো কামুকি! নিজের দোষ না ভাবিয়া পরের দোষ দেখিয়া হাসিতেছ! তোমারও যে আজ শৃগালীর মত অবস্থা। উপপতির প্ররোচনায় স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া তোমার একুল ওকুল দুকুল গেল। অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় জলে নামিয়া আছে, লজ্জা নাই!

"আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী
জারস্যার্থে পতিং হিত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা॥

কেহ কেহ 'হিত্বা' স্থলে 'হত্বা' পাঠ করেন। তাহাতে অর্থ হয় এই, ধনিকন্যা উপপতির পরামর্শে নিজের পতিকে হত্যা করিয়া আসিয়াছিলেন। দুষ্টা নারীর পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব আর কিছুই নাই। আরও কত রকমের গল্প যে সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় তাহার বিবরণ দিতে গেলে মহাভারত বাড়িয়া যায়, কাজেই আজ এই স্থানেই 'ইতি'।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী।

দিবাস্বপ্ন

(কথিকা)

স্নিগ্ধ দ্বিপ্রহর—জলভরা মেঘে আবৃত গগনমণ্ডল। দক্ষিণের সুমন্দ পবনে জুড়াইয়া দিতেছে সকল শরীর—দ্বিতলের মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া বাহির বিশ্বের বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছি।

উত্তর অঙ্গনের নারিকেল-বিটপী-শীর্ষ বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে—তাহারি গায়ে গায়ে সংলগ্ন পনসবৃক্ষের শাখায় শাখায় তরঙ্গিত স্নিগ্ধ মারুত হিল্লোল। বহুদিনের প্রতিবেশী উহারা, পত্রের মৃদুল স্পর্শে গভীর প্রীতির মৌন বিনিময়ে আত্মহারা।

পূর্ব্বে ঐ ঘন পল্লব নিবিড় আম্রশাখী অসিতবরণে তার নয়নে শ্যাম অঞ্জন মাখাইয়া দিল। তাহারি অন্তরালে দূরান্তরের সুদৃশ্য পল্লীবনবীথী—যেন কোন অদৃশ্য-শিল্পী তুলিকার গাঢ়-সবুজ-সৌন্দর্য্য-সম্পাত। এ দিকে নাটমণ্ডপের উচ্চ ছাদে কেলীনিরত পারাবতাবলী সহসা তাদের মুগ্ধ ক্রীড়াব্যাহত করিল, কি এক অজ্ঞাত আরাবে। ভীত চকিত হইয়া তারা উড়িয়া গেল দলে দলে কাতারে কাতারে। আবার কি জানি কেন সারি বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিল—স্তব্ধ আকাশে যেন দুইটি লহরী বহিয়া গেল। ভাদ্রের বর্ষণের কোনও স্থিরতা নাই; সহসা দেখি শান্তবায়ু প্রবল বেগ ধরিয়াছে, জলভারমন্থর জলধর অঝোরে ঝরিতে সুরু করিল। জলের ঝাপটে শয্যা ভিজিয়া যায় গবাক্ষরুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। তন্দ্রায় নয়ন অভিভূত—জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম সহসা স্বপ্নে জাগিয়া উঠিলাম।

চোখ মেলিয়া দেখি এক অজানা অভিনব কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! চারিদিকে আকাশ—বিশাল আকাশ—সীমাহারা নীল—কূলহীন ইথার সাগর। ধরণীর শেষ ধূলি-কণাও নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—প্রদোষের আলো আঁধারে মিশানো চারিধারে—তারি মাঝে মনোরথ দিশাহারা কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে—সবই ছায়া ছায়া অজানা আবছায়ায় কিছুই বুঝিতেছি না। একি সত্য না মায়া—বাস্তব না প্রহেলিকা!

বাতাস স্তব্ধ নিথর কোথাও কোনও সাড়া নাই বক্ষের নিশ্বাস বহিতেছে কিনা সন্দেহ মূক উৎকণ্ঠায় মগ্ন চৌদিক!

নীরব আরও নীরব—গভীর নীঃরবতায় প্রকৃতি অচেতন তারি মাঝে হঠাৎ এক সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন—মৃদু অতি মৃদু সমীর মূর্চ্ছণ দূর সুদূরের এক তরঙ্গ কম্পন—কিসের শব্দের ক্ষীণ সাড়া স্পষ্ট, স্পষ্টতে আরও পরিষ্কার পক্ষের উড্ডীনধ্বনি আর, সূচীসূক্ষ্ম, তীব্র, বীণারনিক্কণ প্রায়—অস্ফুট মধুর কূজন কাকলী ক্রমে নিকটে আরো নিকটে ফুটিয়া উঠিল শুভ্রধূসর বিহগের সারি বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে কোথায় তা জানি না—অজানার তীর হইতে কোন অজানার উপকূলে।

সলীল-পতত্রের মিলিত সঞ্চলনে দৃশ্যে ও শব্দে এক অপরূপ সুষমা, অমরার এক মোহন মায়া সঞ্চারিত করিয়া দিল সারা আকাশে। চোখের পলক, আর কিছুই নাই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছে দিবাস্বপ্ন শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

লছমনিয়া

(গল্প)

(১)

জমিদার সন্তোষ বাবু তাঁর পুরাতন ভৃত্য লছমনিয়ার উপর আজ ভারি চটিয়া গিয়াছেন। তার অপরাধ সে বাবুর একটি বিশেষ আদেশ প্রতিপালন করে নাই। তিনি তাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া দারোয়ানকে কড়া হুকুম দিয়াছেন তাকে যেন আর এ বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

লছমনিয়া যাইবেই বা কোথায় ? তার বাড়ী নাই, ঘর নাই, স্ত্রীপুত্র নাই, আত্মীয়স্বজন বলিতেও কেহ নাই। সে বাবুর পিতামহের আমলের চাকর ; সারাজীবন এই সংসারে চাকরী করিয়াই কাটাইয়াছে ; বাবুকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। বিশেষ বাবুর পাঁচ বছরের ছেলে নরুকে সে অত্যন্ত ভালবাসে, তাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারে না ! তাই তার এই সংসারের প্রতি ভারি মায়া। কি করে নিকটেই একটা আমগাছ তলায় অনাহারে পড়িয়া থাকিয়া ঐ বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছে, প্রাণের একান্ত বাসনা আর একবার তার স্নেহের নরুকে বক্ষে ধারণ করিয়া চিরতরে বিদায় হয় ; অন্ততঃ যদি একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাইতেও পারে।

আর নরুরও এই সংসারে লছমনিয়াই সব। সে না হইলে তার একদণ্ডও চলে না। খাওয়ার সময় লছমনিয়া হেভোম পেচার মত গল্প, ময়নামতি টুনটুনির গল্প না বলিলে তার খাওয়া হয় না, নিদ্রার সময় সে ঘুমপাড়ানি গান না করিলে তার নিদ্রাই আসে না ; সে তার পিঠে চড়িয়াই ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপ বেশভূষায়, খেলায়, বিহারে সর্ব্বদা সকল কাজে লছমনিয়াই তার একমাত্র সম্বল। আজ এই লছমনিয়াকে কাছে না পাইয়া নরু যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল ; সমস্ত বাড়ীটা যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া দুই একবার দৌড়িয়া কাছে গিয়াছে, কিন্তু তাঁর রক্তচক্ষু দেখিয়া কিছুই বলিতে সাহস পায় নাই ; ভয়ে এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া আসিয়াছে। মাকে কত জিজ্ঞাসা করিয়াছে। মা কিছুই বলিলেন না, বলিতে সাহস পাইলেন না, পাছে তার একমাত্র ধন নরু তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম লছমনিয়ার শোকে কাতর হইয়া পড়ে। আজ তিনিই তাকে কোলে করিয়া এ কথা সে কথায় ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লছমনিয়া সর্ব্বস্ব তার প্রাণ কি প্রবোধ মানে ? সে এক একবার কোল হইতে নামিয়া দৌড়িয়া নীচে যায়, আবার উপরে আসে। কোন শব্দ হইলেই চকিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখে এই বুঝি তার লছমনিয়া আসে। সেদিন তার স্নান, আহার কিছুই ভাল লাগিল না ; তাহার হাসি-খেলা আমোদ-আহ্লাদ সবই চলিয়া গিয়াছে ঐ একজনের অভাবে।

এদিকে সারাদিন না খাইয়া বেলা শেষে লছমনিয়া ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবসন্নদেহে মাটীতে শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল মধ্যেই তার তন্দ্রা আসিল। নরু মধ্যাহ্ন আহারের পর আজ আর নীচে যায় নাই ; তার মা তাকে যাইতে দেন নাই। আহারের পর তিনি তাকে নিয়া শয়ন করিলেন। তার কিন্তু ঘুম মোটেই হইল না ; হইবে কি লছমনিয়া যে ঘুমপাড়ানি গান গায় নাই। সে কেবল বিছানায় পড়িয়া

এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মা ঘুমাইয়া পড়িলে সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিল এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস এই রাস্তা দিয়া নিশ্চয়ই তার লছমনিয়া আসিবে। মনে তার আজ লছমনিয়ার উপর অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে। একবার পাইলেই হয়, তাকে এর উপযুক্ত শিক্ষা সে দিবেই দিবে। সরলপ্রাণ শিশু, সে বুঝিতে পারে নাই—লছমনিয়ার পক্ষে ঐ বাড়ীর দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। নরু তখনও সেই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ দৃষ্টি গেল ঐ আমগাছটার তলায়, যেখানে ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্নদেহ লছমনিয়া মাটীতে পড়িয়াছে। এ কি? কে ওখানে শুইয়া আছে?—লছমনিয়া না? সে আমতলা পড়িয়া কেন? তার কি কোন অসুখ করিয়াছে? অসুখ করিয়া ত —ঐখানে—মাটীতে শুইয়া কেন? তার ত ভাল বিছানা আছে!

বিস্ময় ও উদ্বেগের সহিত ক্ষণকাল সে এইরূপ চিন্তা করিল;—কিছুতেই সে স্থির করিতে পারিল না, কেন লছমনিয়ার এই দশা। ইচ্ছা হইল একবার মাকে ডাক দেয়; দুই এক পা করিয়া শয্যার কাছে আসিল; কিন্তু কি মনে করিয়া আর ডাক দিল না। সে চুপি চুপি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। প্রাতে তার জন্য কয়েকটি আঙ্গুর ও দুই জোড়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল। উহার সে কিছুই খায় নাই, থালাতেই পড়িয়াছিল। আসার সময় সে সেগুলি হাতে করিয়া আনিল কারণ সে জানে তার লছমনিয়া আজ খায় নাই, এক বিন্দু জলও তার মুখে পড়ে নাই। ক্রমে সে রাস্তায় আসিয়া ঐ আমতলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া সে তার যে অবস্থা দেখিল তাহাতে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিজ গাত্র হইতে জামাটা খুলিয়া লইয়া তার উপাধান করিয়া দিল। মাথা নাড়া দিতেই লছমনিয়া জাগিয়া উঠিল; দেখিল তার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি নরু ফল ও সন্দেশ হাতে করিয়া তার পাশেই ভুঁইতে বসিয়া আছে। যাকে দেখিবার জন্য তার প্রাণ এত ব্যাকুল সে যে আপনিই আসিয়া প্রেম, প্রীতি ও সরলতার সৌম্য মূর্ত্তিতে তার সমক্ষে উপস্থিত। তার নরু যে তাকে ভুলে নাই ইহা দেখিয়া আনন্দে তার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। আত্মহারা হইয়া তাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য যেই সে হাত বাড়াইল, অমনি উপরতালা হইতে গর্জ্জন হইল—"কিরে নরু?" সন্তোষ বাবু এ সব কাণ্ড দেখিয়া একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। ছুটিয়া আসিয়া তিনি নরুকে কান ধরিয়া লইয়া গেলেন, আর লছমনিয়াকে তখনই গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আঙ্গুরগুলি ও সন্দেশ দুই জোড়া সেই খানেই পড়িয়া রহিল। লছমনিয়ার অন্তিম বাসনা আর পূর্ণ হইল না।

(২)

ইহারই দিন দুই পরে একদিন বাবুর স্ত্রী এক দাসী সঙ্গে করিয়া নরুকে লইয়া পিছনের দীঘিতে স্নান করিতে গেলেন। নরুকে স্নান করাইয়া সিঁড়িতে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা জলে নামিল। ঘাটলার পাশেই একটি সুন্দর জলপদ্ম। নরু উহা লইবার জন্য সেদিকে হাত বাড়াইল, অমনি হঠাৎ জলে পড়িয়া একেবারে তলাইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া বাবুর স্ত্রী ফিরিয়া দেখিয়া "হায়, হায়—গেল—গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "খোকাবাবু জলে পড়িয়া গিয়াছে—জলে পড়িয়া গিয়াছে" বলিয়া ডাকাডাকি ও চীৎকার করিতে করিতে দাসী বাহির বাড়ীর দিকে ছুটিল।

হট্টগোল শুনিয়া যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। কেহ কেহ লাফাইয়া জলে পড়িল। কিন্তু হায়, কেহই খোকাকে উঠাইতে পারিল না। তখন মহাসোরগোল পড়িয়া গেল। বাবুও আসিয়াছেন। তার চক্ষের জল আর রোধ মানে না, নরু যে তার একমাত্র সন্তান, বংশের দুলাল। বুক তার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। বাবুর স্ত্রীও বুকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় লছমনিয়া কোথা হইতে টলিতে টলিতে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিল। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে আবার এই কয়দিন যাবত একরূপ অনাহার ও অনিদ্রা, ঘোর দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্টে সে একেবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে; চক্ষু তার কোটরগত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। আসিয়াই সে স্খলিতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যেখানে সকলে নরুকে খোঁজ করিতেছিল সেখানে ডুব দিল। কতক্ষণ যায়, সেও আর উঠে না। পরে জেলে ডাকাইয়া জাল টান দেওয়া হইল।

এক টান, দুই টান, তিন টান, পরে দুইটি মৃতদেহ জালে উঠিল, একটি নরুর ও অপরটি লছমনিয়ার। লছমনিয়া নরুকে জড়াইয়া বুকে করিয়া আছে। জীবনে মরণে তার বুকের ধন বুকেই রহিল। ভগবানই তার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিলেন।

বাবুর স্ত্রী বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, লছমনিয়া থাকিলে কি নরু আমার এমনি যায়!"

বাবু চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এমন অকৃত্রিম ভালবাসা, এত গভীর প্রাণের টান ওর আমার নরুর প্রতি! থাকৃতে চিনি নাই। অকৃতজ্ঞ হইয়াছিলাম, সেই পাপেই বুঝি আমার এই শাস্তি।"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

চিত্র পঞ্চক*

প্রথম চিত্র—সমাজ ও সাহিত্য

প্রায় ছয় হাজার বছরের আগের কথা। কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পাণ্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তটে দাঁড়াইয়া দেখিলে, যতদূর দৃষ্টি চলে—কেবলি বীচিমালা ফেণিল জলরাশি! তাহাতে তৃণ গুল্মাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের কোন চিহ্নও দেখা গেল না! পাণ্ডবেরা সুতরাং 'দুস্তোর' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক কারণে ভূমির পরিবর্ত্তন হইল। ভূপঞ্জরের উন্নতি হইল,—'খর গাঙ্গে চড়া পড়িল।' ক্ষুরধার ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে স্থানে স্থানে শত শত ছোট বড় চড়া পড়িল। নিম্নবঙ্গে এগারসিন্দুর, দগদগা, আর্শী, জাঙ্গালীয়া, দ্বীপেশ্বর পাটধা, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি হইল! ব্রহ্মপুত্র সন্তান ঐ সকল দ্বীপ মনোহর তৃণগুল্মে শোভিত হইল। পক্ষ্যাদি বাসা করিল মানুষ আসিল। কোচ হাজং প্রভৃতি এই নূতন দেশের অধিবাসী হইল। ক্রমে ঐ স্থান আর দ্বীপ সমূহ রহিল না—বিস্তৃত ভূখণ্ড অসংখ্য প্রাণীর আবাস হইয়া উঠিল,—মানুষে মানুষে দেশটা ভরিয়া গেল। জঙ্গলবাড়ীতে লক্ষ্মণ হাজো আর অগ্রসিন্দুর বা এগার সিন্দুরে বিবিধ কোচ্ রাজত্ব করিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে ভাল মানুষেরা আসিতে লাগিলেন।

দেশে প্রায় সর্ব্বত্র নল খাগড়ের জঙ্গল, কত আগাছা, কত চিত্র বিচিত্র ফুলের, ফলের গাছ, কত বা পুষ্পিতা লতার সমীকৃত সৌন্দর্য্য যেন দেবতা আশীর্ব্বাদের সাগর সিঁচিয়া দিলেন! পূর্ব্বদিকে দিগন্ত বিসর্পিত হাওরের মাঝখানে ঢেউয়ের সাথে মাথামাথি করিয়া হাওরের জল রক্তে রাঙা করিয়া দিয়া অরুণোদয় হয়,—আর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে রাঙা রবি ছবি লইয়া হিল্লোল খেলা করিয়া তাহাকে বিদায় দেয়। এমনি সৌন্দর্য্যের সায়রের একখানি স্বপ্নরাজ্য ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভগবতী গড়িয়া তুলিলেন! তার বনে বাঘ, মহিষ, শূকর, হাতী, সাপ, শ্যামা, দয়েল, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি!, জলে কুমীর আর অফুরন্ত মাছ! দিকে দিকে বেওর বন্দ—! ভোরের সূর্য্য হাওরের জলরাশিতে স্নান করিয়া উঠিয়া কোন্ অজানা দেশের শীকর-সম্পৃক্ত অমৃতায়মান বায়ুর সাথে স্বাস্থ্য ও শক্তি বিলাইয়া দিয়া যাইত।

দ্বিতীয় চিত্র—শক্তি

কোচ রাজা লক্ষ্মণ হাজরা রাজধর্ম্ম পালনে ত্রুটী করিতেছিলেন। এই সময় ভগবানের প্রেরণায় বাংলায় স্বাধীনতার বাণ ডাকিয়াছিল। দিকে দিকে স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইল। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ইশা খাঁ প্রভৃতি বিভিন্ন বঙ্গখণ্ডে স্বাধীনতা প্রচার করিলেন। সম্রাট আকবর ইহাকে বাংলার বার ভূঁইয়ার বিদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারভূঁঞা দমন করিতে দীল্লির প্রভূত শক্তি ব্যয় হইতে লাগিল। সাহাবাজ খাঁ ইশা খাঁর সঙ্গে লড়াই করিলেন। অবশেষে অম্বরপতি মানসিংহ ইশা খাঁকে তাড়না করিলেন। ইশা খাঁ নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এই নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তখন এ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার রাজা উপাধি লইয়া স্থানীয় সৈন্যদল গঠন করিয়া প্রবল প্রতাপে অবস্থান করিতেন। এই কিশোরগঞ্জের অনতিদূরে রাঢ়দেশাগত দেবীবর সিংহ নামক কায়েস্থ বাসস্থান নির্ণয় করেন। ইঁহারা "আইচ" উপাধিধারী। দেবীবরের পৌত্র গোবিন্দ হাজরা

---

* কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত। ১৩৩৩—আশ্বিন।

তখন হোসেন সাহার নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ হাজরাদী ও হোসেনসাহী এই দুই পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। গোবিন্দ হাজরার পৌত্র রাজা গুণীচন্দ্র তখন পরাক্রান্ত রাজা। ঠিক এই সময় ইশা খাঁ দিল্লীশ্বর হইতে ২২ পরগণার জমিদারী ও দেওয়ান মসনদ আলী উপাধি লইয়া জঙ্গলবাড়ীতে আসিয়া লক্ষণ হাজরাকে তাড়াইয়া তথায় পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন রক্ষা করিলেন। ইশা খাঁ কাঁকরদীয়ার বিস্তীর্ণ মাঠে গুণীচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয়পক্ষে এই নিম্নবঙ্গের অসংখ্য হিন্দু মোসলমান সেনানী প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিল। ইশা খাঁ পরাজিত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার কৌশলে গুণীচন্দ্র নিহত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করিলেন।

এই গুণীচন্দ্রের পিতা যশোবন্ত খাঁর আমলে যশোদল গ্রামের প্রতিষ্ঠা এবং যশোদলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তখন হইতেই ইঁহাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত।

ইশা খাঁ চারিপাড়ার মাহিষ্য রাজা নবরঙ্গ রায়কেও ধ্বংস করিয়া আপততঃ দেশ নিরাপদ করিলেন।

ভারত বিজয়ী মহাবীর মানসিংহ ইশা খাঁকে দমন করিতে আসিলেন। ইশা খাঁ এগারসিন্দুর দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দাস, তীয়র, জেলে, নমশূদ্রে গঠিত দুর্জ্জয় বাঙ্গাল সৈন্য এগারসিন্দুরের দুর্গ প্রাকারে দাঁড়াইয়া ভীষণ হুঙ্কার দিয়া উঠিল, মৃণ্ময় দুর্গ প্রাচীরে ইশা খাঁর ব্যাঘ্রমুখ কামান সকল জল স্থল অন্তরীক্ষ কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মানসিংহ ব্যস্ত হইলেন। তিনি তোপ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লোহারদিয়া, টোক প্রভৃতি স্থানে আজিও সেই তোপ নির্ম্মাণের শেষ চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। ইশা খাঁর পুর্ত্তগীজ ফিরিঙ্গী সেনানায়কেরা দীপেশ্বর জাঙ্গালিয়া হোসেনপুরে ইয়োরোপীয় প্রথানুসারে বাঙ্গাল সৈন্যকে শিক্ষা দিতে ছিলেন। সেই ফিরিঙ্গীদের গাঁইগোত্র আজো হোসেনপুরে অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে চাঁদপুরের বিস্তীর্ণ মাঠে রাজপুত ও মোগল সেনার সহিত ইশা খাঁর বাঙ্গাল সৈন্যের যুদ্ধ হইল।

তৃতীয় চিত্র—শিক্ষা।

এদেশে প্রধান শিক্ষা ছিল হিন্দুদের সংস্কৃত ও পার্শি আর মুসলমানদের পার্শি ও আরবী। মঙ্গলবাড়ীয়া তখন এদেশের প্রধান পার্শী শিখিবার কেন্দ্র। মৌলবী মহম্মদ আজিম এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। বড় বড় আলেমগণ এই খানেই শিক্ষালাভ করিয়া দেশময় জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করিতেন। মুন্সী বরকত উল্লার নিকট বহু রাজা জমিদার ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দু ও অগণ্য মোসলমান পার্শী শিক্ষা করিতেন। হিন্দু মুসলমানে অচ্ছেদ্য প্রণয় ছিল। এগারসিন্দুর দুর্গে মস্‌জেদের পার্শ্বে বানীয়া গ্রামের গোস্বামীগণের পুর্ব্বপুরুষ রূপনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত মঠ আজিও "অধিকারী মঠ" নামে তাহার কীর্ত্তি বহন করিতেছে। মুসলমানগণ এগার সিন্দুর, আরসি, গুরই, হয়বতনগর, জঙ্গলবাড়ী, বৌলাই, অষ্টগ্রাম, ইটনা, সেকেন্দরনগর, জাওয়ার প্রভৃতি স্থানে মস্‌জেদ স্থাপন করেন।

রাজা নবরঙ্গ রায় অতি সুন্দর দারুমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগবেতালে প্রতিষ্ঠা করেন। নওপাড়ার কালী, হোসেনপুরের কুলেশ্বরী আখড়ায় শ্যামসুন্দর প্রভৃতি দেবালয় স্থাপিত হয়।

ঈশাখাঁর বংশধরগণের সংশ্রবে অনেক উচ্চশ্রেণীর মুসলমান স্থানে স্থানে বসবাস করেন। আর কাস্তল, অষ্টগ্রাম, মুমুরদিয়া, গচিহাটা, বনগাঁও, ওয়ারা, জয়সিদ্ধ, মৃগা, মসূয়া, জয়কা, যশোদল, নান্দিনা, প্রভৃতি স্থানে বহু উচ্চশ্রেণীর কায়স্থের বাসস্থান হয়। এঁদের মধ্যে পার্শী ও সংস্কৃত নবীশ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়ের পিতা ৺শ্যামসুন্দর মুন্সী, খুড়া নবকিশোর রায় একাধারে পণ্ডিত ও মুন্সী ছিলেন। নবরায়ের পার্শী অভিধানের পাণ্ডুলিপি বিশেষ প্রশংসার্হ।

সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল মসূয়া গ্রাম। প্রাচীন কুর্চ্চি নামায় দেখা যায় পঞ্চদশ পুরুষের মধ্যে এই গ্রামে একই সময়ে দশজন হইতে আঠার জন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। ঘরে ঘরে পুরাতন পুঁথির কাঁড়ি অনেক উত্তরাধিকারীর ভার স্বরূপ হইয়া আছে। আর কত পুঁথি যে অনলে জলে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। এই গ্রামে এক শতাব্দীর মধ্যে যে সকল পণ্ডিতের লীলাবসান হইয়াছে তন্মধ্যে মনোহর তর্কভূষণ, রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত, লোকনাথ চূড়ামণি, গুরুদাস ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ভূষণ, ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণসুন্দর স্মৃতিরত্ন, ঈশানচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য ও মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহীনন্দের শিবানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি, বৰ্শীকুড়ার জয়নাথ তর্কালঙ্কার, যশোদলের রামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন, কালিদাস সিদ্ধান্ত, গঙ্গাদাস স্মৃতিভূষণ, বনগ্রামের কবি কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন, গচিহাটার গৌরদাস তর্কপঞ্চানন, শিবদাস ন্যায়রত্ন বেতালের কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, আচমিতার গঙ্গাদাস সার্ব্বভৌম, রামনাথ বাচস্পতি, গাঙ্গাটীয়ার রামনারায়ণ তর্কবাগীশ, বাণীয়া গ্রামের আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গোবিন্দকিশোর ন্যায়পঞ্চানন, মুকুন্দকিশোর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণহরি কাব্যতীর্থ, বনমালী সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রের মধ্যে আমরা সোণার কমল, বাণীয়া গ্রামের সোণার বংশী, আচমিতার ঈশ্বর অধিকারীর নাম শুনিয়া থাকি।

কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত মহা মোক্ষতন্ত্র, তন্ত্র চিন্তামণি, শ্যামাসঙ্গীত, সাধন বিধি প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। তাঁহার পোষ্য পুত্রের উপর সাংসারিক নানা বিপদ পাতের সময় নানা নৈসর্গিক কারণে পুঁথিগুলি নষ্ট হইয়াছে। মহামোক্ষতন্ত্র অপহৃত হইয়াছে। উহা প্রাপ্তির ভরসা এখনো আছে। গঙ্গানারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের দশকুমার চরিতের বাংলা কবিতানুবাদ, নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য রচিত "প্রাণবিন্দু" উৎকৃষ্ট তন্ত্রগ্রন্থ। কালীভৈরব তন্ত্রাচার্য্য রচিত শ্যামার্চ্চন পদ্ধতি, তন্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতি মুদ্রিত হইলে গৌরবের বিষয় হইবে।

চিকিৎসা বিদ্যায় কিশোরগঞ্জের গৌরব সামান্য নহে। বিখ্যাত রমণ কবিরাজ, কৃষ্ণচন্দ্র কবিরাজ, মদন কবিরাজ, ঈশ্বর কবিরাজ, রামকিশোর কবিরাজ, গোপীনাথ কবিরাজ, প্রভৃতি এক একজন দিগ্‌বিজয়ী লোক ছিলেন। কৃষ্ণকুমার ডাক্তারের নাম কালবক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে। গোবিন্দ মজুমদারের স্মৃতি আমরা ভুলিতে পারি নাই।

জগদ্বরেণ্য আনন্দমোহন এই কিশোরগঞ্জের কোহিনুর মণি। ব্যবসায়ীশ্রেষ্ঠ এইচ্‌ বোস, অধ্যাপক সারদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, চিত্রশিল্পি ইউ, রায়, হেমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সর্ব্বজন পরিচিত। বঙ্গসাহিত্য সেবায় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দেওয়ান আলিমদাদ খান সুপরিচিত। কিশোরগঞ্জের সাহিত্য কাননের জ্যোতিষ্মান ভাস্কর কেদারনাথের নাম যাবচ্চন্দ্র দিবাকর বর্ত্তমান রহিবে। রাজকীয় কর্ম্মবিভাগে গাঙ্গাটীয়ার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর হাই কোর্টের বিচারপতির কার্য্য করিয়া কিশোরগঞ্জের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

চতুর্থ চিত্র—শিল্প ও বাণিজ্য

দেওয়ান ইশা খাঁর আধিপত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হয়, বস্ত্রশিল্পে কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর ঢাকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিত। জঙ্গল খাসাও তঞ্জাবের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া রুমের পাদ্‌শাহ গৌরব অনুভব করিতেন। বস্ত্রশিল্পের কল্যাণে বত্রিশ গ্রাম কিশোরগঞ্জে পরিণত হয়। তদানীন্তন কিশোরগঞ্জের সৌভাগ্য গর্ব্ব আজ আর আমরা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি। জানি না তখন কি গৌরবে কিশোরগঞ্জের নরসুন্দরী নদী দেশ বিদেশের চিত্র বিচিত্র কেতন শোভিত বাণিজ্য তরণীগুলিকে বক্ষে ধারণ করিত। জানি না, কত বড় কারবারের স্থান ছিল বলিয়া পরামাণিকেরা খাল কাটিয়া বত্রিশকে কাটাখালি করিয়াছিলেন। আজো কাটাখালির বুকের উপর অতীতের রুদ্ধ বেদনা চাপিয়া লইয়া কত চিহ্ন নিষ্ফল করুণ নেত্রে অন্তিম শ্বাসরোধের প্রতীক্ষায় আমাদের পানে চাহিয়া আছে। কি যে বেদনা তাহার, কে বুঝিবে? কেই বা উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগ তাহার শান্তির ব্যবস্থা করিবে? আজো প্রামাণিকগণের জলটুঙ্গী, একুশরত্নের ভগ্ন চূড়ার একাংশ, ভগ্ন গৃহের প্রাকার ও চৈত্য শ্বাপদ সরীসৃপের লীলানিকেতনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও সেই রাজাধিরাজের সেবিত মদনমোহন জুদকশাভ করিয়া বিগ্রহের পরমামুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রামাণিকদের সেই ভগ্ন গৃহের ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যশিল্পের চিহ্ন অল্প মূল্যবহন করে না। এগারসিন্দুরের অধিকারীর মঠের চুণকাম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিন শতাধিক বৎসরেও উহা রৌদ্র কিরণে ঝলসিত হইতেছে।

কিশোরগঞ্জের বস্ত্রশিল্পের কল্যাণে এইখানে বৈদেশিকগণের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রামাণিকরা রাজার হালে বাস করিতেন। তাঁহাদের জমিদারী কেবল সামান্য ছিল না। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। তাঁহারা এই নরসুন্দরী নদীর তীর রাজা বসন্ত রায়ের মত করিয়া সাজাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বিবিধ

সম্প্রদায় আনিয়া গ্রামখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদিকে জঙ্গলবাড়ীর প্রভুত্ব, অপরদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র কাটাখালি জানি না কত আনন্দে ও গৌরবে তখনকার অধিবাসীরা দিন গুজরাণ করিত। ঠাকুরের কৃপায়, আজ কত না বন জঙ্গল ধনীমানীর বাসভবনে পরিণত হইয়াছে, কতজনের পুরুষানুক্রমিক ভাতের সংস্থান হইত, আর এখনো হইতেছে।

তারপর যখন ভারতের সৌভাগ্য রবি অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন, যখন বিদেশী তাঁতিরা বাঙ্গলার তাঁতিকুলের সর্ব্বস্বান্ত করিতে লাগিল, যখন এই কিশোরগঞ্জ বাজিতপুরের তাঁতিদের আঙ্গুল কাটা গেল. তখন যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল—আজ শত শত বৎসরেও তাহার অবসান হইল না। সেই যে সূর্য্য ডুবিয়াছিল আর উঠিল না। কিশোরগঞ্জের শিল্প ও বাণিজ্য এক ফুৎকারে আকাশে লীন হইয়া গেল। আজ সুধু শ্মশানের ভস্মের উপর তপ্তবায়ুর স্মৃতির অতি মৃদু দীর্ঘশ্বাস কান পাতিয়া শুনিলে শোনা যাইতে পারে।

বাজিতপুরের কাষ্ঠ শিল্প, করগাঁর লৌহ শিল্প আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরানী চাকরবন্দ্যাগণের বেড়ার শিল্প এখন নানা কারণে বিলুপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কুলমহিলারা উৎকৃষ্ট পৈতা কাটিতে পারিতেন;—কিন্তু হায় এখন তাঁহারাও যেন প্রায় ধর্ম্মঘট করিতে বসিয়া মডেল ভগিনীর সঙ্গে সুখ উপলব্ধি করিতেছেন।

বরাস্তর হইতে ঢাকা, সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য তরণী যাতায়াত করিত। এগারসিন্দুরের বাণিজ্য খ্যাতির কথা প্রেমবিলাস নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখিত আছে

"এগারসিন্দুর আর দগ্‌দেগা স্থানে
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্বলোকে জানে
এগারসিন্দুর আর মিরজাফরপুর
বাণিজ্য করিত তারা দূর দূরান্তর।"

এ দেশের সেকালের শেষ দিনে নীলের কুঠী নানাস্থানে স্থাপিত হয়। তাহার ভাল মন্দের কথা আলোচনা না করাই ভাল।

পঞ্চম চিত্র—আমোদ প্রমোদ।

পেটে ভাত আর পরণে কাপড় থাকিলে আমোদ করিতে ইচ্ছা করে সবাই। এদেশে প্রবাদ আছে "সাজনে টৌক" আর "বাজনে এগারসিন্দুর।" গান বাদ্যের জন্য এগারসিন্দুর এক সময় প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিল। ঈশা খাঁর প্রধান দুর্গ এগারসিন্দুরে গান বাজানার ধুম লাগিয়াই থাকিত। নানান জাগায় নানান রকমের গান হইত।

এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল বাংলার ঘরে ঘরে রামপ্রসাদের মালসী আর বার মাসের তের পার্ব্বণে বিবিধ মঙ্গল গীত। কত রাগ রাগিণীতে কত মধুর গীত আমাদের আঙ্গিণায় হইত তাঁহার সংখ্যা নাই। বৈশাখ কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের শেষ রজনীতে গ্রামে গ্রামে ব্রজ দাস বৈষ্ণবের দল "জয় রাধে শ্রীরাধে" গাহিয়া মাস কীর্ত্তনের মধুর রাগিণীতে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইত। আট গাঁয়ের ফকীরয়া কত বিচিত্র পটে অদ্ভুত ছবি লট্‌কাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বৈরাগী বৈষ্ণবীর দল খঞ্জনীতে তাল দিয়া কাড় ও কোমলে গোষ্ঠ গায়িত। বর্ষায় নায়ে নায়ে ভাটিয়াল রাগিণীতে গান উঠিত:—

বাহাত্তর বচ্ছরের পাড়ি
বেলা আছে দণ্ডচারি"

হিন্দু মোসলমানে গঠিত ঘাটুর দলে লহর উঠিত

"আরে বংশী বাজে কোন্ বনে।"

দৌড়ের নায়ে সারি গান গায়িত

"দিবা গেল সন্ধ্যা হৈল ও পরাণ কানাই
মায়ে জ্বালাইছে বাতি চল গৃহে যাই"

ভেলুয়ার বারমাসী, মহীপালের গীত, হোলির গান, পাঁকখেলার অভদ্র সঙ্গীত, গুরমার গীত, এদেশে খুব প্রচলন ছিল। তারপর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দে যখন কিশোরগঞ্জেও তাহার বাতাস আসিয়াছিল! আজ যে কীর্ত্তন গানে দেশ মাতোয়ারা, স্বর্গীয় জগবন্ধু অধিকারী বহু দিন আগে এই মাটীতে তাহার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। গৌরমোহন সনাতন কীর্ত্তনীয়া, চন্দ্রনাথ ভৌমিক, দিগেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির যাত্রার দল, রামশঙ্কর ও চূড়ামণির রামায়ণ গান এদেশে আমোদ প্রমোদের ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছিল। স্বরূপা বাইর নাম প্রাচীন সঙ্গীত রসপিপাসুগণ ভুলেন নাই। রাসমণি বা চাতকিনীর মত মধুবর্ষী কণ্ঠ বাংলাদেশে আরত শোনা যায় না, বাদকগণের মধ্যেও গুণী ব্যক্তির অভাব ছিল না। কবিওয়ালার মধ্যে বাহাদিয়ার হরচন্দ্র

আচার্য্য অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। শব্দবিন্যাস পরিপাট্যে রামসুন্দর আচার্য্য বিশেষ চতুর ছিলেন। বিগত এই সাহিত্য সম্মিলনের দিন তাঁহার স্বর্গযাত্রা হইয়াছে।

এদেশে দুর্গাপুরাণের খুব আদর ছিল। রামকানাই, দুলাল, রামদয়াল প্রভৃতি বহু বড় বড় দুর্গাপুরাণীয়ার খ্যাতি ছিল। এখন আর সে সকল গান তালুকদার জমিদার বাবুরা পছন্দ করেন না। ছোটলোকের বাড়ী এ সকল গান কালে ভদ্রে হয়। সুতরাং বেচারীরা না খাইয়া মরিতেছে।

হোসেনপুরের দোল মেলা কিশোরগঞ্জের ঝুলন মেলা, ভোগবেতালের বিজয়া দশমী উৎসব কত না আমোদে নির্ব্বাহ হইত। গোপীনাথ জীউর বাড়ীর দোলমেলা রথমেলা, ঝুলন মেলা, মঠখলা হুসেনপুরের অষ্টমী মেলা প্রভৃতি আনন্দের বাজার ছিল।

খেলায় ও এ দেশে ব্যায়ামের সঙ্গে আমোদ ছিল। অধুনা ফুটবল ব্যাটবলের কৃপায় দেশীয় খেলা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে।

উপসংহার

মোটামুটী কিশোরগঞ্জের কথা সংক্ষেপে বলা হইল। এইখানের অধিবাসীরা চিরদিন সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিত। অপর্য্যাপ্ত মাছ দুধ অতি কম পয়সায় পাওয়া যাইত। তরী-তরকারী এত সস্তা ছিল যে বিনি পয়সায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নহারের চাউল এখনো বালামের প্রতিদ্বন্দ্বী। পাকুন্দিয়ার গুড়, মহুয়ার চড়ের মুগ, আলু, হোসেনপুর কিশোরগঞ্জের দুধ, বৌলাইর তৈল অতি চমৎকার ছিল। পৌষ সংক্রান্তিতে দেশের নানাস্থানে ষাঁড়ের লড়াই, লাঠি খেলার ধুম লাগিত। শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষে ভাটীয়া মুলকে তিনদিন ব্যাপী উৎসব হইত—শ্রাবণ মাস ভরা পদ্মপুরাণ গান হইত, বাঁশ বেত নল খাগড়া, প্রচুর পাওয়া যাইত। আলানী কাঠ লোকে বিলাইয়া দিয়া জঙ্গল সাফ করিত।

লোকে বিবিধ পাখী পুষিত। শ্যামা, দয়েল, শালিক, টিয়া, ময়না পালিত। শ্যামা এখন আদৌ দেখা যায় না। বড় বড় কুকুর ঘরে ঘরে থাকিত। সকলের ঘরেই জাঠা, কোচ, টেটা, হলঙ্গা, লাঠি, প্রভৃতি ছিল। তীর, গুলাইল অনেকে চালাইতে পারিত।

পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্বদিকে ধনু, মেঘনা, দক্ষিণে আড়িয়ল খাঁ প্রভৃতি স্বচ্ছ জল পরিপূর্ণ নদ নদী সকল বারমাস প্রবাহমান থাকিত। ছোট বড় খাল, বিল, বাইদ, ডোবার অন্ত ছিল না। জল খুব পরিস্কার ছিল।

মৌচাকের সংখ্যা করা যাইত না। বাড়ী বাড়ী গাছে গাছে মৌচাক দেখা যাইত। সরিষা ফুলের সময় ঘরে ঘরে হাঁড়ি ভরা মধু থাকিত।

আলানী তৈল কেহ প্রায় কিনিত না। রয়না বা বৈদ্যরাজের তৈল, ভেরেণ্ডার তৈল হাঁড়ি ভরা থাকিত। বাজুনার তৈল অনেকে ভাতে খাইত—কেহ বা জ্বালাইত।

বাঁশের কলম দিয়া কতের কালীতে তুলট করা কাগজে বামুন পণ্ডিতেরা মুক্তার মত অক্ষরে কত কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শত শত বৎসরেও ঐ লেখা এখনো চক্‌চক্ করিতেছে।

গায়ের জোর প্রকাশের খেলাই বেশী চল ছিল। বামুন শূদ্র, হিন্দু মোসলমান একত্রে খেলাইত।

বাঁশের বাঁশীর মধুর তানে সন্ধ্যার সমীরণ সুধা বৃষ্টি করিত। বাঁশী বাজাইতে সকলেই পারিত।

শ্রাদ্ধশান্তি, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে খাওয়ানের প্রথা এত বেশী ছিল যে এখন মনে হইলে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না।

ঘরে ঘরে সোণার কান্তি, শালপ্রাংশু, মহাভুজ এক একজন লোক ছিল। এক একটা সভায় আলো করিয়া ইঁহারা বসিতেন—দেব সভার মত মনে হইত।

কিশোরগঞ্জের সেই শুভদিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সব গিয়াছে—স্মৃতির বালাইও আর বেশী দিন রহিবে না!

যদুপতে কগতা মথুরাপুরী
রঘুপতে! কগতোত্তর কোশল।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মন স্থিরং
ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পুরস্কার

মাতৃহীনা সরলা বালিকা গোলাপ বৃদ্ধ পিতার আদর যত্নে এবং ঝি "দয়াবতীর" লালন পালনে বার বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। শরৎ বাবু সংসারের কেবল গীতা পাঠেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন।

পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইলেও গোলাপ সহজ পোষাক পরিচ্ছদেই সুখী। স্বাধীন বন-কুরঙ্গিণীর মত গোলাপ পাড়ায় চলা ফিরা করিত, সংসারের কাজ করিত আবার কখন বা পুতলের খেলা ঘরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত।

* * * * *

অপরাহ্ন সূর্য্যদেব তখনও অস্তাচল চূড়ার অনেকখানি উপরে। দুই চারিটী পাখী, গাছের ডালে বসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। হঠাৎ জঙ্গলাকীর্ণ একটী অপ্রশস্ত রাস্তার দিক হইতে বামা কণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অমনি বিশ্রাম বাসনায় উপবিষ্ট একটী যুবক, পুকুরের পারের গাছতলা হইতে "ভয় নাই" "ভয় নাই" বলিয়া সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। অর্দ্ধ-উলঙ্গাবস্থায় ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বালিকা বলিতেছে, "ওরে আমার হাত ছেড়ে দে, ছেড়ে দে"। দুর্বৃত্ত কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না এবং নির্ভীক হৃদয়ে বলিতে লাগিল,—"তোমাকে আর বাদ দিলে কি হবে? বহু চেষ্টার ফলে হাতে পড়েছ।" নিরুপায় ভাবিয়া বালিকা আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাইতে লাগিল, "কে কোথা আছ আমায় রক্ষা কর"। তৎক্ষণ সেই যুবক, ঘটনা স্থলের অনতিদূরে পৌঁছিল। দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বালিকার হাত ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যুবক, নারী নির্য্যাতন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। লাফ দিয়া দুর্ব্বৃত্তের গলা সজোরে চাপিয়া ধরিল—শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় নরাকার পশু তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যুবক, বালিকাটীকে বলিল;—"তুমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ কর"। এই বলিয়া যুবক পলাইতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু গণ্ডগোল শুনিয়া পাড়াপ্রতিবেশীর লোকজন আসিয়া পড়াতে তাহার সে পলায়ন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হইতে পারে নাই। সকলেই তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গ্রাম শুদ্ধ হৈচৈ পড়িয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! দিনের বেলায় খুন করিয়া আসামী চলিয়া গেল! আসামী ধৃত না হওয়ায় সকলের মনেই একটা আতঙ্কের ছায়া পতিত হইয়াছিল। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই এই খুন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিশের লোক আসিয়া লাল, কাল পোষাকে গ্রামখানাকে চিত্র বিচিত্র করিয়া তুলিল।

মোটের উপর সর্ব্বসাধারণের ধারণা, আসামী ধরা পড়িলেই পুলিশ তাহাদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিবে না কিংবা কোনও নিরপরাধের ঘাড়ে অনর্থক চাপিয়া বসিবে না। কেবল মাত্র একটী প্রাণে আঘাত লাগিয়া ছিল, সে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যহ বলিত,—"দয়াময়! এর উপযুক্ত পুরস্কার তুমিই প্রদান করিও।"

(২)

বাদী গবর্ণমেণ্ট নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সরোজনাথ রায় বাড়ী গোবিন্দপুর। থানায় থানায় এই মর্ম্মে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আসামী নিরুদ্দেশ। প্রায় ২।৩ মাস কাল অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য্য হইয়া ওয়ারেণ্ট ফেরৎ দিয়া পুলিশ, ফেরারী ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন—"যে কোনও ব্যক্তি খুনী আসামী সরোজনাথকে ধরিয়া দিতে পারিবেন তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এদিকে ঘটনার তদন্ত কার্য্য শেষ করিয়া থানার বড় বাবু একখানা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। রিপোর্টের স্থূল মর্ম্ম এই, "আসামী সরোজনাথ রায়, যদুনাথ বানার্জ্জিকে হত্যা করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় তদন্তে বিশ্বস্ত ভাবে অবগত হইলাম। তবে মৃত যদুনাথে চরিত্র দোষ ছিল, বোধ হয় সেই কারণেই এই নরহত্যা ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে।" শুনানীর পর শুনানী চলিতে লাগিল আসামী ধৃত না হওয়ায় পুলিশ কিংবা হাকিম কেহই নিস্তার লাভ করিতে পারিলেন না।

(৩)

কতিপয় লম্পটের সঙ্গে মিশিয়া পাঠ্যাবস্থাতেই যদুনাথের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তাহার পিতা ফিরোজপুরের বনিয়াদি

বংশ সম্ভূত জমিদার শ্রেণীর লোক। একমাত্র বংশধর পুত্র যদুনাথকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘি ঢালার ন্যায় ব্যর্থ হইল। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল ব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় যদুনাথকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। ইত্যবসরে সুযোগ পাইয়া পিতার অসাক্ষাতে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া দশ হাজার টাকার নোট চুরি করিয়া যদুনাথ নিকটস্থ কোন গণিকালয়ে জীবন যাপন করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে তাহার দৃষ্টিতে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইত। পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে ব্রজগোপালের প্রাণে কিছুমাত্র দুঃখ হইল না, পলেকের জন্যও তাঁর নয়নযুগলে শোকাশ্রু দেখা দিল না। বরঞ্চ কুপুত্রের মৃত্যুতে তিনি ভগবানকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রজগোপাল ভবিষ্যৎ আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন তাহার সমুদয় সম্পত্তির ॥৹ আনা হিস্যা বাড়ীতে স্থাপিত "নন্দদুলাল" বিগ্রহের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বক্রি সম্পত্তির আয়দ্বারা নানারূপ সৎকার্য্য দান দক্ষিণা ইত্যাদি সমাপন করিতে লাগিলেন।

(৪)

সচ্চরিত্র হউক দুশ্চরিত্র হউক, সে ত মানুষ ? বিচার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত নহেন। এ খুনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্তের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানান হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন তত্ত্ব গবর্ণমেণ্ট অবগত হইতে পারেন নাই। বড় সাহেব জানাইয়া দিয়াছেন যে, "আমরা তদন্তপূর্ব্বক রিপোর্ট দিতে তৎপর রহিলাম। আসামী ধৃতপূর্ব্বক বিচারের দিন ধার্য্য হইলে, আমরা তৎপূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত মন্তব্য প্রকাশ করতঃ হুজুরে জ্ঞাপন করিব।" এ দিকে গবর্ণমেণ্টের কাণে পৌঁছিল, যদুনাথকে হত্যাকরার সংস্রবে শরচ্চন্দ্র দত্তের কন্যা গোলাপ সুন্দরীও ছিল। গোলাপের উপর গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইল। অপরাধী না হইলেও তাহাদ্বারা এই খুনের একটা বিশেষ প্রমাণ হইবে, অথবা অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে ত দণ্ডভোগ করিবে ইত্যাদি মতলবে গোলাপের নামে নূতন ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছিলেন। পরস্পর কাণাকাণি ও নানারকম ভাবে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা তাহাকে দোষী কেহ বা তাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জনরব করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই এ কথা শরৎবাবুর কর্ণগোচর হইল যে তাহার মেয়ের নামে ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে একটা গুজব উঠিয়াছে। শরৎ বাবু গোপালকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন "তুমি আর পূর্ব্বের যখন তখন যথা তথা যেও না।" সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন, সরলার নিষ্পাপ নয়ন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হইলনা। তাহার চলা ফেরা পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

(৫)

যদুনাথের মৃত্যুতে রমণী মহলে একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। একদিন বিকাল বেলা ৫ ঘটিকার সময় গোলাপ জল আনিবার কলসী কাঁকে পুকুরের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। পুকুরের দক্ষিণ পারস্থিত জামতলায় একটী ছদ্মবেশী গৈরিক পোষাকে সজ্জিত নবীন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভস্ম মাখা হইলেও শরীরের জ্যোতিঃ দেব জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল! সে জ্যোতিতে পুকুরের পার দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। গোলাপ একদৃষ্টে সেই নবীন সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। নবীন যোগী, যোগে নিমগ্ন হইয়া অনুতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিতেছেন ; "হায় ! কি কুক্ষণে বেড়াইতে বাহির হইয়া এই পুকুর পারে আসিয়াছিলাম ! আমি যে কারণে আত্ম গোপন করিয়াছি, আমার সে শ্রম সফল হইল কৈ? তার অদৃষ্ট গগনে অচিরেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগ ভঙ্গ হইয়া গেল, চোখ মেলিয়া দেখিলেন ; একটী রমণী মূর্ত্তি। ভ্রমর কৃষ্ণ কুন্তলদাম নিতম্ব দেশ অতিক্রম করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দেহের বর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। সন্ন্যাসী তাহার অপলক দৃষ্টিকে ফিরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু, কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। গোলাপও মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;—সেই মুখ, সেই নাক সেই চাহনি, ঠিক যেন সেই ব্যক্তি, কিন্তু সে ত সন্ন্যাসী নয়। বিপন্নাবস্থায় মুহূর্ত্তক্ষণ দেখিয়াছিল, তাতে যতদূর সম্ভব মানসপটে যে চিহ্ন অঙ্কিত ছিল ; তাই আজ উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিল। গোলাপ লজ্জায় নতমুখী হইল বটে তাহার সরলতা মাখানো চক্ষুর্দ্বয়কে আয়ত্তে আনিতে পারিল না। আবার তাহাদের পরস্পর চাহনি পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল। এমন

সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও তিন জন চৌকীদার আসিয়া সন্ন্যাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, শরচ্চন্দ্র দত্তের বাড়ী কোন্‌টা? যুবক বুঝিতে পারিয়াছিল, উহারা গোলাপকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। পুলিশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি মহাশয় কথা বল্‌ছ না কেন?" গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "আমি বিদেশী লোক অত খবর রাখি না।" পুলিশের লোকেরা শরৎ বাবুর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ছদ্মবেশী যুবক, গোলাপকে চিনিতে পারিয়াছিল, তথাপি তাহার কৌতুক নিবৃত্তির জন্য জিজ্ঞাসা করিল; "তুমিই কি শরচ্চন্দ্র দত্তের কন্যা গোলাপসুন্দরী? বালিকা বলিল; "হাঁ", সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি বালিকার কাছে আসিয়া ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে জানাইয়া দিল। বালিকা, সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া বলিল; "গোসাইজি! আমায় রক্ষা করুন." তখন ছদ্মবেশী যুবক বালিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। প্রায় দু দণ্ড পরে পুলিশের লোকেরা বিফল মনোরথে পুকুরের পারে ফিরিয়া আসিল; সন্ন্যাসী ও বালিকাকে দেখিতে না পাইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

(৬)

সরোজনাথ, ফেরারী হইয়া থাকা বিপজ্জনক ভাবিয়া স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দিয়া হাজির হইয়াছিল। হাকিম, পুলিশ রিপোর্ট দৃষ্টে ও প্রমাণাদি গ্রহণে আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। আজ বহরমপুরের সেসন কোর্টে সরোজনাথের বিচার হইবে। যথাসময়ে আসামীকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করা হইলে,—জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন;—"যদুনাথ বানার্জ্জিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী সরোজনাথ রায় কি তুমি?" উত্তর—"হাঁ আমিই বটি"। প্রশ্ন;—নরহত্যা পাপে কেন লিপ্ত হয়েছিলে? উত্তর;—"নরহত্যা করি নাই, একটী অবলা বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া, নরাকৃতির একটী পশুহত্যা করিয়াছি।" প্রশ্ন—"উৎপীড়িতা বালিকা তোমার কে হয়"? উত্তর—কিছুই হয় না"। প্রশ্ন;—"অত্যাচার কি তোমার সাম্‌নেই হয়েছিল"? "হাঁ"। গোয়েন্দা পুলিশ আশুবাবু তদন্তের ডায়রীসহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। সরোজনাথের জবাব ও আশুবাবুর ডায়রী এক মিল হওয়াতে জজ সাহেব, জুরী মহোদয়গণকে জানাইয়া দিলেন,—"এ মোকদ্দমায় বিশেষ সাক্ষ্য গ্রহণ অনাবশ্যক। আপনাদের মতামত চাই আসামী দোষী কি নির্দ্দোষ"? জুরী মহোদয়গণ একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন "আসামী নির্দ্দোষ"। জজ সাহেব তৎক্ষণাৎ সরোজ নাথকে খালাস দিলেন। সরোজনাথ বাড়ী আসিয়া দেখিতে পাইলেন ইতিপূর্ব্বে খবরের কাগজে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি ইউনিভার্সিটীতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সরোজনাথ পরীক্ষার শুভফল পাইয়া কত যে সুখী হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

(৭)

পাড়ার মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া বলিত "খুনী গোলাপী"। আজ খুনী গোলাপীর বিয়ে। কাঞ্চনপুরময় নানারূপ ধুমধাম চলিতে লাগিল। শুভ গোধুলিলগ্নে সরোজনাথের হস্তে, প্রাণের দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া শরৎবাবু আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ষোলআনা সম্পত্তি সরোজনাথকে দান করিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলেই নানা উপহারে নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, এমন সময় একটী বৃদ্ধা এক মোড়ক কাগজ আনিয়া বরের হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। কৌতুক মনে করিয়া পরস্পরে টানাটানি করিতে করিতে কাগজের মোড়ক খুলিয়া গেল। সকলেই দেখিয়া অবাক হইলেন কাগজের মোড়কের মধ্যে একখানা রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র। দাতা ব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... গ্রহিতা—সরোজনাথ রায় ... ...।

দলীলের মর্ম্ম এই:—

অস্য দানপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী কুপুত্রের পিতা। পুত্রের আচরণে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম. তুমি আমার সে কষ্ট দূর করিয়াছ। যদিও সে আমার ত্যজ্যপুত্র, তথাপি তাহার কৃতপাপ আমাতে অর্শিতে পারে আশঙ্কা ছিল, দুর্ব্বৃত্তকে হত্যা করিয়া আমার সে আশঙ্কা দূর করণান্তর পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়াছ। সে আরো কিছুকাল জীবিত থাকিলে নানারূপ প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইত। অতএব তোমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ নিম্ন-তপছিলের লিখিত সম্পত্তি সমূহ তোমাকে দান করিয়া নিঃস্বত্ববান হইলাম। ইত্যাদি।

সঙ্গে একখানা পত্রে লেখা আছে,—"আমার শরীর অশক্ত নতুবা নিজে আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতাম। যাহোক, আমার প্রদত্ত জিনিষের সদ্ব্যবহার করিও।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরোজনাথ, প্রাপ্ত দানপত্রখানা মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন;—"এই দানসূত্রে প্রাপ্ত ষোল আনা সম্পত্তির আয় কেবল পরোপকার ও অতিথি সেবায় ব্যয় করিব।" তিনি নিজে গরীবের ছেলে, তাঁহার কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না, সম্পত্তির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত সুশ্রী দেহখানা, আর আত্মীয়ের মধ্যে মা, তাই তিনি মাকে আপন শ্বশুর বাড়ী আনিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ব্রজগোপাল ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, সরোজনাথ মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধ-দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। উভয় সম্পত্তির মালীক হওয়াতে গোলাপ জমিদার ঘরণী সাজিলেন। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে প্রজাগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ভৌমিক।

চোখ্যের বালু।

(পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের চলিত ভাষায় লিখিত)

তুইন্ কি আমার থাকোমাণ, তুইন্‌কি আমার থাকি' ?
মিছা কথার ভাইল (১) কেবল, কেবল আন্ধা (২) ফাঁকি!

আইছ্ না তুইন্ আমার বারাত্ (৩), অইয়া যা গো দূর!
বরদাস্ত অয় না চোখে এই চেহারা তুর!

কিসের লাগ্যা তুর চেহারা এমুন হাছুন্—বা'ড়্যা (৪)!
হাতের শাঁখা মাথার সিঁদুর নিলো কেডা কা'ড়্যা!

শাড়ী কাপড় খু'ল্যা রাখি' কে পরা'লো থান!
শক্ত-সাবল্-লোয়ায় বুঝি বানাইল্ তার প্রাণ!

আইজ মা তুইন্ সবের মাইঝে বেবাক্ চাইতে তুচ্ছি।
ঝাঁটার মুখের কুটার মতো তুইন্ সগলের তুচ্ছি।

তুর ভিতরে ছিরি (৫) আগের কিচ্ছু যে গো নাই!
অমঙ্গলের কাঁড়ি (৬) বেবাক্ লইছে বুকে ঠাঁই!

জল শুকা'য়া গেছে গাঙের, প'ড়্যা রইছে চড়া;
তাতা বালুর তত্তা (৭) ফুঁয়ে বুক্‌টা যে তুর ভরা!

ঠকুর দলান প'ড়্যা গেছে, ভাঙ্গা ইটের তূপ (৮);
খাড়া অইয়া রইছে ভয়াল ভীবিষিকার রূপ।

হাজার পায়ে দলা যে'ন্ বাসি ফুলের মালা;
আইলে মা গো বুকে লইয়া একি বিষের জ্বালা!

হাতে-শুতে (৯) পার্‌ছি না গো ভাবুতে এক্‌টিবার,
বুকের মাইঝে পড়ব এমুন জোড় ছেকাটের (১০) পাড়!

কপাল ভা'ঙ্গ্যা অইলে মা গো বাসি আথার ছালি (১১)!
আদরিণী মাইয়া আমার অইলে চোখের বালি।!

এমুন ক'র্যা নিঠুর বিধি মাথাত দিলো বাড়ি,
বিয়ার বছর মাইয়া আমার অইয়া আইলো রাঁড়ি, (১২)

খালি ক'র্যা বেবাক যদি নিলে তাহার কা'ড়্যা,
রাখ্যা তারে কি কাজ তবে তিলে তিলে মা'র্যা।

যে-আগুনটা জ্বা'ল্যা দিছ বুকের কলজা জু'ড়্যা,
বাঁ'চ্যা থা'ক্যা জীবন ভ'র্যা মর্‌বো জ্ব'ল্যা পু'ড়্যা,

অনেক দয়া কর্‌ছ, বিধি, নাই গো তাহার পার!
দয়াল ঠাকুর করো তবে দয়া এক্‌টু আর!

দারুণ শোকীর পাপ জীবন্‌টা কা'ড়্যা তবে নিয়া,
বাঁ'চ্যা থাকবে পাপের থা'ক্যা দাও গো রিয়াই (১৩) দিয়া!

এমুন অইয়া বাঁচার চাইতে মরণই তার বাঁচা।
এ পার থা'ক্যা সে পার্‌টাই তাহার আসল হাঁচা (১৪)!

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।

---

(১) ভাইল—প্রতারণা
(২) আন্ধা—অন্ধকারময়
(৩) বারাত—কাছে
(৪) হাছুন্‌বা'ড়্যা,—ঝাটামারা
(৫) ছিরি—শ্রী
(৬) কাঁড়ি—স্তূপ
(৭) তত্তা—গরম
(৮) তূপ—স্তূপ
(৯) হাতে,শুতে—কোনকালে
(১০) ছেকাট—যুবক
(১১) ছালি—ছাই
(১২) রাঁড়ি—বিধবা
(১৩) রিয়াই—রেহাই
(১৪) হাঁচা—সত্য

বাবু ও কেরাণী।

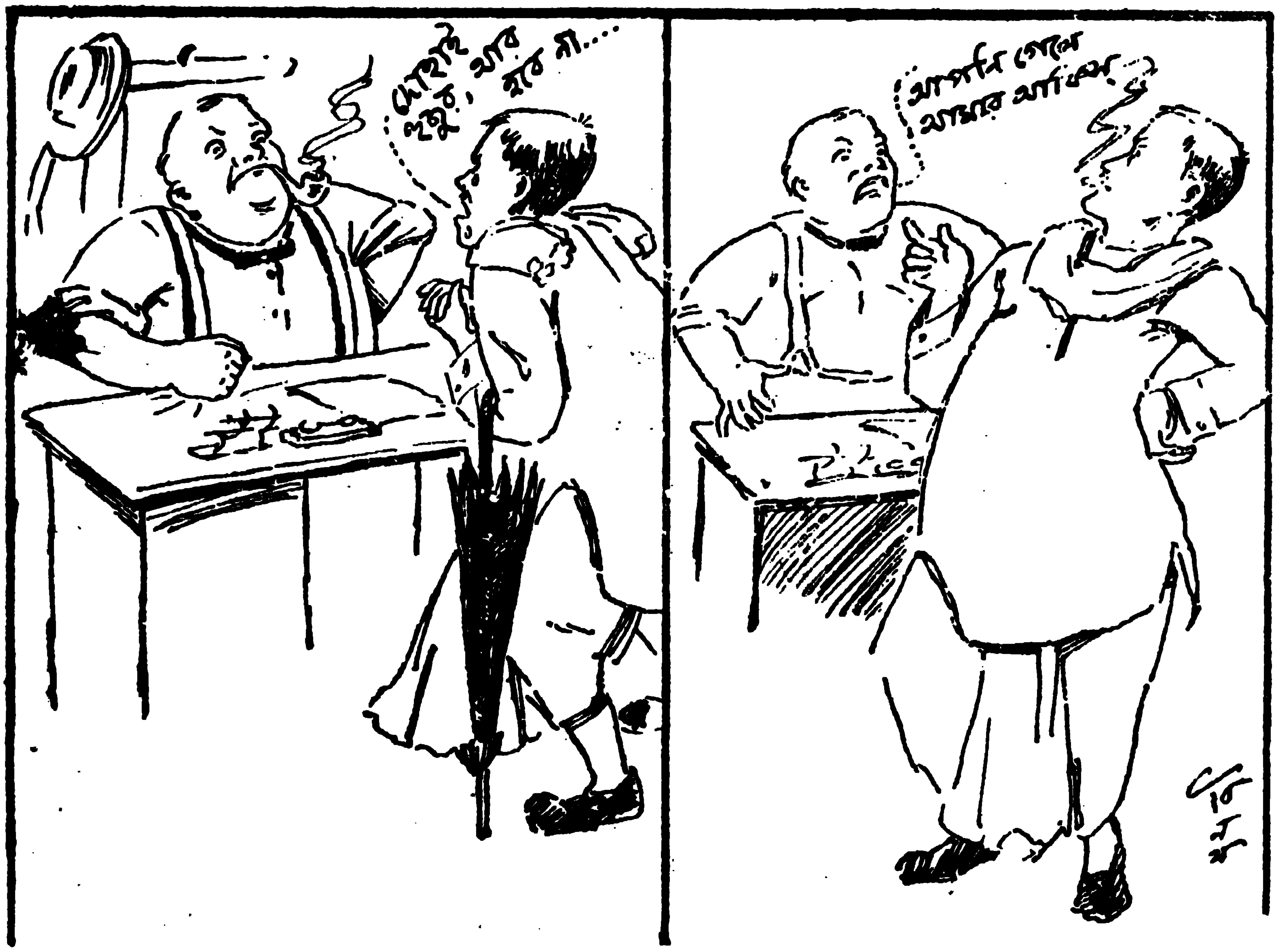

"দশটা বেজে তিন মিনিট
এম্‌নি ক'রে চাক্‌রি ?"
"দোহাই হুজুর আর হবে না
হয়েছে ঝক্‌মারি !"

"দিন মজুরি একটা টাকা
জুট্‌বে নাকি এম্‌নি আমি রাখিশ ?"
র'ইল তোমার চাকরী !
"আপ্‌নি গেলে আফিস ?"

শোক সংবাদ

এজেলার শিক্ষার অগ্রণী সর্ব্বজনমান্য গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত ১৭ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এ জেলার শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট শক্তি যোজনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালী ও নিয়ম শৃঙ্খলা ছাত্রদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই অতীত যুগে এ জেলায় যাঁহারা শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

* * * * *

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি, আমাদের লেখক, ময়মনসিংহের গৌরব, বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ২৮শে ভাদ্র ৬০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় সন্ন্যাস রোগে তিনি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

=কারণ=

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না ?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে ? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না ?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন ?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা ?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা ?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮। ১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ঃ

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১॥০
ঢাকার বিবরণ	১॥৵
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস	॥০
সাময়িক সাহিত্য	৩৲
রামায়ণের সমাজ	৪৲
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	।৶০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷০

"লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে," আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই)	১৲
ব্রতকথা	৷০
শৈব্যা	।৶০
মহরম	॥০
কালের ডায়রী (সচিত্র)	৷০
রংকথা	(যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ । কার্ত্তিক—১৩৩৪ দশম সংখ্যা ।

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the
LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children
whom you would love so much? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest
way to create an estate.
WE SHOW IT HOW
Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.
or to:—
N. K. Roye, District Represe tative for Dacca & Mymensingh.
KALIKANTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		...	৭৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	৪৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
" ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	১০৲
" ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	১৫৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
কার্য্যকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

আসল্কার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচন্দ্র দাশ গুপ্তের ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাগু, বাঘী, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
অমর ঔষধালয়
ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
পোঃ বায়রা (ঢাকা)

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—
মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।
গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৹

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৹

বাটলীওয়ালার এগুপিলস্, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷৹ ও ১৷৹

বাটলীওয়ালার এগুমিক্শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৷৵ ও ৸৹

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷৹

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচড়া প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।ন

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,
[illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে, নং ১৪
[illegible] ঠিকানা—"[illegible]" বোম্বে।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স
অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধাবাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কন্‌কনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷৹ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-এস
[illegible]

সূচী।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য	শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু	২৪৩	জ্যোতিষ কথা	শ্রীমতী পূর্ণিমাপ্রভা রায়	২৬০
প্রাচীন কাহিনী	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন	২৪৭	সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬২
বন-সোহাগী	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৫০	একটী বারমাস্যা	শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ রায়	২৬৪
বলরামের পত্নীপ্রেম (গল্প)	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত	২৫১	উচ্চ-নীচ (কণিকা)		২৬৫
যৌবন প্লাবন (উপন্যাস)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৫৫	সমালোচনা		২৬৬
প্রবাসের আবাদ	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৫৭	সংবাদ		২৬৬

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম্

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

পুঃ ময়মনসিংহের অধিবাসী যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহাদের ঠিকানা জানা প্রয়োজন।

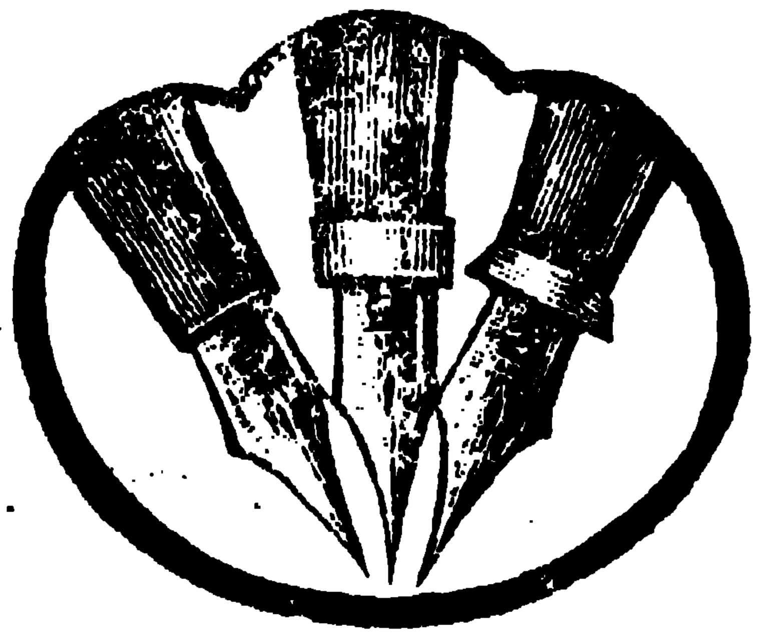

কে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার একমাত্র স্থল।

'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !'

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র ও সেবক নৃপেন্দ্রকুমার-সম্পাদিত,
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী-গণিত ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত,

১৩৩৪ সালের

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। যে পঞ্জিকার বিরাট কার্য্যকারিতা, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য পাঠ্য বিষয়, প্রয়োজনীয় সংবাদ-চিত্রাদির চমৎকার সঙ্কলন সন্দর্শন করিয়া, দেশের মনীষীবৃন্দ, পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ ও জন-সাধারণ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন—'তোমারি তুলনা তুমি এ মহিমণ্ডলে !', এ সেই পঞ্জিকা, এ সেই জাতীয় জীবন-যাত্রার অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অতুলনীয়, অপরিহার্য্য, অমূল্য অভিধান !

প্রত্যেক মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রণীত

"কালের ডায়রী"

(ঐতিহাসিক গল্প)

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রচলিত জনপ্রবাদ লইয়া চারিটী গল্প রচিত হইয়াছে।

প্রথম গল্প—কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের উত্থান পতনের কথা, ২য়—সুসঙ্গ রাজবংশের কথা, ৩য়—ইশা খাঁর কথা, ৪র্থ—দস্যু কেনারামের কথা। যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ভাবে পড়িতে চান, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল। ইহাতে দুই খান হাফটোন চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। মূল্য ... আনা মাত্র। সৌরভ কার্য্যালয়, ময়মনসিংহ।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী কৃত

বিশ্ব-বীণা

বালক বৃদ্ধ যুবা নারী—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই এই বীণার ভিতরে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুনিতে পাইবেন। হাই স্কুল ও মাইনার স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার দেওয়ার উপযোগী। পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ উভয় পক্ষের উপকারী। দক্ষিণা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত
প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতিতে প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সোণাবিবি।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩৩৪। | দশম সংখ্যা।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য।

(৬)

যোগ সাহিত্য

এদেশের যোগীদিগের মধ্যে একশ্রেণী ছিলেন—কামিনী কাঞ্চনত্যাগী। অষ্টসিদ্ধি ছিল ইঁহাদের লক্ষ্য, "নিরঞ্জন" ইঁহাদের দেবতা। মস্তকে সংস্রারপদ্মে ইঁহারা নিরঞ্জন দর্শন করিতেন। 'নাথ' যোগীরা এই শ্রেণীর উদাসীন। মীননাথ, ইঁহাদের আদি গুরু। গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য। মীননাথ, আগু আদিনাথ বা শিব হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সে হিসাবে ইঁহাদিগকে শৈব সন্ন্যাসীও বলা যাইতে পারে। কিন্তু শৈব হইলেও ইঁহারা শিব-দুর্গার উপাসক নহে।

আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ এই তিননাথই, শ্রেষ্ঠ। এদেশে এই নাথত্রয়েরপূজা প্রচলিত আছে। এই পূজার নাম "তিননাথের মেলা।" তিন পয়সায় এ 'মেলা' হয়। এক পয়সার পান-সুপারি, এক পয়সার তৈল এবং এক পয়সার গাঁজা ইহাই 'মেলা'র উপকরণ। সন্ধ্যার পরে তৈল দিয়া বাতি জ্বালিয়া, পান ও গাঁজা খাইয়া ভক্তগণ তিননাথের ভজন গাইয়া থাকে। ভজন এইরূপ—

"সাধুরে ভাই,
দিন গেলে তিননাথের নাম লইও।
সারাদিন কৈরো ভাই সংসারের কাম।
সন্ধ্যা হইলে লইও তিননাথের নাম।

তিননাথের মেলার নামে গাঁজাখোরদের বড় আনন্দ। তিননাথের মেলার 'কথা' (অর্থাৎ কিরূপে পূজা প্রচারিত হইল সে বিবরণ) আছে। মেলার সময় একজন কেহ 'কথা' বলে অন্যেরা শুনে।

তিননাথের মধ্যে গোরক্ষনাথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এদেশে "পর্ব্ব" নামে একপ্রকার গান আছে। এই গানে ভাঙ্গের জন্ম কথার গীত হয়—

"পর্থমে আনিল ভাঙ্গ গুরুগোর্থনাথে।"

গীতের কথায় বিশ্বাস করিলে জানা যায়, গোরক্ষনাই এদেশে প্রথম ভাঙ্গের আমদানী করেন। গ্রীয়ার্সনের গোরক্ষনাথ একজন নেপালী সাধু হইতে পারে, এই নেপালী সাধু নেপাল হইতেই ভাঙ্গসহ বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাঙ্গের অন্য নাম—'সিদ্ধি'। যোগীরা অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য এই নবম সিদ্ধির সেবা করিতেন। তাঁহাদের শিষ্যেরা অষ্টসিদ্ধি ছাড়িয়া শেষে এই নবমকেই একমাত্র সিদ্ধি বলিয়া ধরিয়াছিলেন। গাঁজা, ভাঙ্গের বড় ভাই। গাঁজারও এক নাম সিদ্ধি'। আধুনিক বাউলেরা ইহাদের মধ্যে নাথপন্থী এবং সহজিয়া দুই দলই আছে—গাঁজারই সেবা করে। ইহারা গাঁজাকে 'শুক্না তামাক'ও বলে।

'তিননাথের মেলা' ছাড়া আর এক প্রকারও গোরক্ষ-নাথের পূজা এদেশে চলিত আছে। এ পূজার নাম গোর্খের ধার শোধা'। গাই বিয়াইলে প্রত্যেক গৃহস্থকে গোর্খের ধার শুধিতে হয়। গোর্খনাথ ঠাকুর (গোরক্ষনাথ) গরুর রক্ষাকারী; গাই বাছুর রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহার নিকট গৃহস্থের একটা 'ধার' হয়। গাই বিয়াইলে সেই গাইয়ের দুধের ক্ষীরের নাড়ু তৈয়ার করিয়া গোর্খেরনাথের নামে দেওয়া হয়। ইহাই এ পূজার একমাত্র উপচার। পূজার

কোন নির্দ্দিষ্ট দিন তারিখ নাই। গাই যখনই বিয়াক, প্রায়শঃ বৈশাখ মাসেই গোর্থের ধার শোধা হয়। রাখালেরা এ পূজার পুরোহিত। সন্ধ্যার পরে রাখালেরা গৃহস্থের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। একখানি পীড়ির উপর দড়ী ও লড়ী রাখিয়া দেওয়া হয়, ইহাই গোর্খনাথের আসন। রাখালেরা এই আসনের সম্মুখে সারি দিয়া বসিয়া গোর্খনাথের মাহাত্ম্যসূচক ছড়া গায়। এই ছড়াই এ পূজার মন্ত্র। একজন ছাড়ার চরণগুলি বলে,—অন্যান্য রাখালেরা একযোগে প্রত্যেক চরণের পরেই "হেচ্চ" বলে। এই "হেচ্চ"ই গোর্খনাথের বীজ মন্ত্র। ছড়া সমাপ্ত হইলে ক্ষীরের লাড়ু ছড়াইয়া দেওয়া হয়, রাখালেরা উহা, কাড়াকাড়ি করিয়া যে যাহা পায়. খায়। ছড়ায় গোর্খনাথের রূপ—

"হাতে লড়ী মাথায় টীক।
গাজের কূলে পারেন পিক ॥

নাথ যোগীদিগের লিখিত গ্রন্থ ও এবং রচিত গান আছে। গ্রন্থে ও গানে নাথ-পন্থার সাধন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। মীননাথের লিখিত "স্মরদীপিকা" নামে একখানি কামশাস্ত্রের পুথি পাওয়া গিয়াছে। নাথ-যোগীদিগের রচিত বাঙ্গালা কোন গ্রন্থ এ মহকুমায় পাওয়া যায় নাই। এ প্রদেশে ইঁহাদের রচিত কতকগুলি সাধন-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। যোগ-মার্গানুসরণকারীরা উহা গান করিত। এখনও দুই একজন বাউল ফকীরের মুখে এই সকল গান শুনা যায়। উহার একটি গান এই :—

তুমি শিষ্যের কথা কর অবধান;
শুরু মীননাথ রে—
ও গুরুজী,—
দন্ত হৈল বড়বড় আঠু হৈল কিঙ্কর
কেশ হৈল বগুলার পাখী,
গভীর বরণ হৈল দুটি আঁখি রে—
গুরু মীননাথ রে—
ও গুরুজী,—,
শোন গুরু লোকের বোল,
ছাড়রে কামিনীর কোল,
তুমি দিনে দিনে ঘাটে জরা বোয়াইলা রে—
ও গুরুজী—
কভুনি দেইখাছ গুরু, ইহা নি শুইনাছ রে—
তাল গাছে লাল ঘোড়ার ছাও।
গুরু মীননাথ রে—
পাখী হৈয়া সে আধার যোগাইল রে,
আধারে ধরিয়া খাইল মাও।
গুরু মীননাথ রে—
ও গুরুজী—
অমাবস্যা মঙ্গলবার ছুতিয়া পালিয়া রে—
ডাইন অঙ্গে না শোয়াইব নারী,
সেই নারীর শ্বাসে রে, সর্ব্বঅঙ্গ শুকাইব রে
না মানিব ওঝা আর গুনিনে।
গুরু মীননাথ রে—

মীননাথ, কোন সময়ে কামিনী-কাঞ্চনের মোহে পড়িয়া সাধন ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ জরা-গ্রস্ত, মন বিষয়াসক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে শিষ্য গোরক্ষনাথ কতকগুলি গান গাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। উল্লিখিত গান তাহারই একটি। মীন-চেতন ও গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে মীননাথের এই পতন ও উদ্ধারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সহজিয়া বা বাউলেরা, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব যোগী। ইহারা ত্যাগী নহে, ভোগী। ভোগের পথে সদানন্দ লাভ, ইহাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ইহারা যোগমার্গে স্বাস্থ্য, শক্তি ও অটলত্ব লাভের চেষ্টা করে! "কামদেবায় ধীমহী" —ইহাদের গায়ত্রী। কিন্তু কামসাগরে সর্ব্বদা 'সিনান' করিলে ও ইহারা ডুবিয়া মরে না। ইহারা বলে—

"অমিয়া সাগরে, সিনান করিবি,
কেশ না ভিজাবি তায়,
রাঁধুনী হইবি, ব্যঞ্জন বাটিবি
হাঁড়ী না ছুইবি তায়।"

ইহাদের কথা সব 'ঠারে ঠোরে', যে, দলের লোক. সে বুঝে, অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। প্রবাদ এই, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী এই মতের প্রধান প্রচারক ছিলেন। সহজিয়া মতে যাহারা সিদ্ধ, তাহাদিগকে অবধূত বলে। ইহাদের সাধারণ নাম বাউল। বাউলেরা মাথায় দীর্ঘচুল রাখে, হাতে একটা লৌহ বলয় ধারণ করে। ইহারা

শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডন করে না লোহার একটা দীর্ঘ চিমটা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে এবং সন্ধ্যাকালে ধূপ-ধূম দিয়া এই চিমটার আরতি করে। সেই সময়ে উচ্চ কণ্ঠে—

"বীর অবধূত, নিতাই অবধূত,
করোয়া ধারী, কাঁথাধারী,
প্রভু অটল বিহারী—"

এই মন্ত্র আবৃত্তি করে। সহজিয়া মতে মানুষ সকলের উপরে—দেবতারও উপরে। মানুষের যিনি আরাধ্য তিনি "সহজ মানুষ"। এই সহজ মানুষ সকলের দেহেই আছেন। তাঁহাকে চিনাই সাধনা। বৌদ্ধদিকের 'চর্য্যাপদ' ইহাদের পুরাতন সাহিত্য। এক্ষণে চর্য্যাপদের প্রচার, বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদাবলী, তরুণীরমণের পদ, বিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি সহজিয়া মতের গ্রন্থ। রাঢ়েই এই মতের বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল। আমাদের এ মহকুমায় এই মতের একখানি গ্রন্থ "ষড়চক্র ভেদ"। ইহার আরম্ভ এইরূপ:—

"আদ্য পাতালে এক তরুবর।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদি আছে তার সহস্র শিখর॥
চারি খানি ডাল তার, চারি খানি ×।
বাষট্টি হাজার আছে শরীরের নাড়ী॥
ষড়চক্রে দ্বাদশ নাড়ী কহিল প্রধানে।
বাষট্টি হাজার নাড়ী সকলে বাখানে॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী দুইভিতে জান।
তার মধ্যে সুষমা যে মুখ্য করি মান॥
সুষম্নার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সন্ধান।
তাহাকে জানিলে সিদ্ধি হয় কায়া প্রাণ॥"

সমাপ্তি—

"বিশ্বাস করিয়া কর সাধু সঙ্গে মতি।
বর্ত্তমানে পাবা দেখা রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি।"

সহজিয়া মতের আর এক খানি গ্রন্থ—"বস্তুতত্ত্ব"।

উহার আরম্ভ এইরূপ:—

কোথা হৈতে আসে বস্তু কোথায় করে স্থিতি।
কোনখানে থাকি বস্তু করে গতাগতি॥
বসিয়া থাকেন বস্তু পদ্ম অষ্টদলে।
রূপে রসে গন্ধে গুণে করে ঝলমলে॥

মধ্যভাগে—

মস্তক ভিতরে হয় মূল সরোবর।
সহস্র দল পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
উদর মাঝারে আছে রস সরোবর।
শতদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
নাভির নামাতে হয় প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
ঘোর অন্ধ সরোবর তিন পদ্ম হয়।
এহি তিন সরোবরে পদ্ম উপজয়॥
দুই পদ্ম বিকসিত এক পদ্ম কোড়া।
ঊর্দ্ধমুখ অধমুখ দুই মুখ যোড়া॥

গ্রন্থের শেষাংশ লিখিবার উপায় নাই। উহাতে গুপ্ত সাধন প্রণালী লিখিত। সে প্রণালী আধুনিক রুচির হিসাবে অশ্লীল ও জুগুপসিত। সহজিয়াদিগের একটী গান এই—

মন রে আমার,
ত্রিপিনীর কূলে থাইকা না জান সাতার।
অ আমার মন—
গহীন গম্ভীর জল তিন ধারেতে বয়,
তিন দিকে তিনটি নিশান তিনটি রকম হয়।
সরস নদীর মৈধ্যে দিয়াছি সাতার।
এই নদীতে স্নান করিলে জনম নাহি আর॥
অ আমার মন—
অষ্টম দল শত দল দশম দলে থানা,
ষোড়শ দলেতে আছে তার বারাম খানা,
সপ্তদল বিদিত কৈল হৃদয় পথ সার,
পদ্মের সঙ্গে আছেন গুরু ডিম্বের আকার॥
অ আমার মন—
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নারী সুষম্নাতে তালা,
শ্রীগুরুর আজ্ঞা বিনে না যায় তালা খোলা।
প্রেমের ছোয়ানী গোসাই চৈতন্ত কামার।
নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাই আছেন চকিদার॥

ইসলামী যোগীদিগকে 'দরবেশ' বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বত্যাগী ফকীর, কেহ সংযমী গৃহস্থ। সাধনাঙ্গে নাথযোগী ও সহজিয়াদিগের সহিত ইঁহাদের বিশেষ প্রভেদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার ... কলিকাতা

নাই। কুণ্ডলিনী জাগরণ, ষড়চক্রভেদ, নিরঞ্জন দর্শন, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ, ইঁহাদের মতেও আছে। এই মতের একজন ফকীরের মুখে শুনিয়াছি—

"সাঁইর উপরে কিছু আছে বেদ কোরাণে নাই।" জগতের যিনি কারণ, তাঁহাকে ইহারা বলেন সাঁই। সাঁই—মানুষ, মানুষের মধ্যেই তিনি বিরাজ করেন।

দরবেশদিগের একখানি গ্রন্থের নাম "বাল্‌কা নামা"। প্রণেতা নঞান চান্দ ফকীর। নঞান চান্দ, হিন্দু কি মুসলমান, বলিবার উপায় নাই। আর নঞানচান্দ কেন, দরবেশ মাত্রেই কোন জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ নহেন। সাধনক্ষেত্রে ইঁহারা সকলে একজাতি, সে জাতির নাম দরবেশ, ফকীর বা সাধক। এই নামে মুসলমান ত আছেনই, হিন্দুও আছেন। মুসলমান ফকীরের হিন্দু শিষ্য, এবং হিন্দু ফকীরের মুসলমান শিষ্য, যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মানিকগঞ্জ মহকুমার খরারচরের প্রসিদ্ধ পাঁচু ফকীর, জাতিতে মুসলমান হইলেও সকলেই তাঁকে 'বাবাজী বলিত। তিনি কোন হিন্দু বৈরাগীর শিষ্য ছিলেন এজন্ত বৈরাগীর মতই তিনি নিরামিষাশী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন।

বাল্‌কা নামায় দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সে তত্ত্ব কথা অসাম্প্রাদায়িক। আমরা উহা হইতে কিছু উদ্ধার করিতেছি :—

বাল্‌কা (শিষ্য) জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম, কাঁহা বৈঠে সাঁই।
কাঁহা বৃন্দাবন মোকাম মুস্কিল স্থান ভেস্ত পাই॥
কাঁহা গোলক বৈকণ্ঠ কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সূর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দ ভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা॥
নঞান চান্দ ফকীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকমে পাই॥

মুরসিদ (গুরু) উত্তর করিতেছেন--

দিল্‌মে বৈঠে রাম রহিম, দিল্‌মে মানিক সাঁই॥
দিল্‌মেঁ বৃন্দাবন মোকাম মুস্কিল মস্তান ভেস্ত পাই॥
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিয়া আলম তারা।
চান্দ সুরুজ মেঘ জ্যুতি ইন্দ্র বইছে ধারা॥

পুনরায়.—

বাল্‌কা বলে মুরসিদে করি যোড় হাত।
বালকা আর মুরসিদ রহে কতদূর তফাৎ॥
মুরসিদ বলেন বাবা ঠাণ্ডা হও তুমি।
এসব পিণ্ডার খবর কহিয়া দিব আমি॥
বাল্‌কা আর মুরসিদ যদি আশমান জমিন হয়।
বাল্‌কার আহ্লাদে মুরসিদ কেমনে মিলয়॥
চাতক আহ্লাদে যেমন মেঘে জল দেয়।
বাল্‌কার আহ্লাদে মুরসিদ ইমতি মিলয়॥
আশমানে থাকে মুরসিদ খাকীতে বালকা বৈসে।
আশমানের চন্দ্র যেমন হাতে পড়ে খৈসে॥

পুনরায়—

বালকা বলে মুরসিদ শুনিয়া হৈলাম ভোর।
দুনিয়ার মৈধ্যে কাঁহা চাইর গোর॥
মুরসিদ বলেন বাবা ঠাণ্ডা হও তুমি।
ইসব পিণ্ডার খবর কহিয়া দিব আমি॥
প্রথম গোর হয় ত পিতার মস্তকে।
দ্বিতীয় গোর হয় ত মায়ের উদরে॥
তৃতীয় গোর হয় ত সংসার পরিপাটী।
চতুর্থ গোরে খাকীর পিণ্ডা খাকীতে দিবে মাটী॥

এইরূপে পিণ্ডার (দেহের) বহু অদ্ভুত তত্ত্ব বর্ণনায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান সময়ে বাউল ও দরবেশ সম্প্রদায়ে উহা আলোচিত হইয়া থাকে। মোটামোটি বলিতে গেলে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সমস্তই (স্বয়ং ভগবানসহ) এই দেহের মধ্যে আছে এবং "ধড়ের মধ্যে যে বাস করে, সে হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে,"—এই সকল গ্রন্থে বুঝান হইয়াছে।

"বালকা নামা" আকারে খুব বৃহৎ নহে কিন্তু ইহাতে যে সকল তত্ত্বকথা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা আকাশের মত বৃহৎ ও উদার। সেই অনন্ত উদার কথার মধ্যে ও "মানুষ—মানুষ, সে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, এবং মানুষের মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন"—ইহাই পরম কথা।

বাল্‌কা নামার ভাষা পারসী ও হিন্দী মিশ্রিত হইলেও প্রহেলিকাবৎ ইহার প্রশ্নসমূহ এবং সেই সকল প্রশ্নের

অচিন্তিতপূর্ব্ব উত্তর পাঠে বড়ই আনন্দ জন্মে। গ্রন্থ শেষে—

"বিনা বীজে গাছ সেহি কল্পতরু।
হিন্দু মুসলমান দেখ সবাকার গুরু॥"

বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমরা ও সেই অবীজোদ্ভূত কল্প তরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে যাইয়া ও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমরা গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় এ মহকুমার যে সকল প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে রহিল। ইহা 'সমালোচনা' নহে, বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতে গেলে "দিগ্‌দর্শন" মাত্র। সুতরাং এইটুকু মাত্র পাঠ করিয়াই পাঠকেরা গ্রন্থ-রস উপভোগ করিতে পারিবেন এ আশায় এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। তাঁহারা এ মহকুমার শব্দ সম্পদের কথঞ্চিত পরিচয় অবগত হউন, এবং এ সমুদয় রক্ষার বিধান করুন, ইহাই অভিপ্রেত।

এই সকল পুরাতন সম্পদ্ রক্ষার একমাত্র উপায়, মুদ্রণ ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই সকল বিরাট্‌কায় গ্রন্থ ছাপাইতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা, সহজসাধ্য নহে। অবশ্য এ মহকুমায় এবং ময়মনসিংহ জেলায় ধনী বা দাতার অভাব নাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দানের ধারা বর্ষিত হইবে কিনা তাহাই চিন্তার বিষয়। কেন না এরূপ দানে স্বর্গাপবর্গলাভের ব্যবস্থা কোন স্মৃতি সংহিতাতে নাই। আত্ম-প্রসাদই এ দানের ফল। কিন্তু সে প্রসাদ ভোগে তাহারই লোভ, যিনি এ রসের রসিক। আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি।*

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

প্রাচীন কাহিনী

শ্যালক-ডাকাইত।

আজ আমরা সেকালের আর একটী অদ্ভুত ডাকাইতের কথা লিপিবদ্ধ করিব।

আপনারা অনেকেই জানেন যে ৬০।৭০ বৎর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কিরূপ বৈবাহিক ব্যবহার ছিল। দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধনের মহিমায় কুলীন কন্যাদিগের মধ্যে অনেকেরই জীবনে বিবাহ ঘটিত না। অনেক কুলীন কন্যা ৫০।৬০ বর্ষ বয়সে ২০।২৫ বর্ষ বয়স্ক যুবকের গলে বর মালা দিয়া অবশিষ্ট জীবন পিত্রালয় কি মাতুলালয় গলগ্রহ স্বরূপ থাকিতেন। এক এক কুলীন পুত্রের স্ত্রী বিদ্যমানেও একশ দেড়শ বিবাহ পর্য্যন্ত হইত, এ কথা যাঁহারা অতিরঞ্জিত মনে করেন তাঁহারা একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তকখানা দেখিবেন।

অল্প দিনের কথা বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, রচিত গানে কুলীন ঠাকুরদিগের যে সকল কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলেও আপনারা সে কালের কৌলিন্য প্রথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এমন অনেক কুলীন ছিলেন যাহারা একদিন মাত্র এক এক শ্বশুরবাড়ী আহার করিলেও অনায়াসে একবৎসর কাটাইয়া দিতে পারিতেন।

বিবাহের পরে স্ত্রীর সহিত আর বড় সম্বন্ধ থাকিত না তবে কেহ কেহ ১০ কি ১৫ বৎসর পরে একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়া পুত্রকন্যাদিগের মুখ দেখিয়া আসিতেন বটে।

আমাদের দেশে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় উক্তরূপ একজন কুলীন পুত্র ছিলেন। তাঁহারও ১৩।১৪টী বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, একটী পত্নী নিয়া গৃহে বাস করিতেন আর সকলে নিজ নিজ পিত্রালয় থাকিতেন। তাহার মেদিনীপুরে এক শ্বশুরবাড়ী ছিল। বিবাহের পর ৭।৮ বৎসর গত হইল, তিনি মাত্র সম্প্রদানের রাত্রিতে শ্বশুরালয় ছিলেন তার পর আর ওপথে পদার্পণ হয় নাই। ৮ বৎসর পরে মনে হইল একবার শ্বশুরবাড়ী যাইবেন, সঙ্গে একটী ভৃত্য চলিল, এবং তাহার নিকট আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি থাকিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেকালে আজ কালের মত যান বাহনাদির প্রাচুর্য্য ছিল না, নৌকাযোগে কিংবা পদব্রজে ভিন্ন দূর দেশে যাওয়ার অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভৃত্যের সহিত পদব্রজেই শ্বশুর বাড়ী চলিলেন। শ্বশুর বাড়ীর ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে

* টাঙ্গাইলের কোন বাণী সেবক ধনকুবের যদি এই গ্রন্থগুলি রক্ষার উদ্যোগী হন তবে বোধ হয় এই গ্রন্থগুলি করাল কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আমরা আশা করি, অচিরে ময়মনসিংহবাসী এই অমূল্য রত্নগুলি উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন। সৌঃ সঃ।

এক প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠ পার হইয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হয়, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যা অতীত হইলে সেই মাঠে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু ভৃত্য দুই জনে দুই পথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে হাটিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আর ভৃত্য ৫০।৬০ হাত পশ্চিম দিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কারণ ডাকাইতের ভয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে কালে দিনে দুপরেও মাঠে ঘাটে দস্যু ডাকাইতের ভয় ছিল, রাত্রিকালে তো প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া চলিতে হইত।

আমরা ইহাও বলিয়াছি যে সেকালের দস্যুগণ প্রাণে না মারিয়া একটীও পয়সা নিত না।

এই অবস্থায় দুইজন দুই দিকে থাকিলে একজন, দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইলে অন্ততঃ আর একজন পলাইয়া প্রাণ বাঁচিতে পারিত, একজন বাঁচিয়া গেলে কথা প্রকাশ হইতে পারে এজন্য দস্যুরাও দুই পথে দুইজন দেখিলে পার্য্যমাণে আক্রমণ করিত না।

সে রাত্রে নভোমণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের সাহায্যে ইতস্ততঃ দেখা যাইত বটে।

এদিকে পথিক দুই জন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দক্ষিণ দিকে ছুটিতেছেন।

এই সময় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যুতালোকে দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে কয়েক জন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার ভৃত্যের মস্তকে লগুরাঘাত করিল। সেই আঘাতেই ভৃত্য বিকট চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, দস্যুগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিয়ৎকাল এইরূপ দৌড়া দৌড়ির পর বন্দোপাধ্যায় নিবিড় অন্ধকারে কোন পথে কোথায় লুকাইয়া পড়িলেন দস্যুগণ তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

বন্দোপাধ্যায় প্রাণ ভয়ে কম্পিত ও অবসন্ন কলেবরে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া দৈবাৎ তাহার শ্বশুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বাবা রক্ষা কর বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা শক্তিও বলুপ্ত হইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া বাড়ীর লোকে আসিয়া দেখিলেন একটী যুবক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। বাড়ীর সকলেই শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন, কিছুকাল পরে পথিকের চৈতন্যোদয় হইল, পথিক ক্ষীণস্বরে জল চাহিলেন এবং জলপান করিয়া অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। ব্যাপার কি বাড়ীর লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। পথিকের বৃদ্ধ শ্বশুর বলিলেন ভয় কি বাবা? আমার বাড়ী যখন আসিয়াছ তখন আর তোমার চিন্তার কারণ নাই।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া নাম ধাম গোত্রাদি জানিয়া নিজ জামাতাকে ঠিক করিয়া লইলেন, পথিক তখনই দেখিলেন একটী সুন্দরী যুবতীর চক্ষু ছলছল করিতেছে, মুখখানাও মলিন হইয়া আসিতেছে। সুন্দরী আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, উদ্বিগ্নভাবে সেথান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধ শ্বশুরের মুখেও গভীর চিন্তার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

বাড়ীর মধ্যে শাশুরী নানাবিধ পাকশাকের আয়োজন করিতেছেন, কুলীন কন্যার ভাগ্যে যাহা ঘটে না তাহা ঘটিয়াছে; জামাই নিজে উপস্থিত হইয়াছেন, আনন্দের বিষয়ই বটে। আহার করিয়া জামাইবাবু পান তামাক খাইতেছেন এমন সময় সেই ডাকাইত ৪ জন ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শুনিতে পাইল তাহারা যাহাকে তাড়া দিয়াছিল সেই লোকটা তাহাদের বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অধিকন্তু সেই লোকটা তাহাদের ভগিনী পতি, ইহা নজির প্রমাণে ঠিক হইয়া গিয়াছে।

চারি ভাই মহাবিপদে পড়িলেন। বড় ভাই বলিলেন এখন কি করা যায়, এই শত্রুকে বধ করিলে ভগিনী বিধবা হয়, আর বধ না করিলে আমাদের চারি ভাইর প্রাণ যায়, পরিবার অন্নাভাবে মরে, কারণ এ জীবিত থাকিলেই ঘটনা পুলিশের কাণে যাইবে, তারপরেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আর এক ভাই বলিল দাদা! একটা ভগিনীর জন্য চারি ভাইর প্রাণ দিতে পারি না।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে প্রকারেই হউক ইহাকে প্রাণে বধ করিতে হইবে। পরামর্শ ঠিক হইল বধ করাই কর্ত্তব্য, ঘর হইতে বাহির হইলে বধ করিব। আর যদি বাহির না হয়

ভগিনীর সাক্ষাতেই বধ করিতে হইবে। এ দিকে জামাই বাবু শয়নকক্ষে শয়ন করিতে গেলেন তাঁহার স্ত্রী ইতিপুর্ব্বেই সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। জামাইবাবু ঘরে গিয়া দেখেন তাহার স্ত্রী অস্ফুট স্বরে কাঁদিতেছেন। জামাইবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য. কুলীন কন্যার ভাগ্যে যাহা ঘটে না, আজ তোমার সেই সৌভাগ্য উপস্থিত। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, ইহ. তোমার শত জন্মের তপস্যার ফল মনে করা উচিত; স্বামীর কথা শেষ না হইতেই যুবতী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, বাঁচিবার আশা থাকেতো চুপ কর, কয়েকটা কথা শোন, তারপর যাহাই ইচ্ছা বলিও। জামাইবাবু স্ত্রীর কথা শুনিয়া ভয়ে চিন্তায় বিস্ময়ে জড়বৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

যুবতী স্বামীর কর্ণের কাছে মুখ নিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকাইত ভ্রাতৃগণের দুরভিসন্ধির কথা বলিলেন। জামাই-বাবুর চক্ষু স্থির, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, এখন উপায়। যুবতী বলিলেন আর উপায় নাই, একটী মাত্র উপায় আছে তাহা আমি অগ্রেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। জামাইবাবু বলিলেন কি উপায়। যুবতী বলিলেন, ধর, আমার এই সাড়ীখানা মেয়ে লোকের মত পর, কপালে সিন্দুর দেও, হাতে শাখা পর, বিপদে সাহস কর, এই বলিয়া যুবতী নিজ হাতে যুবককে যুবতী সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, ঐ দেখ নিকটে পাকা পায়খানা দেখা যায়। তুমি ঘটী নিয়া ঐ পায়-খানায় যাও। উঁহারা দেখিতে পাইলেও আমি পায়খানায় যাইতেছি মনে করিয়া তোমার কাছে যাইবে না। পায়খানার নীচে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া একজন লোক অতি কষ্টে প্রাচীরের অপর পৃষ্ঠে উপস্থিত হইতে পারে। তুমি এই ভাবে প্রাচীরের বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরিয়া ২।৩ ক্রোশ দূরে থানায় উপস্থিত হইতে পারিলে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবা। জামাইবাবু পত্নীর কথানুসারে প্রাচীরের বাহির হইয়া দ্রুতবেগে থানায় গিয়া রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। থানায় যাহারা ছিলেন তাহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বিষ্ঠা লিপ্তাঙ্গ স্ত্রী বেশধারী একজন যুবক ব্রাহ্মণ ভূতলে পড়িয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। ঘটনা শুনিয়া থানার কর্ত্তা বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

সেকালের ডাকাইতগণ আজকালের, ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়া পুলিশের সঙ্গে সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সাহস পাইত না। তাহারা পুলিশকে সর্ব্বোপরি হর্ত্তাকর্ত্তা বলিয়া মনে করিত, এবং যমের ন্যায় ভয় করিত।

উহারা যথেষ্ট ঘুষ দিয়া পুলিশকে বাধ্য রাখিত ঘুষখোর পুলিশ ঘুষদাতা দস্যুকে কিছুতেই গ্রেপ্তার করিত না, বরং সুযোগ পাইলে তাহাদের কাজের সুবিধা করিয়া দিত।

যাহারা এই ব্রাহ্মণকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহারা পুলিশের অপরিচিত নহে, পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে মাসে মাসে বহু টাকা আদায় করিয়া থাকে। তাহাদের একটী শিকার আজ পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কি দস্যুর হাতে দেওয়া উচিত, এই চিন্তায় পুলিশ "ন যযৌ ন তস্থৌ" মধ্যে পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর পুলিশের বড় কর্ত্তা ঠিক করিলেন অনর্থক একটা ব্রহ্ম বধ করা অনুচিত।

প্রকাশ্যে বলিলেন, ঠাকুর, শীঘ্র এখান হইতে যাও, দস্যুর দলে বহু লোক আছে, তাহারা এখানে উপস্থিত হইলে বিপদে পড়িতে হইবে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, তুমি এই রাস্তা ধরিয়া শীঘ্র ২ পালাও। পথিক তথাস্তু বলিয়া অতি কষ্টে দেশের দিকে চলিলেন।

এদিকে কাক কোকিল ডাকিতেছে রাত্রি প্রায় প্রভাত, জামাই বাবু রাত্রে বাহির হয় নাই, ঘরেও তাহার সারাশব্দ পাওয়া যায় না, ডাকাইত চারিভাই মহাব্যস্ত হইয়া দরজায় গিয়া বলিল সাবিত্রী! শীঘ্র দরজা খোল। বলাবাহুল্য যে ভগিনীর নাম সাবিত্রী, সাবিত্রী দরজা খুলিয়া দিল, দস্যু চতুষ্টয় ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শিকার পলাইয়াছে, একমাত্র সাবিত্রীই ঘরে আছে।

তৎক্ষণাৎ চারি ভাইর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। বড় ভাই রক্তচক্ষুঃ ঘুরাইয়া বলিলেন সয়তানি! তোর কৌশলেই শত্রু পলাইয়াছে, তুই আমাদের চারি ভাইর প্রাণ নাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিস্। সাবিত্রী বলিল আমাকে মারিলে তোমাদের বিপদ দূর হইবে না। বরং আরও ঘনীভূত হইবে। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, ইহার পরে তিনি যদি শোনেন যে, তোমরা তাহার প্রাণরক্ষা-কারিণীরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছ তাহা হইলে তোমাদের কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। যদি বাঁচিতে চাও তবে শীঘ্র

আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেও, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া দিব। আমি তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছি তিনি কিছুতেই আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। মেয়ের ঘরে গোলমাল শুনিয়া বুড়ো ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি মেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন সাবিত্রী ঠিক বলিয়াছে, আমার লক্ষ্মী মেয়ে কোনও দিনও মিথ্যা কথা বলে না, তাহাকে অন্ত লোক দিয়া জামাইর বাড়ী পাঠাইয়া দেও, সে গেলে তোদের আর কোন বিপদ থাকিবে না।

ইহার পর যুক্তি ঠিক করিয়া সাবিত্রীকে শ্বশুড়বাড়ী পাঠান গেল সে তথায় গিয়া কথানুরূপ কার্য্য সাধন করিল। সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এই সাবিত্রীও ঠিক সেইরূপ। আমাদের দেশে অনেকে এখনও প্রাচীনা সাবিত্রীর ন্যায় এই সাবিত্রীকেও ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

বন-সোহাগী। *

বনসোহাগী আর ফিঙা একই জাতীয় পাখী। শরীরের রঙে কিন্তু অনেক চের তফাৎ। ফিঙা একহারা কালো আর বনসোগী বিচিত্র বর্ণ বৈভবে মনোহর।

বনসোহাগী অতি সুন্দর পাখী। আকারে ফিঙার মতনই বড় হয়, তার চাইতে একটু হৃষ্টপুষ্ট। ঠোঁট কালো, পুরু তীক্ষ্ণাগ্র বেঁটে। চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল। ঠোঁটের উপর হইতে মাথার উপরিভাগ সমস্ত এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পর্য্যন্ত কালো রঙ। ঘাড়, পীঠের কতক অংশ এবং লেজের উপরি ভাগ তাম্রা ও কমলা রঙের। পীঠের শেষ ভাগের অংশ পরিষ্কার সাদা। ডানা দুটী বেশী লম্বা নহে। ৬।৭ ইঞ্চি মাত্র প্রত্যেকটী ডানার দৈর্ঘ্য। পালক ৪।৫ ইঞ্চি মাত্র লম্বা হয়। পালকগুলির রং প্রায় পদ্মের পাপড়ির মত। খানিকটা শ্বেতাভ পদ্ম রঙ তারপর ক্রমশঃ একটু গাঢ়। ঠোঁটের নীচে হইতে লেজ পর্য্যন্ত নিম্নভাগের রং সাদা। লেজ, ফিঙার লেজের মত দ্বিধা বিভক্ত ও লম্বা। চক্ষের উপর দিয়া দুটী কাজল কৃষ্ণ রেখা মাথার পেছনে গিয়া গলার উপর মিলিত হইয়াছে।

এমন সুন্দর পাখীটার বংশ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আগে আমরা শত শত বন সোহাগী দেখিতে পাইতাম, এখন আর তেমন দেখা যায় না। এই পাখীগুলা অত্যন্ত বিলাসী—সঙ্গীতই জীবনের যেন প্রধান সার্থকতা। ইহারা অত্যধিক মাত্রায় আলস্য পরতন্ত্র। সকালে উঠিয়া খোলা হাওয়ায় ঊষার আলোকের উপর রসাল চড়াইয়া ফিঙার কণ্ঠে, দয়েলের অনুকরণে গান গাহিতে থাকে। অনুচ্চ ও অনাবৃত জায়গায় বসিয়া সঙ্গীত করা ইহাদের অভ্যাস। এই সময় যদি ধারে কাছে দুই একটা ফড়িং পোকার উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। বাঘের মত ঝাঁপ দেয় বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ "ঝাবা ঝামা" বা "ঝাঝা "ঝাপা" বলে। যে স্থান ইহাদের বেশী পছন্দ হয়, প্রায় সর্ব্বদাই সেই স্থানে বসিয়া গান করে। অবশ্য এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকার অভ্যাস ইহাদের নাই।

বন সোহাগীর পা দুটী মেটে শ্বেতাভ। ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা। নখ ঈষৎ বক্র—তীক্ষ্ণ। স্বচ্ছ কৃষ্ণ তার চক্ষু দুটি খুব সুন্দর। বনসোহাগী বার মাসই আমাদের দেশে বাস করে। বহু চেষ্টায়ও আমি ইহাদের বাসার খোঁজ করিতে পারি নাই। কখন কখন দুই একটী তরুণ শাবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কেহ কেহ বলে এই চতুর পাখী কাঁটা ঝোপে বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া থাকে।

বনসোহাগীর স্ত্রী জাতিগুলার রং অপকৃষ্ট। কোনো সৌন্দর্য্যই নাই; পুরুষগুলির যে যে স্থান খুব রঙীন,—মেয়ে গুলির দেহের বর্ণ সেই সকল স্থানে শুক্‌না—পাতার মত—বৈচিত্র বিহীন। বুকের রংও পরিষ্কার সাদা নহে, অনেকটা—মেটে গোছের। পুরুষ ও স্ত্রী পক্ষীর কদাচিৎ দেখা হয়। বসন্তের বাতাস আসিলে মাঝে মাঝে বন-সোহাগী চঞ্চল হইয়া সঙ্গীত মধুর রসে দয়িতার চিত্ত হরণ করিতে প্রয়াস পায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* লেখকের অপ্রকাশিত গ্রন্থ "পারক পাখী" হইতে উদ্ধৃত।

বলরামের পত্নীপ্রেম

(১)

আরে রাত তেমন বেশী নাই, উঠ্, উঠ্ তোরা সব; ঢাল্, তরোয়াল, সড়কি, লাঠি নে, উঠ্ উঠ্, শীগ্‌গির করে,—বৃদ্ধ বলবন্ত ভাগ্যমন্ত সর্দ্দারের সাঙ্কেতিক আহ্বানে ও হুঙ্কারে অল্পকাল মধ্যেই বিশাল মেঘনানদীর মধ্যস্থিত ঝাপটার চরের নদীর ধারের বৃহৎ বটগাছের নীচে লাঠি, বল্লম প্রভৃতি হস্তে নমঃশূদ্র লাঠিয়ালের দল জড় হইতে লাগিল। চরের মুসলমান, চরের নমঃশূদ্র, খোলা নদীর ঝড়ঝাপটার মধ্যে মহিষ, শূয়র, কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে কেমন গাঠগোট্টা পালোয়ান হইয়া উঠে! কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা চুল ধারণ করিয়া ঢাল-বল্লমহস্তে সকলের উপরে মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান পুত্র কেশব সর্দ্দারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাগ্যমন্ত বলিল, তো'র হাতে আজ লড়াইয়ের ভার; দরকার হ'লে মর্‌তে পারবি, কিন্তু পিঠ দেখাতে পারবি নে, জমীর দখল নেওয়া চাই-ই—চাই-ই, সর্দ্দার। শোন্ সকলে শোন্—বক্‌শিস্ জনকে দশ দশ টাকা, আর নূতন কাপড় চাদর, তা-ছাড়া লুঠ তরাজ করে যা আন্‌তে পারিস্, সবই তোদের।

ক্রমে ক্রমে কালো কালো জোয়ানের দল নদীতীরে-বাঁধা ডিঙ্গীতে চড়িতে লাগিল। ভাগ্যমন্ত নিবিষ্টমনে তাহাদের গতি লক্ষ করিতেছিল, শেষ লাঠিয়ালটী যখন নৌকায় যাইয়া উঠিল, তখন বৃদ্ধ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সর্দ্দার! সব ঠিক্, ঠিক্?

উত্তর হইল, ঠিক্।

তখন বৃদ্ধ সজোরে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, বল তবে জয় মা কালী! হর হর ব্যোম্ ব্যোম্! রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মিলিতকণ্ঠে উচ্চারিত সেই শব্দ উত্থিত হইয়া মেঘনার বক্ষোপরি আকাশে মিশিয়া গেল।

বৈশাখের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। আকাশ গভীর মেঘে আবৃত, মাঝে মাঝে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিকের অপর পারে সাইটুনলের দিকে আঁধারের বক্ষ চিরিয়া আকাশের গায় বিদ্যুৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেকখানিতে দশ দশ জন করিয়া পনরখানা ডিঙ্গী মেঘনার বুকের উপর দিয়া পাল তুলিয়া গর্ব্বভরে ঢেউ কাটিয়া চলিয়াছে।

অনুমান ঘণ্টাটাক্ পরে ছিপগুলি আসিয়া জমির পাশে লাগিল!

একটা নূতন পয়স্তী চর, বছর পাঁচেক হয় মেঘনার মাঝে দেখা দিয়াছে। তাহার পর হইতে ডাঙ্গাহাতিমোহনের তালুকদার ও নূতন ধনী মিত্রদের সঙ্গে গণেশপুরের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন জমিদার চৌধুরী-সাহেবদের সঙ্গে এই চর লইয়া মহা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। উভয়েই তাহাদের নিজ নিজ প্রাচীন জমির লপ্ত-পয়স্থ বলিয়া ইহাকে দাবী করিতেছে তাহার পর হইতে ফৌজদারী, দেওয়ানী, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ১৪৫ ধারা, ১০৭ ধারা, ৯ ধারা, ১০৮ ধারা, ক্ষতিপূরণের মাম্‌লা—কত কি মোকদ্দমা ও কাণ্ডকারখানা হইয়া গেল। এখন চর মিত্রদের প্রজাদেরই দখলে, বলরাম সর্দ্দার ও তাহার দলের মুসলমান লাঠিয়ালদের লাঠির কাছে সকলকেই মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে।

ভাগ্যমন্তের গণেশপুরে তলব হইল। তখন মিঞা সাহেব তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এ কি হ'লো, সর্দ্দার? লজ্জার কথা!

লজ্জার, মহালজ্জার কথাই বটে। কি উত্তর দিবে ভাগ্যমন্ত? মাথা হেঁট করিয়া ভাগ্যমন্ত নির্ব্বাক্ অবস্থায় বসিয়া রহিল। চল্লিশ বৎসরের উপর হইল সে চৌধুরী সাহেবদের পক্ষে প্রথম লাঠি ধরে—আলিমজ্জান চৌধুরী, নিজামদ্দিন চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী এই সময়ের মধ্যে পার হইলেন, এখন সংসারের কর্ত্তা মীর আমজাদ আলি চৌধুরী। পূর্ব্বাপর এপর্য্যন্ত মান বজায়ই রহিয়াছে, কথার সঙ্গে কার্য্যের এক তিলও নড়চড় হয় নাই, যখন যে কাজ হাত দিয়াছে, মহা গৌরবের সঙ্গেই তাহা হাসিল করিয়া আসিয়াছে। এমন প্রকাণ্ড ঝাপটার চর, চৌধুরী-সাহেবদের জমিদারীর মুকুট-মণি, কাহার বিক্রমে ও চেষ্টায় দখল হইয়াছিল? উঃ! সে সব দিনের কথা মনে হইতেও শরীরের রক্ত আনন্দে উৎসাহে টগবগ করিয়া উঠে! শেষটায় কি না তাহাকে হটিতে হইল;—বলরামের কাছে! ডাঙ্গা-শামুকে পা কাটিতে হইল! বলরাম! হাঁ, জোয়ান্ বটে। লম্বা তেমন নয়, নয়ই, কিন্তু শরীরটা আগাগোড়া কেমন লোহার

মত শক্ত, বল্লম পর্য্যন্ত লাগিয়া ফিরিয়া আসে, কালো তেল-তেলে চেহারা, কেমন জোয়ানো, যেন বাঘ! বাপের বেটা! হইলে কি হয়—ভাগ্যমন্তের কাছে? কিন্তু হায়! সে যে এখন বুড়া! চুল দাড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে. দেহটাকে লইয়া আগের মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে না; তাই তো কেশব সর্দ্দার তাহাকে এবার নিতেই আপত্তি করিয়াছে; বলিয়াছে, বুড়া বাপকে লইয়া চলা-ফেরা কঠিন, তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়াই নাকি শেষ লড়ায়ে বলরামের কাছে হাটিতে হইল—কি লজ্জার কথা! ভাগ্যমন্তের বুক ভেদ করিয়া মস্তবড় এক দীর্ঘ-নিশ্বাস উত্থিত হইল।

আর বলরাম! বলরাম সর্দ্দারই বা কে? তাহারই তো ছেলের এক প্রকার ভায়রা-ভাই। তাহারই তো লাঠিখেলার সাগরেদ্, কিন্তু খেলায় এখন গুরুকেও ছাড়াইয়াছে। বা:! কেমন জোয়ানটা, আর লাঠি তরোয়াল চালাইতে কেমন ওস্তাদ বলরাম সমকক্ষ সর্দ্দার মুলুকে নাই বলিলেই চলে।

চৌধুরী সাহেব ঈষৎ হাসিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, ছেলের ভায়রার বিরুদ্ধে লাঠি-বল্লম চালাতে বুঝি মমতা হয়? অন্য সর্দ্দারের সন্ধান নেব কি?

ছেলে! ছেলের ভায়রা! ভাগ্যমন্ত চিনে মনিব, আর জানে জমি, আর মান। মেয়ে বা ছেলে বা অন্য আর কিছু—কেউ নাই তাহার।

অবশেষে ভাগ্যমন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিল, চর এবার সে দখল করাইয়া দিবেই, তাহার মৃত্যুপণ, টাকা আর মামলা-মোকদ্দমার ভার চৌধুরী-সাহেবের উপর।

ভাগ্যমন্ত! ভাগ্যবানই বটে সে। প্রথম যখন ঝাপটার চর দেখা দেয়—সে আজ কতদিনের কথা,—তখন আসলি গ্রামের জমীতে বাস অসহনীয় ও অসম্ভব বিবেচনায় নিতান্ত পেটের দায়ে সে চৌধুরী-সাহেবদের লাঠিয়াল-সর্দ্দার স্বরূপে চর দখল করিয়া দিয়া তাঁহাদের অধীনে কিছু জমি লাভ করিয়া বাস করিতে থাকে। এমন পালোয়ান ও লাঠিয়াল, তখন এই অঞ্চলে ছিল না—ভাগ্য সর্দ্দারের নামে বিপক্ষের দল, ডাকাইত, পুলিশ, জমীদারের দল কাঁপিত। তখন হইতে চৌধুরী-সাহেবদের পক্ষে লড়াই করিয়া কত নূতন জমি ও চর সে দখল করিয়া দিয়াছে; নিজেও কৃতকার্য্যের ফলের অংশ লাভ করিয়া সাহেবদের অনুকম্পায় ক্রমে এক মহা ভাগ্যবান্ গৃহস্থে পরিণত হইয়াছে। তাহার দেহের এমন স্থান খুবই কম, যেখানে কোনও তরোয়াল, বল্লমের, লাঠির বিষম আঘাতের চিহ্ন ধারণ না করিতেছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনের গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া সে আপনাকে কত গৌরবান্বিত মনে করে! দুই স্ত্রী, পাঁচ পাঁচ বেটা, চারি মেয়ে, নাতি নাতিনী, তিন-তিনটা গোলা ধানে ভরা, পাঁচ ছয়খানা লাঙ্গল, গোটা-বার চৌদ্দি বলদ, আট দশটা গাইগরু, দুশ' বিঘার উপর ধানী ও পাটের জমি,—টাকা পয়সা, লোকজন কোনও দিকেই কম নয়। লাঠিয়ালি করিতে যাইয়া মাঝে মাঝে অবশ্য তাহাকে হাজতে, জেলে যাইতে হইয়াছে, লুঠ-তরাজ, খুন জখমের সঙ্গে এমন জড়িত হইতে গেলে এমনটা অবশ্যম্ভাবী. কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চৌধুরী সাহেবদের জলের মত ব্যয় করা টাকা ও তদ্বিরের জোরে, তাহাকে সেখানে থাকিতে হয় নাই, অন্ততঃ হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইয়া সে খালাস পাইয়াছেই।

* * * *

জয়! জয় মা কালী! হর হর ব্যোম্ ব্যোম!—ভয়াবহ শব্দে গগন কম্পিত করিয়া কেশব সর্দ্দারের দল শত্রুপক্ষীয়কে যাইয়া আক্রমণ করিল। আঁধার রাত্রি, এমন ভাবে এ সময় যে তাহারা আক্রমিত হইবে, ভাবে নাই। তথাপি তাহারও যে একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল, এমনও নয়; বলরাম সর্দ্দারের তেমন শিক্ষা নয়। অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রোত্থিত হইয়া তাহার দলের নমঃশূদ্র ও মুসলমান লাঠিয়ালেরা লড়াইয়ে মহোৎসাহে মাতিয়া গেল, স্ত্রীলোকেরা পশ্চাৎ হইতে তাহাদের লাঠি সড়কির যোগাড় করিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। কেশব সর্দ্দারের পক্ষীয়েরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবারও বুঝি তাহাদের লড়াইয়ে হটিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কেশবের অতর্কিত প্রবল আক্রমণের ধাক্কা যেন অপর পক্ষ সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা বিষম বীরত্ব দেখাইয়া হটিয়া যাইতে লাগিল। দুই পক্ষের লাঠিয়ালদের হুঙ্কারে গর্জ্জনে নৈশাকাশ বিকম্পিত হইতে লাগিল, স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আর্ত্তনাদে মিশিয়া এক বিষম শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। কোথায় যে কে

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সেই আঁধার রাত্রিতে যাইয়া আত্মরক্ষার্থ স্থান লইবে, নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না, চারিদিকে তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া যে যে দিকে পারিল ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন কেশবের দল মশাল জালিয়া ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল, দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিয়া উঠিয়া আকাশ লাল করিয়া তুলিল। বহুদূরে অপর পারে ভাগ্যমন্ত তাহার সঙ্গীর জনকয়েক বৃদ্ধের সহিত দাঁড়াইয়া মহোৎসাহভরে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছিল।

দণ্ড দুই মধ্যে সব কার্য্য শেষ হইয়া গেল, বলরাম সর্দ্দার ও তাহার দলের লোকেরা আঁধারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল, স্ত্রীলোকেরাও ছোট ছোট ছেলেপেলে লইয়া অন্তর্ধান করিল, কিন্তু কেশব সর্দ্দারের পূর্ব্ব হইতেই আদেশ ছিল, বলরামের স্ত্রী সুন্দরী রঙ্গিণীকে যেমন করিয়া হোক্ ধরিয়া আনিতেই হইবে। তাহারই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বিক্রম বেশী; এমন তেজ ও সাহস নাকি স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে! শেষপর্য্যন্ত স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে লাঠি ও বল্লম যোগাইয়া সাহায্য করিয়াছে সে, অবশেষে নিজ হস্তেও বল্লম চালাইয়া সাংঘাতিকরূপে লাঠিয়ালদের জখম করিতেও সে দ্বিধাবোধ করে নাই। কি বিক্রম! কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে অবশেষে স্বামী হইতে বিচ্যুত হইতে হইল, ধরা দিতে হইল।

যুবতী রঙ্গিণী ও লুট-তরাজের অন্যান্য মালপত্র লইয়া, চরের ঘর দুয়ার সমস্ত অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া, দুই পক্ষের মৃতদেহ যাহা পাওয়া গেল কলসীর গলায় বাঁধিয়া নদী গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া, ও জনকয়েক বাছাই বাছাই লাঠিয়াল চরের দখল বজায় রাখিবার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া, কেশব সর্দ্দার তাহার দলবলসহ নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবার 'জয় মা কালী!' রবে গগন কম্পিত হইল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘনা-বক্ষ প্রবল বাত্যা-বিক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গ সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তাহারা ঝাপটার চরে আসিয়া আবার মহোল্লাসে 'জয় মা কালী!' রবে চারিদিক কম্পিত করিয়া মাটিতে পদার্পণ করিল, এবং ভাগ্যমন্ত মহানন্দভরে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, এই তো বেটার কাজ। এখন মরতে পারবে শান্তিতে ভাগ্যমন্ত। বল—'জয় মা কালী। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!'

(২)

চর লইয়া আবার নবোদ্যমে পুলিশ-তদন্ত মামলা-মোকদ্দমা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু মিত্রদের পক্ষে, আর তাহা পুনর্দখল করা দিন দিনই সুদূরপরাহত হইয়া উঠিতেছিল। টাকা! টাকা! চৌধুরী-সাহেবের পক্ষ হইতে অজস্র টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। সে বন্যার মুখে মিত্রদের সমস্ত চেষ্টা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বলরামেরও আর কোন সংবাদ নাই। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, সেই রাত্রিতেই তাহার লাশ মেঘনায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কেহ বলিল তাহা নয়, সে গা-ঢাকা দিয়াছে, তলে তলে যেন আবার কি মৎলব পাকাইতেছে। এমন সহজে হটিবার পাত্র নয়, যাকে বলে বলরাম সর্দ্দার—বাঘের বাচ্চা।

এ দিকে বলরামের বৌটা খায় না, নায় না, কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। কেশব তাহাকে কত রকম সাধাসাধি করিতেছে; প্রকাশ করিয়াছে তাহার কাছে—বলরাম মরিয়াছে, তাহার জন্য চরের প্রান্তদেশে নূতন বাড়ী-ঘর তৈয়ের হইতেছে, সেখানে পুরানো বৌ দুটাকে ফেলিয়া তাহাকে সাঙ্গা করিয়া শুধু তাহাকে লইয়া সে বাস করিবে, গহনা কাপড় চোপড় টাকা পয়সা—কত কি সবের প্রলোভন দেখাইতেছে, কিন্তু সে কথা শুনিলেই রঙ্গিণী বাঘিনীর মত কেমন বড় বড় চোখদুটা লাল করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, তাহা ছাড়া কোথা হইতে সে এক ছুরী সংগ্রহ করিয়াছে, কিছু বলিলেই কেশবকে দেখাইয়া নিজ বুকে মারিয়া মরিবার ভয় দেখায়।

এমন করিয়া মাস-তিনেক চলিয়া গেল। না, দেখিতে দেখিতে আরো মাস চারি অতিবাহিত হইল।

* * * *

চর চৌধুরী-সাহেবদের এখন সম্পূর্ণ দখলে আসিয়াছে। ভাগ্যমন্ত সর্দ্দারকে পূজার সময় নগদ টাকা, শালজোড়া, ও ত্রিশ বিঘা জমি বক্শিস্‌স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। কেশব সর্দ্দারও উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইয়াছে। ফৌজদারী মোকদ্দমায় মিত্রেরা একেবারেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই! প্রমাণ হইয়াছে পরিষ্কাররূপে, চৌধুরী-সাহেবদের প্রজারাই পূর্ব্ব হইতে ঘর বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিল এবং মিত্রদের

পক্ষ হইতে বলরাম সর্দ্দারের দল গভীর আঁধার রাত্রিতে অতর্কিতে তাহাদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের বাড়ীঘর পোড়াইয়া দিয়াছে ও নানা প্রকারে তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। যে দুটা লাশ অনেক কষ্টে মেঘনা-বক্ষ হইতে উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহাও না কি সাহেবদের প্রজাদেরই—রহিমদ্দি ও নিমচাঁদের ; দাখিলা, রেজিষ্টারী কবুলতি. অন্যান্য কাগজপত্রেও তাহাদের নামীয় জমা-জমির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মিত্রদের বড় কর্ত্তা সুবল মিত্রের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিয়াছে, জামীনে তিনি আপাততঃ খালাস আছেন, আর বলরাম সর্দ্দার—পলাতক, পুলিশের হালুয়া উদ্যত তরোয়ালের মত পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বিরুদ্ধে খুন ও লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার চার্জ্জ তো রহিয়াছেই, তাহা ছাড়া চৌধুরী-সাহেবেদের প্রজা পরাণ নমঃর স্ত্রীকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়াও চার্জ্জ বর্ত্তমান।

ভাগ্যমন্ত বেটার দিকে ফিরিয়া চায়, মাঝে মাঝে রঙ্গিণীকেও প্রবোধ দিয়া কি বলিবে বলিবে করিয়া আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু কেশব সর্দ্দারের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু সাহস করিয়া বলে না, শুধু তাহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনা যায়—বুড়োর কথা কেউ শোনে না, দেখ্‌বি তোরা দেখ্‌বি, এর ফল ভাল হবে না, মোদের কালে এ-সব বলাই ছিল না।

কেশবের নূতন বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। রঙ্গিণী সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সব চুপ চাপ। সুন্দরী রঙ্গিণী পূর্ব্বেরই ন্যায় কাঁদিয়া কাটিয়া চোখ ফুলাইতেছে, একাকী বসিয়া কি ভাবে, কাহারো সঙ্গে সম্পর্ক নাই, কেশবের এত উপরোধ অনুরোধ সব ব্যর্থ।

এমন সময় একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে কেশব সর্দ্দারের সেই বাড়ীতে এক ডাকাইতি হইয়া গেল। ডাকাইতেরা সংখ্যায় তেমন বেশী নয়, কিন্তু আক্রমণে তাহাদের সঙ্গে লড়াইতে কেশব সর্দ্দারের পক্ষের লোকজন তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না, অত রাত্রিতে অতটা দূরে লোক সংগ্রহও তেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। কিন্তু ডাকাইতের দল কাহারো উপর কিছু অত্যাচার করিল না, কোন টাকা পয়সা বা জিনিষপত্র লইবার দিকেও তাহাদের দৃষ্টি দেখা গেল না, কেবল তাহারা কেশব সর্দ্দার ও বলরামের স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া গেল। আঁধারের ভিতর তাহাদের অনুসরণ করিতে কাহারো সাহস হইল না।

মেঘনার ধারের সেই বটগাছ। তাহার ডালা হইতে পূর্ব্ব হইতেই সুদীর্ঘ দড়ি ঝুলানো ছিল। অল্পকাল মধ্যেই কেশব সর্দ্দারের মৃতদেহ তাহাতে ঝুলিতে লাগিল।

অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। মেঘে চারিদিকের আকাশ ঢাকা। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে, ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ। মেঘনা-বক্ষে ডিঙ্গীর উপর একমাত্র বলরাম ও তাহার স্ত্রী।

বলরাম স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, কি বলিস্ তুই কি বলিস্? কি কৈফিয়ৎ তোর্, রঙ্গি!

রঙ্গিণী গম্ভীরস্বরে ভাঙ্গা-গলায় উত্তর করিল, কি বলবো আর? আমি নির্দ্দোষ, খোঁজ নিয়ে দেখো না।

জড়িত-কণ্ঠে উত্তর হইল, কি খোঁজ? নেব—কি খোঁজ? নির্দ্দোষ তুই জেনেছি, কিন্তু তোকে নিয়ে আমি ঘর করবো কেমন করে? লোকে যে বলবে তুই ভ্রষ্টা, রঙ্গিণী ভ্রষ্টা! আমি দেশ ছেড়েছি, নাম ভাঁড়িয়েছি, দূরে পদ্মার মাঝে মিঠার চরে যেয়ে ঘর বেঁধেছি, কিন্তু তোকে ছাড়া যে আমার ভাল লাগে না রঙ্গি!

রঙ্গিণীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—চলো, আমায় সেখানে নিয়ে চলো।

বলরাম বিকটভাবে হাসিয়া বলিল, তা' কি হয় রঙ্গি? তা' কি আর হয়! তোকে নিয়ে আবার ঘর! ভ্রষ্টা! ভ্রষ্টা! আমি তো গিয়েছিই, আর তুই-ই কি থাকবি—

হঠাৎ সে বাঘের মত লাফাইয়া গিয়া রঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। মেরো না, মেরো না, আমি—আমি--নির্দ্দো—ষ শব্দে মেঘনার উপরের মেঘাবৃত আকাশ ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইল।

পর-মুহূর্ত্তেই ঝপ করিয়া শব্দ হইল এবং রঙ্গিণীর সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি মেঘনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল! প্রবল স্রোতবেগে বলরামের নৌকা মুহূর্ত্তে কতদূর সরিয়া আসিল! সম্মুখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ অর্দ্ধক্ষিপ্ত বলরামের অলক্ষিতে মুখ হইতে ভগ্নকণ্ঠে শব্দ নিষ্ক্রান্ত হইল—রঙ্গি রঙ্গিণী! কিন্তু তাহার কোনও উত্তর আর পাওয়া গেল না। কোথায় কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিয়াছে অভাগা বলরাম?

মিত্রদের চর গিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধনী, অবস্থাবান, দিন দিনই তাহাদের অন্য নানা দিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। চৌধুরী-সাহেবদের পক্ষ হইতে চরে মহা-সমারোহের সঙ্গে পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। সকলেই সুখী, মাঝখান হইতে বলরামের জীবনটাই কেমন ছারখার হইয়া গিয়াছে! ছোট লোক—পুলিস ছাড়া কে তাহার সন্ধান নেয়?

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত দত্ত।

যৌবন প্লাবন

(উপন্যাস)

(১)

কলিকাতা সার্কুলার রোডের ১৮২নং বাড়ীটা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বাড়ীটা লাল রংয়ের তেতালা, বেশ বড়। সামনে মাঝারি রকমের একটা লন্। লনের চারি ধারে দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ, সবুজ পত্রপল্লবে সতেজ ও সুন্দর। এবাগানে বার মাসই ফুল ফুটিতে দেখা যায়। বাড়ীর মালীকটির নাম বিজনবল্লভ রায় চৌধুরী। সেকালের বিলাত ফেরত। অনেক দিন একটা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। লোকটি মোটা সোটা রকমের নাদুশ নুদুশ চেহারা, থপ্ থপ্ করিয়া চলেন। মাথার পেছনে এক গুচ্ছ চুল কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। তা ছাড়া সারা মাথা ভরা টাক। চোখ দু'টি ছোট হলেও বেশ জ্বল জ্বলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রেমিক হৃদয়ের পরিচায়ক। মিঃ চৌধুরীর প্রথমা পত্নী প্রায় কুড়ি বৎসর হইল একটী মাত্র মেয়ে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মেয়েটি বি, এ পড়ে। বোর্ডিংয়ে থাকে।

শনিবার দিন বিকাল বেলা বাড়ী আসিয়া আবার সোমবার ভোরে বাড়ীর গাড়ীতে বোর্ডিংয়ে চলিয়া যায়। মেয়েটির নাম সুজাতা। মিঃ চৌধুরী ঘর শূন্য রাখেন নাই স্ত্রীর মৃত্যুর ঠিক্ ছয় মাস পরেই তাঁহার এক বন্ধুর বিধবা পত্নীকে প্রেমপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। নিঃসন্তান বিধবা প্রচুর ধন সম্পত্তি লইয়া নূতন স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিলেন সেও প্রায় কুড়ি বৎসর হইতে চলিল। মিসেস চৌধুরীর নাম সুনয়না। তাঁহার নাম যে কেন পিতামাতা সুনয়না রাখিয়াছিলেন, সে ইতিহাসে বুঝিতে পারি না। সুনয়নার রংটি খুবই ফর্সা। এক হারা লম্বা চেহারা চোখ দুটি এত ছোট যে হাসিলে তাহা কোথায় লুকাইয়া যায় ঠাওর পাওয়া যায় না, মিসেস চৌধুরী স্বামীর কাছে আসিয়াও কোন সন্তান উপহার দেন নাই। সুনয়নার বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু লোকের কাছে কোন দিন ত্রিশের বেশী হইয়াছে বলিয়া বলেন না। চোখে মুখে দাম্ভিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চাল চলন বিলাতী মেম সাহেবেরও অনেকটা উপর। বয়, খানসামা ইত্যাদির কোনটারই অভাব নাই। কাহাকেও ডাকিতে হইলে এমন মিহিসুরে ডাকেন যে মেম সাহেবেরাও এমন বিচিত্রসুর বাহির করিতে পারেন না, সে স্বর স্বাভাবিক ভাবে এমনি কর্কশ যে হঠাৎ বোধ হয় কোন পালোয়ান কুস্তী করিবার জন্য কাহাকেও আহ্বান করিতেছে। মিঃ চৌধুরীর মিসেস্ চৌধুরীর কাছে একেবারে জুজুটির মত থাকেন। এমন শান্ত শিষ্ট পত্নী-বৎসল স্বামী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক পত্নীই নিজ নিজ স্বামীকে বশে আনিতে না পারিলে মিসেস্ চৌধুরীর কাছে গোপনে পরামর্শ করিয়া যান। ঘরে অন্য কোন জনপ্রাণী না থাকিলেও ইঁহাদের কাজের অভাব ছিল না। মিঃ চৌধুরী শিক্ষিত লোক ও সে কালের বিলাত ফেরত ও ব্রাহ্ম বলিয়া সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পাড়ায় রিডিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বেচেলার্স ইউনিয়ানের 'সেক্রেটারী' ছাত্রসমাজের প্রেসিডেন্ট সায়েন্টিফিক্ এসোসিয়েসেনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, বিধবা আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক, আবার সভা সমিতি বক্তৃতা, পার্টির ত অভাবই ছিল না, মিঃ চৌধুরী অবসর মাত্রই পাইতেন না। যারা নূতন বিলাত যাইতেন কিংবা বিলাত বা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিতেন, মোট কথা বিদেশযাত্রী ও বিদেশ প্রত্যাগত পুরুষ ও নারী তার বাড়ীতে প্রত্যহই আসিয়া মিলিতেন। ইহার অন্য একটা আকর্ষণও ছিল। সে কথা বলিবার আগে মিসেস্ চৌধুরীর কাজের তালিকাটা ভাল করিয়া না দিলে চলিতে পারে না। মিঃ চৌধুরীর ন্যায় মিসেস্ চৌধুরীরও অবসর মাত্রই ছিল না। তাঁর কত কাজ! মহিলাসঙ্গীত সমিতির সভানেত্রী, মহিলা শিল্পাশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকা নারী ব্যায়াম শিক্ষাগারের উপদেষ্ঠাত্রী,

এসব কাজ দেখিতে শুনিতে বাড়ীতে বড় একটা থাকিতে পারিতেন না। ভোরে বাহির হইয়া বেলা বারোটায় ফিরিতেন। আবার বিকেল বেলায় বাহির হইয়া রাত্রি দশটা এগারটার আগে কখনও ফিরিতেন না। স্বামী স্ত্রীতে অতি অল্প সময়ই দেখা শুনা কথাবার্ত্তা চলিত। দু'জনেরই ত কাজের সীমা ছিল না। ইহাদের সকলের চেয়ে বড় কাজটা ছিল প্রজাপতির দৌত্য করা! মিঃ চৌধুরী ও মিসেস্ চৌধুরী এবিষয়ে ওস্তাদ শিকারী ছিলেন। শিকার ধরিয়া দিতে ইহাদের তুলনা মিলিত না। এজন্ত বহু অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের বাপ মা সদা সর্ব্বদা মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরীর কৃপা ভিক্ষা করিতেন। ভাল বাছাই ছেলেটিকে নিজ নিজ মেয়ের জন্ত ধরিবার জন্ত ডিনার ও পার্টির খরচ যোগাইতেন। পরের পয়সায় মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে নিত্য আনন্দ উৎসব লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ীর ধারে মোটর, ফিটন, ব্রুহাম্ এবং টেক্সির সংখ্যা বড় কম দেখা যাইত না। মিসেস্ চৌধুরীর গলার স্বরটা একেবারেই শ্রুতি মধুর না হইলেও তিনি বেহালা, পিয়ানো ও হারমোনিয়াম বাজাইতে খুবই সুনিপুণা ছিলেন,—সেজন্তও অনেক শিক্ষিতা ও বিদুষী মেয়েরা আপনা হইতেই গান বাজনা শিখিবার জন্ত তাঁর কাছে আসিতেন! এমন দিন ছিল না যে দিন কাহাকেও বিদায় দিতে কাহাকেও বা আবাহন করিতে কিংবা বিবাহের প্রস্তাবটা পাকা করিতে, কিংবা কোর্টসিপের প্রথম অবস্থার সলজ্জ ভঙ্গিমাটুকু অপসারিত করিবার জন্ত কোন না কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন এখানে না হইত।

আমরা ১৯২৫ সালের জানুয়ারীর ২২শে তারিখ হইতে গল্পটার গোড়া সুরু করিতেছি। সে দিন বেশ শীত পড়িয়াছিল। বিকেল বেলা পশ্চিম দিকের আকাশটার ভামাটে রঙের মেঘ আর চিম্নির ধোঁয়ায় চারি দিকটা অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আজ মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে একটা বড় রকমের পার্টি। আমেরিকা হইতে তিনজন যুবক, জাপান হইতে একজন যুবক ও ইংলণ্ড হইতে দুইজন যুবক মাসখানেক হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাহাদিগকে সমাজের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেওয়ার জন্তই এই আয়োজন ও অনুষ্ঠান। বেলা চারিটায় পার্টির সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল কিন্তু বেলা তিনটা হইতেই লোক আসিয়া জড় হইতেছিল। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। তাদের সাজ সজ্জা কত যে বিচিত্র রকমের সে কথা বলিতে গেলে পুঁথির পাতা অনেকটা বাড়িয়া যাইবার ভয় আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলে দলে আসিয়া মিঃ চৌধুরীর ড্রইং রুমে মিলিত হইতেছিলেন। সোফা, চেয়ার, সব ভরিয়া গিয়াছিল। সাড়ীর খস্‌খসানি এবং চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ এবং নানা রকমের এসেন্সের সৌরভ চারিদিকে প্রমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহাদের জন্ত এত আয়োজন তাহারা তখনও আসিয়া পৌছেন নাই। এই নারী সমাজে—প্রৌঢ়ার সংখ্যা ও বড় কম ছিল না, তাহারা নিজ নিজ মেয়েদের লইয়া আসিয়াছিলেন। বয়সে ভাটি পড়িলেও প্রৌঢ়াদের সাজ সজ্জাটা বড় কম ছিল না। জুতা, মোজা পরিলে কিম্বা মেম সাহেবা চালে চলিলেও অনেকের হাতে পানের ডিবা ও দোক্তা ও জরদার কৌটাটা ছিল। কাঁটা চামচ চালাইতে শিক্ষা দীক্ষালাভ করিলেও বাঙ্গালী জীবনের এই বেহদ্দ সুখের সাধ পান ও দোক্তার আস্বাদটা তারা ভুলিতে পারেন নাই। মিঃ চৌধুরী ও মিসেস্ চৌধুরীর আজ একটুকু অবসর নাই। মিঃ চৌধুরী আজ সাজ সজ্জা বেশ পরিপক্ক রকমের করিয়াছিলেন। একটা মটকার সুট্ পরিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বিশেষ করিয়া ধনী বন্ধুদের পত্নীদের সঙ্গে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেছিলেন. মিসেস্ চৌধুরী গেষ্টদিগকে নানাভাবে পরিতুষ্ট করিতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সীকে বলিতেছিলেন—আপনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন যে? অমনি আবার তাঁহার স্বামীর কথা উল্লেখ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়া আসর বেশ জমাইয়া তুলিতেছিলেন। কোন মেয়ের চিবুকে হাত দিয়া কোন মেয়ের কাঁধে হাত দিয়া কাহারও ব্রেসলেটের গড়নটার আলোচনা করিয়া মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন—আজকালকার মেয়েগুলো এত বড় silly যে নিজেরা মেলামেশা করতে জানে না, আলাপ পরিচয় করতেও পারে না! আমাদের সময় এ সব কিন্তু ছিল না, একটু bold হ'তে হয় বৌদি! আবার কাহাকেও বা গান গাইবার জন্ত কাহাকেও বা বেহালা বাজাইবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া হাসির লহর ছুটাইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

বাহিরে লতাকুঞ্জের ছায়ায় ছোট ছোট টিপয় আর

দু'পাশে দু'খানা চেয়ার দিয়া বেশ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। চল্লিশ পঞ্চাশজন গেষ্টকে অভার্থিত করিবার মত প্রচুর আয়োজন ছিল। গল্প স্বল্প ক্রমে বেশ সুরু হইয়া উঠিয়াছিল, একটী মেয়ে পিয়ানোতে একযায়গায় বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সকলের মুখেই উৎসবের পুলক দীপ্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন সময় মিঃ চৌধুরী কয়েকজন যুবককে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রবাদের আবাদ।

(৭ম চাষ)

যাঁরা চাষী তাঁরা বুঝলেও অনেকের জন্ত বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে; লাঙ্গলে 'মাটী খায়'; অবশুই রোজ রোজ বা বার মাসই মাটী খায় না। লাঙ্গল যখন মাটী খায়, তখন চাষীকে বড় ফ্যাসাদে পড়িতে হয়।

শ্রাবণের পৈঁকি চাষের পরে ভাদ্রের রৌদ্রে যখন মাটী শক্ত হইয়া উঠে তখনই প্রায় লাঙ্গলে মাটী খায়।

"ভাদ্রে বিপদ ভদ্রে ছাড়ে।"

লাঙ্গলও মাটী খায় আর এ সময় আমাদের দেশের কুকুরও পাগল হয়। একটা প্রবাদ এই প্রসঙ্গেই আছে

"চাষীর লগে কুকুর পাগল,
মেড়া বলদ রামছাগল।"

১। 'হুইত্যা লাড়ি, বইয়া কই,
দাম ঠেইল্যা ভেদা।"

আমাদের দেশে নমশূদ্র, দাস কৈবর্ত্ত, এবং অনেক মুসলমানও নদী ও খাল বিলে মাছ ধরিবার জন্ত বাঁধ দেয়, সে সব বাঁধে তাহারা ১০। ১২ জন মিলিয়া রাত্রে পাহাড়া দেয়, প্রাতে সমস্ত মিলিয়া মাছ একত্র করিয়া বাঁটিয়া নেয় তখন তাহারা রাত্রে কে কি করিয়াছে সেই কার্য্যানুসারে মাছ বণ্টন করে।

২। "রউ কাটলে বউ পলায়।"

৩। "কেচকী মাছে ভেচকী মারে।"

৪। "এক লাড়িতে সাত লাউ নষ্ট।"

লাড়ি মাছ দিয়া লাউ তরকারী খাইলে 'শনি' ছাড়ে প্রবাদ।

৫। "ইঁচা (চেংড়ি) কাটলে মিছা
রান্তে নাই; খাইতে কিছু কিছু পাই।"

৬। "আগে রাঘা, পরে কই
আগে চিড়া পরে দই।"

নূতন বর্ষাগমে যখন পুকুর, খাল প্রভৃতি হইতে মাছ বাহির হইতে আরম্ভ করে, তখন নাকি রাঘা মাছ প্রথম বাহির হয়। অর্থাৎ প্রথম অকেজো থাকিলেও শেষটা ভাল হওয়ার আশা করা যায়।

৭। "ভাংনা মাছের বাড়ে তেল,
রান্তে রান্তে পরাণ গেল।"

৮। "বাইল্যা মাছ, (আর) কাইল্যা বউ।
টীকা নিষ্প্রয়োজন, বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

৯। "ইলিশা, খলিষা শৈব বাচা ভাংনা
তথৈ বচ, রোহিত মৎস্য রাজেন্দ্র
পঞ্চ মৎস্য নিরামিষ:।"

এক ব্রাহ্মণ খুব নিষ্ঠার ভাণ করিতেন, দৈবাৎ এক শিষ্য বাড়ীতে গিয়া বহু উপাদেয় মৎস্য থাকা স্বত্বেও কর্ত্তার পাকে মাছ না দেওয়ায় তিনি উল্লিখিত মৎস্যগুলি নিরামিষের সামিল বলিলেন।

১০। "মদগুর, মদ্‌গুরু প্রিয়
সকুলে ব্যাকুল প্রিয়া
বাচা ভাংনা তথা পাইব্যা
মৎস্য পঞ্চ নিরামিষ।"

এই পাঠান্তরও শুনিতে পাওয়া যায়। অবশুই "নাহ মূলাজনশ্রুতি:।"

অনেকেই বর্শী দিয়া মাছ ধরিতে পটু, কাহারও বা 'বর্শী ব্যামো'।

দাদা মহাশয়কে এ বিষয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর উস্তাদ মনে করি তাঁর মুখে এবং আরও ২। ১ জন বর্শী শিকারীর নিকট কয়েকটী প্রবাদ পাইয়াছি।

১১। "ঘুমে থাইক্যা উইঠাই বাবু তৈয়ার করেন চার,
মাছের নামে ঘন্টা মুত্রা, দৌড়া দৌড়ি সার।

যাহারা মাছ না আনিয়া বাড়ীতে আসিয়া নিষ্ফল বাগাড়ম্বর করে।

১২। "রউএর খাওয়া বউএ ও বোঝে।"

রোহিত মাছের বর্শীর টোপ গিলা বোঝা খুবই সহজ।

১৩। ধরি মাছ না ছুঁই পানি

বিদ্রূপচ্ছলে বলা হয়।

১৪। "যে না বোঝে টিপের ভাও,
তার লগে গিয়া টিপ টিপাও।"

এক শোল মাছ, বড়শীওয়ালা তাহাকে ধরিবার জন্য ফ্যাৎনা কাঠি বার বার টিপ টিপ করিতেছে দেখিয়া বলিল,—

'বার বড়শী, তের জাল,
পলতে গেল ঘাড়ের ছাল,
ছাই মাথা, কাণ কাটা—
ত্রিভুবন দেখাইল চিল বেটা,
যে না বুঝে টিপের ভাও
তার লগে গিয়া টিপ টিপাও।"

অর্থাৎ আমি বারটী বড়শী ছিড়িয়া, ১৩ খান জাল ছিড়িয়া বাহির হইয়াছি। পলর চাপে ঘাড়ের ছাল গিয়া ধরা পড়িলে, গায় ছাই মাখিয়া প্রথম কাণ কাটিতেই চিল ছোঁ মারিয়া অনেক ঘুরিল,—আবার জলে পড়িলাম, এখন বোঝ আমি পাত্র সোজা নই।

১৫। "লাইগ্যা থাক্‌লে মাইগ্যা খায় না"

১৬। "যতদিন লুটিয়া খায়, ততদিন মাগিয়া খায়।"

১৭। পীরের মাইর ধীরে ধীরে,

১৮। উস্তাদের মাইর শেষ রাত্।

১৯। লাঠী খাইক্যা কলমের মাইর শক্ত।

২০। কে কারে মারে!
আপ্‌নে আপ্‌নে মরে।

২১। আইছেন জামাই, নিবেন ঝি,
এর বেশী আর করবেন কি?

২২। হুতুম ধুমের তিনটা পুত
একটা পেঁচা, একটা ভূত
বেও একটা ভালা, বাপেরে ডাকে শালা।

২৩। "এক মায়ের একপুত, খাইয়া না খাইয়া যমদূত।

২৪। ঠাঁই গুণে কালি, ঠাঁই গুণে কাজল।

২৫। এক অইলে গিরস্থালী আর নইলে চূণ কালী।

২৬। "বাঁশ, কলা বাসক
তিনই সীমানা নাশক।"

২৭। বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।

২৮। ঠাইস্যা দিলে, ভাইস্যা উঠে

অর্থাৎ আবাগ্যার কপালে বাইট্যা দিলেও লাগেনার মত।

২৯। "কর্ম্মে নাই যার.
লাগে না কপালে তার।"

৩০। "পাইয়া না খাইয়া—
ছালা মরে লোহা বইয়া"

৩১। আমার যাইব না লেজের দুখ
তোমার যাইব না পুতের শোক।"

অনেক ব্রাহ্মণ এক সাপের অনুগ্রহে বেশ টাকা করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণপুত্র একদিন সাপকে বধ করিবার জন্য প্রহার করিলে, সাপের লেজ কাটিয়া যায়, সাপ গোসায় ব্রাহ্মণপুত্রকে দংশন করে, পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া সাপের নিকট কান্নাকাটি করিলে পর সাপ এই কথা বলে।

৩২। "আগুয়ানি পাছুয়ানী
তবে আগুন পোহানা।

৩৩। "আগুন বেটা কুইড়া
মানুষ না দেয় ছাইড়া
রইদ বেটা রাজা,
মানুষ করে তাজা।

শীতকালে প্রাতে আগুন জ্বালিয়া আগুন ও রোদ্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে।

৩৪। "রইদ্ উঠ ফাইট্যা,
গুয়া দিয়াম কাইট্যা।
ছেঙ্গা ক্ষেতে ছেঙ্গা ফুল,
ছেঙ ছেঙ্গাইয়া রইদ্ উঠ।

৩৫। "হাড়ি পাতিল কুত্তায় চাটে
সিঁকার মধ্যে গঙ্গাজল।"

শিষ্টতায় বশিষ্ট প্রায় অনেক নৈষ্ঠিকের দিনের অর্দ্ধেক পূজা আস্রার ভাগে কাটিয়া যায়, কিন্তু অন্য দিকে সুপুত্র (?) "টুক্ করে ঢুকে চাচার হোটেলে, খায় নিষিদ্ধ পক্ষী "অথবা অন্তঃপুরস্থ নিজ গৃহে সন্ধ্যার আড়ালে সলিম চাচাকে লইয়া

দিব্যি দিব্যি "সান্ধ্য সম্মীলন" করেন। এমন সব স্থলে এই প্রবাদ খাটে। দেশে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

৩৬। দই খাইয়া ভাণ্ডের বিচার।

৩৭। নিস্ফলা গাছে বানরও চড়ে না।

৩৮। "অম্বল, কম্বল, ডাম্বল
তিনই শীতের সম্বল।"

"পান, পানি, পিঠা তিনই শীতে মিঠা' প্রবাদে থাকিলেও অম্বল শীতকালে মুখ রোচক, কম্বলও আরাম দায়ক, আর ডাম্বল ব্যায়ামে শরীর গরম হয়।

৩৯। মাণিকঠাকুরের ঘোড়া
বেবাক দিকেই কাম যোড়া।

৪০। যার নাই কেহই, তার আছে সেই (ভগবান)

৪১। পশ্চাৎ যন্তব তন্তব।

৪২। রাজা যেখানে স্বয়ং মূর্খ স্ত্রী কুপণ্ডিত
সেই রাজ্যে বাস করা অতি অনুচিত।

৪৩। লাউয়া পেটে আই ঢাঁই
চেঙ্গা পেটে দিতেই নাই।

৪৪। আকলে খাইয়া মাটী
বাপে পুতে কামলা খাটি।

৪৫। 'মাটী খায়' হাতী, লাঙ্গল
বকে বলদ, রামছাগল।

৪৬। মাটীর তলে টেকা পাইলে
পানির তলে আগুন জ্বলে।

যাহারা "পাওয়া" পাইয়া রাতরাতি বড়লোক হইয়া পড়ে, তাহারা অনেক অদ্ভুত কাজ করিয়াও হজম করে।

৪৭। "জামাই খাইকা বউ উঁচা
এক কাঠা ধান দুই কাঠা চোঁচা।"

যেখানে গরমিল মিলনের সম্ভাবনা থাকে সেখানে এই প্রবাদ খাটে।

৪৮। "হাজার টাকার বাগান নষ্ট
পাঁচসিকার এক ছাগলে।"

৪৯। 'যার মরণ যেখান
নাও বাইয়া যায় সেখান।

৫০। "বাহির বাড়ী হরিকীর্ত্তন
বাড়ীর মধ্যে সুঁটকী ভোজন।"

৫১। "বাহির বাড়ী লণ্ঠন,
ভিতর বাড়ী ঠন্ ঠন্।"

উল্লিখিত দুইটীতেই বাহ্যাড়ম্বরের দৃষ্টান্ত।

৫২। 'সিলেটে উত্তম নাস্তি, মধ্যম নাস্তি চট্টলে.
ময়মনসিংহে দরিদ্র নাস্তি, মূর্খ নাস্তি বিক্রমে।

৫৩। "গোয়াল, গাবর, ভঁইষ (মহিষ)
এর লগে না পথ বইস্,
যদিইবা বইস্, লগে একটা লাঠি লইস্,
যদি আইয়ে আগাইয়া, কয়টা দিতে লাগাইয়া।

৫৪। "সাপে খায় লেখ্‌লে
বাঘে খায় দেখ্‌লে।"

৫৫। "সাপ মাইরা, কেঁচুরে বিষ
বাঘের চোখে কামড় দিস।

৫৬। "মিছা কথা, সিঁচা পানি।"

এ দুইরই অস্তিত্ব কম।

৫৭। "আগে গেলে বাঘে খায়,
পাছে গেলে টেকা পায়।"

৫৮। "মূলে মূলা নাস্তি—শয্যা উত্তর দক্ষিণে।"

অর্থাৎ যেখানে আসলের নামে দেখা নাই কেবল গোড়ামীর ভাণ।

৫৯। "আছে গরু, না বয় হাল,
তার দুঃখ চিরকাল।"

যাহারা পাঁচ দিক বজায় অথচ অসুবিধার সীমা নাই।

৬০। "ভুঞ্জিতে পাথর ভাল, ভুঞ্জাইতে থালা'
দুগ্ধেতে শর্করা ভাল, দধিতে কলা।"

পাথরে ভাত খাইতে ভাল, এবং ভাত দিতে অর্থাৎ পরিবেশন করিতে থালা ভাল।

৬১। নাও টানা থেকে পাও টানা ভাল।

কম জল দিয়া নাও টানিয়া কষ্ট করিয়া নায় যাওয়া অপেক্ষা হাটিয়া যাওয়া ভাল।

৬২। ধনের মধ্যে ধন ধান,
আর ধন গাই,
সোণা রূপা (ও) কিছু ধন,
আর যত সব ছাই।

৬৩। গোয়ালে দুধাল গাই, গোলায় ধান,
পুষ্করণীতে মাছে ভরা, টাকার নাই টান, (কম)
পুত্র যার দেখে পড়ে—খায় দুধ ভাত,
কলিকালে মানুষ নয়—সেই জগন্নাথ।

৬৪। "কাণে শুনে না, কপালে বাড়া বানে।"

৬৫। "মূর্খ বৈদ্য, ভণ্ড সাধু,
(আর) কমপোক্ত বুদ্ধিমান,
এই তিনে গাঁও শ্মশান্।"

কমপোক্ত—আবাত্তি, ইঁচড়ে পাকা।

৬৬। দিনে শিয়াল, রাতে গাই—
ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই।

৬৭। বাড়ীর দক্ষিণে শকুনের বাসা,
ছাড় ভাই সে গাঁয়ের আশা।

৬৮। যে গাঁও মূর্খের নাই আকাল,
সেই গাঁও ছাড় সকাল সকাল।

উল্লিখিত চারিটী প্রবাদ যে সব গ্রামে দেখা যায় সে সব গ্রামে বাস "যথারণ্যং তথাগৃহম।"

৬৯। শিবশূন্য মঠ, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য,
জল শূন্য পুষ্কুণী আর বুদ্ধি শূন্য কার্য্য,
এই ভাও যেখানে, থাইকো না ভাই সেখানে।

৭০। "কামে এড়া, ভোজনে দেড়া,
সে যাউক গিয়া বৈষ্ণব পাড়া।"

কাজকর্ম্ম করিতে যে গাফিলি করে তাহাকে গেঁয়ো ভাষায় এড়া বলে। আর বৈষ্ণব পাড়ায় নাকি কাজকর্ম্ম কম! এই সব উক্তি শাশুরী ননদী বউঝির প্রতি প্রয়োগ করেন। সাবেক দিনের কথা!

৭১। ধানের সাক্ষী খেড় (খড়)
পাল্লার সাক্ষী ফের (কমবেশী)

সাতটী চাষ হইল সহৃদয় পাঠক মহাশয় চাষীকে উৎসাহিত করিলে, ক্রমশ উন্নত প্রণালীর চাষে অগ্রসর হওয়ার আশা করি।

অতঃপর বিভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থার যে সব 'ছড়া' তৈয়ারী হইয়াছিল সেগুলি প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জ্যোতিষ-কথা।

ঠাকুর মা বলিতেন "ঠাকুর দাদা নিজে নিজে অঙ্ক দ্বারা পঞ্জিকা লিখিতেন" সে জন্যই আমরা ঠাকুর মাকে ঠাকুর দাদার বিজ্ঞাপন বলিয়া উপহাস করিতাম; ঠাকুর মার মুখে নানা বিষয়ে কত প্রবাদ ছুটিত বলিয়া আমরা তাহাকে বুড়া বেদেনী বলিতেও ছাড়িতাম না, তিনি বলিতেন তোরা নির্ব্বোধ এসব কথা মনে রাখিলে কাজে লাগিবে, তখন আমাদের মধ্যে হাসির ফোঁয়ারা ছুটিত, আমরা ঠাকুর মাকে আরব্য উপন্যাসের "বুড়ি" "পরি" বলিয়া কতই না ক্ষেপাইতাম, এখন আর সেই ঠাকুর মা নাই তাহার কথায় কথায় গ্রাম্য শ্লোকগুলিও আর শুনিতে পাই না, তখন তাঁহার সেই আধা-অস্পষ্ট অস্ফুট কথাগুলি বুঝিতেও চেষ্টা করি নাই, সেই পণ্ডিত পত্নীর ভিতরে নারিকেল ফলের ন্যায় যে কিছু বিশুদ্ধ সার ছিল বহু গবেষণায় এতদিন পরে আংশিকরূপেও জানিতে পারিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; প্রবাদ আছে কায়েতের ঘরের বিড়ালও কিছু জানে" আমরাও কায়েতের বংশে জন্মিয়াছি কিন্তু বিড়ালের ন্যায়ও পূর্ব্ব পুরুষদের গুণ গরিমা কিছুই পরিজ্ঞাত নাই, কেবল বিজাতীয় ভোগ বিলাসিতায় বাহিরের থবর খুঁজিয়া ঘরের পরশমণিকেও পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি।

আমাদের ঠাকুর মা ঠাকুর দাদার পরলোক গমনের পর ৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে তিনি নিজেই তাহার একাদশীর তিথি নির্ণয় করিয়া লইতেন সে জন্য তাঁহাকে পঞ্জিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, তিনি একাদশী নির্ণয়ের সময় মনে মনে কি বলিতেন এবং আঙ্গুলে গুণিয়া তাহা ঠিক করিয়া লইতেন; আমরা একদিন বলিয়াছিলাম ঠাকুরমা তুমি কেবল তোমার একাদশী ঠিক করিয়া লও আমাকেও পূর্ণিমা বলিয়া দেওত" তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন তোর ঠাকুর দাদা সবই জানিতেন; তবে আমিও কিছু পারি, এই বলিয়া তিনি একটী কি টোট্‌কার মত মন্ত্র বলিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই "পূর্ণমার" তারিখ বলিয়াদিলেন। তখন আমরা তাঁহাকে মন্ত্র সিদ্ধা "খনা" বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এক দিদি

ঐ শ্লোকটী অস্পষ্ট ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিল, আমি তাহার অনুসন্ধান করিয়া কোন প্রবীণ মহাত্মার নিকট যাহা ব্যাখ্যা বুঝিলাম তাহা বাস্তবিক এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহার মূল শ্লোকটী সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কিনা ঠিক বলিতে পারি না তবে যথা শ্রুত উদ্ধৃত করা গেল।

"বিরিষ মিথুন কাঁকড়া সিঙ্গী,
পক্ষে পক্ষে মীনের ডিঙ্গী;
ইষে দশে বরষ শেষে
বিষুব তিথি দিনে মিশে।"

ভাবার্থ বৃষ (জ্যৈষ্ঠ) মিথুন (আষাঢ়) কর্কট (শ্রাবণ) সিংহ (ভাদ্র) ইষে (আশ্বিনে) পক্ষে (দুই) অঙ্ক ধরিবে এবং মীন পর্য্যন্ত ঐ আশ্বিনের মতই থাকিবে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের অঙ্ক ২, আষাঢ় ৪, শ্রাবণ ৬, আশ্বিন মাসের সংখ্যা ১০ ধরিবে। এবং বরষ শেষ পর্য্যন্ত মীন মাস অর্থাৎ চৈত্র পর্য্যন্ত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র প্রত্যেক মাসের সংখ্যা ১০ ধরিবে এবং তাহার সহিত বিষুব সংক্রান্তির তিথি আর যে মাসের যে তারিখ আবশ্যক তাহা যোগ করিলেই ঐ দিনের তিথি নির্ণয় হইবে। তবে ইহা জানা আবশ্যক যে ১, প্রতিপদ ২, দ্বিতীয়া ৩, তৃতীয়া ৪, চতুর্থী এইরূপে ১৫ পূর্ণিমা এবং ৩০ অমাবস্যা বলিয়া প্রচলিত আছে। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এবং বাঙ্গালার মেয়েদের গণনা বিচারের নৈপুণ্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে আমাকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও কতিপয় প্রশ্নের উত্তর উদাহরণসহ লিখিত হইতেছে তবে আমার ন্যায় অল্পজ্ঞানা রমণীর পক্ষে ভ্রম প্রমাদ হওয়া সর্ব্বদাই সম্ভবপর বটে তাই বলিয়া ঠাকুর মার শ্লোকটিকে তুচ্ছ করা যায় না, পাঠক পাঠিকাগণ শ্রম স্বীকার করিয়াও পরীক্ষা করিয়া লইবেন। ১ম প্রশ্ন ১৩৩৪। ১৩৩৭ সনের ১২ই আষাঢ় ৮ই ভাদ্র ও ১২ই আশ্বিন এবং ২৮শে চৈত্র কোন্ তিথি হইবে ?

ইহার উত্তরে দেখিতে হইবে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ১৩৩৪ সনে কোন্ তিথি ছিল ? আমরা দেখিতে পাই বিষুব সংক্রান্তিতে ১২ অর্থাৎ শুক্ল দ্বাদশী এইরূপে ৩০শে অমাবস্যাও তৎপর ৩১শে শুক্লা প্রতিপদ ধরাই জ্যোতিষের নিয়ম, তিথির মান হিসাবে কখন পূর্ব্ব বা পরের দিনের তিথিও ধরিতে হয়।

১৩৩৪ সনের বিষুব তিথি ১২+ আষাঢ় মাসের সংখ্যা ৪+তারিখ ১২=২৮ অর্থাৎ কৃষ্ণাত্রয়োদশী।

১৩৩৭ সনের বিষুব তিথি ১৪+আষাঢ় মাসের সংখ্যা ৪+তারিখ ১২=৩০ অমবস্যা।

১৩৩৪ সনের বিষুব তিথি ১২+ভাদ্র মাসের সংখ্যা ৮+তারিখ ৮=২৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী।

১৩৩৭ সনের বিষুব তিথি ১৪+ভাদ্র মাসের সংখ্যা ৮+তারিখ ৮=৩০ অমাবস্যা।

১৩৩৪ সনের বিষুব তিথি ১২+আশ্বিন মাসের সংখ্যা ১০+তারিখ ১২=৩৪ বাদ ৩০=৪ শুক্লাচতুর্থী।

১৩৩৭ সনের বিষুব তিথি ১৪+আশ্বিন মাসের সংখ্যা তারিখ ১২=৩৬ বাদ ৩০=৬ শুক্লাষষ্ঠী।

১৩৩৪ সনের বিষুব তিথি ১২+চৈত্র মাসের সংখ্যা ১০+তারিখ ২৮=৫০ বাদ ৩০=২০ কৃষ্ণাপঞ্চমী।

১৩৩৭ সনের বিষুব তিথি ১৪+চৈত্র মাসের সংখ্যা ১০+তারিখ ২৮=৫২ বাদ ৩০=২২ কৃষ্ণা সপ্তমী।

এক্ষণে অতীত কালের তিথি নির্ণয় বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে বাসনা করি।

২য় প্রশ্ন ১৩৩০। ১২ই ভাদ্র ১০ই পৌষ ও ২রা চৈত্র কোন তিথি ছিল ? বঙ্গবাসীর ৬৪ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া পাঠক পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

১৩৩০ সনের বিষুব তিথি ২৮+ভাদ্র মাসের সংখ্যা ৮+তারিখ ১২=৪৮ বাদ ৩০=১৮ কৃষ্ণা তৃতীয়া।

ঐ সনের তিথি ২৮+পৌষ মাসের সংখ্যাঙ্ক ১০+তারিখ ১০=৪৮ কৃষ্ণাতৃতীয়া।

ঐ সনের তিথি ২৮+চৈত্র মাসের সংখ্যাঙ্ক ১০+তারিখ ২=৪০ বাদ ৩০=১০ শুক্লাদশমী।

এই প্রকারে পণ্ডিত মহিলারা অনন্ত কালের কথাও বলিয়া দিতে পারিতেন। আমরা সেই আর্য্য নারীদের বংশধর হইয়াও সব হারাইয়া ফেলিয়াছি আমরা সব বিষয়েই বিদেশীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, আমাদের ঘরের খবর কিছুই জানি না তাই বিদেশীয়দের সামান্য কৌশল ও জ্ঞানকেই আমরা দৈববলের ন্যায় আশ্চর্য্য মনে করি। তাই আমার প্রার্থনা শিক্ষিতা মহিলারা একবার আপনার ঘরের দিকে ফিরিয়া আসুন আমাদের হিন্দুদের পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করুন

হিন্দুর শাস্ত্রে, হিন্দুর জ্ঞানে, হিন্দুর ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করুন্ কত মণি মাণিক্য হিন্দুর গৃহে গৃহে অযত্নে বিকৃত হইয়া যাইতেছে তাহা দেখুন, তাই কবি বলিয়াছেন—

"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে।"

প্রকৃত পক্ষে অনুসন্ধিৎসার ফলে কবি বাক্য সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীপূর্ণিমাপ্রভা রায়।

সংগ্রহ

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ "জাভাযাত্রীর পত্রে" "ময়মনসিংহ গীতিকার" কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমরা সেই পত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিতেছি:—

"কাল সকালেই পৌছব সিঙাপুরে। তারপর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই যে চল্‌চে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে ব'লে নয়, মন এই ক'দিন যে-কক্ষে চলছিল সে কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে ব'লে। কিসের জন্যে? সর্ব্বসাধারণ ব'লে যে একটী মনুষ্য-সমষ্টি আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ যে একটুও মনের মধ্যে থাক্‌বে না তা হ'তেই পারে না। কিন্তু তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলি ঠেলা দিয়ে দাবী করতে থাকে। দাবী করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাস কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বল্‌তে চাই বটে তোমাকে গ্রাহ্য করিনে, কিন্তু হেকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা, সাহিত্যের শ্রোতৃ-সভায় আজ সর্ব্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন? এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানব সাধারণের জন্যেই ছিল না?

কথাটা একটু ভেবে দেখবার! কালিদাসের মেঘদূত মানব সধারণের জন্যেই লেখা আজ তার প্রমাণ হ'য়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হোতো তাহলে সে দলও থাক্‌ত না আর মেঘদূতও যেত তারি সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু এখন যাকে পাব্লিক বল্‌চি কালিদাসের সময় সেই পাব্লিক অত্যন্ত গা ঘেঁষা হ'য়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকৃত তা'হ'লে যে মানব সাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আট্‌কে দিত।

এখনকার পাব্লিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্ব্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হ'য়ে তাল পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কি। এই সর্ব্বসাধারণ যে, মানব-সাধারণের প্রতিরূপ তা বলা চলবে না। এর ফরমাস যে একশো বছর পরের ফরমাসের সঙ্গে মিল্‌বে না সে কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। কিন্তু এই উপস্থিত কালের সর্ব্বসাধারণ কানে খুব কাছে এসে জোর গলায় দুও দিচ্চে বাহবা দিচ্চে।

উপস্থিত কালের সঙ্কীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই দুও বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাব্লিক মহারাজ আজ দুই চোখ লাল ক'রে যে কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেচে আস্‌চে কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল ব'য়ে গেল, আস্‌চে কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদগদ চিত্তের পূর্ব্বে ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেণের আপিস ঘর গুদাম ঘরের আশে পাশে হঠাৎ যখন কলকাতা সহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নতুন গড়া দোকান-পাড়ার এক পাব্লিক দেখা দিলে। অন্তত তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নক্সায় উঠেচে। তারি ফরমাসের ছাপ পড়েচে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত খোলার উপরকার খইয়ের মত পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারিদিকে হায় হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত চাপা তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল—

ওরে রে লক্ষণ, একি অলক্ষণ
বিপদ ঘটেচে বিলক্ষণ।

অতি অগণ্য কাজে, অতি অবসন্ন সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম—ইত্যাদি

দোকান-পাড়ার জনসাধারণ খুসি হয়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাটের পাব্লিককেই মাথা-গুনতির জোরে মানব-সাধারণের প্রতিনিধি ব'লে মেনে নিতে হবে নাকি? বস্তুত এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্ব-সাধারণের মহা সভায় উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দিয়েছিল।

অথচ ময়মনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েচে তাতে সহজেই বেজে উঠ্‌চে বিশ্ব-সাহিত্যের সুর। কোনো সহরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাসের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য ত সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ ক'রে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল,—তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি ব'লে সম্মান ক'রে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে সাধু-বাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এই জন্যেই কবিকে একলা বলতে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বলতে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই দিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন ক'রে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু মুণ্ডের মাথানাড়া গুন্‌তির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনা-তত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্ব্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে করচি। তার কারণ চিঠি লিখব ব'লে বসলুম কিন্তু কোনমতেই চিঠি লেখা হ'য়ে উঠ্‌ল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্চে আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চল্‌তে চল্‌তে চারদিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেচি। সেই চিঠিগুলি ছিল চল্‌তি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলো ছায়ার দিকে মেলে দেওয়া সেই সব ছাপের ধারায় চলন্ত চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফ বন্ধ হ'য়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হ'য়ে উঠেচে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মানুষ তো কোন একটা জায়গায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, নিয়ত তারা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয় লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম্‌। অর্থাৎ আস্ত জিনিষকে টুক্‌রো করা ও টুক্‌রো জিনিষকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখ্‌লুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকে না তাকে তিনি তালভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে শব্দ-তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে

ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথা সময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্; বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্ব্বগ্রাহী, ছোট বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি-বাচস্পতি কিম্বা লিপি-সর্ব্বভৌম, কিম্বা লিপিচক্রবর্ত্তী। ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী। (বিচিত্রা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি বারমাস্যা

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন "ময়মনসিংহ গীতিকা" পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন "পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গ্রামগুলি সাহিত্যিক তীর্থ পদবাচ্য"। তাঁহার এই উক্তির মূলে যে কতখানি সত্য নিহিত আছে একটু সন্ধান করিলেই আমরা তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারি। আজ চন্দ্রাবতী, বংশীদাস ও দ্বিজ ঈশান প্রভৃতি যে সব পল্লী কবির কবিত্ব প্রতিভা অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সভ্য সমাজের সমক্ষে সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারা আমাদেরই কবি। একদিন ঠিক আমাদের পল্লী আবাস ঘেরিয়া তাহাদের অমিয় ঝঙ্কার উত্থিত হইয়াছিল! কতিপয় পল্লী-সেবক মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহারাই কি সব? বাংলা মায়ের নিভৃত কোণে কত কবি নিজ নিজ ক্ষুদ্র আবেষ্টনের ভিতর আপনাদের কবিত্বসুধা বিতরণ করিয়া অখ্যাত ভাবে অস্তমিত হইয়া গিয়াছে তার খুঁজ কে রাখে?

অন্যান্য জিলার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের এই ময়মনসিংহ জিলার গ্রামে ২ শত শত বাণীর সেবক অজ্ঞাত ভাবে অবস্থান করিয়া যশোহীন মৃত্যু লাভ করিয়াছে। অধিকাংশই নিরক্ষর চাষা গোছের লোক ছিল এবং ইহাদের ইহাদের কবিত্ব অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের আসরে এই দানের মূল্য কিছুমাত্র ন্যূন নয় বরং ভাবের চমৎকারিতায় ও মনোভাবের উদার বিশ্লেষণে বিশেষ সমাদর পাওয়ার যোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লী রাজ্যে যে সব গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিয়োদ্ধৃত বার-মাস্যাটী সমধিক প্রচলিত। কোন সতী নারীর পতি বিদেশ গমন করিলে বৎসরের মাস-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাব কিরূপ হয়, তাহাই এই গানটীর প্রতিপাদ্য বিষয়। মনে পড়ে পল্লীপ্রবাসে যখনই উহা শুনিয়াছি তখনই আমার মনপ্রাণ আনন্দ উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়াছে।

এই বারোমাস্যাটী ভাবের ও ভাষার উলঙ্গতার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, বাহ্যিক ভাবে দেখিতে গেলে ইহার বিশেষ কোন সৌন্দর্য্যই চোখে পড়িবে না, কিন্তু গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইবেন ইহা নিশ্চিত। প্রিয়তমের জন্য নারীর ব্যাকুলতা এর চেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

জৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসের নূতন জল,
শ্রাবণ মাস কাটাইল নারী নাইয়রে নাইয়রে
আরে নাইয়রে।
তিন মাস গত অইল, রূপুন সাধু না আসিল,
আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
ভাদ্র মাসে আওলা কেশ আশ্বিন মাসে বর্ষশেষ
কার্ত্তিক মাস কাটাইল নারী কাতরে কাতরে
আরে কাতরে।
ছয় মাস গত অইল রূপুন সাধু না আসিল
আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
আগুন মাসে দাওয়া মারী, পৌষ মাস শীত ভারী;
মাঘ মাস্যা শীত নারীর অন্তরে অন্তরে
আরে অন্তরে।
নয় মাস গত অইল রূপুন না আসিল,
আস্‌লা বন্ধু রইলা কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
ফাল্গুন মাসে দ্বিগুন জ্বালা চৈত্র মাসে শরীর কাল,
বৈশাখ মাসে অইল নারীর যৌবন উতালা;
বার মাস গত অইল রূপুন সাধু না আসিল,
আস্‌লা বন্ধু রইল কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

উচ্চ-নীচ

বিকাল বেলা বেড়াইতে গিয়া নদীর ধারের একটী স্থান দখল করিয়া বসিলাম। মুক্ত বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহ, তরঙ্গের উদ্দাম নর্ত্তন হৃদয়ে এক পুলক প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া দিল।

দিবসের কর্ম্মক্লান্তি ও সর্ব্বপ্রকার অচ্ছন্নতার অবসানে প্রতিদিন এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের শ্যামল তটভূমি ব্যাপিয়া যুবা বৃদ্ধের এক ছোটখাট হাট বসিয়া যায়। প্রকৃতির সেই লীলাঙ্গনে বসিয়া কেউ অপর পাড়ের ডুবমান ঝাউগাছগুলির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, কেউ বা নদীর কল-রোলের সহিত সুর মিলাইয়া সঙ্গীতালাপ আরম্ভ করিয়া দেয়।

সম্মুখেই বাঁধা দেখিলাম একটী নৌকা। বেশ সুন্দরভাবে সাজানো—দুলিয়া দুলিয়া অসংখ্য তরঙ্গ লহরের সৃষ্টি করিতেছে। ছিপের ভিতরে একটা পরিষ্কার ফরাস পাতা আর তার উপর বসিয়া আছেন মূল্যবান সাজপোষাক পরা এক জমিদার গোছের লোক। গলায় থেকে উপবীত গুচ্ছ আত্ম-প্রকাশ করিয়া আছে। মস্তকে ও গুম্ফে বার্দ্ধক্যের শুভ্র হাসি সবেমাত্র বিকসিত হইবার উপক্রম করিতেছে। স্থূল মোটা শরীর দেখিয়া মনে হইল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাও যথেচ্ছভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে।
ছিপের বাহিরে বসিয়াছিল এক বাটে খোট্টা চেহারার লোক। বিমলিন শরীর দেখিয়া মনে হইল দুর্ভাগ্যের ঘাতপ্রতিঘাত ও দারিদ্র্যের নিপীড়ন ইহাকে পিটা লোহার মত কদাকার ও শক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দেখিলাম নৌকা চালান ও প্রয়োজন মত বাবুর সেবা করাই তার কাজ।

বাবুটী ঝিমাইতে ঝিমাইতে এক একবার তাহাকে তামাক ভরা ও অন্যান্য কাজের ভার দিতেছিলেন আর সে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সেই সব করিয়া দিতেছিল। লোকটীর সেই সবিনয় ভাব দেখিয়াই স্পষ্ট মনে হইল যে প্রভু ভৃত্যের মত একটা উচ্চনীচ সম্বন্ধ তাহাদের ভিতর বর্ত্তমান। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে এক নৌকায় অবস্থান করিলেও ইহাদের ভিতরকার অস্পৃশ্য ভাবটা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বাবুটী ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হরে, আমি আজ রাত্রে নদীতেই থাকব ঠিক করেছি নৌকাটা নদীর ভিতরের দিকে নিয়ে রাখ।" সেই লোকটী প্রভুর আদেশ মত নৌকা ভিতরের দিকে নিয়া চলিল, রাত্রি হইল দেখিয়া আমিও বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম।

দুই—

শেষরাত্রে ঝড় তুফানের শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানালা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বৃষ্টি বাতাসের এক প্রবল ঝাপটা নির্দ্দয়ভাবে শাসাইয়া দিল। দেখিলাম প্রকৃতির সে এক তাণ্ডব নর্ত্তন।

পূর্ণ দুই ঘণ্টা ব্যাপি ধ্বংসলীলার অবসানে যখন নৈসর্গিক স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিল; তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। একটা দুঃখবিমিশ্রত কতুহল নিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেই মনে হইল—পূর্ব্বদিনের সেই নৌকা ও তার দুইটী আরোহীর কথা। ইহাদের না জানি কি দুর্গতিই হইয়াছে! মনে মনে সে চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আমি নদীর দিকে ছুটিয়া চলিলাম।

পূর্ব্বদিনের সে স্থানটীতে উপস্থিত হইয়া আমার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—সেই নৌকা বা তাহার আরোহীদের কোন চিহ্নও সেখানে নাই। হতাশভাবে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি—এমন সময় একটা ঝাউগুচ্ছের আড়ালে আমার দৃষ্টি পড়িল। বেশ দেখিলাম গাত্র সংলগ্নভাবে ভাসিয়া আছে দুইটী মৃতদেহ। হস্ত সাহায্যে একটী অন্যটীর সহিত এমনি-ভাবে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে স্রোতের প্রাবল্যও এ সংযোগ ছিন্ন করিতে পারে নাই। কাছাকাছি উপস্থিত হইতেই শোকে বিস্ময়ে আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল--কি আশ্চর্য্য ইহারা যে সেই প্রভুভৃত্য দুইটী!

পূর্ব্বদিনের উচ্চনীচ সম্বন্ধের সহিত অদ্যকার এই সাম্যের তুলনা করিয়া আমার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একদিন যে কুলগর্ব্বিত ধনী ছোট লোকের স্পর্শকেও অপবিত্রকর বলিয়া মনে করিত আজ কিনা মৃত্যুর সুকৌশল বিধানে তাহাকে এক নীচ জাতীয় লোকের সহিত ভ্রাতৃভাবে গলাগলি করিতে হইতেছে। এদৃশ্য দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে উচ্চনীচের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সকলের ভিতর ভ্রাতৃভাব স্থাপনই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা।

সমালোচনা

কৌমুদী—প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী ঢাকা মূল্য ৸৵৹ আনা।

সুসঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সাময়িক পত্রে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও নানা সভায় যে সব প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন সে গুলি "কৌমুদী" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ সম্ভ্রান্ত প্রাচীন রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিলাসের কোলে লালিত পালিত হইয়াও জ্ঞানের চর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেন; বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করা তাহার পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু বেশী গৌরব তাহার জীবন ব্যাপী জ্ঞানচর্চ্চা; "কৌমুদী" তাহার সেই জ্ঞান চর্চ্চার নিদর্শন। প্রবন্ধগুলি যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় তখনই ইহা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রত্যেকটী প্রবন্ধ গভীর চিন্তা ও গবেষণার পরিচায়ক।

গ্রন্থের ভূমিকা লেখক সত্যই লিখিয়াছেন যে "ঋত্বিকের মন্ত্রপূত হোমশিখার ন্যায় সমুজ্জল এক অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য শ্রী তাঁর সুমধুর চরিত্রটী চিরকাল উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল।" বস্তুতঃ তাঁহার প্রবন্ধ গুলির ভিতরেও এই হোম শিখা জ্যোতি ও ব্রাহ্মণ্য তেজঃ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুসঙ্গ রাজবংশ চিরকালই রক্ষণশীল সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজের অগ্রণী এবং স্বর্গীয় মহারাজ ও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাহার প্রবন্ধ গুলিও সেইভাবে সমুজ্জল। আমাদের কোন পন্থা 'অবলম্বনীয়" "অভিভাষণ" সংস্কৃতভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা" প্রভৃতি প্রবন্ধ যেমন সূক্ষ্মজ্ঞান, ধীশক্তি, সুযুক্তি পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আছে তেমন ভারতের প্রাচীন আদর্শের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবও আছে।

তদ্ভিন্ন প্রাচীন ভারতের চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা নামক প্রবন্ধে মহারাজ তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। পাশ্চাত্য আর্ট শব্দের বহুল প্রচলনে আমাদের প্রাচীন কলাবিদ্যার কেহ ধার ধারেন না; কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় নানাবিধ শিল্পের কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মহারাজ যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত অভিভাষণটীও একটী সুযুক্তি পূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ। বর্ত্তমান মহারাজ পিতার সুযোগ্য পুত্র, পিতৃগুণের অধিকারী, তিনি পিতার ইচ্ছানুসারে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কেবল যে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা নহে; বঙ্গীয়সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্নকে সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, নচেৎ প্রবন্ধগুলি লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভবনা ছিল। এজন্য বর্ত্তমান মহারাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নীতিকল্প লতিকা—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

অতি সুন্দর ছন্দে সংস্কৃতে বহু নীতিরত্ন গ্রথিত হইয়াছে। যাহারা সংস্কৃত জানেন না তাহারাও ইহা বুঝিতে পারিবেন। দেশে এখন সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা অতি বিরল। সুতরাং গ্রন্থকারের এই উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়; গ্রন্থকার নীতিকথা লিখিতে বসিয়াও বঙ্গের সাময়িক দুর্গতি বিস্মৃত হয়েন নাই; মাঝে ২ বঙ্গ নারীর দুর্গতির কথা করুণ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শোক সংবাদ

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি আমাদের লেখক কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্য আর ইহজগতে নাই গত ২৫শে আশ্বিন বুধবার রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এ জিলার কবিগানের সরকারদের শেষ কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিলেন। ময়মনসিংহের আর একটী গৌরব-স্মৃতি করালকালের আহ্বানে ধ্বসিয়া পড়িল।

সাহিত্য সংবাদ

গত ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার কিশোরগঞ্জ তরুণ সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্তি করে আস্‌ছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে—মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি **সুরমা** ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"মিল্ক অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দূর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলব্ধ বিলাসভোগ। বড় শিশি ১৲ মাঝারি ৷৵০ ছোট—৷৷০ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখ্‌বে। রুমালে একটু ঢাল্‌লে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৷৵০ আনা, ছোট—৷৷০ আনা।

এস্, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৯ | ২ লোয়ার-চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

Shourabh--Reg. No. C. 745.

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়ম[illegible]	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৷৹
ঢাকার বিবরণ	১৷৹
সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস	৷৹
সাময়িক সাহিত্য	৩৲
রামায়ণের সমাজ	৪৲
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	৷৵৹

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৸৹

"লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১৷৹

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই)	১৲	মাতরম	৷৹
ব্রতকথা	৸৹	[illegible]লের ডায়রা (সচিত্র)	৸৹
শৈব্যা	৷৵৹	[illegible]কথা	(যন্ত্রস্থ)

সৌরভ প্রেস।

নূতন সাজ সরঞ্জামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল প্রকারের মুদ্রণকার্য্যই সুলভে ও ঠিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইতি—

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। অগ্রহায়ণ—১৩৩৪ একাদশ সংখ্যা।

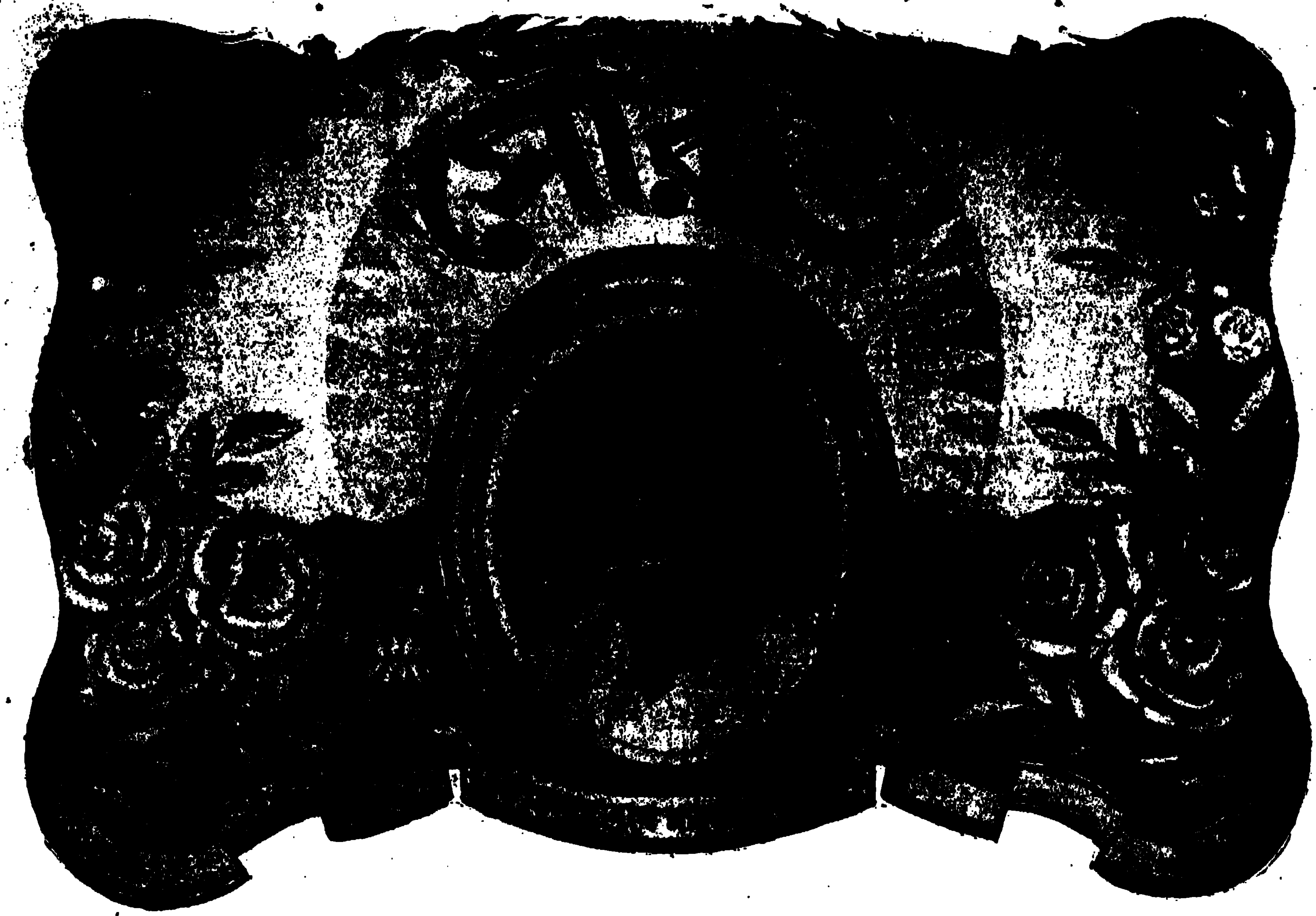

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

Everyday the UNEXPECTED is happening, and too often the
LAST CALL comes when it is least expected.
So are you sure you have finished your duties towards your wife and children
whom you would love so much ? If not DO IT NOW.

LIFE INSURANCE

is the bulwork of defence to the home. It is the surest & quickest
way to create an estate.
WE SHOW IT HOW

Apply to:—

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COY.
of
Toronto, Canada.

or to:—

N. K. Roye, District Representative for Dacca & Mymensingh.
KALIKNTA LODGE, Mymensingh.

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ৮ সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গর্মী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘা, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে	...	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম „	...	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম „	...	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা „	...	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা „	...	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা „	...	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা „	...	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা „	...	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵৹ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—।৵৹ আনা, হাসির হল্লা—।৵৹ আনা, ছায়াপথ—৸৹ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵৹

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্‌শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵৹

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵৹

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন এক্‌সও টেবলেটের শিশি ১৷৹ ও ১৷৹

বাটলীওয়ালার এগুমিক্‌শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৷৵ ও ৸৹

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷৹

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵৹

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।৹

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। এজেন্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

ডাঃ এইচ, এল, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

ওয়ারলী রোড্, পোঃ কোডেল রোড্ বোম্বে, নং ১৪

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউরাসাপুর" বোম্বে।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সত্বরে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাঘি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কনকনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫৷৹ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

সূচী।

অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল ...	২৬৭	প্রবাদের আবাদ	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	২৮১
স্বামীর-মার প্রেম (গল্প)	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম্, এ বি, এল	২৭১	শতঘ্নী ও একঘ্নী	শ্রীযুক্ত তারিনীকান্ত মজুমদার ...	২৮২
যৌবন-প্লাবন (উপন্যাস)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৭৪	সার্থক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	২৮৫
একটী সমস্যা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	২৭৮	অপরাধ (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ রায় ...	২৮৮
নালিতার বারমাস্যা	...	২৫৫	সমালোচনা	...	২৮৮
কেন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	২৮০	বিরহ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত ...	২৯০

সৌরভ চিত্রাবলী

বা

ময়মনসিংহ এলবাম্

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও

সুন্দররূপে মেরামত করিবার

একমাত্র ষ্টল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত

"কালের ডায়রী"

(ঐতিহাসিক গল্প)

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রচলিত জনপ্রবাদ লইয়া চারিটী গল্প রচিত হইয়াছে।

প্রথম গল্প—কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের উত্থান পতনের কথা, ২য়—সুসঙ্গ রাজবংশের কথা, ৩য়—ইশা খাঁর কথা, ৪র্থ—দস্যু কেদাররায়ের কথা।

যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ভাবে পড়িতে চান, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল। ইহাতে ২০ খান হাফটোন চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

অভিমত—

"ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। আমরা পুস্তকটি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ময়মনসিংহের কীর্ত্তির কয়েক খানি ছবি থাকায় এইটী লোভনীয় হইয়াছে।"

প্রবাসী

ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পের মত লেখা, লেখা সরল বর্ণনার ভঙ্গী চমৎকার। কয়েক খানি প্রাচীন স্থানের চিত্র গ্রন্থ খানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমার এই গ্রন্থখানি কিশোর ও যুবকদিগের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মানকরি। স্কুলে এই শ্রেণীর বই পাঠ্য হওয়া উচিত ছাপা ও কাগজ বেশ হইয়াছে।"

আনন্দ বাজার ৫ই অগ্রহায়ণ

গ্রন্থকার ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসকারে বহিখানা লিখিয়াছেন। অনেকগুলি ছবি সন্নিবেশিত থাকায় এবং ছাপা কাগজ বেশ সুন্দর হওয়ায় অধিকন্তু লেখকের লেখার গুণে বহি খানা সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। রসজ্ঞ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন! ২৫ শে কার্ত্তিক,

[illegible]

"ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক বিভব উপেক্ষণীয় নহে। শৈশব কাল হইতে ঐতিহাসিক বিভবের সহিত পরিচয় লাভে দেশ প্রীতির উদ্ভব হওয়ার সুযোগ লাভ ঘটে। গ্রন্থকার প্রায় ২০ খানা সুদৃশ্য চিত্র ও সহজ সরল ভাষায় গ্রন্থ খানাকে উপভোগ্য করিয়াছেন; তিনি পূর্ব্বে শিশু সাহিত্য রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন: এই গ্রন্থ লিখিয়া ও তিনি পূর্ব্ব যশ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। **চারুমিহির**

সৌরভ কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী কৃত

বিশ্ব-বীণা

বালক বৃদ্ধ যুবা নারী—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই এই বীণার ভিতরে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুনিতে পাইবেন। হাই স্কুল ও মাইনার স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার দেওয়ার উপযোগী। পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ উভয় পক্ষের উপকারী। দক্ষিণা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

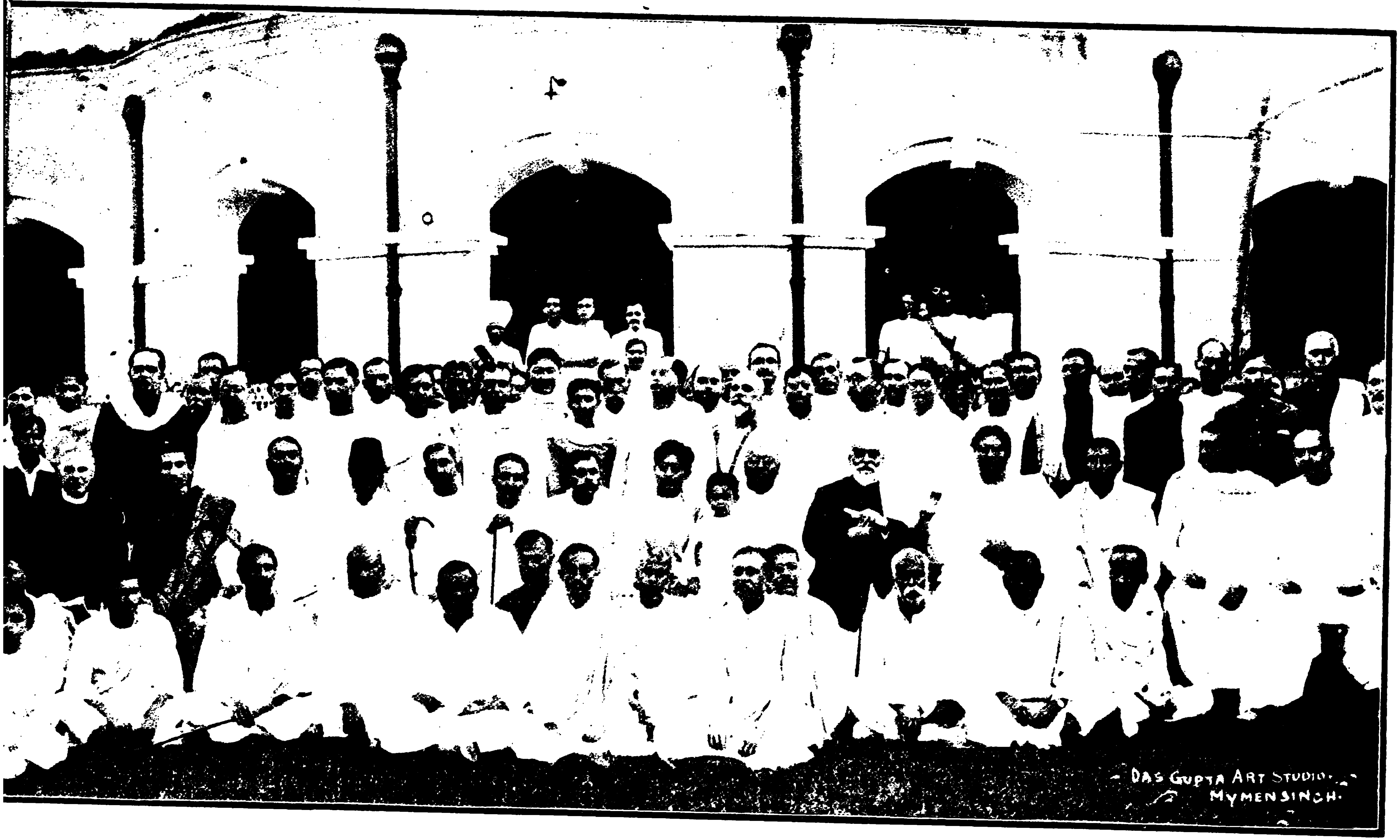

ময়মনসিংহ

ভূম্যধিকারী সভার বার্ষিক অধিবেশন।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪। একাদশ সংখ্যা।

অভিভাষণ।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিজয়ার পর আজ আমরা সকলে বাণীর মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি। আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনারা আমাকে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মনোনীত করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার অযোগ্যতার কথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াও আমি আপনাদের ভালবাসা প্রণোদিত আহ্বান প্রত্যাখান করিতে সাহসী হই নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে অকৃত্রিম সহৃদয়তার আতিশয্যে আপনারা আমার যোগ্যতার বিচার করেন নাই, আশা করি সেই উদারতার মাহাত্ম্যে আমার সকল ত্রুটি আপনারা মার্জ্জনা করিবেন।

আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবের আসন প্রদান করিলেও সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা যে আমার নাই, তাহা আমি অবগত আছি। গত বিশ বৎসর সাহিত্যানুশীলন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে ব্যক্তিগত ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই আমি আজ তরুণ সাহিত্যিকদিগের নিকট নিবেদন করিব।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই স্তরে স্তরে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠে। জাতীয় চরিত্র পরোক্ষভাবে সাহিত্যকেই অনুসরণ করে। সাহিত্য মানুষের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মাহুতি দিতে সক্ষম করে। সুতরাং জাতিকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

যে জাতি যত উন্নত সেই জাতির সাহিত্যও তেমনি সম্পদশালী। জাতীয় জীবনের উপর সাহিত্যের এইরূপ অসীম প্রভাব বলিয়াই সাহিত্যিকের দায়িত্ব অতিশয় গুরু এবং সাহিত্যিকের যশঃ এমনই দুর্ল্লভ। অবসর কালে চিত্তবিনোদনের উপযোগী নানাবিধ সখের সামগ্রীর ন্যায় সাহিত্য সাময়িক আমোদের জিনিস নহে। সাহিত্যিকের সফলতা কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। নিষ্কামভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ না করিলে সাহিত্য সাধনায় কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

এখন আমাদের মাতৃভাষার সুদিন আসিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃ ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলন করা দূরের কথা বাঙ্গলায় আলাপ করিতে তাহারা ঘৃণা বোধ করিতেন। এখন তাহারা মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এত দিন বাঙ্গলা সাহিত্য একরূপ নির্ব্বাসিত ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কোন কোন মনীষীর গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হইয়া বৈদেশিক সাহিত্যিকগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে। ইহা আমাদের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব ও অনেক রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের যে কোন জাতির সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের সাহিত্যের দৈন্যাবস্থা সম্যক বোধগম্য

হইবে। কেবল কাব্য ও উপন্যাসই পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যের সম্বল নহে। ভূগোল, খগোল, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সুজননবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পুস্তক এক এক ভাষায় রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অসীম জ্ঞান পিপাসা, অতুলনীয় অনুসন্ধিৎসা। তাঁহারা শ্রমশীল মধুকরের ন্যায় নানা দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপন আপন জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিস্মৃতির তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বরে বিলুপ্ত হইতেছিল। জ্ঞান পিপাসু পাশ্চাত্য মনীষীগণই সর্ব্বাগ্রে অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু লুপ্তপ্রায় রত্নরাজি উদ্ধার করিয়াছেন। বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ ও পৌরাণিকযুগের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে জর্ম্মাণ, ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিতেরা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সংবাদ ও অনেক ভারতবাসী রাখেন না। বৈদেশিক মনীষিগণ জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রশিল্প, কাব্য, দর্শন, ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের অভিনবতথ্য সকল আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজপুত, মহারাষ্ট্র, শিখ প্রভৃতি বীরজাতির ইতিহাস যেমন ইংরেজ লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন তেমনি গারো, হাজং, সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির ইতিবৃত্ত ও তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন জাতি নাই, যাহার ইতিবৃত্ত ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই, এমন শাস্ত্র নাই, এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই যাহা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই।

মানুষের হৃদয়ে প্রবল জ্ঞান তৃষ্ণা জাগিলে সে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সে পাগলের ন্যায় অধীর হইয়া যে স্থানে তাহার জ্ঞান তৃষ্ণা নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে সেই স্থানে ছুটিয়া যায়। ক্ষুদ্র স্বার্থ তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। কোন বাধা বিঘ্ন তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। আপনারা চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাঙের কথা অবগত আছেন। তিনি নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের জন্য চীন দেশ হইতে পদব্রজে একাকী তাতার ও আফগানিস্থানের নিবিড় অরণ্য সমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কি অদম্য ছিল তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা, কি অসীম ছিল তাহার সাহস ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। তিনি ৫ বৎসর কাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম এবং দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর হুয়েনসাঙ্ হিংস্র জন্তু সমাকুল দুর্গম বন্য পথ দিয়া ভারতবর্ষের ১১০টী প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে গিয়া তিনি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ৭৫০খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অলবরুণি একজন আরব দেশীয় ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি সুলতান মামুদের পারিষদ ছিলেন। সুলতান মামুদ যখন ১০০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন অল্‌বরুণি তাহার সহিত এদেশে আগমন করেন। তিনি প্রায় ১০ বৎসর কাল ভারতবর্ষে থাকিয়া হিন্দু পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তিনি এ দেশ হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া গিয়া আরব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। অল্‌বরুণি স্বদেশে গিয়া ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজ নৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটী ইতিহাস রচনা করেন। ইহাতে তাৎকালীন ভারতবর্ষের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। অল্‌বরুণির মৃত্যুর প্রায় ৯০০ শত বৎসর পর জার্ম্মেণ দেশীয় একজন প্রফেসার আরব দেশে আসিয়া আল্‌বরুণির ইতিহাসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই জন্য তাঁহাকে দুইবার বহু অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া আরব দেশে আসিতে হইয়াছিল। সাত বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি দুই খণ্ডে আলবরুণির ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য একজন জার্ম্মেণ পণ্ডিত কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। অথচ এখন পর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় সেই মূল্যবান গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

হৃদয়ে যথার্থ জ্ঞানের পিপাসা না থাকিলে কখনও সাহিত্য সেবা করা যায় না। আরব সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন প্রাচীন কালের আরব দেশীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশ হইতে কত কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

আমাদিগকে ও পৃথিবীর নানা জাতির সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া মাতৃ ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

অনুবাদ জ্ঞান সংগ্রহের একটী প্রধান উপায়। মৌলিক গবেষণা করিবার লোক সকল দেশেই বিরল। অন্যের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও সঞ্চিত জ্ঞান অনুবাদের সাহায্যে আয়ত্ত করা সহজ সাধ্য। পাশ্চাত্য জাতিরা এই উপায়েই নানা দেশ হইতে অমূল্য রত্নাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় বঙ্গভাষায় লেখকগণ পাশ্চাত্য জাতির উন্নত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে একান্ত বিমুখ। কোন কোন লেখক ইউরোপের নিকৃষ্ট উপন্যাসের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের সাহিত্যকে কলুষিত করিয়াছেন বটে কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করিবার শ্রম সাধ্য কাজে কেহ মনোযোগী হইতেছেন না। জ্ঞানের সকল শাখার অনুশীলন ব্যতীত আমরা বঙ্গ সাহিত্যের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। আমাদের চাই গভীর জ্ঞান তৃষ্ণা, কঠোর সাধনা ও অদম্য শ্রমশীলতা।

বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে পাশ্চাত্য জাতিরা অচিন্তনীয় ব্যাপার সাধন করিতেছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাহাদের অব্যাহত গতি। বর্ত্তমানে তাড়িত শক্তি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। আজ ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট গায়কের সঙ্গীত, শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর বক্তৃতা আমেরিকাবাসীরা ঘরে বসিয়া শুনিতেছেন। ইংলণ্ডে থাকিয়া আমেরিকাবাসীর ফটোগ্রাফ তোলা হইতেছে, পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ আটলান্টিক মহাসাগরের বিপুল ব্যবধান মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতবর্ষেও বেতার সঙ্গীত প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সভ্যতার বিস্তারের সহিত মানুষের অভাব বাড়িতেছে। এখন প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত পদার্থ সকল আর সভ্য জাতির অভাব পূরণ করিতে পারিতেছেনা। নব্য রাসায়নিকগণ প্রকৃতির সহিত প্রবল প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক পদার্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের উপাদান নির্দ্ধারণ করিতেছেন। সেই সকল উপাদান দিয়া রসায়নাগারে বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নূতন প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল গড়িয়া লইতেছেন। এইরূপে তাঁহারা একটী নূতন কৃত্রিম রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। নীলের জন্য এখন ভারতীয় কৃষকদিগের মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয় না। রেশমের জন্য গুটী পোকার চাষ না করিলেও চলিতে পারে। জর্ম্মাণীর রসায়নাগারে সহস্র রকমের রঙ্ ও রেশম প্রস্তুত হইতেছে। আল্‌কাতরা হইতে নানা প্রকার ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এখন জাতি, যুই, চাঁপা, বকুল, গন্ধরাজ, হেনা, চামেলি, ইত্যাদি কুসুম ব্যতীত ও আলকাতরা হইতেই ঐ সকল ফুলের গন্ধদ্রব্য এবং নানা জাতীয় সুস্বাদ ফলের সিরাপ রসায়নাগারে তৈয়ার হইতেছে। ফল ও ফুলের অভাব আল্‌কাতরাই পূরণ করিতেছে। আধুনিক রাসায়নিকগণই যথার্থ যাদুকর। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উপাদান হইতে কৃত্রিম রঙ রেশম, চামড়া, রবার, চিনি, ঘি, তৈল, চর্ব্বি, আঠা, রঞ্জন ইত্যাদি কয়েক শত মাত্র আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কৃত্রিম পদার্থের সংখ্যা লক্ষাধিক হইয়াছে। রাসায়নিকগণ আমাদিগকে অভয় দিতেছেন যে যদি কখনও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় তবে Laboratory হইতে সেই অভাব পূরণ করা যাইতে পারিবে। জর্ম্মণীর রসায়নাগারে এখনই মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য Protein প্রস্তুত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৌতূহলজনক বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া সরল সহজ ভাষায় বালক বালিকা ও সাধারণ পাঠকদিগের উপযোগী বহু সংখ্যক পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান চির উপেক্ষিত। নব বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন পুস্তক নাই বলিলেই হয়। Book of knowledge, Popular Science, Self Educator প্রভৃতির ন্যায় সরল বিজ্ঞানের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় কবে রচিত হইবে কে জানে?

আধুনিক সময়ে বহু সংখ্যক সুবৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। উহাদের প্রায় বার আনা অংশই অসার গল্প ও উপন্যাসে পূর্ণ থাকে। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কদাচিৎ ক্ষুদ্রাক্ষরে উহাদের বিপুল কলেবরে স্থান প্রাপ্ত হয়। প্রথম যুগের মাসিক পত্রিকা "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "বঙ্গদর্শন", "বান্ধব" "ভারতী" পত্রিকায় যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, বিশ ত্রিশ

বৎসর পূর্ব্বে ও "সাধনা" "নব্যভারত" এবং "সাহিত্য" পত্রিকায় যে সকল সুচিন্তিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে সেই রূপ প্রবন্ধ ও এখন দুর্লভ। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকাই যেন পল্লবগ্রাহী পাঠক পাঠিকাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকা-সম্পাদকেরা অনেকেই ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় চাহিদা দেখিয়া প্রবন্ধাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের ভাব উন্নত করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহারা তাহাদেরই রুচি অনুসরণ করিতেছেন। মাসিক পত্রিকাই জাতীয় সাহিত্যের স্তর গঠন করে। মাসিক পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি প্রকাশিত না হইলে জাতীয় সাহিত্যের উপাদান কোথা হইতে আসিবে?

কাব্য ও উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। কাব্য ও উপন্যাস যেমন মানুষের চিত্তাকর্ষণ করে তেমন আর কিছুতেই করে না। এই জন্য যুগে যুগে প্রতিভাবান কবিগণ কাব্য ও উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। মনীষী লেখকগণ মহান্ আদর্শ সমাজের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া থাকেন। পাপের ভয়াবহ পরিণাম দেখাইয়া পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মাইয়া দেন। এই আদর্শ সৃষ্টিতেই কবির কৃতিত্ব। সম্প্রতি এক শ্রেণীর লেখক প্রচার করিতেছেন যে নিরবচ্ছিন্ন কলা সৌন্দর্য্যের বিকাশই কাব্য উপন্যাসের চরম উদ্দেশ্য। Art for art sake তাহাদিগের মূল মন্ত্র। তাহারা বলিতে চান, শিল্পীর, শ্লীলতা অশ্লীলতা, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার অঙ্কিত চিত্রে সৌন্দর্য্য নিখুঁত ভাবে প্রস্ফুটিত হইলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাহার অঙ্কিত চিত্রে সমাজের হিত হইবে কি অহিত হইবে শিল্পীর তাহা দেখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক ইহা ভ্রম ধারণা।

যে দিন শোক বিহ্বল ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দন মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় স্পর্শ করিয়া এক অপূর্ব্ব কাতর ছন্দ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল সেইদিন তমসা তীরে নারদ উপস্থিত হইয়া বাল্মীকিকে একখানা কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ
সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।"

এই পৃথিবীতে এমন চরিত্রবান্ ও সর্ব্বজন হিত পরায়ণ কে আছেন যে তাঁহার আদর্শ জীবন কাব্যে অঙ্কিত করিয়া মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারি? নারদের উপদেশ অনুসারে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যের উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্রাঙ্কন। মহর্ষি ব্যাস রচিত মহাকাব্যের উদ্দেশ্যও কর্ম্ম জগতে ধর্ম্মের জয় প্রতিষ্ঠা। ইয়ুরোপের মহাকবিরাও ধর্ম্মের জয় এবং পাপের ভীষণ ভয়াবহ পরিণামের চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

পাপের চিত্র অঙ্কিত করাই দোষ এই কথা কোন বিবেচক ব্যক্তিই বলিবেন না পাপের চিত্রকে যদি কেহ এমন লোভনীয় করিয়া অঙ্কিত করেন যে তাহা দেখিয়া লোকের মনে পাপাশক্তি জন্মে, হৃদয়ে ভোগলালসার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় তবে সেই চিত্র অতিশয় নিন্দনীয়। তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হইবে। ইয়ুরোপের এক শ্রেণীর উপন্যাসিক স্বাধীন প্রেমের মোহময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া দাম্পত্য জীবনের প্রতি সাধারণের ঘৃণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। থিয়েটারের উদ্দাম লালসা পরায়ণা অভিনেত্রী, বেশ্যা রমণী ও ব্যাভিচারিণী বিবাহিতা নারীই তাহাদের উপন্যাসের প্রধান নায়িকা। পাশ্চাত্য উপন্যাসিকদিগের অনুকরণে কোন কোন অদূরদর্শী বাঙ্গালী লেখকও অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া লোকের মন কলুষিত করিতেছেন। দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতাকে পদদলিত করিয়া নির্লজ্জভাবে লাম্পট্যেরই তাহারা যশকীর্ত্তন করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকগণ কখনও পাপকে লোভনীয় করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহারা পাপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মাইবার জন্য। Victor Hugo, Zola, Tolstoi, Dostavaski প্রভৃতি প্রতিভাবান্ উপন্যাসিকগণ অতিশয় খোলাখুলি ভাবে পাপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদের উপন্যাস পাঠ করিলে কাহারও হৃদয় কলুষিত হয় না। বরং পাপের প্রতি পাঠক পাঠিকার ঘৃণারই উদয় হয়। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রায় প্রকাশিত তাঁহার সাহিত্য ধর্ম্ম প্রবন্ধে আর্ট বাদীদের অঙ্কিত নগ্ন পাপ চিত্রের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন।

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ মনে করচেন্ নিত্য পদার্থ, ভুলে যান যা সত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রস বোধে যে আব্রুতা আছে সেইটাই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটাই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমক্রেসি তাঠাকে বলচে ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই পৌরষ। কিন্তু এ পৌরষ চিৎপুর রাস্তার, অমর পুরীর সাহিত্যকলার নহে।" রবীন্দ্র নাথ অকস্মাৎ নির্মেঘ আকাশ হইতে ব্রজ নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় আর্টে বাঙ্গালীর চৈতন্যোদয় হইবে।

এখন পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সাহিত্যের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে অতি প্রাচীন কালেই সাহিত্য চর্চ্চার সূচনা হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের দান অতুলনীয়। যত দিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে তত দিন এই দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অধিবাসীরা অতি প্রাচীন কালে বেশ সুখ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পূর্ব্ব বঙ্গের ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। তখন উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রচুর শালি ধান্য জন্মিত। সেই ধান্য কখনও বিদেশে রপ্তানি হইত না। তাই তখন কাহারও অন্নাভাব ছিল না। গৃহস্থেরা শালি ধান্য ঘরে তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছয় মাস কাল বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়াছে। সেই অবসর কালে পল্লীবাসীরা নানা প্রকার আমোদ উৎসব গানবাজনায় মত্ত রহিয়াছে। বিশাল দেহ ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ব্বময়মনসিংহবাসীর শান্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই! সুখশান্তি ও অবসর থাকিলে স্বভাবতই মানুষের জীবন আনন্দময় হইয়া উঠে। হৃদয়ের সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসই নানা ভাবে কাব্য কলায় ফুটিয়া উঠে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক দৃশ্য অসামান্য রমনীয়। এই প্রাকৃতিক মনুষ্যের প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃই কবিতার উৎস উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। এই অনুকূল অবস্থার প্রভাবেই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ লেখকগণ সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বোড়গ্রামের নারায়ণ দেবই এই অঞ্চলের বঙ্গ ভাষায় প্রথম কবি। যখন পশ্চিমবঙ্গে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন সেই সময়ে নারায়ণ দেব পূর্ব্ব ময়মনসিংহে পদ্মপুরাণ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। নারায়ণ দেবই পদ্মপুরাণের প্রথম রচয়িতা। "প্রথমে রচিল গান কাণা হরি দত্ত" বিজয় গুপ্তের এই একটী পংক্তির উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন হরি দত্তকে পদ্মপুরাণের আদি কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দীনেশ বাবুর ভ্রম ধারণা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামীর-মার প্রেম

(১)

তড়িৎবালার যে কখনও রামী নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেহ জানে না, কিন্তু তবুও তাহার নাম বাল্যকাল হইতেই রামীর মা। দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে সে এই নাম পাইয়াছিল; কি জানি, তাহা না হইলে নাকি তাহাকে ভবিষ্যতে বন্ধ্যা থাকিতে হইত। তাহার যে অন্য কোনও নাম বাপ মা দিয়াছিল বোধ হয় না; একে নীচশ্রেণীর লোক, তাহাতে অবস্থা তেমন ভাল নয়, তাহার উপর আবার তিন চারিটা মেয়ে—কে পোষাকী নাম রাখে?

অপূর্ব্ব সুন্দরী রামীর-মা! দরিদ্র সাহা বংশেও কি এমন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে! বাপ-মা অবস্থাপন্ন নয়, খাইবার পরিবার কষ্ট, কিন্তু সকল-বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত-বেগে রামীর-মা দেহের নানা অঙ্গ অপূর্ব্ব সুষমায় সাজাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। তথাপি না বলিয়া উপায় নাই, প্রসাধনের অ-নৈপুণ্যবশতঃ ও কাপড়-চোপড়ের অভাবের দরুণ, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, ঠিক্ তেমনটী যেন হইয়াও হইল না। গায়ে তাহার প্রাচীন ধরণের যৎসামান্য রূপার যা' কিছু গহনা, এবং পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে যে নূতন কোরা-বস্ত্র সে ধারণ করিত, তাহা হইতে তাহাকে পাড়াগেঁয়ে রূপসী বলিয়াই মনে হইত।

অতি অল্প বয়সেই কেবল সাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। নিতান্ত বদ্খৎ চেহারা এই কেবলের। জাতিতে সাহা, ব্যবসা বুদ্ধি বা টাকা রোজগারের যত রকম ফন্দী

জানার অভাব নাই, মাছের পক্ষে জলের মত এ-আবহাওয়ার মধ্যেই যে সে গঠিত; টা···কা তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের বস্তু। কিন্তু অন্য কোন দিকে তাহার যেন দৃষ্টিই নাই। সে আছে সম্পূর্ণরূপে সংসারে মাথা গুঁজিয়া, দুটা পয়সা যাতে আসে, বাঁচে, তাহার চেষ্টাতেই অহরহ ব্যস্ত—চাল-চলন, কাপড়-চোপড়ের দিকে সাহাদের তেমন দৃষ্টি কখনও নাই, কেবলের তো একেবারেই নাই। কালো চেঙ্গা কৃশ মূর্ত্তি, মস্তক বড়, একটা লম্বা মুখ, তাহার উপর হাটে বাজারে মাথায় বোঝা লইয়া যাতায়াতের দরুণ ঘাড়ের দিক্‌টা সম্মুখে নোয়াইয়া পড়িয়াছে, হাঁটু-পর্য্যন্ত-মাত্র মোটা নোংরা কাপড়—দেখিতে বিশ্রী।

দুটা জিনিষ না হইলে ছোটলোকদের চলেই না;—একটা বলদ, আর একটা স্ত্রী। কেবলের প্রথমটার দরকার নাই, সাহা-শ্রেণীর, জমি জিরাতের সঙ্গে সম্পর্ক এক প্রকার নাই, কিন্তু স্ত্রী না হইলে রান্না-বান্না কে করে, ঘর-সংসার কে করে, ঘর-সংসার কে দেখে? তাই রামীর মা'র তাহার গৃহে প্রবেশ; নিজামদ্দি সেখ যে দিন ভেড়াল্লার হাট হইতে চাষের বলদ জোড়া কিনিয়া আনে, সেই দিন চারি কুড়ি-সাত টাকা দিয়া রামীর মাকেও কেবল-সাহা কিনিয়া আনিয়াছিল।

স্বামীর ঘরে রামীর-মা'র দিন যাইতেছিল একরকম মন্দ নয়। সংসারে মাত্র দুজন প্রাণী ও বুড়া শাশুড়ী; ঢেঁকি-পার দেওয়া, কাপড়কাচা, রান্না বান্না করা, কাজ কর্ম্ম খুবই কম। হাটে বাজারে বানিয়াতি সদায় বিক্রী করিয়া কেবলের যাহা আয় হইত, তাহা দিয়াই খরচ চলিয়া যাইত। ইহা ছাড়া বাপের আমল হইতে কেবলের কিছু টাকা ধারেও দেওয়া ছিল, দিন দিন সুদসহ তাহা বাড়িতেছিল।

প্রেম বলিয়া নাকি একটা জিনিষ আছে যাহার নাকি এখনকার দিনে খুবই রেওয়াজ; পৃথিবীতে যত রাজ্যের বড়লোক ও বাবুদের এবং তাহাদের ঝি বৌদের এটা না হইলে জীবন বৃথা গেল বলিয়া মনে হয়, এটা না হইলে নাকি তাহাদের চলেই না। এর আবার নানারূপ; মোটামুটী কিন্তু দুই ধারায় বিভক্ত করা চলে একে—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া হইতেছে—নিজ ঘরেরটীর প্রতি প্রেম দেখানো। অতি সাধারণ ধরণের প্রতিভা-শূন্যদের, যাহাদের সংখ্যাই জগতে বেশী, এ-ব্যবসা। এর চর্চ্চায় যে সুখ নাই, এমন বলা যায় না, তবে শীতকালের মরা-গাঙ্গের মত একটানা স্রোত, আবেগশূন্য, বৈচিত্র্যবিহীন। যতদিন তাও ভাটার দিকেই এগোনো যায়, নেহাৎ মন্দ বোধ হয় না. কিন্তু যদি উজান বহিতে হয় (তাহা যে অনেকের ভাগ্যে হয় না, কে অস্বীকার করিবে?), তাহা হইলে দাঁড় টানিতে টানিতে হাত বুক ব্যথা হইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। আর, —পরকীয়া? এটিই হইতেছে মানব জীবন-আকাশের সুখ পূর্ণচন্দ্র, প্রেমের পূর্ণস্বরূপ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পর্য্যন্ত এর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে শতমুখ। পরকীয়া অর্থাৎ পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করিতে না শিখিলে, প্রকৃত পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব শিখিলে কোথায়? পরকীয়া চর্চ্চা করিতে করিতে অবশেষে ভগবানের উপর নিয়া এই প্রেমকে নিবদ্ধ করিতে হইবে—তবেই বদ্ধজীবাত্মার মুক্তি। এই জন্যই তো ভগবান্ স্বয়ং, লোক-শিক্ষার্থে ও হিতার্থে পূর্ণাবতার কৃষ্ণচন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া মামী রাধিকা গোয়ালিনীর সঙ্গে অপরূপ প্রেম করিয়া জগতবিখ্যাত হইয়া আছেন। এ অতি কঠিন শাস্ত্র—এই পরকীয়া-প্রেমশাস্ত্র অনেক লাঠিগুতা ও হাড়ভাঙ্গার সঙ্গে মিশ্রিত। তা, কবিই তো বলিয়াছেন—'যতন না হ'লে কোথায় মিলয়ে রতন?'

কেবলের এই প্রেমতত্ত্ব জিনিষটা জানাই ছিল না। সে খাইত, হাটে বাজারে যাইত, ক্ষেতে বেগুন শশা লাগাইত, টাকা ধার দিত ও খাতকদের তাগাদা করিত, মাঝে মাঝে হরিলুটের গানে লাফাইত ঝাপাইত ও সকাল সকাল যা-তা খাইয়া পা ধুইয়া ও পাঁকের জন্য আঙ্গুলের মাঝে গরম সরিষার তেল মাখিয়া, পান তামাক খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িত। স্ত্রীর সঙ্গে তাহার যা কিছু সম্পর্ক নিতান্ত সাধারণ সত্যিকার ব্যাপার, কোনও কল্পনার কুহেলিকার, যাহাই বাবুদের ও তাহাদের বৌদের চিঠিপত্রে, বইতে প্রেমনামে অভিহিত, কোনও যেন চিহ্ন নাই কেবল বা তাহার স্ত্রীর সম্পর্ক-মধ্যে। রামীর-মা'রই কি এসব জানিবার কোন সুযোগ ছিল?

রামীর-মা'র যখন বছর আঠার বয়স এবং কেবলের উনচল্লিশ, তখন তাহাদের এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিল। বাপেরই মত কাল কুৎসিত মূর্ত্তি; নাম হইল কৃষ্ণরাম। মায়ের তাড়না অসহ্যবোধ হওয়াতে বাধ্য হইয়া অবশেষে

কেবলকে ছেলের জন্য রূপার পাটা তৈয়ের করিয়া দিতে হইল। পাড়াপ্রতিবেশিনী কেউ কেউ রামীর-মাকে বলিতে লাগিল, একটা ছেলে, টাকা পয়সা আছে, কেন, সোনার কিছু করে দিতে পারলিনে? সে কোনও উত্তর করিল না, শাশুড়ী সোয়ামী বর্ত্তমানে এসব বিষয়ে আবার তাহার মতামত, বাপ্‌রে!

(২)

চন্দ্র-সূর্য্য উঠিতেছে, ডুবিতেছে; রাত হইতেছে, দিন দেখা যাইতেছে; লোকজন ঘুম হইতে উঠিতেছে, ক্ষেতে যাইতেছে, বাজারে যাইতেছে, গয়ালে ফিরিতেছে, রাত্রিতে কাজকর্ম্মের শেষে ঘুমাইতেছে—রামীর-মারও নিত্য নৈমিত্তিক খাওয়া-পরা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর নিকানো, ছোট বড় নানা কাজে লিপ্ত থাকিয়া দিন যাইতেছিল। এমন সময় গ্রামে ওলাউঠার আবির্ভাব হইল।

লোকগুলি নিতান্ত দরিদ্র, নোংরা, কুসংস্কারগ্রস্ত—মরিতে লাগিল ইঁদুরের মত বিনা আপত্তিতে। পোক মাকড় হয়, মরে, কে তাহাদের সংবাদ নেয়? বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদাকাটিরও যে তাহাদের সময় নাই কাহারো তাহা হইলে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারাই বা বাঁচে কৈ?

অনেক লোক মরিল, অনেক। যাহারা রহিল, তাহারাও অস্থিরচিত্ত, কি জানি কোন্ দিন কাহার তলব হয়! ডাক্তার নাই, পয়সা নাই, পয়সা থাকিলেও খরচ করিয়া লাভ কি, কপাল তো কেউ খণ্ডাইতে পারিবে না, আর এ 'ফকীর'-'ওঝার' -মুলুকে ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে বিশ্বাসই বা করে কে তেমন? কে কাহার সংবাদ নেয়? কিন্তু মরার ভয় খুবই আছে, বিশেষ করিয়া সাহাদের, মরিয়া গেলে এত কষ্টের রোজগারের টাকা-পয়সা ভোগ করিবে কে? কেউ কাহারো ঘরের দিকে পা বাড়ায় না।

কেবলের মা মরিল। বুড়া মা, কাঁদাকাটি করিবার কেউ নাই; তাও রামীর-মা দুই চারিবার চীৎকার করিয়া কোন প্রকারে সনাতন নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। তাহার পর ছেলেটাকে ধরিল। জলপড়ার জন্য, মন্ত্র পড়াইবার জন্য স্বামী স্ত্রী পীরফকীর, সুধনা নমঃর বাড়ীতে সারাদিন ধরিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; সন্ধ্যার সময় সেটা মরিল। কেবল একা তাহার পিশ্‌তুতো ভাই রামগতিকে সঙ্গে লইয়া কোন প্রকারে রাত্রিতে শ্মশানে যাইয়া ছেলের সদগতির ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

পরদিন স্বয়ং কেবলেরই সদগতির ব্যবস্থা হইল। ছেলের মৃত্যুতে রামীর মা খুব চেঁচাইয়া পাড়া ফাটাইয়া কাঁদিয়াছিল; অশিক্ষিত অসভ্যদের গলাই এমন, অন্যের দিকে চাহিয়া যে গলাকে সংযত করিয়া চলিতে হয়, এ-শিক্ষা এ-গুলো পায়ই নাই। স্বামীকে যখন ধরিল, তখন রামীর মা একা কি যে করিবে, কিছুই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কেবল মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের জন্য যেন চিন্তাই নাই, শুধু ছেলেটার জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া বিছানা ছটফট্ করিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মুখে কেবলই—'কেষ্ট', 'কেষ্ট'। সত্যই কি ছেলের জন্য এতটা মায়া তাহার প্রাণে মজুত ছিল, কই কোন দিন তো এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, এ যে ঠিক্ বাবু ভুঁইয়াদেরই মত ছেলের জন্য কাঁদাকাটা! বিকালের দিকে আর সে কথা মুখে বাহির হইল না, মুখ বন্ধ হইয়া আসিল, পেট ফুলিয়া উঠিল, হাত পা শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, রামীর-মা বার কয়েক কথা কও, কথা কও বলিয়া আধা-ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিল; আর কথা কও! সব ততক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে!

তখন গভীর রাত্রি, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, গ্রাম নিঝুম, নিস্তব্ধ, চারিদিক ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। শুধু বাড়ীর পশ্চিমদিকের বড় হিজলগাছের উপর হইতে মাঝে মাঝে অলক্ষী পেঁচার মিউ মিউডাক শুনা যাইতেছে, তাহা ছাড়া পাশের এ বাড়ী সেবাড়ী হইতে কচিৎ আসন্ন মৃত্যু পীড়িতের আর্ত্তনাদ ও বমনের শব্দ। এমনি রাত্রিতে না কি ভূতপ্রেতেরা শ্মশানে বসিয়া মড়ার মাথা ও হাড় লইয়া দাবা পাশা খেলিয়া থাকে!

ঘরে মড়া লইয়া রামীর মা সারাটী রাত্রি বিছানার পাশে বসিয়া রহিল, মড়াকে ছাড়িয়া গেলে নাকি অমঙ্গল হয়।

অনেক পরে প্রভাতের আলো দেখা দিল। সে এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরিয়া এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না, যে শবের সুব্যবস্থা করিবে। যেখানে যায়, সেখানেই অলক্ষী অলক্ষী! তফাৎ যা, ওলাউঠা গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, কি আক্কেল, নিজের বাড়ী যা—এমন ভাবে তাড়িত হইয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

সারাটী দিনই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। সন্ধ্যায় বৃষ্টি থামিয়া চারিদিক আঁধার হইয়া উঠিল। রামীর মা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী তেমনি পড়িয়া আছে—মুখ হা করা, চোখ দুটা মেলা, যেন তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, মুখটা অনেকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে—চাহিতে কেমন গা ঝিম্ ঝিম্ করে। একদৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শেষে আসিয়া সে স্বামীর পায়ে হাত দিয়া মাথায় ছোঁয়াইল, তাহার পর মাটীতে পড়িয়া একবার নতজানু হইয়া প্রণাম করিল, তৎপরে হাতের দড়ি দিয়া শবের গলায় বাঁধিল, জোরে দু তিনবার টান্ দিতে ধড়াস্ করিয়া মাচাঙ্গ হইতে সেটা মাটীতে পড়িয়া গেল। রামীর মা এমনি করিয়া সেটাকে প্রেমদড়িতে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল,—মস্ত বড় লাশ, একলা সে পারিবে কেন, অল্পেতেই সে ঘামাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার চেষ্টার বিরাম নাই এখানে শবটা ঠেকে, ওগাছের গুঁড়িতে ঠেকে, উঁচু জায়গায় ঠেকে, চামড়ার স্থানে স্থানে উঠিয়া যাইতেছে—রামীর মা'র চোখে ভরিয়া উঠিতেছে, আঁচলের খোটে তাহা মুছিতেছে। এমন ভাবে দণ্ড চারির চেষ্টায় সে দেহটাকে শূন্য মাঠের পাশে লইয়া আসিল। কোথায় যাইতেছে সে? শ্মশানে? সে তো অনেক দূরে!

এমন সময় মড়ার গন্ধে গোটাকয়েক শৃগাল আকৃষ্ট হইয়া খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া আসিয়া হাজির হইল। রামীর মা সেগুলিকে দুর্ দুর্ করিয়া তাড়াইয়া জোরে আবার দড়ি ধরিয়া টান দিল, হঠাৎ দড়িটা ছিঁড়িয়া ছিট্‌কাইয়া সে দূরে পড়িয়া গেল, কোনক্রমে সে মাটীতে উঠিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে শিয়ালের দল আসিয়া মৃত দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।

সে দৃশ্য দর্শন বুঝি অসহ্য হইয়া উঠিল, সেখান হইতে পলাইয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকিতে ভয়ে তাহার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল—বুঝি বা সেটা এখনো মাচাঙ্গের উপর তেমনি তাহার দিকে বড় বড় চোখ দুটা বদ্ধ করিয়া হা করিয়া পড়িয়াছে। ঘরের দাওয়ায় আঁধারের ভিতর সে বসিয়া রহিল।

* * * *

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে রামীর মাকে সাপুর গ্রামে আর দেখা যায় নাই। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ বলে, সেই রাত্রিতে সেও জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে তাহার মৃতদেহের কোনও সংবাদই কি পাওয়া যাইত না? কেবলের শূন্য ভিটায় এখনও নাকি গভীর রাত্রিতে 'রামীর মা', 'রামীর মা' করিয়া কেবলের গলায় হাঁক্-ডাক্ শুনা যায়। ইঃ! এতই পেরেম! অধিকাংশেরই কিন্তু মত, সহরের নামাপাড়ার রূপসী নর্ত্তকী তড়িৎবালা, 'যেছুঁড়ী সহরের সকলের প্রাণ,' নবীন উকীল, ডাক্তার, জমিদার, মুহুরীর দল যাহার জন্য তোয়ারা, সে আর কেউ নয়, রামীর মা। কিন্তু সে কি এতটা সুন্দরী ছিল, না এমন কচি বয়সের সে, এমন হৃষ্টপুষ্ট মিষ্টি, এমন নাচিবার গাহিবার তাহার ক্ষমতা হইবে, স্বপ্নেও কি কেহ ভাবিতে পরিয়াছে, আর এত অফুরন্ত রস যে তাহার মধ্যে মজুত ছিল, কে কবে মনে করিতে পারিয়াছে? কি জানি, কিছুই বলা যায় না, যোগ্যহাতে পড়িলে অসম্ভবও যে সম্ভবপর হইয়া উঠে।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত দত্ত।

যৌবন প্লাবন

(২)

যাহারা বিলাত হইতে এবং আমেরিকা হইতে আজ এক মাস মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাদের দেহ ও মন হইতে সদ্য সাহেবী ভাবটা চলিয়া যাওয়া একেবারেই সম্ভবপর নয়। এমন অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নয়। তাহাদের মুখে চোখের ভিতর এই ভাবটাই বেশ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল যে ওগো! আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু! আমরা সাগর পারের রতন মাণিক! এই কটীর মধ্যে তিনজন ব্যারিষ্টার একজন এডিনবরার এল, আর, সি, পি, মার্কা মারা ডাক্তার আর দু একজন আমেরিকার নিউইয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার, আর দুজন জাপান ফেরৎ তাদের একজন সাবান তৈরী শিখিয়া আসিয়াছেন অপর জন কাঁচ তৈরী করিবার বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। সাজ পোষাকে সকলেই ষোল আনা সাহেবী চালে আসিয়াছেন, একটুকু ফ্যাসানের ত্রুটী হয় নাই। মিঃ চৌধুরী ভবতরীর কর্ণধার সেকথা আমাদের

গল্পের গোড়ায়ই বলা হইয়াছে এই সময়ে বিদেশ যাত্রী যুবক দলের মধ্যে এমন খুব কমই দেখা যাইত যাহারা যাবার পূর্ব্ব হইতেই মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে আনাগোনা না করিতেন। ইহাতে লাভ বই কোন ক্ষতি ছিলনা। লাভ এই ছিল যে তাদের চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাইবার ব্যয়টা লাগিত না, কেন না মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে প্রায়ই পার্টি, ডিনার, সোসিয়েল গেদারিং ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া বেশ আনন্দ ভোজে সন্ধ্যাটা কাটিত। এই প্রত্যাশিত দলের আগমনে সমবেত নরনারীর মজলিসের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তরুণীরা নিজেদের সাড়ীটা ঠিক্ মত আছে কি না, ব্রুচটা ঠিক্ বসান আছে কি না, এবং মাথার চুল এদিক্ ওদিক নড়িল না ঠিকই আছে এসব দিকে হঠাৎ সতর্ক নজর দিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রৌঢ়ারা লোলুপ দৃষ্টিতে তরুণদের চেহারা ও ভঙ্গীটুকু পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভুলিলেন না। যুবাদিগকে উপস্থিত নর নারীদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন মিঃ ও মিসেস্ চৌধুরী। সকলেই ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, আমেরিকার এঞ্জিনিয়ার যুবকদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি মাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। জাপান ফেরত যুবক দুইটী আসর পাইতেছিলেন না, তাহারা এসভায় হংসমধ্যে বকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে তাহারাও নীরব ছিলেন না, একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া নিজেরাই সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘরে আর বসিয়া থাকা চলে না।

শীতের পীতাভ রৌদ্রটুকু পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে সকলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দাড়িওয়ালার চাপকানপরা ও পাগড়ী আঁটা বয়ের দল চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মিঃ চৌধুরী আপনার মেয়ে সুজাতাকে একটী তরুণ সুন্দর যুবকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া অন্যত্র এইরূপ গল্পের সঙ্গী যুটাইয়া দিবার জন্য স্ত্রীকে ইসারা করিয়া নিজেও সেই সঙ্গে ধনী বন্ধুগণের কন্যাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। মিনিট পনের পর দেখা গেল যে লতাকুঞ্জের নিভৃত ছায়ায় অভ্যাগতগণের যোগ্য কিংবা অযোগ্য বলিতে পারি না তরুণী বন্ধু জুটিয়া গিয়াছে। সুজাতা আজ কমলা রঙের একখানি সাড়ী পরিয়া এবং সেই রঙের একটী ব্লাউস্ পরিয়া সোনার ব্রস্ ও পিন্ আঁটিয়া পায়ে জরির কাজ করা এক যোড়া সুন্দর নাগরাই পরিয়া তাহার রুচি কিশলয়ের মত শ্রীকে শোভন করিয়া তুলিয়াছিল। এই যে তরুণ যুবকটী যাহার সহিত মিঃ চৌধুরী সুজাতার পরিচয় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এই তরুণ যুবকটী ডাক্তারীতে অসাধারণ গবেষণা দেখাইয়া বিলাত হইতেই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। বয়স সাতাইস বৎসর। যুবকটীর নাম অনিলচন্দ্র বসু ইঁহার পিতা সবজজ ছিলেন। দু' বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহারা ছয় ভাই। অনিলবাবুকে আমরা মিঃ অনিল বলিয়াই বলিব। অনিল সকলের ছোট। বড় ভাইদের মধ্যে সকলেই বড় চাকরী করেন। প্রায় সকলেই বিদেশে থাকেন।

কাজেই পরিবারের মধ্যে পরস্পরের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। মিঃ অনিল বিলাত হইতে কলিকাতার মাটিতে পা দেওয়া মাত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু মেজদাদা মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কনকমঞ্জরী ঠাকুরপোর সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠা বিদুষী ভগ্নী তমালবালার রূপ ও গুণের অসাধারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনিল শুধু এইটুকু বলিয়াই তাহার বৌদির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল যে, বুঝ্‌লে বৌদি—, আপনার বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই আবার আর একজনের বোঝা বইব? মাপকর।— তারপর দু'সপ্তাহ দাদার বাড়ীতে তার থাকিতে হইয়াছিল সে দু'সপ্তাহ ঐরূপ বাক্যের পীযুষধারা বর্ষণ এক দিনের জন্যও ক্ষান্ত হয় নাই।

মিঃ চৌধুরী চলিয়া গেলে কথাটা প্রথম আরম্ভ করিয়া দিল সুজাতা। সুজাতা কহিল—মিঃ বসু, হঠাৎ বিলাতের মাটি ছেড়ে এই অধীন দেশের মাটিতে পা দিলে বিশেষ করে আমাদের নারী-সমাজের দিকে লক্ষ্য পড়লে আপনাদের মনটা বিশেষভাবে যে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, এ কথাটা বোধ হয় আপনি কোন রকমেই অস্বীকার কর্‌তে পারেন না?

অনিল হাসিয়া বলিল—নারী-সমাজের দিকে আমি কোন দিনই বড় একটা নজর দিই নি, আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস চৌধুরী সত্য কথা বল্‌তে কি নজর দেওয়ার

মত অবসরও আমার হয়নি। হবেই বা কখন? এ বয়সটাত কেবল পুঁথিপত্রের পৃষ্ঠা ঘেটে ঘেঁটেই কেটে গেল। আপনাকে বুঝে নেবার, দেখে নেবার সময় আমার এখন হতে পারে, কেননা—এখন নূতন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সে জীবন ছিল শুধু আপনাকেই নিয়ে থাকা, কেমন করে ভাল ছাত্রবলে পরিচিত হব, কেমন করে সংসারে প্রবেশ করবার পথে কোন বাধা না পড়ে, এটাই ছিল প্রবল। এখন ধীরে ধীরে সবদিকে নজর পড়বে বই কি!—প্রথমে কথাটা আরম্ভ করাই যত কঠিন, কিন্তু একবার আরম্ভ হইয়া গেলে আর তেমন বাধে না, সে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষেই তুল্য।

সুজাতা চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া ঈষৎ চুমুক দিয়া মৃদুহাস্তে মিঃ অনিলবসুর প্রতি একটু চাহিয়া মাথা নত করিয়া কহিল—মানুষত একদিনেই সবদিকে লক্ষ্য রেখে চলতে পারে না। ধীরে ধীরে সবটাতে নজর পড়ে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনি ত প্রায় পাঁচ ছয়মাস বিলেত থেকে এদেশে এলেন, আমি অন্য কোন সমাজের কথা তুলতে চাই না, জানতে চাই শুধু আমাদের নারী-সমাজের কথা, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায়? অবশ্য স্বাধীন দেশের স্বাধীনতার বিশেষত্বটুকু বাদ দিয়ে শিক্ষার দিক্ দিয়ে সমাজের দিক্ দিয়ে আলোচনাটাই আমি করতে চাই ও শুনতে চাই।

অনিল একটু গম্ভীর হইয়া চশমাটা খুলিয়া লইয়া পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল—"আপনারা এখনও অনেক অনেক পেছনে। আমরা পুরুষজাত ও যেমন অনেকটা ডুবে আছি অতল তলে, মেয়েরা তার চেয়েও অনেক বেশী ডুবে রয়েছেন। যদি কথাগুলোর সত্যিকার রূপ দেওয়া যায় তা হলে আপনি বোধ হয় এক্ষুণি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে পালাবার জন্য ব্যস্ত হবেন।

সুজাতার চোখ দুটির মধ্যে একটা জ্যোতিঃ ছিল। হাসিলে সে চোখ দু'টির মধ্য হইতে একটা স্নিগ্ধশান্ত অপূর্ব্ব রূপপ্রভা ফুটিয়া বাহির হইত। শ্যামাঙ্গিনী হইলেও তার মুখখানা ছিল বেশ সুন্দর হাসিতে ঢল্ ঢল্ সে হাসিটুকু ছিল বড় মিষ্টি। অনিলের কথা শুনিয়া সুজাতা মধুর হাসি হাসিয়া কহিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন; আমি কোনমতেই পালাব না। সকলেইত আমাদের নিন্দা করে, আপনার মুখেই আবার নূতন করে নিন্দা টা শোনা যাক্।

নিন্দা—নিন্দা সে নিশ্চয়ই নয়। প্রথম অভিজ্ঞতাটার কথা বলি। আমরা বাঙ্গালী—দু পাঁচ বছরে কোন রকমেই সাহেব হয়ে যেতে পারি না। যারা সাহেব হন, তারা মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে অনেকখানি খাটো হয়ে পড়েন। তেমনি আমাদের নারী-সমাজের মধ্যেও হঠাৎ মেম সাহেব সাজার যে বিচিত্র ভঙ্গী এসে উপস্থিত হয়েছে এ আমি কোনমতেই বরদাস্ত করে পারি না। বিলাতে মেয়েদের মধ্যে যে সতেজ সাহসিকতা আছে স্বাধীনভাবে চলবার যে সাহস তাদের মজ্জাগত হয়েছে সে শিক্ষা আমাদের মেয়েদের হতে ঢের বাকী। তার পর এদেশের পুরুষদের mentality টা এমনি নীচ হয়ে পড়েছে যে লজ্জায় মাথা নীচু করতে হয়, সেদিন মিঃ চাটার্জ্জির বাড়ীতে ডিনারের টেবিলে বসে কেবল মেয়েদের সমালোচনাই শুনলুম্। সে দলে প্রফেসার ছিলেন, ব্যারিষ্টার ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন। কোন্ মেয়ে কোন্ পুরুষের সঙ্গে মেশেন, কেমন করে চলাফেরা করেন, শুধু কুৎসাই বসে বসে শুনলুম অথচ সে সব মেয়েরাই আপনাদের নব্যাদলের; সে সব পুরুষ এমন ভাবে নিজেদের নারীসমাজের নিন্দা করেন, তারা কি মানুষ না পশু? আবার অপনারা যদি কারু সঙ্গে মেশেন, এমনি ভাবে মেশেন যে নিজদের অনেক সময় সাম্লাতে পারেন না। Help অনেক সময় মেয়েদের পুরুষের কাছ থেকে নিতে হয়, তা বলে বেহায়ার মত দিন রাত যদি একজনের পেছনেই আনা গোনা করেন এবং সে লোকও যদি নিজের responsibility এবং as a man তার ব্যক্তিত্বটুকু বজায় রাখতে না পারেন তা হলে সমাজ অচল হয়ে পড়বেইত। আমি এদেশের নারীসমাজের এমন ধারা স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে কোন উন্নতি হবে বলে মনে করি না বরং অন্ধকারটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

সুজাতা গম্ভীরভাবে বলিল—বলেন কি?

ঠিক কথাই বলছি মিস্ চৌধুরী!—একজন ইংরাজের মেয়ে, সহরের খুব বড় ঘরের কথা ছেড়ে দিন্, বড় ঘরে মেশ্‌বার মত সুযোগ আমার হয়নি middleclass যাদের বলে তাদের সঙ্গে মিশে দেখেছি। আপনাদের দেশে কজন তেমন মেয়ে আছেন? একজন কর্ম্মনিপুণা ইংরাজ মেয়ের সঙ্গে আপনাদের তুলনা হ'তেই পারে না। তারা যেমন বাইরের কাজও পারে ভিতরের কাজও তেমনি পারে। এমন মেয়েও দেখেছি, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, কাপড় কাচ্‌ছে, ড্রয়ার সাফ কচ্ছে, রান্নার যোগাড় দিচ্ছে, ডিনার টেবিলের উপর ফুলদানিতে ফুল দিতে পর্য্যন্ত ভোলেনি।—আর আপনাদের কলেজ বা উনিভার্সিটি এডুকেশন যারা পাচ্ছেন, তারা একেবারে helpless—না পারেন রান্না করতে, না পারেন তরকারি কুটতে, না পারেন ভাল করে societyতে মিশতে, না পারেন একজন পুরুষের সঙ্গে সরল সহজভাবে আপনার স্বাতন্ত্র্যটাকে বজায় রেখে চল্‌তে। কোণে বসে গজগজানি—plan করা, এ হচ্চে এদের বিশেষত্ব। এই যে university Education দেওয়া হচ্চে মেয়েদের, আপনারা ব্রাহ্মের দল, কিংবা or advance Hinduর দল আমার মাথায় লাঠিই মারুন আর একঘরেই করুন, আমাদের দেশে এ শিক্ষার কোন দিনই ভাল ফল হবে না। কেননা যে সব পুরুষের চোখ আছে তারা এমন রুগ্ন; অপটু মেয়েকে বিয়ে করে lifeটাকে miserable করবে না। টেনিশন, মিল্টন, সেক্সপীয়র, বিদ্যাপতির নিয়ে সংসার করতে গেলে সব সময়ও কবিতা চলে না।

সুজাতার মুখ লাল হইয়া গেল। সে একটু বিরক্তির সহিত তর্কের সুরে কহিল,—আমি আপনার কথা মেনে নিতে রাজি নই।

অনিল গম্ভীর ভাবে কহিল 'আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আমার বেশ ধারণা হয়েছে যে আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য যে রকম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, এতে দেশের ক্ষতি বই লাভ হবে না। মেয়েদের শিক্ষার জন্য নূতন করে syllabus তৈয়ারী করা দরকার। সে শিক্ষাতে এমন সব বিষয় এনে ফেলতে হবে যাতে তাদের নিজদের দায়িত্ব জ্ঞানটা বেশ ভাল করেই হয়। মিস্ চৌধুরী আপনি কি শিক্ষা পেয়েছেন কেমন করে রোগীর সেবা করতে হয়? আপনি কি জানেন হঠাৎ একটা accident হ'লে কেমন করে তার প্রতিবিধান করতে হয়? আপনি পারেন একা সাহস করে পথ চলতে? impossible, দেখবেন বি, এ, এম, এ পাশ করা ছেলেরাই কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতে ছাড়বে না। এমন ভাবে তাকাবে যেন কোন দিন তারা কোন মহিলাকে দেখে নাই! এসব জাতের ধারা! জন্মে জন্মে অধীনতার দারুণ পাশে বাধা থাকার দরুণ আমরা মানুষ হইনি! মানুষ হতে এখনও অনেক বাকী। কাগজে কেবল নারীর উপর অত্যাচারের কথা ছাড়া কোন্ কথা আছে? দেশে পুরুষ কোথায়? পুরুষ নাই—পুরুষ মরে গেছে। কটা কলেজের ছেলের দেহে এমন শক্তি এমন মন ও সাহস আছে যে তারা দু'টা ঘুসি দিতে পারে ও সইতে পারে? আপনারা যারা Education পাচ্ছেন, তাদের দেহ এমনি ক্ষীণ যে লতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কাগজে—উপন্যাসে মুখে নারীর গৌরব মহিমার ব্যাখ্যা করলে শুধু চলে না। কাজের ভিতর দিয়ে দেখাতে হয়। আমাকে ঘৃণা করবেন মিস্ চৌধুরী, আপনাদের কারু সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমি সাধারণ মানুষের মত কাকেও অযথা admire করতে পারি না। কাপুরুষের মত পেছনে নিন্দাও করি না। আমি দেশটাকে এক মাসের ভিতর যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। আমরা এখনও Dark ageএর মানুষ! জাত গড়তে ঢের বাকী।

সুজাতা কখনও কোন দিন তর্কে কারু কাছে হারে নাই। আজ সে নিন্দাটাই শুধু শুনিয়া গেল। কোন প্রতিঘাত কোন বাধা দিতে সে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে বিরুদ্ধতর্ক করিবার জন্য ভাব প্রবাহ বেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মিসেস্ চৌধুরী সুজাতার কাঁধে হাতখানি দিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—সুজাতা, একবার এদিকে এসত, মিঃ রায়ের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি তোমার বাবার বন্ধু কটকের ডাক্তার মধুসূদন বাবুর ছেলে। কলকাতাতেই ব্যারিষ্টারী করবেন। মিঃ অনিল মিসেস্ চৌধুরীকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন এবং সুজাতাকেও নমস্কার করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেই আবার নীরবে সেখানে বসিয়া একটা

সিগার ধরাইলেন। সুজাতার মাথা গরম হইয়াছিল। অনিলের শেষদিকের কথাগুলি তাহার মনে খুবই ব্যথা দিয়াছিল, যাইবার সময় সে অনিলকে একটী কথাও বলিয়া গেল না—নমস্কার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

একটী সমস্যা।

ছিল একদিন যখন হিন্দুললনাগণ শাস্ত্রে ও শস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া নিজদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব নিজেরাই রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, এমন কি প্রয়োজন হইলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসুরনাশিনী মূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতি কুল ধ্বংস করিতেন। শত্রু জয় করিতে অপারগ হইলে রণক্ষেত্রে হাসিমুখে আত্মবিসর্জ্জন দিতেন। কিন্তু "তেহি নো দিবসা গতাঃ"। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তঃপুরচারিণী নারীগণেরও আত্ম রক্ষার শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্ব্বল হিন্দু আত্মরক্ষার উপায়হীন হইয়া একমাত্র কাপুরুষতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাহাদের কুললক্ষ্মীদিগকেও পর্দ্দার অন্তরালে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে যথার্থই অবলা করিয়াছেন। নারী-দের সেই বীর্য্যও নাই, সেই সাহসও নাই। দেশ রক্ষা ত দূরের কথা নারীরা এখন আত্মরক্ষা করিতেই অসমর্থা। কিন্তু অন্তঃপুর যে দুর্ভেদ্য দুর্গ নয় এবং সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনও যে অক্ষয় কবজ নয় তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি। সেখানে সূর্য্যদেব প্রবেশ করিতে না পারিলেও দুর্ব্বৃত্তের লালসা দৃষ্টি অনায়াসে পৌঁছিতে পারে একথা এখন কাহারাও অবিদিত নাই। নারীগণের প্রতি কামাসক্ত নর পশুদিগের অত্যাচার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন স্থানে অসহায়া স্ত্রীলোকের সন্ধান পাইলেই মাংস লোলুপ ব্যাঘ্রের মত পাষণ্ডগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। হিন্দুসমাজ নারীদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার সম্মান রক্ষা করিতে হিন্দুগণ সমর্থ বলিয়াই নির্য্যাতিতা হিন্দুনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই নারীনির্য্যাতন ব্যাপার যেমন বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছে, তেমনি সমাজের নেতাদের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যখন দুই চার বৎসর পর কোন হিন্দু নারীকে দুর্ব্বৃত্তেরা হরণ করিয়া নিয়াছে তখন সমাজের লোকেরা ঐ অসহায়া নারীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা ত করেনই নাই, ঘটনাটী গোপন করিয়া নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে সুখ শান্তিতে দিন কাটাইয়াছেন। ঐরূপ ঔদাসীন্য ও দুর্ব্বলতাপ্রদর্শনে কামুক নরপশুদের সাহস অধিকতর বাড়িয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা অহিন্দুর নারীধর্ষিতা হইলে তাহারা সেই সমাজেই পুনরায় স্থান প্রাপ্ত হয়। সমাজের লোকই তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া সুখ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু হিন্দুসমাজ নারীকে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও নিরপরাধা নারীকে উদ্ধার করিয়া আনিলে তাহারা সমাজে স্থান পায় না। চির বর্জ্জনই আধুনিক সংকীর্ণ হিন্দুসমাজ নীতির নিষ্ঠুর বিধান।

যে হিন্দুসমাজ একদিন হূন, শক্, কোল, দ্রাবিড় রাজপুত প্রভৃতি বিধর্ম্মীকে উদার বক্ষে স্থান দিয়াছে সেই হিন্দুসমাজই এখন তাহার নির্য্যাতিতা নিরপরাধা মা ভগ্নীদের বর্জ্জন করিয়া নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিতেছে। জীবন্ত ধর্ম্ম কখনও জনমণ্ডলীকে বর্জ্জন করে না, অন্যকে গ্রহণ করে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরকে গ্রহণ করিয়াই এই বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সেই উদার ধর্ম্মের আদর্শ এখন ক্ষুদ্রচেতা হিন্দু অনুসরণ করিতে অসমর্থতার ফলে ধর্ম্ম একটা নিষ্পেষণ যন্ত্র পরিণত হইয়াছে।

যে সকল নিরপরাধা অসহায়া নারীকে দুর্ব্বৃত্তগণ হরণ করিয়া নিতেছে তাহারা হিন্দুদিগের নিষ্ঠুরতার ফলে সমাজে স্থান পাইতেছে না। তাহারা নিরুপায় হইয়া দুই মুষ্টি উদরান্নের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছায় বেশ্যা বৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিতেছে; কিছু সুকৃতি থাকিলে কোন আখড়ায় গিয়া ভেক্ গ্রহণ করিতেছে, গত্যন্তর নাই। অনেক স্থলে সতীত্ব হরণকারী উৎপীড়কের অঙ্কশায়িনী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতেছে।

হিন্দুদিগের নির্ম্মম বর্জ্জন নীতির ফলে দুর্ব্বৃত্তদিগের সাহস বাড়িয়া যাইতেছে। এখন এমন একটী দিনও বাদ যায় না যখন কোন না কোন স্থানে নারীগণের বুক ফাটা

উষ্ণশ্বাসে গগন পবন বিষাক্ত হইয়া না উঠিতেছে৷ আর সেই বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া হতভাগ্য হিন্দুসমাজ অসাড় জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ দেখিবার নাই, কেহ প্রতিবিধান করিবার নাই, এমন কি চিন্তা করিবার পর্য্যন্তও কেহ নাই।

যাহা হউক ভগবানের অলক্ষিত ইঙ্গিতে কালের অনুকূল হাওয়ায় হিন্দুসমাজের নিথর নিস্পন্দ দেহে যেন একটু সঞ্জীবতা দেখা যাইতেছে। কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি নির্য্যাতিতা নারীদিগের রক্ষাকল্পে কিছু উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন; পক্ষান্তরে লাঞ্ছিতা রমণীগণের মধ্যেও কেহ কেহ পুরুষের মুখাপেক্ষিণী না হইয়া প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মান রক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিতেছে কেহ বুদ্ধিবলে পিচাশদিগের কবল হইতে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছেন; কেহ বা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া স্বহস্তে অস্ত্র ধারণ করতঃ নরপশুদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছেন, এরূপ ঘটনাও এখন সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে। রোগ হইলে তাহার সাময়িক যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা অপেক্ষা রোগের মূলকারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই অতি উত্তম হয়। কিন্তু দেশের লোক এখনও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নাই। কাজেই মন্দের ভাল হিসাবে আপাততঃ যথাসম্ভব রোগের ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা যে ক্রমে অল্লাধিক পরিমাণে হইতেছে, ইহাও কতকটা আশাপ্রদ মনে হয়।

সমাজে এখনও জমিদার সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। তাহারা যদি এই সমস্যার সমাধানের জন্য যত্নশীল হন তাহা হইলে নারী-নির্য্যাতন পাপ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। জমিদারগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে সমাজ দেহস্থ এই গলিত কুষ্ঠ ব্যাধির মূল উৎপাটিত হইতে যেমন বিলম্ব হইবে না তেমনি অসহায়া নারীদিগকে তাঁহারা আশ্রয় দিয়া তাহাদের সৎপথে থাকিবার সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিতে পারিবেন। যাহাতে পাষণ্ডগণ অসহায়া স্ত্রীলোকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে না পারে জমিদারগণ সমবেত হইয়া চেষ্টা করিলে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কোন স্থানের কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে অবিলম্বে যাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ষিতা স্ত্রীলোকগণ এবং তাহাদের আত্মীয় স্বগণ যাহাতে সমাজে কোন প্রকার নিগ্রহ ভোগ না করে তাহারও সমুচিত উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকার কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইলে সেইগুলি যদি উপযুক্ত সৎসাহসী কর্ম্মিগণের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে অচির কাল মধ্যে এই পাপ স্রোতের গতি একেবারে রুদ্ধ না হইলেও কতক পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কামান্ধ নরপিশাচগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই নির্য্যাতিতা নারীর কষ্টের অবসান হয় না। বরং তখন হইতে তাহাদের মানসিক কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান নাই, তবে তাহারা কোথায় যাইবে? মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু নির্য্যাতিতা কন্যাদিগকে বুকে তুলিয়া লইতে ঘৃণা বোধ করে! তবে নির্য্যাতিতা নারীরা কোথায় যাইবে? দেহধর্ম্ম বশে তাহাদেরও ক্ষুৎপিপাসা হয়, বাসের স্থানের প্রয়োজন হয়। কে তাহাদিগকে দিবে আহার, কে দিবে আশ্রয়? হতভাগিনীরা কোথায় দাঁড়াইবে? ইহারা কি স্রোতের তৃণের মত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে ভাসিয়া যাইবে! সমাজের নেতার কাজ সমাজের সকলের কল্যাণ সাধন করা এবং প্রতিবেশীদিগকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুসমাজের নেতারা নির্য্যাতিতা নারীকে আশ্রয় না দিয়া উৎপীড়কের হাতেই সমর্থন করিতেছেন। ব্যথিতাকে সান্ত্বনা না দিয়া, লাঞ্ছিতাকে গৌরবের আসনে স্থাপন না করিয়া নেতারা তাহাদিগকে চিরদুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিতেছেন।

নিরাশ্রয়া ধর্ষিতা নারীদিগের আর কোন উপায় করিতে না পারিলেও তাহারা যাহাতে নিরাপদে বাস করিয়া দুই বেলা দুইমুষ্টি অন্ন পায় তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি। এবং তাহা করিতে আমরা ন্যায়তও বাধ্য। যাহাদের আমরা রক্ষা করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় তাড়াইয়া দিলে যেমন অধর্ম্ম হইবে তেমনি দুর্ব্বৃত্তদিগেরও লালসানল বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই প্রকারের কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। আমরা কত প্রকারে কত অর্থ অপব্যয় করিতেছি, মাতৃজাতির

সম্মান রক্ষার্থে কি আমাদের কিছুই করিবার নাই? পাশ্চাত্যদেশে নারীদিগের অসুবিধা নিবারণের জন্ত নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের দেশের ন্যায় তথায় দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক নারীনির্য্যাতন কদাচিৎ হয়। তথায় স্বেচ্ছায় যৌবন সুলভ ইন্দ্রিয় শক্তিবশত যদি নারী পদস্খলিতা হয় তবে তাহাদের উদ্ধার করিয়া সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। অবৈধপ্রণয়ের ফলে অন্তর্ব্বর্ত্তিনী নারীদিগের সুপ্রসবের জন্ত এক এক দেশে বহু সংখ্যক হাসপাতাল (Maternity House) আছে। অবিবাহিতা নারীর গর্ভজাত পরিত্যক্ত সন্তানদের রক্ষার জন্ত বহুসংখ্যক অনাথ আশ্রম (Foundling House) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ ঐ সকল নারীদিগের মাথা মুড়াইয়া তাড়াইয়া দেয় না। পাশ্চাত্য দেশের কথা স্বতন্ত্র, মানিয়া নিলাম। আমাদের মত তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ নয় একথাও মানিলাম। কিন্তু নিরপরাধিনী ধর্ষিতা নারীদিগকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই কি হিন্দুধর্ম্ম সম্মত। হিন্দুধর্ম্ম এরূপ সংকীর্ণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মনুপরাশর প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ষিতা নারীদিগকে সমাজে গ্রহণেরই ব্যবস্থা আছে তাড়াইয়া দেওয়ার কোন বিধান আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। সে কালের হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন ঋষিরা। অতিশয় উদার ছিল তাঁহাদের ধর্ম্ম মত, একান্ত করুণ ছিল তাঁহাদের হৃদয়। আমাদের নাই উদারতা, নাই হৃদয়ে একবিন্দু স্নেহ-মমতা। শুষ্ক অসার কতগুলি বিধিব্যবস্থাকে আমরা সনাতন ধর্ম্মের সিংহাসনে বসাইয়া অন্ধ বিশ্বাসে পূজা করিতেছি।

অতীব সুখের বিষয় ময়মনসিংহ ভূম্যধিকারী সভার সভ্যগণ উক্ত সভার বাৎসরিক অধিবেশনে ধর্ষিতা নারীদের আশ্রয়ের জন্ত একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শুভ সংকল্প সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকার একটী স্থায়ী ফণ্ড আবশ্যক। ঐ অর্থ সংগ্রহের ভার একটী কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব হইবে না ইহা আমরা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি। ভূম্যধিকারী সভার অধিবেশনের দিনই প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আমি এই সভার পক্ষ হইতে জিলার ভূম্যধিকারিগণ ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ে আমার এই প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

উপসংহারে এই কার্য্যের সফলতার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করি ইতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

নালিতার বারমাস্যা

(পল্লীগীতি)

বাংলাদেশে পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ধানের পরিবর্ত্তে আজকাল সর্ব্বত্রই অধিক পরিমাণে নালিতা উৎপন্নের প্রচেষ্টা।

অন্যান্ত জিলার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের এই ময়মনসিংহ জিলার কৃষকদের বর্ত্তমানে পাটই একমাত্র সম্বল। নালিতার সহিত তাহাদের সুখদুঃখ এমনিভাবে জড়িত যে একমাত্র এই ফসলের ভালমন্দেই তাহাদের হৃদয় আনন্দ বা বিষাদে ভরিয়া যায়; ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের বাৎসরিক যাবতীয় সাধ মিটান উহারই উপর নির্ভর করে।

অন্যান্ত ফসলের চেয়ে পাট জন্মানেই কৃষকদের অধিকতর পরিশ্রম করিতে হয়। বৎসরের কোন সময়ই তাহারা ইহার সংস্রব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। কথাটা যে কতদূর সত্য পল্লীগ্রামে প্রচলিত নালিতার বারমাস্যাই তার প্রমাণ।

এই গানটী কবে কাহাদ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। তবে ভাষা ও ভাবের উলঙ্গতা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় পল্লীর কোন কৃষক কবিই ইহার রচয়িতা।

নালিতা উৎপাদনের যাবতীয় কাজ ও এতৎসংলগ্ন নানা সুখস্বপ্নই এই বারমাস্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই পল্লীমাঠ মুখরিত করিয়া ইহার ঝঙ্কার উঠিয়া থাকে। কর্ম্মনিরত অবস্থায় কৃষকদের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিতে ইহা অদ্বিতীয়। এই গানটীর অনাড়ম্বর গ্রাম্যভাষায় গড়িয়া উঠিলেও বর্ণনার সারল্য ও মনোভাবের উদার বিশ্লেষণে সাহিত্যের আসরে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

পৌষনা মাসেতে ভাইরে পুষ্প অন্ধকারী।
নাল্যার লাগ্যা পিরস্থ্যো না লয় ঘর বাড়ী॥

(দিশা) ও নিলকে, শরীল করলাম কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে।
মাঘনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল।
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম জোয়াল ভাঙ্গলাম্ আরও
ভাঙ্গলাম ফাল॥
ফাল্গুনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম মই।
দুর্ব্বায় ভেদাল্লায় কয় আমরা যাইবাম কই॥
চৈত্রিনা মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা।
নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা।
বৈশাখ মাসেতে ভাইরে নাল্যার ফালুলাম আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনলাম ভাউজের লাগিগ বালি।
নাল্যা যে নিড়াও গো তুমি ধানত নিড়াও না।
গোসা কর্যা বইয়া থাকবাম ভাত রানৃতাম না।
জ্যৈষ্টিনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার আইল্যা পড়ে আগা।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম্ ভাউজের লাগ্যা তাগা।
আষাঢ় মাসেতে ভাইরে গাঙ্গে নয়া পানি।
হউরীর আগে বউয়ে কয় নাইয়র যাইবাম আমি॥
শাউনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম্ ভাউজের লাগ্যা নাকুল॥
ভাদ্রনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম্ ভাউজের লাগ্যা বালি।
নাকুল দিলা যেমন তেমন বালি দিলা ভাঙ্গা।
তোমার ঘাড় ঠেঙ্গ থইয়া আমি বইবাম হাঙ্গা॥
আশ্বিন মাসেত ভাইরে পাটের অইল ভাউ।
পাট বেচ্যা গিরস্থেরা কিনল দৌড়ের নাউ॥
কার্ত্তিক মাসেতে ভাইরে বাড়ীর করলাম ঠাট।
ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাউজে লারত যায় পাট॥
অগ্রাণ মাসেতে ভাইরে সবে নয়া খায়।
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা ফাজনায় যায়॥
ও নিলকে শরীল করলাম্ কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে। *

* বারমাস্তার দিশা-পদটী প্রত্যেক মাসের শেষেই এক একবার উচ্চারণ করিতে হইবে।

কেন?

জনম লভিয়া পুনঃ মৃত্যু কেন হয়?
রোগ শোক জরা দুঃখ কেন এ ধরায়?
সদা কেন মৃত্যুভীতি হৃদয় কাঁপায়?
আত্মীয় বিয়োগে কেন সবি শূন্যময়?
শান্তিময় নহে কেন কোনো লোকালয়?
অভাবে সবাই কেন করে 'হায়, হায়'?
কৈশোরেই কেন আয়ু ফুরাইয়া যায়?
জগতের সবি কিগো পাইবে বিলয়?
সৃষ্টির মাঝারে কেন এত ব্যতিক্রম?
চিরকাল রহিবে না কেন জোছনা-রাতি?
ফুল কেন ঝরে' যায় জাগাইয়া ভ্রম?
কেন যায় চির-প্রিয় যৌবনের ভাতি?
উদরের চিন্তা কেন এতই বিষম?
হয় না আনন্দ কেন জীবনের সাথী?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রবাদের আবাদ।

(৮ম চাষ)

"মূঢ়ের দিগ্‌বিদিক্ বোধ নাই" গোছের হইয়া ক্রমশঃ প্রবাদের চাষে অগ্রসর হইতেছি ফল কি পাইব জানি না। তথাপি সুধীজনের উৎসাহ আমাকে কর্ম্মের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী দাদা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে, প্রবাদের আবাদ অত্যাবশ্যক এবং ইহার দ্বারা যে ভবিষ্যতে সাহিত্যের একাঙ্গ পুষ্ট হইবে তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং আমার সহকর্ম্মী হইবার জন্য যাঁহারা আমার চাষে সহায় করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তরুণদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এখন চাষের কথায় মন দেওয়া যাক্।

"সাক্ষাতে দাদা, দাদা,
অসাক্ষাতে চিমা গোদা।"

অনেকে সাম্‌নে দাদা, ভাই, ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণ করিয়া মতলব হাসিল করে সত্য, কিন্তু পরে তফাৎ গিয়াই দুর্ণাম করে।

রাজার গর্জ্জন থলপট,
কুকুরের গর্জ্জন খেড়,
নারীর গর্জ্জন পান্তা ভাত
গোঁয়ারের গর্জ্জন ঘাড়।

নিষ্ফল বাগাড়ম্বর স্থলে এই সব প্রবাদ খাটে।

খল পশী, দুষ্মন ভাই,
চোরা বান্দী ছুঁছড়া গাই।

পাড়াপড়শীর লোক যদি দুষ্ট প্রকৃতি হয় এবং বাড়ীর গাই ও দাসী বাঁদী যদি অসংযত হয় তবে দুঃখের সীমা নাই।

চেচ্‌ড়ার ক্ষেত ভেদালিয়া বাড়ী
লাখ টাকা হলেও ভিখারী।
গাছ হইতে ফলের আদর বেশী।
নী যায় প্রাণ, কাউছালি সার।

কাউছালি—যন্ত্রণায় হা হুতাশ।

যার বাড়ীত থাকি, তার মর্চ্ছে মা,
লগে যদি না কান্দি (তবে) খেদাইয়া দিত না ?

অপরকে খুসী করিবার জন্য অনেক সময় অনিচ্ছায়ও কাজ করিতে হয়।

অমানুষে মানুষ নিন্দে
বাওয়াসে নিন্দে ঝাড়ি,
অসতী এ সতী নিন্দে,
এই সে দুঃখে মরি।"

একেই বলে চালুনের সুচের নিন্দা করা। যাহার নিজ বাড়ীতে, নিজ চরিত্রে দোষের সীমাই নাই. সে যে পরের সরিষা প্রমাণ দোষে পর্ব্বত দেখে এইস্থলে খাটে।

কাণ কাট্‌লে যে সুখ, নারায়ণ সরকার জানে।
বাঙ্গাল নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি।
বাঙ্গাল মানুষ নয়, বটে এক জন্তু,
লাফ দিয়া গাছে চড়ে, লেজ নাই কিন্তু।
সুমানষের রাও,
কুমানষের পাও,
খাওনে চিনি কাঙ্গাল,
খড়মে চিনি বাঙ্গাল।

কথাবার্ত্তায় ভদ্র অভদ্র চিন্‌তে পারা যায়। আর পাও দেখিয়াও ভদ্র অভদ্র চিনা যায়। দরিদ্রের খাওয়ার ভাব ভঙ্গী দেখিলে চিনা যায়, আর খড়ম দেখিয়া বাঙ্গাল চিনিতে পারা যায়। তাহাদের খড়মের সাম্‌নের দিক ক্ষয় পাইয়া যায়। অভ্যাস কম বলিয়া।

"ইন্দ্রানগর, মৌরাপুর,
ছবি (ছয় বুড়ি) বিকায় কন্যার জোড়,
যদি জামাই লইয়া যায়,
দুই একটা এমনই যায়।

কন্যার বাজারের সুলভতার দৃষ্টান্ত।

"সাতগাঁও, বালিশিরা, মধ্যে মধ্যে ছড়া,
জেলা গো চান যেন মণি গো মরা।"
হুগালি ভুল্লভচান, পরগণার মাঝখান
উবাইয়া বাইন করে, বইয়া দায়,
বহুত কপালের জোরে, বীজ দোনা পায়,

উবাইয়া—নুইয়া নুইয়া।

বামুনকে বস্ত্র দান, আল্‌গা তার তানা,
বামুনকে তণ্ডুল দান ভাঙ্গা ক্ষুদ দানা,
বামুনকে তৈজস দান মধ্যে তার ছেঁদা
বামুনকে গরু দান সার তার লেদা,
বামুনকে হরিনাম ওজন তার কম,
আইলরে পুরুত যজমানের যম।
"শাগের লগে কাঁচা মরিচ
ডাইলের লগে ঘি,
মাংসের লগে আদা (আর)
কন্যার লগে ঝি।"

শাকে কাঁচা মরিচ, ডাইলে ঘি দিলে যেমন উৎরে যায়, মেয়ে বিবাহের সময় পিতা যদি কন্যার সঙ্গে ঝি (দাসী) দেন তবে খুব শোভন হয়।

পুতে করে গয়া, ঝিয়ে করে সর্ব্বজয়া।

পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করার জন্য পুত্রের যেমন গয়া যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য. সেই প্রকার, সকলের মঙ্গলের জন্য কন্যার ও "সর্ব্বজয়া" ব্রত করা অতি আবশ্যক।

চোরের কয় চুরি কর, গৃহস্থরে কয় সজাগ থাক্।

এমন এক শ্রেণীর উপদেষ্টা আছেন যাঁহারা মতলব মত

কথা পারেন, অর্থাৎ দুইদিকের মন রক্ষা করিতে চাহিয়া "গাছেরও পাড়েন, তলেও কুড়ান"।

দোষ ও দেয় ঘুষ ও নেয়
পাছের দুয়ার দিয়া,
মুখ মুইছা "না" করে
মাজরা স্থলে গিয়া।

মাজরা—মীমাংসা স্থল।

অনেকে লোভের বশে ঘুষ বা পাত্রভেদে প্রণামী (?) গ্রহণ করিয়া অপকর্ম্মেরও সহায়তা করেন, কিন্তু যখন পুনরায় অন্য দিক দিয়া স্বার্থের হানি ঘটে, তখন দিব্ব ভাল মানুষ সাজিয়া আমি এর কিছুই জানি না বলিয়া সরিয়া পড়েন। ফলে সমাজে ইঁহাদেরই জয় জয়কার পড়িয়া যায়। আর যে অচল অটলভাবে শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকে তাকে নাকাল কর্ত্তে অনেকে পিণ্ডেপ্রাণে লাগিয়া যায়।

শ্বশুর বাড়ী বাসা, একজন মারলে
তিনজন গোসা।
যা শত্রু পরে পরে।
এক বেল্লিক একাই হাজার
একলাই করে গাঁও উজার,
থাকিতে কয় না মুখের কথা,
বাহিরে গেলেই টেঙ্গা গুঁতা।
চেংড়া চিকিৎসক, লেংড়া গাই,
টেংড়া মাছ (আর) তেনুরা ভাই।
থাকলে দুঃখের সীমা নাই।
অসৎনারী বদ্ধ জল।
সীত যেমন গঙ্গাজল।
বড় লোকের ভালবাসা,
গৃহস্থের মুরগী পোষা।

কখন জবাই করিবে ঠিক নাই। তৈল মাংস বেশী হইবার জন্য খাওয়া দাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকে।

জ্বর আর পর,
খাওন না দিলেই লড়।

লড়—দৌড়, প্রস্থান।

নিদান বলেন "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্য"।

কীল আর তেল,
পড়লেই গেল।

তেল মাটীতে পড়িলে সবটুকু তুলিতে পারা যায় না। কীলও পড়িলে পাওয়ার যা তা ত হইয়াই যায়!

লেপ্‌লে পুছ্‌লে বাড়ী,
পিন্‌লে চিন্‌লে নারী।

যথাযোগ্য কার্য্যতার দ্বারাই পরিচয়।

গরুর কুটুম লেইলে পুছলে
মানুষের কুটুম আইলে গেলে।
নায় না আঁটে হুইত্যা যাও।
শ্বশুর বাড়ী, মথুরাপুরী,
দিন কয় থাক্‌লেই ঝাঁটার বাড়ি।
লাভে বেং, অপচয়ে ঠেং।
চাংও মিছা পাগাড়ও মিছা।
পেঁয়াজ, পয়জার, কড়ি।

এক খেয়া ঘাটে এক পণ কড়ি দিয়া পার হইতে হইত। একদিন একটা নাছোরবান্দা পয়সা নাই বলাতে পাটনী বলিল, যদি এক সের পেঁয়াজ খাও তবে কড়ি না দিলেও পার করিব; কিন্তু কিছু খাইয়াই অস্থির হইয়া পড়িল তখন পাটনী বলিল, এখানে যে পয়জার (জুতা) দেখিতেছ, যদি তার একশটী বাড়ি খাইতে পার তবে পার করিব। লোকটা একটু এদিক সেদিক চাহিয়া যখন দেখিল নিকট কেউ নাই তখন বলিল, "এ আর কথা কি এখানে ত কেউ নাই, মার ভাই একশ পয়জার। ৭ হরি! দশ বিশ ঘা খাইতে না খাইতেই চেঁচাইয়া বলিল, ভাই থাম, থাম আমি কড়িই দিতেছি।" পেঁয়াজ পয়জারও খাইলই বেশীর ভাগ কড়িও দিল।

ভাত এমন চিজ্ (দ্রব্য)
খোদার লগে উনিশ বিশ।

অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন আমাদের রক্ষা কর্ত্তা ভাতও আমাদের প্রাণ রক্ষার প্রধান সহায়।

গোয়াল, বাইন্যা, কামার,
চাইব আনি চুরিতার,
সুতার বাড়ী দিলে কাঠ
আন্‌তে আন্‌তে জান্ ফাট্ (প্রাণ যায়

কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে বাড়ে পেট্
ঝাঁকা জিংলায় লতা বাড়ে, জলে বাড়ে ভেট্।

ভেট্—শাপলা ইহা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে।

মন্দ মূর্খ, মাতাল বৈদ্য, মিথ্যুক ভণ্ড জ্ঞানী
গণ্ডা গণ্ডা পুষ্কুর্ণির একটায়ও নাই পানি,
শোনা কথায় দোনা সাজা দেয় নাকি যেই গাঁয়,
দিন থাক্‌তে সেলাম দিও সেই গ্রামের পায়।
রাজার পুত পিয়ারী বিয়া কর্চ্ছেন ঝিয়ারী।

বিদ্রূপচ্ছলে বলা হয়।

দ্বিতীয়ার চান্ শুতিয়া দেখে।

শুতিয়া—শুইয়া।

দেবতার যেটা লীলা খেলা
মানুষের তাতে দোষ মেলা।
আর কয়টা দিন থাক বাছা,
দেখ্‌বে কয়জন সিধা চাচা।
তিন দিনের যুগী,
ভাতেরে কয় অন্ন।
আগে দেয় না দুধটুক,
শেষে দেয় গাই বাছুর।

যাহারা দুষ্ট কৃপণ, তাহারা সামান্য আয়ের জন্য শেষটায় পস্তায় এবং বাধ্য হইয়া বেশী খরচ করে।

বাচাল, বৈতাল, বেকুব, বদ্‌মাইস্
শুনবে না এদের কোন ফরমাইস্।
পান্ খাইকা চূণ হইলেই সর্ব্বনাশ !
আম হইল রস, কাঁটালে কোষ,
এতদিনে পানি খাউরীর মার্গের দোষ।

কার্য্যসিদ্ধি হইলে অনেকেই সামান্য অজুহাতে উপকারকের কাছ হইতে সরিয়া পড়ে।

হাতে পাঞ্জি মঙ্গলবার।
পরের আশা, গাং পার বাসা।

পরের উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকা ভাল নয়।

বেলের চাঁড়,
কাউটার নাড়।
ছোট বউ পেটে ডাঙ্গর।

ডাঙ্গর—বড়।

গাঁজা, গেরুয়া, গোঁফদাড়ী,
তিন "গ" এই সাধু ভারি।
নিতায় খাই নিমন্তনে না।

অনেকে নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়া পাচক ঠাকুরের হাতে খাইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ জল, আতপ অন্ন না হইলেও চলে, কিন্তু নিমন্ত্রণে গিয়া স্বপাক, ব্রাহ্মণ জল, আতপ অন্নের জন্য আব্দার করেন। পাচকের হাতের ভাত খান না, কিন্তু ডাইল, তরকারী অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে সব স্থানে দুই ব্যবস্থা এ সব স্থলে এ প্রবাদ চলে।

হাটবারে পাঠ নাই, নিতাবারে তথা।

যে দিন গ্রামে হাট বসে বা যে দিন নিমন্ত্রণ থাকে সে দিন আর পড়া কিসের ?

কম তশীলে গাঁও উজার।

তহশীলদার গাফিলি করিলে প্রজারা তাহাকে বড় "আমল"ই দেয় না।

হাতেগোতে পয়সা নাই,
কোঁছ ঝাড়ে সতরবার।

হাতেগোতে—কোনও কালে।

থাকতে দিছে ছিঁড়া চাটী,
মইলে দিব শীতল পাটী।

বিদ্রূপ উক্তি।

জাইন্যা ভাসুরের নাম,
বউএ করে উদ্‌রাম।

উদ্‌রাম্—না জানার মত ভাব প্রকাশ।

দেবতায় খাইলে সিদ্ধি মানুষে ভাং।

এম্‌নে না হেম্‌নে ক'রে,
যেম্‌নে তেম্‌নে পেট ভরে।

কতকগুলি কার্য্য, সময় পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন গুরুপুরোহিতকে যে জমি দেওয়া হয় তাহা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, ভোগোত্তর ইত্যাদি, আর নাপিত, ধোপা প্রভৃতি যে জমি ভোগ করে তাহা "নান্‌কার"। কর্ম্মচারী বেতনের উপর যা রোজগার করেন তাহা "উপরি", তহরী ইত্যাদি। চাকর হাট করিয়া যাহা বাঁচায় তাহা চুরি ! শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে লৌকিকতা বা প্রণামী গ্রহণ না করিয়া,

ব্যবসা বা কার্য্য বিশেষের পুরস্কার গ্রহণ করার নাম কর্ত্তার ভালমানুষী ইত্যাদি।

জয়কালে ক্ষয় নাই

মরণকালে অসুখ নাই।

উন্নতির যখন সময় আসে তখন, কোনও প্রতিবন্ধকই আটকাইয়া রাখিতে পারে না। আর যখন অদৃষ্ট মন্দ হয় তখন আর কেউ সামলাইতে পারে না।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শতঘ্নী ও একঘ্নী।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই শতঘ্নী নামক অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে একঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ আছে। শতঘ্নী শব্দে শত ব্যক্তির এবং একঘ্নী শব্দে এক ব্যক্তির হননকারী বুঝায়। এই জন্য কেহ কেহ শতঘ্নীকে কামান ও একঘ্নীকে বন্দুক মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। আবার কেহ কেহ এইরূপ গর্ব্বকারীগণকে বিদ্রূপ করিয়া কবিতাও লিখিয়া থাকেন। ১৩৩২ সনের জ্যেষ্ঠ মাসের সৌরভে, শতঘ্নী যে কামান নহে, তাহা আমি প্রতিবাদ স্বরূপে কিঞ্চিৎ দেখাইয়াছি। এই প্রবন্ধে উভয় অস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কামান ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রদ্বারা এক সময়ে শত শত্রুকে বধ করা যায় না, বিশেষতঃ ইহা নগর প্রাচীরের উপর স্থাপিত থাকিত, অতএব শতঘ্নী কামান, এইরূপ একটা দুর্ব্বল অনুমান ব্যতীত শতঘ্নীকে কামান মনে করিবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। রামায়ণের অনেক স্থানেই শতঘ্নীর উল্লেখ আছে; কিন্তু উহা কিরূপ আকারের অস্ত্র, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। শূল, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রের সহিত উহার উল্লেখ থাকায়, বিশেষতঃ এক স্থানে শতঘ্নীর বিশেষণ স্বরূপে শিত (তীক্ষ্ণ) শব্দের ব্যবহার থাকায়, এই অস্ত্র যে কামান নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তৎপর লঙ্কাকাণ্ডে আছে, রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের অভিপ্রায়ে রাক্ষসেরা তাঁহার অঙ্গে নানাপ্রকার অস্ত্রের আঘাত করিয়াছিল। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরে বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রের আঘাত করে। তন্মধ্যে শতঘ্নীরও নাম আছে। যথা,

রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্ব্বশঃ।

বধ্যমানো মহাকায়ো নাববুধ্যত রাক্ষস॥ ৫৪। ৬। ৬০

অনুবাদ—রজ্জুবদ্ধা শতঘ্নীসমূহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করা সত্ত্বেও সেই মহাকায় রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

এখানে শতঘ্নী হইতে নিঃসৃত গোলা বা অন্য কোন অস্ত্রে নহে, শতঘ্নীদ্বারাই আঘাত করা হইয়াছিল। অতএব, শতঘ্নী যে কামান বা তৎসদৃশ কোন আগ্নেয়াস্ত্র নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ১৭২ অধ্যায়ে আছে—

পতন্ত্যবিরলাঃ শূলা শতঘ্ন্যঃ পট্টিশাস্তথা। ৪০ সংখ্যক শ্লোক।

অনুবাদ—শূল শতঘ্নী পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র অবিরত পতিত হইতে লাগিল।

উক্ত পর্ব্বের ১৭৭ অধ্যায়ে চারি স্থানে শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। ২৭ সংখ্যক শ্লোকে আছে—হেমপট্টাবনদ্ধাঃ শতঘ্ন্যশ্চ প্রাদুরাসন্ সমন্ততঃ—পূর্ব্ব বাক্যের সহিত যোগ করিয়া এই বাক্যে, রাক্ষসী মায়ায় বহুসংখ্যক শতঘ্নীর একত্রে আবির্ভাব বুঝাইতেছে। তৎপর ৩৬ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্দ্ধ—বজ্রৈঃ পিনাকৈরশনিপ্রহারৈঃ শতঘ্নিচক্রৈর্ম্মথিতাশ্চ পেতুঃ। অর্থাৎ বজ্র পিনাক প্রভৃতি অস্ত্রের প্রহারের ও শতঘ্নিচক্রে মথিত হইয়া সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। এই বাক্যে শতঘ্নী একটি প্রকাণ্ড অস্ত্র এবং চক্র সহযোগে চালিত হওয়া বুঝায় এবং সেই চক্রের নিষ্পেষণে সৈন্যগণ মথিত হওয়াও বুঝায়। ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে, শূল ভূষণ্ডি শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র পতিত হইতেছে, লেখা আছে। তৎপর ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে পুনরায় চক্রযুক্তা শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহাভারতের প্রমাণেও শতঘ্নী শব্দ কামান না বুঝাইয়া অন্য আকারের প্রকাণ্ড অস্ত্র বুঝায়। এই সকল প্রমাণেও যদি পাঠকের মনের সন্দেহ দূর না হইয়া থাকে তবে রঘুবংশের একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বাদশ সর্গে আছে—

অয়ঃসঙ্কুচিতাং রক্ষ শতঘ্নীমথ শত্রবে।

হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূটশাল্মলীমক্ষিপৎ।

রাঘবঃ রথমপ্রাপ্তাং তামাশাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।

অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীসুখম্।

অনুবাদ—রাক্ষস (রাবণ) যমের নিকট হইতে অপহৃত লৌহকীলবৃত কূটশাল্মলীবৎ শতঘ্নী নামক অস্ত্র শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র রথপর্য্যন্ত না পৌঁছিতেই রাঘব অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণসমূহ দ্বারা তাহা অনায়াসে কদলীর ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই সঙ্গে সুরবৈরীগণের জয়াশা ও ছেদন করিলেন।

এখানে রামের বাণে শতঘ্নী খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। আর প্রমাণ অনাবশ্যক।

এখন একঘ্নীর কথা। এই অস্ত্র একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না; কিন্তু এক ব্যক্তিকে হনন করিবেই। বন্দুকের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই, বন্দুকের একবার আওয়াজে একাধিক প্রাণী আহত হইতে পারে; এবং এক প্রাণীও নিহত না হইতে পারে। অপিচ তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একঘ্নী অস্ত্র একবারের অধিক ব্যবহৃত হইতে পারে না। মহাভারতে এক স্থানেই এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের নিকট এই অস্ত্র পাইয়া কর্ণ তাহা অর্জ্জুনের বধের জন্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন নৈশযুদ্ধে রাক্ষসী মায়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেই অস্ত্রের আঘাতে রাক্ষস ঘটোৎকচকে নিধন করেন। সেই অস্ত্রে ঘটোৎকচ নিহত হওয়াতে অর্জ্জুন নিঃশঙ্ক হইলেন, এরূপ উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থানেই আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই অস্ত্র একাধিক বার ব্যবহৃত হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক, এই অস্ত্রের আকৃতি ও প্রয়োগ কিরূপ। নিশাকালে ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কুরুগণ কর্ণকে বলিলেন, শক্ত্যা রক্ষঃ জহি কর্ণাথ—দ্রোণপর্ব্ব, ১৭৭ অধ্যায়, ৪৮ সংখ্যক শ্লোক। অনুবাদ—কর্ণ শক্তি দ্বারা রাক্ষসকে বিনাশ কর। পুনরায় ৫০ সংখ্যক শ্লোকে আছে—রাক্ষসং ঘোররূপং শক্ত্যা জহি ত্বং দত্তয়া বাসবেন। অর্থাৎ, ইন্দ্র তোমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার প্রহারে এই ঘোররূপ রাক্ষসকে বিনাশ কর। তৎপর ৫২, ৫৩, ৫৪ সংখ্যক শ্লোকে আছে—কর্ণ তাহার বিনাশেচ্ছু হইয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন। যে অস্ত্র বহু বর্ষ যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জুনবধের জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র যাহা কর্ণকে দিয়াছিলেন, উল্কার ন্যায় জ্বলিতা, মৃত্যুর ভগিনী, যমের জিহ্বার ন্যায় সেই শক্তি রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এখানে "উল্কার ন্যায় জ্বলিতা" শব্দে, এই অস্ত্রকে বন্দুকের গুলি মনে করাও যাইতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে আছে—দৃষ্টা শক্তিং কর্ণবাহ্বন্তরস্থাং নেদু ভূতান্যন্তরীক্ষে। অর্থাৎ কর্ণের বাহুর অন্তরস্থ সেই শক্তি দেখিয়া আকাশে ভূতগণ নিনাদ করিতে লাগিল—এখানে, কর্ণের বাহুর অন্তরে বন্দুকের জ্বলিত গুলি থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উজ্জ্বল দীপ্তিময় চাকচক্যশালী কোন অস্ত্র কর্ণের হাতে ছিল, তাহাই বুঝাইতেছে। তৎপর ৫৭ সংখ্যক শ্লোকে আছে—সা তাং মায়াং ভস্মীকৃত্বা জ্বলন্তী ভিত্ত্বা গাঢ়ং হৃদয়ং রাক্ষসস্য। ঊর্দ্ধং যযৌ দীপ্যমানা নিশায়াং নক্ষত্রাণামন্তরাণ্যাবিবেশ—অর্থাৎ সেই শক্তি রাক্ষসী মায়া ভস্ম করিয়া রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে ভেদ করিয়া রাত্রিকালে ঊর্দ্ধদেশে নক্ষত্রমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করিল। এ সকল কথা যে কল্পিত, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইন্দ্রের নিকট একঘ্নী শক্তি পাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কথাই আগাগোড়া কল্পনা। আমার বক্তব্য এই যে, বন্দুক কামান বা তৎসদৃশ কোন যন্ত্রের নলের ভিতর হইতে বাষ্পের বলে গুলি বা অন্য কোন অস্ত্রের নিঃসরণ তৎকালের লোকের মনে কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে রামায়ণের যুদ্ধে গাছ পাথরের এত ছড়াছড়ি, এবং মহাভারতের যুদ্ধে গদার এত প্রাধান্য বর্ণিত হইত না।

এই শক্তি একঘ্নী বা অমোঘ বলিয়া এই অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। কিন্তু অন্যত্র তাহা আছে। ১৮২ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের পরেই আছে—

যদি জানীথ তাং শক্তিং একঘ্নীং সততং রণে।
অনিবার্য্যামসহ্যাঞ্চ দেবৈরপি মরামরৈঃ॥
সা কিমর্থন্ত কর্ণেন প্রবৃত্তে সমরে পুরা।
ন দেবকীসুতো মুক্তা ফাল্গুনে বাপি সঞ্জয়॥

এখানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—হে সঞ্জয়, এই শক্তি একঘ্নী ও অমোঘ বলিয়া জানা থাকিলে কর্ণ কি জন্য যুদ্ধের প্রথমেই তাহা কৃষ্ণ বা অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করেন নাই? এই কথার উত্তর মহাভারতে এইরূপ আছে যে, কর্ণ প্রত্যহই এই অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে বধ করিব, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া যুদ্ধে যাইতেন, কিন্তু পরে কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া

তাহা অর্জ্জুনের প্রতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একথারও উত্তর আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অতি অল্পকাল পূর্ব্বে বিরাটের গোগৃহে কুরুসৈন্যের সহিত একা অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেখানে কৃষ্ণ ছিলেন না। তথাপি কর্ণ এই অস্ত্রের ব্যবহার করেন নাই।

একঘ্নীকে বন্দুক মনে করিলে আরো অনেক কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। কর্ণকে একটি বন্দুক দেওয়ার পরেও সেই অস্ত্র ইন্দ্রের নিকট আরো অনেক ছিল, মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আদিপর্ব্বে খাণ্ডব দাহনের আখ্যায়িকায় অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতার যে ঘোর যুদ্ধের বর্ণনা আছে, সেই যুদ্ধে ইন্দ্র তাঁহার বীর্য্যসর্ব্বস্বভূত প্রধান অস্ত্র বজ্র বিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরেও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা বহুক্ষণ যুদ্ধ করেন। তাঁহার নিকট বন্দুক থাকিলে কেন তিনি তাহার ব্যবহার করিলেন না, উহার কোন কারণ দেখা যায় না। সকল কথা একত্র করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই বুঝায় যে, ইন্দ্রের নিকট একঘ্নীশক্তি একটিই ছিল, এবং তাহা তিনি কর্ণকে দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অন্য এক দিক দিয়াও এ কথার আলোচনা করা যাইতে পারে। বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্র এখন যত ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক, প্রথম ব্যবহৃত হওয়ার সময়ে সেরূপ ছিল না। স্কটলণ্ডে প্রিষ্টন নামক স্থানের যুদ্ধে রাজপক্ষে কামান ছিল, কিন্তু বিদ্রোহী হাইল্যাণ্ডর গণ অসি প্রহারে ইংরেজ সৈন্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। হাইল্যাণ্ড পক্ষেও একটিকামান ছিল, তাহা কেবল বিজয় ঘোষণা করার জন্য সঙ্গে টানিয়া আনা হইয়াছিল; যুদ্ধে উহা ব্যবহৃত হয় নাই। ভারতবর্ষে পানিপথ ও শিক্রির যুদ্ধে বাবরের সঙ্গে কামান ছিল; কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন, যুদ্ধ জয় ঐ কামানের প্রভাবে হয় নাই, বাবরের রণ কৌশলেই হইয়াছিল। কামান কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিবার জন্যই আনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তৎকালে কামান বন্দুক ও তীর সমভাবেই ব্যবহৃত হইত। এই দুইযুদ্ধের অনেক পরে সম্রাট আকবরের সময়ে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে মোগল পক্ষে কামান ছিল; তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যাও বিপক্ষের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, রাজপুত পক্ষের প্রধান অস্ত্র তীর, বর্শা ও তরবারি, তথাপি যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়াছিল। ইহারও পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ সময়ে একদা রাজ্ঞী নুরজাহান স্বয়ং সেনানীত্ব গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহী সেনাপতি মহব্বত খাঁ বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যুচ্চ মাতঙ্গপৃষ্ঠে পরিস্তোমের অভ্যন্তরে আসীন ছিলেন, ক্রোড়ে তাঁহার অল্পবয়স্কা দৌহিত্রী শায়িত ছিল। বিপক্ষ পক্ষ হইতে একটা তীর আসিয়া তাঁহার দৌহিত্রীর গাত্রে বিদ্ধ হয়, এবং তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া হটিয়া আসেন। এই সকল ঘটনায় জানা যায় যে বন্দুক প্রথম ব্যবহৃত হওয়ার অনেক পরেও তীর ও বন্দুকের ব্যবহার সমভাবেই চলিয়াছিল। বন্দুক এখনকার ন্যায় সাংঘাতিক হইলে তাহার সহিত তীরের প্রতিযোগিতা কখনই সম্ভব হইত না। কর্ণ যে অস্ত্র যত্ন পূর্ব্বক বহুবর্ষ অর্জ্জুন বধের জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা প্রকৃত হউক আর কল্পিতই হউক, উহা নিশ্চয়ই তীর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কোন অস্ত্র এবং উহা কখনই বন্দুক হইতে পারে না।

মহাভারতের অন্য কোথাও একঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ নাই। অন্য কোন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে। রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় বা রামায়ণের অন্য কোন স্থানেও একঘ্নী শব্দ নাই।

উপসংহারে নিবেদন, প্রাচীন ভারতে নানা বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেগুলি ধীর গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে, প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ গৌরব বৃদ্ধির জন্য লোকের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে পারে। তাহা না করিয়া যাহা আমাদের ছিল না, তাহা লইয়া বৃথা গোলযোগ ও চীৎকার করিলে যাহা প্রকৃত পক্ষে ছিল, তৎপ্রতিও লোকের মনে অনাস্থা জন্মিয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

——:•:——

সার্থক।

(১)

তাপিত বুকের গোপন কথা,
লিখে যে জন চোখের জলে ;
সেই ত কবি, বাণীর সাধক,
ব্যথা যাহার ছন্দে গলে।

(২)

চিত্রকরের সেই ত সেরা,
পরাণ যেথা পরশ মাগে ;
তুলি ধরা ধন্য তারই,
লাঞ্ছিতেরে বুকে জাগে।

(৩)

সেই ত গায়ক তারেই বলি,
আকাশ ভরে করুণ গানে ;
দুখীর যত দরদ গাঁথা,
সেই ত ছড়ায় বিশ্ব-প্রাণে।

(৪)

মানুষ বলার তারই দাবী,
মলিন মুখে হাসি ফুটায় ;
সেই ধনেরই সার্থকতা,
যে ধন লাগে আর্ত্ত-সেবায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অপরাধ

(১)

রাত্রি ১২টায় জমিদার বাটীর এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া করিম যখন আদিষ্ট হইল যে কোন এক গভীর নিশীথে, তাহাকে শান্তিপুরের দত্তদের বাড়ী আগুন ধরাইয়া আসিতে হইবে, তখন হৃদয়টা তার মর্ম্মপীড়ায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। দুই গ্রামের বড় লোকদের ভিতর বিরোধ বাঁধিয়াছে তাতে তাকে এ বীভৎস কাজে নিযুক্ত করা কেন? সামান্য একজন দরিদ্র প্রজা বলিয়া কি তার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার অধিকার নাই? জমিদারের পশুপ্রবৃত্তির সহায়তা করাই কি প্রজার বড় কাজ!—এ অত্যাচার অসহ্য। সমস্ত হৃদয়ের আবেগ নিয়া করিম সুধীর বাবুর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; কার্য্য সাফল্যের পুরস্কার সেই দরিদ্র্য পীড়িত জীবনকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; জমিদার ও দেওয়ানজীর অন্যায় ভয় প্রদর্শনে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল তিনদিনের ভিতর কোন এক শুভক্ষণে সে এ কাজটা করিয়া আসিবে।

বাড়ীর পথে এ সত্যটা তার খুব মর্ম্মপীড়ার কারণ হইল যে আপন বিবেক বুদ্ধি পরিচালনে ভালমন্দ ভাবিয়া কাজ করিতেও সে অসমর্থ। গ্রামের প্রান্তে একটী দীন কুটীরে স্ত্রী ও কয়েকটী সন্তান নিয়া সে কায়ক্লেশে জীবনটাকে বহিয়া চলিয়াছিল ইহাই ছিল তার শান্তি; অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া জমিদারের দয়ায় আপন স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের স্বপ্নও সে কখনও দেখে নাই তবে আজ তার উপর ভগবানের এ রোষ.ঘাত কেন? গভীর রাত্রে একজনের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া কাজটা কি ভীষণ! মনে মনে সে চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া করিম শিহরিয়া উঠিল, মাথাটা এক নিমিষে ঘুরিয়া গেল আজ সে প্রথম উপলব্ধি করিল দারিদ্র্য সংসারের বড় অভিশাপ।

(২)

গভীর রাত্রে তিনদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও করিম সফলকাম হইতে পারিল না। প্রতিদিন সে দৃঢ়-সঙ্কল্প আগুন লাগাইবেই, কিন্তু দত্তদের বাড়ী উপস্থিত হইতেই তার দৃঢ়তা এক নিমিষে ভাসিয়া যাইত। কার্য্যের বীভৎসতা ও অহেতুকতা স্মরণ করিয়া যে এমনি অভিভূত হইয়া পড়িত যে আপনার ভিতর আর এতটুকু শক্তিও খুঁজিয়া পাইত না।

চিরদিন দুঃখ দারিদ্রের ভিতর দিয়া লালিত পালিত হইয়া এতদিন সে নিজকে কঠিন প্রাণ বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, আজ এই দুর্ব্বলতার মাপ কাটীতে আপন হৃদয়ের কোমলতার পরিমাপ করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল।

এইরূপে অনন্যোপায় হইয়া করিম জমিদারের হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিল না। অদূর ভবিষ্যতে

এক ভীষণ লাঞ্ছনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সে উদ্বিগ্ন মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সামান্য একটা প্রজার এতদূর বেয়াদবি জমিদারের কাছে উপেক্ষিত হইল না। যথা সময়ে পাইক আসিয়া যখন বাবুর নৈশ আহ্বানের কথা জানাইল, তখন অজানিত ভয়ে যূপকাষ্ঠগামী ছাগের ন্যায় করিমের ফিরিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইল। সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যার জন্য তাহাকে একটা ভয়াবহ পরিণামকেও বরণ করিয়া লইতে হইবে? কিন্তু ইহাতে অপরাধের গুরুত্ব বৃদ্ধি ব্যতীত আর ও কিছু লাভ নাই। সে জমিদারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অক্ষমতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাই সমিচীন বিবেচনা করিল।

সুধীর বাবু ও দেওয়ানজী উদ্বিগ্ন ভাবে করিমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে উপস্থিত হইতেই তাহাদের চোখ মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণের জন্য কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভয়ে ও হতাশায় করিমের গাত্রকম্প দেখা দিল; দেওয়ানজী যখন সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জমিদারের আদেশ উপেক্ষা করার মত তার কি কারণ ছিল, তখন সে সবিনয়ে তার হৃদয়ের—দুর্ব্বলতার কথা জানাইল। কিন্তু এই সরল সত্যকথাটা হিংস্র বাবুদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইল না। তাহারা ইহাকে ছোটলোকের তাজা বুকের আস্পর্দ্ধা বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রভুশক্তি অমান্য করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন।

মানুষ যখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করে তখন চারি দিকের অনুকূল আবহাওয়ার ও প্রভুত্বের গর্ব্ব তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলে যে অন্ধকারের অন্তরালে আলোক লুকাইয়া থাকিলে সে চিনিতে পারে না। ক্ষমতার মদিরা তাকে অন্ধ করিয়া রাখে আর সে সম্মুখের দীনহীন-নিরীহদের পদদলিত করিয়া শক্তির অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। সুধীর বাবু ছিলেন ঠিক এই ধরণের লোক। তুচ্ছ এক ক্ষুদ্র প্রজার এতদূর বেয়াদবি তিনি আর এক মুহূর্ত্ত সহ্য করিতে পারিলেন না। নিকটেই দুইজন সবল দেহ হিন্দুস্থানী দারওয়ান অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি তাদের দিকে এক পৈশাচিক ইঙ্গিত করিয়া এ অপরাধের সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

শেষরাত্রে করিমের স্ত্রী পায়চারির শব্দে ঘরের বাহির হইয়া দেখিল ক্ষতবিক্ষত ও মূর্চ্ছিত করিমকে রাখিয়া কতকগুলি লোক ছুটিয়া যাইতেছে।

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়।

সমালোচনা

বিষ চিকিৎসা— শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা। এই পুস্তকখানির পরিচয় দিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইহা একখানি অমূল্য রত্ন; প্রায় বিনা মূল্যে এই রত্ন বিতরিত হইতেছে।

এই দেশে বহুলোক সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে, এবং শৃগাল কুকুর প্রভৃতির দ্বারা আহতের সংখ্যাও কম নয়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই সব চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি সুদীর্ঘকাল সহস্র সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া সফলতালাভ করিয়াছেন। এ সব দেশীয় চিকিৎসা একরূপ গুপ্ত বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল। এবং অতি গোপনের ফলে বহু দুর্লভ ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এই অমূল্য ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া স্বীয় উদারতা প্রদর্শন ও সর্ব্বসাধারণকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে লিখিত প্রায় সব ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ও সুপরীক্ষিত। এই জন্যই ইহার মূল্য বেশী। তারপর ইহাতে গোঁড়ামি নাই। তিনি আধুনিক ডাক্তারি কোন কোন ঔষধ প্রয়োগের কথা লিখিয়াছেন। যে স্থলে ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন সে স্থলে তিনি ডাক্তার ডাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। যে সব ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে তাহার সহিত দেশীয় ওঝাগণের চিকিৎসার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার গবেষণা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আর বইখানা এমন প্রাঞ্জলভাবে সুপ্রণালীতে লিখিত যে সাধারণ বাঙ্গালা জ্ঞান থাকিলেই যে কেহ ইহা দ্বারা চিকিৎসা করিতে পারিবে।

মোটের উপর ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের দংশনে বা সর্প দংশনে এই গ্রন্থখানা অকৃত্রিম সুহৃদ। পঞ্জিকার ন্যায় প্রতি ঘরে ঘরে ইহার একখণ্ড রাখা উচিত। ইহাতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গৃহস্থেরপক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

সন্ধ্যাক্ষ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা। একখানি হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ। লেখক ধর্ম্মপ্রাণ—পরমব্রহ্মের ধ্যানে লেখকের মনে যে সব ভাবতরঙ্গের উদয় হইয়াছে তাহা তিনি সন্ধ্যায় স্থান দিয়াছেন। চিন্তা কণিকাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মন স্বতঃই কল্প লোকের দিকে অগ্রসর হয়। লেখার ভিতরে কোনও সাম্প্রদায়িকভাব নাই। সংসার তপ্ত মানুষ এ গ্রন্থ পাঠ করিলে ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ পাইবেন এবং সৎ-সঙ্গলাভের সুযোগ পাইবেন। ইহাতে কয়েক খানা ছবিও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিকার ও শিকারী—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই শ্রেণীর সুখ পাঠ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার থাকিলেও বাংলা সাহিত্যে যে এরকমের বহির একান্ত অভাব তাহা বলাই বাহুল্য। বাংলা দেশে কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর হইয়া গল্প ও উপন্যাসের অপরূপ প্রাসাদ রচনা করা যতটা সহজ সাধ্য, আয়াস-লব্ধ পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রম-সাপেক্ষ গবেষণার প্রাচুর্য্য তত নহে। তাই এই শ্রেণীর লেখার সহিত বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের খুব বেশী পরিচয় নাই। এ দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই "মৃগয়ার" অভিযান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিবার প্রথা এতদিন মৃগয়াসক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্যের বাহিরেই ছিল। প্রতীচ্যের অনুকরণে আজ সাহিত্যের দিকটায় ও অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে; আশার কথা সন্দেহ নাই।

বিষয় বৈচিত্র্যে ও লিপিচাতুর্য্যে যাহার রচনা সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল, তিনি আমাদের ময়মনসিংহের গৌরব পরলোকগত মহারাজ সূর্য্যকান্ত। তাঁহার শিকার কাহিনী দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ও "মৃগ ও মৃগয়া" নামক একখানা গ্রন্থের প্রচার করেন।

এইবার আমরা মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের "শিকার ও শিকারী" পাঠ করিয়া তেমনি অপার আনন্দলাভ করিয়াছি। কমলার বরপুত্র হইয়াও লেখক বনে, জঙ্গলে, কান্তারে, প্রান্তরে অশেষ কষ্টসহ্য করিয়া যে অসীম সাহস ও অপূর্ব্ব শ্রম কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ধনীর দুলালদের অনুকরণ যোগ্য। আবার তাঁহার সে সব বিচিত্র শিকার কাহিনী এমনি মনোরম ভাষায় উপহার দিয়াছেন যে, প্রেমের উপন্যাস পাঠ নিরত পাঠকের মনের অরুচি কাটিতে একটুও দেরী হয় না। লেখক স্বাভাবিক বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থসূচনায় আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি লিপিকুশলতায় তাহার পুস্তক যে যুবক-বাঙ্গলায় সমাদর লাভ করিবে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল। তবে মূল্যটা আর একটু কম হইলে মন্দ হইত না।

ভরসা করি "শিকার ও শিকারী"ই যেন লেখকের সাহিত্য চর্চ্চার শেষ নিদর্শন না হয়। তাহার প্রচুর অবসর সাহিত্য-সাধনার কনক কুসুমে বিকশিত হইয়া উঠুক এই আমাদের কামনা।

বিরহ

বিরহ ভালবাসি বিরহ সুধু চাই!
মিলন দূরে থাক্ মিলনে কাজ নাই!
বিরহ আঁখি নীরে, শিশির হাসে ধীরে,
এমন মধুরতা মিলনে কোথা পাই?
বিরহ ভালবাসি—বিরহ সুধু চাই!
আকাশে চেয়ে থাকি, চাতক হয়ে ডাকি,
মেঘের গুরু গুরু শ্রবণে শুনি তাই!
চকোর হয়ে, উড়ি,—বেড়াই ঘুরি ঘুরি,
সুদূরে চাঁদ হাসে নয়ন মেলে চাই।
বিরহ ভালবাসি মিলনে কাজ নাই!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

গুণে গন্ধে গরিমায়

সকল কেশতৈলের শ্রেষ্ঠ

=কারণ=

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও চুলগুলিকে খুব কালো করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=রাত্রে সুনিদ্রার সহায়তা করে। চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করে।

কে—শ—র—ঞ্জ—ন=মহিলা কুলের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে মুখখানিকে সুন্দর করে।

আজই কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা, ডাকব্যয় সাত আনা।

ঠিক করিয়া বলুন দেখি আপনার এই সমস্ত উপসর্গগুলি হইয়াছে কি না ?

(১) আপনার কি নিত্য মাথাধরে ? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় না ?

(২) একটু মানসিক শ্রম করিতে গেলে আপনি কি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়েন ?

(৩) আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধার অল্পতা, কার্যে অনাসক্ত এগুলো আছে কিনা ?

(৪) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা দেখা দিতেছে কিনা ?

তাহা হইলে—

আজ হইতে আমাদের "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করুন। এক সপ্তাহেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি চলিয়া যাইবে। আপনি সবল ও সুস্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম হইবেন।

প্রতি শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকব্যয় দশ আনা

কবিরাজ—নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮। ১ এবং ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কবিরাজ শক্তিপদ সেন।

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেসে—সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh—Reg. No. C. 745.

কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ ১৲

ময়মনসিংহের ইতিহাস ১॥০

ঢাকার বিবরণ ১॥০

সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ॥০

সাময়িক সাহিত্য ৩৲

রামায়ণের সমাজ ৪৲

চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ।৶০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷৹

"লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲

ব্রতকথা ৷৹

শৈব্যা ।৶০

মতরম ॥০

কালের ডায়রী (সচিত্র) ৷৹

রংকথা (যন্ত্রস্থ)

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক

স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদারের

বিগত সিকি শতাব্দীর গবেষণার ফল

"রামায়ণের সমাজ"

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে রামায়ণী যুগের যাবতীয় আলোচনা, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ৪॥০ টাকা।

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস।

পঞ্চদশ বর্ষ। পৌষ—১৩৩৪ দ্বাদশ সংখ্যা।

সচিত্র মসিক পত্র ও সমালোচনা।

রামায়ণের সমাজ

সম্বন্ধে

আনন্দ বাজারে অভিমত

ময়মনসিংহের "সৌরভ" সম্পাদক এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুপণ্ডিত কেদার বাবুর জীবনব্যাপী সাধনার ফল "রামায়ণের সমাজ"। প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগের সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, লোকব্যবহার আলোচনা করিতে গিয়া তিনি হিন্দুর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণ-কথা মন্থন করিয়া যে অমৃত বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রগাঢ় বিচারশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বহুকাল বিরাজিত থাকিবে। এই গ্রন্থ সমালোচনা করিতে যে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক, আমাদের তাহা নাই; অতএব সমালোচনার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব না। কেবল বলিব, জাতীয় অতীত গৌরব সম্বন্ধে অজ্ঞ হিন্দুর ঘরে ঘরে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পঠিত ও আলোচিত হউক। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব স্মরণ করিয়া হিন্দু বর্ত্তমান পঙ্কশয্যা হইতে উত্থিত হউক।

ময়মনসিংহ, সৌরভ প্রেস হইতে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাক মাশুল সহ— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বায়রার বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম স্বর্গীয় ডাক্তার **অমরচন্দ্র দাশ গুপ্তের** ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত আবিষ্কৃত ও সহস্র সহস্র রোগীর পরীক্ষিত ও প্রশংসিত অতি উত্তম রক্তপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক

চন্দ্রোদয় সালসা।

ইহা দূষিত রক্তজনিত সমস্ত পীড়ায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, গমী, পারার দোষ, খুজলী, পাঁচড়া, নালী ঘা, বাও, বাঘা, স্ত্রীলোকদিগের রক্ত ও শ্বেত প্রদর, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অতীব উপকারী। বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া থাকি। মূল্য বড় বোতল ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা, ১ সপ্তাহের সেবনোপযোগী প্রতি শিশি ঘন সারাংশ ১৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

অমর ঔষধালয়

ডাক্তার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

পোঃ বায়রা (ঢাকা)

ডাক্তার বাটলীওয়ালার

৪৪ বৎসরের বিখ্যাত ঔষধাবলী।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনা সমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

বাটলীওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও রুগ্ন শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক। মূল্য ৸৵০

বাটলীওয়ালার "কলেরার ডাইরিয়ার মিক্শ্চার" ওলাউঠা উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য। মূল্য—৸৵০

বাটলীওয়ালার এগুপিলস, সকল জ্বরের মহৌষধ ১৷৵০

বাটলীওয়ালার খাঁটী কুইনাইনের একগ্রেন ও দুইগ্রেন একশত টেবলেটের শিশি ১৷০ ও ১৸০

বাটলীওয়ালার এগুমিক্শ্চার ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ ১৵ ও ৸০

বাটলীওয়ালার টনিক পিল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতার মহৌষধ মূল্য—১৷০

বাটলীওয়ালার দন্তমঞ্জন দাঁতের পীড়া ও দন্তরক্ষার উৎকৃষ্ট ঔষধ মূল্য—।৵০

বাটলীওয়ালার দাদ খোস পাঁচরা প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ।৵০

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়!

ডাঃ এইচ, বাটলীওয়ালা এণ্ড সন্স কোং লিঃ,

দায়ানী রোড, পোঃ ক্যেডেল রোড, বোম্বে, নং ১৪

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"কাউয়াসাপর" বোম্বে।

সৌরভের নিয়মাবলী।

১। মাঘ হইতে সৌরভের বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে মাঘ হইতে কাগজ লইতে হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

২। সৌরভের বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতি মাসে		…	৭৲
„ ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	…	৪৲
„ ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	„	…	৩৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	„	…	১২৲
„ ৩য় পৃষ্ঠা	„	…	১০৲
„ ৪র্থ পৃষ্ঠা	„	…	১৫৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	…	৮৲
সূচীপত্রের নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	„	…	৫৲

অগ্রিম টাকা দিলে টাকায় ৵০ আনা কম পড়িবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

কর্ম্মকর্ত্তা, সৌরভ—ময়মনসিংহ।

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

মর্ম্মগাথা—।৵০ আনা, হাসির হল্লা—।৵০ আনা, ছায়াপথ—৸০ আনা, রামধনু ১৲।

গ্রন্থকার—গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স

অতি চমৎকার রক্ত পরিষ্কারক

শরচ্চন্দ্র সালসা

সকল ঋতুতেই প্রয়োজ্য এবং বাধা বাধি নিয়ম নাই। ইহা সেবনে অতি সহজে গর্ম্মি, পারার দোষ, নানাপ্রকার বাত, বেদনা, বাধি, নালি ঘা, খুজলি, পাঁচরা, গায়ে চাকা চাকা ফুটিয়া বাহির হওয়া, সন্ধি স্থান ফোলা, হস্ত ও পদের কনকনানি প্রভৃতি যাবতীয় দূষিত রক্ত জনিত রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে শরীর সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ইহা নবজীবন প্রদান করে এবং শরীর সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১ ডিবা ২৲ টাকা একত্রে ৩ ডিবা ৫॥০ টাকা। তিন সপ্তাহ সেবন করিলেই রীতিমত উপকার পাইবেন।

স্পিরিট এসাফেটিডা—কলেরার অতি চমৎকার রোগনিবারক ও রোগনাশক মহৌষধ। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা সেবন করিলে রোগ কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারে না এবং রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা সেবনে রোগী কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহস্থের ১ শিশি করিয়া ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র।

ডাক্তার—সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এল-এম-পি

দাশ গুপ্ত মেডিক্যাল হল, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)

উপহারের

মণি-কাঞ্চন-সম্মিলন!

ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলী ও চিত্র-সাহিত্যের

অভিনব আয়োজন!!

ভারত-গৌরব
গ্রন্থাবলী

সুসাহিত্যিক
প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
প্রণীত ও সম্পাদিত

(১)
হরিদাস ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যযুগের ভক্তাগ্রগণ্য তথাকথিত যবন হরিদাস ঠাকুরের অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী—১৭৫ পৃঃ ৪খানা ছবি ছাপা ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। মূল্য—১৲ টাকা

(২)
সপ্তগোস্বামী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের আদিগুরু বৃন্দাবন-প্রবাসী গোস্বামীপাদ রূপ, সনাতন প্রভৃতি সপ্তগোস্বামীর জীবনবৃত্ত। ৩৭৫ পৃঃ ৬খানি ছবি স্বর্ণাক্ষরে কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য—২৲ টাকা।

ঈশাননাগর প্রণীত
(৩)
শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

অধ্যাপক মিত্র কর্তৃক সুদীর্ঘ ভূমিকা ও অসংখ্য টীকা টিপ্পনীসহ সম্পাদিত। ৩০০ পৃষ্ঠা

প্রত্যেক গ্রন্থই উপন্যাসের মত সরস অথচ বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্য্যে ভক্তি-রসসিক্ত মধুর ভাষায় লিখিত

(৪)
সচিত্র কৃত্তিবাসী
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সংস্করণ
মূল্য ৩৲ টাকা

চিত্র-সাহিত্য

সতীরাণী চিত্রে	১।০
সতীলক্ষ্মী চিত্রে	১।০
সতী চিত্রে	২।০
রামায়ণ চিত্রে	২॥০
ভারতনারী চিত্রে	২॥০
বর-কনে	২॥০
চন্দ্রশেখর চিত্রে	৩৲

পটুয়াটুলী
ঢাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।
Phone :—2812 B.B. Telegram :—Politeness, Cal,

আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম

কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ ১৲

ময়মনসিংহের ইতিহাস ১॥০

ঢাকার বিবরণ ১॥০

সারস্বত কুঞ্জ (গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস) ॥০

সাময়িক সাহিত্য ৩৲

রামায়ণের সমাজ ৪৲

চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প) ।৶০

উপন্যাস গ্রন্থাবলী

সমস্যা ১৷৹

লেখার গুণে গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হইয়াছে" আনন্দ বাজার

শুভ-দৃষ্টি ১৲

"একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস।" নায়ক।

স্রোতের ফুল ১।০

স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

আশীর্ব্বাদ (গল্প বই) ১৲

মধুরম ॥০

ব্রতকথা ৷৹

কালের ডায়রী (সচিত্র) ৷৹

শৈব্যা ।৶০

রংকথা (যন্ত্রস্থ)

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক

স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদারের

বিগত সিকি শতাব্দীর গবেষণার ফল

"রামায়ণের সমাজ"

প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে রামায়ণী যুগের যাবতীয় আলোচনা, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ৪॥০ টাকা।

Research House,
Mymensingh.

ম্যানেজার—
সৌরভ প্রেস

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত

"কালের ডায়রী"

(ঐতিহাসিক গল্প)

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রচলিত জনপ্রবাদ লইয়া চারিটী গল্প রচিত হইয়াছে।

প্রথম গল্প—কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের উত্থান পতনের কথা, ২য়—সুসঙ্গ রাজবংশের কথা, ৩য়—ইশা খাঁর কথা, ৪র্থ—দস্যু কেনারামের কথা।

যাঁহারা ইতিহাসকে উপন্যাসের ভাবে পড়িতে চান, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল। ইহাতে ২০ খানা হাফটোন চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

অভিমত—

"ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। আমরা পুস্তকটি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ময়মনসিংহের কীর্ত্তির কয়েক খানি ছবি থাকায় এইটী লোভনীয় হইয়াছে।"

প্রবাসী

ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পের মত লেখা, লেখা সরল বর্ণনার ভঙ্গী চমৎকার। কয়েক খানি প্রাচীন স্থানের চিত্র গ্রন্থ খানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থখানি কিশোর ও যুবকদিগের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে করি। স্কুলে এই শ্রেণীর বই পাঠ্য হওয়া উচিত। ছাপা ও কাগজ বেশ হইয়াছে।"

আনন্দ বাজার ৫ই অগ্রহায়ণ

"গ্রন্থকার ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসাকারে বহিখানা লিখিয়াছেন। অনেকগুলি ছবি সন্নিবেশিত থাকায় এবং ছাপা কাগজ বেশ সুন্দর হওয়ায় অধিকন্তু লেখকের লেখার গুণে বহি খানা সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। রসজ্ঞ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করিবেন [illegible] কার্ত্তিক,

ভোটরঙ্গ

"ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক বিভব উপেক্ষণীয় নহে। শৈশব কাল হইতে ঐতিহাসিক বিভবের সহিত পরিচয় লাভে দেশ প্রীতির উদ্ভব হওয়ার সুযোগ লাভ ঘটে। গ্রন্থকার প্রায় ২০ খানা সুদৃশ্য চিত্র ও সহজ সরল [illegible] গ্রন্থ [illegible] উপভোগ্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে শিশু সাহিত্য রচনা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া ও তিনি পূর্ব্ব যশ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। **চারুমিহির**

সৌরভ কার্য্যালয়—ময়মনসিংহ।

বায়ড়া মাতৃপূজা ঔষধালয়

ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও আপনাদের অনুগ্রহে ৩। ৪ বৎসর আমি "মাতৃপূজা ঔষধালয়" নামে এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখাইয়া ঔষধ বিক্রয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার সবিনয় নিবেদন শুধু আমার কৃত্রিম ঔষধগুলি একবার ব্যবহার করিয়া ফলাফল দেখিবেন।

স্বর্ণসিন্দুর—৪৲ তোলা

জ্বরের যম

মাতৃ সুধা ঔষধ। মূল্য ১ শিশি ৸০ একত্র ৪ শিশি ৪৲ মাত্র।

পাণ্ডু রাক্ষসী

এক সপ্তাহে, পাণ্ডু, কামলাও আরগ্য হইয়া থাকে। মূল্য ১ শিশি ১৲ এক মাত্র।

উকুন নাশক তৈল

এই তৈল মালিশে যাবতীয় উকুন ধ্বংশ হইয়া থাকে। পেটে মালিশ করিলে যাবতীয় ক্রিমি ধ্বংশ হইয়া থাকে। মূল্য ১ শিশি ১৷০ টাকা মাত্র।

মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

ষড়্‌গুণবলি জড়িত মকরধ্বজ—৮৲ তোলা

যৌবন বাহার

শরীরের শক্তি, কান্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে মাত্র ১ কোটা ২৷০ টাকা। একত্র ৩ কোটা ৭৲ টাকা মাত্র।

প্রমেহ রাক্ষসী

হাতে হাতে ফল পাইবেন। মূল্য ১ কোটা ২৷০ টাকা একত্র ৩ কোটা লইলে ৬৲ পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার তৈল ও ঔষধ নাম মাত্র লাভ রাখিয়া বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। রোগীর শরীরের অবস্থা লিখিলে ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ পাঠান হইয়া থাকে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঠিকানা—

কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন শর্ম্মা কবিশেখর

"মাতৃপূজা ঔষধালয়"

পোঃ বায়ড়া, গ্রাঃ বায়ড়া, জিলা ঢাকা।

সৌরভ চিত্রাবলী
বা
ময়মনসিংহ এলবাম

অভিনব ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবস্থা।

ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিত্র ও পরিচয় ও মহৎ জীবনীসকল সচিত্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন।

মহৎ জীবনী ও ফটো সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার, সৌরভ,

ময়মনসিংহ।

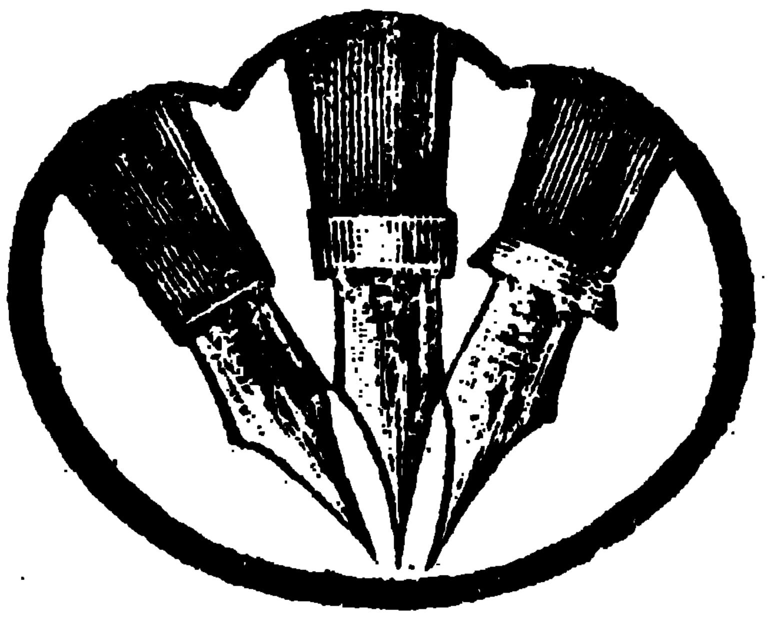

কে, ভি, দত্ত এণ্ড কোং

ময়মনসিংহ।

সকল প্রকার ফাউণ্টেন পেন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে বিক্রয় ও সুন্দররূপে মেরামত করিবার একমাত্র ষ্টল।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী কৃত

বিশ্ব-বীণা

বালক বৃদ্ধ যুবা নারী—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই এই বীণার ভিতরে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুনিতে পাইবেন। হাই স্কুল ও মাইনার স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার দেওয়ার উপযোগী। পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ উভয় পক্ষের উপকারী। দক্ষিণা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত

প্রণীত

মন্দাকিনী

(কবিতা পুস্তক)

সৌরভ, নব্য ভারত, ঢাকা রিভিউ প্রতিভায় প্রকাশিত কবিতা লহরমালা নিয়াই মন্দাকিনী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইবে।

পুরাতন সৌরভ

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

স্বর্গীয়

বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

সৌরভ প্রেস—ময়মনসিংহ।

সৌরভ

পঞ্চদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩৩৪। | দ্বাদশ সংখ্যা।

ময়মনসিংহের প্রাচীন পল্লী—সাহিত্য।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিকগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মের মহিমা ও নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচারের জন্যই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠিত। সেকালে হিন্দুর সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মের অনুশাসনেই নিয়ন্ত্রিত হইত। এই জন্য মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র নামে পরিচিত। সাহিত্যের ন্যায় হিন্দু স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যিকগণ যেমন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তেমনি ভাস্করগণও দেব প্রতিমা গঠনেই কলা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং স্থপতিগণ দেব মন্দির নির্ম্মাণে শিল্প নৈপুণ্যের চরম বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ জ্যোতিষ, জ্যামিতি, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবন ও ধর্ম্ম অনুশীলনেরই ফল।

প্রথম যুগে ময়মনসিংহের সাহিত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত সনাতন নিয়মই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিই প্রধানতঃ প্রাচীন ময়মনসিংহের সাহিত্যের ধর্ম্মগ্রন্থ। সেকালের গ্রাম্য কবিগণ এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রণেতা বহু কবির নাম ও গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লী সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব থাকিলেও এখানে সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লীতে ধর্ম্ম সাহিত্যের পাশাপাশি আর একটা লৌকিক সাহিত্য (Lecular Libratura) গড়িয়া উঠিয়াছিল এই লৌকিক সাহিত্যই বাঙ্গলা অর্থাৎ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অমূল্য দান।

সেকালের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার ও দেবদেবীর মহিমা কীর্ত্তন ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। এই জন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক কাব্যাদি রচনা করিয়া সাহিত্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বনের মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিলে যেমন তাহার স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ থাকে না, তেমনি কল্পনার অনন্ত গগন বিহারিণী কবি শক্তিকে সংকীর্ণ নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। একঘেয়ে ধর্ম্ম বিষয়ক সাহিত্য সর্ব্বদাই নীরস ও কবিত্বহীন হয়। নিরক্ষর সাধারণ লোক দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে আনন্দ পাইতে পারে না। তাহা তাহারা পণ্ডিতের সাহিত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা লইয়া একটা লৌকিক সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই লৌকিক সাহিত্য সৃজনে উচ্চ বর্ণের পণ্ডিতদিগের কোনই হাত ছিল না। ইহার কৃতিত্ব পল্লীর নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর কবির প্রাপ্য। ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রতি ক্রিয়ার ফলে ইহার জন্ম। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাব্যের নায়ক নায়িকা ছিল দেবদেবী, লৌকিক সাহিত্যের নায়ক নায়িকা দরিদ্র কৃষকের পুত্র কন্যা। পল্লী কবি কোন মর্ম্মস্পর্শী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া গ্রাম্য ভাষায় গীত রচনা করিতেন। কর্ম্মের অবসর সময়ে রাত্রে গৃহস্থের বাড়ীর অনাবৃত প্রাঙ্গণে দলেদলে পল্লীর নিম্ন শ্রেণীর লোক সমবেত হইত। তাহারা ভাবমুগ্ধ গাইনের তানে লয় সহকারে গীত করুণ কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হইত। গীতের বিষয় সকলের জানা ঘটনা বলিয়া সহজেই শ্রোতৃগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। এই "পালাগান" শ্রবন ব্যয় সাধ্য ছিল না। একখানি নূতন বস্ত্র আর দুই একটা টাকা দিলে সকলেই নিজ বাড়ীতে "পালাগান" গাওয়াইতে পারিতন। এইরূপে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে একটা লৌকিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আজ যে ময়মনসিংহ গীতিকা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যে গীতিকার অনুবাদ পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইতেছেন; সেই গীতিকা পূর্ব্ব ময়মনসিংহের নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর কবিরা রচনা করিয়াছিলেন। কত স্বভাব কবি এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কত গীত কবিতা আমাদের ত্রুটীতে অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এখন ও চেষ্টা করিলে আরও অনেক "গীতিকা" উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই গীতিকাগুলিই

আমাদের পরম গৌরবের সামগ্রী। আমি আশা করি আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সকল রত্নরাজির উদ্ধার সাধন করিবেন।

এইখানে একটী কথা বলার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। "মৈমনসিংহ গীতিকা" নাম দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল গীতিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন সেইগুলি ভাবের গভীরতায়, কবিত্বের মাধুর্য্যে এবং ভাষার স্বাভাবিক সরলতায় অতুলনীয়। ঐ সকল গীতিকা পাঠ করিয়াই পাশ্চাত্য মনীষিরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা" নাম দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় খণ্ড গীতিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ১৩ টী গীতিকার মধ্যে ৯ টীই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কবি রচিত। ১টী চট্টগ্রামে এবং ৩টী শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গে প্রাপ্ত। বাণিয়াচঙ্গে প্রাপ্ত গীতিকা তিনটী ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে গীত হইয়া থাকে, বোধ হয় পূর্ব্বময়মনসিংহে কবির রচনা। যে ৯টী গীতিকা ময়মনসিংহের কবি রচিত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে এইগুলিই দ্বিতীয় খণ্ড গীতিকায় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপ স্থলে দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "ময়মনসিংহ গীতিকা দিলেই সঙ্গত হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল পূর্ব্ব ময়মনসিংহে গীতিকার ন্যায় অন্যত্র গীতিকা দুর্লভ। এই স্বভাব সুন্দর গীতিকাগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ময়মনসিংহ বাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

গীতিকা ব্যতীত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কথা সাহিত্য ও সঙ্গীতের সম্পদ ও অসাধারণ। এই কথা—সাহিত্যকে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) শিশুদিগের উপযোগী পশুপক্ষীর গল্প (২) যুবক যুবতীদের উপযোগী প্রণয়ের গল্প (৩) প্রবীণদের উপযোগী রসাত্মক গল্প। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় শিশুদিগের উপযোগী অনেক গল্প সেকালের পল্লী সাহিত্যিকেরা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গল্প বলিয়া প্রাচীনারা দুরন্ত শিশুদিগকে সংযত করিতেন। এই গল্পগুলির সহিত আমাদের মধুর বাল্যস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। মনে আছে ঘুমে চক্ষু নিমিলীত হইয়া আসিতেছে, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় বলিতাম "তার:পর"। এই গল্পগুলি সেকালের শিশুদিগের ঘুমের অব্যর্থ ঔষধ স্বরূপে মহিলারা ব্যবহার করিতেন। আধুনিক মহিলারা এই শ্রেণীর কতগুলি গল্প শিখিয়া লইলে ছেলে মেয়ে ঠেঙ্গানোর শ্রম হইতে অব্যাহতি পাইবেন সন্দেহ নাই। শিশুসাহিত্যের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব ময়মনসিংহে প্রচলিত কতগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া 'টুনটুনির' বই নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এমন চিত্তাকর্ষক শিশুপাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। ইহাও পূর্ব্ব ময়মনসিংহের দান।

ময়মনসিংহের পল্লী সাহিত্যের সঙ্গীত সম্পদও অসামান্য ছিল। সে কালে কত পল্লী কবি পাতায় ঢাকা বনফুলের ন্যায় নীরবে তাহাদের হৃদয়ের সঙ্গীত সুধা ঢালিয়া দিয়া জনসাধারণের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন। সেকালে পল্লী আনন্দ ভরপুর ছিল। পল্লীগৃহস্থের বাটী সর্ব্বদা উৎসবের সঙ্গীতে মুখরিত থাকিত। এখনও পল্লীতে পূজা পার্ব্বনে বিবাহাদি উৎসবে কত রকম সঙ্গীত শোনা যায়। এখনও পল্লীর কৃষকেরা হাল চালাইতে, খেত নিড়াইতে, ধান কাটিতে গান গাইয়া শ্রম লাঘব করে। পল্লী সঙ্গীতের মধ্যে কতগুলি ধর্ম্মবিষয়ক যেমন কীর্ত্তন ও মালসী, 'কবি' 'বাউল' "ভাটিয়াল" ও ঘাটুগানই পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বিশেষত্ব।

উৎসবাদি উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে সকল সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন তাহাতেও বেশ কবিত্ব আছে। আমি একটী বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকের নিকট তাহাদের গানের একটী ফর্দ্দ সংগ্রহ করিয়াছিলাম সেইটী শুনিলে বুঝিতে পারিবেন স্ত্রীলোকদিগের গানের তহবিল ও ক্ষুদ্র নয়। ১। গোষ্ঠ ২। অক্রুর সংবাদ ৩। সখীসংবাদ ৪। দূতীসংবাদ ৫। কৃষ্ণলীলা ৬। রাইরাজা ৭। সুভদ্রার বিবাহ ৮। রুক্মার বারমাসী ৯। চন্দ্রকলার সয়ম্বর ১০। পার্ব্বতী তপস্যা ১১। লক্ষ্মণ পারিজাত ১২। সীতার বিবাহ ১৩। সীতার বনবাস ১৪। সীতার বারমাসী ১৫। রামের বারমাসী ১৬। অজ্ঞাত বনবাস ১৭। বিদ্যাসুন্দর এতদ্ব্যতীত পানখিল, জলভরা, সাজান, সম্প্রদান, বরশয্যা পাশা খেলা ইত্যাদি বহু রকমের গান বিবাহ উপলক্ষে মেয়েরা গাহিয়া থাকেন। "বাউল", "ভাটিয়াল" ও ঘাটু গান পূর্ব্ব বঙ্গের নিজস্ব জিনিস। মানব হৃদয়ের সুখ দুঃখ ও আশা নৈরাশ্য

জড়িত সরল উচ্ছ্বাস বাউল ও ভাটিয়াল গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আব হাওয়া বর্জ্জিত গ্রাম্য কবি বন বিহঙ্গের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া আপন মনে এই সকল সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করিয়াছেন। পল্লী সঙ্গীতে কৃত্রিমতা নাই, উহা সরল হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। অলঙ্কারের গুরুভারে ভাবের নৈসর্গিক লাবণ্য কোথাও প্রচ্ছন্ন হয় নাই। এই জন্যই পল্লী সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিলে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক রত্নরাজি স্থান পাইতে পারে।

আজও বৈষ্ণব ফকীরের ঝোলাগুলির মধ্যে অনেক রত্ন লুক্কায়িত আছে। আপনারা দুইচার পয়সা খরচ করিলে সেইগুলি হস্তগত করিতে পারিবেন। তরুণদিগের হৃদয়ে নবজাগরণের সাড়া পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তরুণেরাই দুইদিন পর প্রবীণের স্থান অধিকার করিবেন। তরুণদিগের অসীম উৎসাহ, সৎকার্য্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কি স্বদেশের সেবা কি নর নারায়ণের সেবা, কি সাহিত্যের সেবা সকল অনুষ্ঠানের তরুণেরা নিষ্কাম কর্ম্মী। আমি এখানে সমবেত তরুণ সাহিত্যিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাহারা যেমন সাহিত্যানুশীলন করিয়া মাতৃভাষার উন্নতি করিবেন তেমনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কীটদষ্ট লুপ্ত প্রায় হাতের লেখা গ্রন্থ, কথা সাহিত্য গীতিকা ছড়া ও প্রবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবেন।

আপনারা সকলে চেষ্টা করিলে সাহিত্যের লুপ্ত প্রায় উৎকৃষ্ট উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং আপনারাও যশস্বী হইবেন। আশা করি এই অনুষ্ঠান যেন কেবল কথায় পর্য্যবসিত না হয়। ভগবান আপনাদের সাহিত্যানুষ্ঠানকে সফলতা দিন্ ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

* কিসোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

নারীশক্তি—জাগরণের প্রয়োজনীয়তা।

(১)

বিচিত্র কর্ম্মা পরমেশ্বর এক শুভমুহূর্ত্তে নরনারীর সৃজন করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। জীবনের সর্ব্বাবস্থায় নরের সঙ্গিনীরূপেই নারী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছে। পুরুষের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে সহায়তা করাই নারীর প্রধান কার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

মানবসমাজে নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে ধার্য্য হইয়াছে। মানব সমাজে নারী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও সমাজ রক্ষায় প্রধান অবলম্বন। জীবনের বিভিন্নমুখীন উন্নতি সাধনে নারীর সহায়তা ও সাহায্য অপরিহার্য্য। নারীজাতির সহায়তা ভিন্ন পার্থিব উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৃহের সকল কার্য্যই নারীজাতির সুনিপুণ হস্তের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই সুপরিচালিত, সংশোধিত ও সুমার্জ্জিত হয়। কি সামাজিক, কি নৈতিক, সকল প্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ফল গৃহ-শিক্ষা। গৃহে সুশিক্ষা লাভ করিয়াই মানুষ জগতে মহান্ আদর্শকে বাস্তব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ গৃহে প্রধানতঃ নারীজাতির কার্য্যের সংমিশ্রনেই হইয়া থাকে। মানব সমাজে নারীর স্নেহময়ীমাতা ও সুদক্ষা পত্নীরূপেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জগতের আশা ভরসা সকলই নারীজাতির উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। আজি জগতে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি তাঁহাদিগগের কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন, তাহার মূলীভূত কারণ যে তাঁহারা অনেকেই সেইরূপ স্নেহময়ী ও বিচক্ষণা জননীর সহবাস ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। মানব সমাজে এই মাতৃত্ব বস্তুটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে।

বিশ্বপিতার নিকট হইতে জীবনের অনেক মূল বিষয়েই নারী-নরের ন্যায় একই অধিকার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে একই মহান উদ্দেশ্য লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে। যে সকল কার্য্য পৃথিবীতে অসম্পূর্ণ থাকিবে তাহাই পূর্ণ করিতে নারী জাতির ধরায় আগমন। তাহাদের জ্ঞান, ক্ষমতা, বুদ্ধি যদ্যপি কোনও কোনও স্থলে অপর জাতি হইতে কিছু বিভিন্ন অথবা নূন হইতে পারে, তথাপি এই সকল প্রকৃতিদত্ত বস্তুগুলি অনুকূল অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা সুমার্জ্জিত হইলে উজ্জ্বলতর হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতের ইতিহাসে ইহার প্রভূত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে।

নারীজাতিকে সকলক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিলে সমাজের কল্যাণ নাই এবং জগতের উন্নতিও হইতে পারে না। সমাজের উন্নতি সাধনোদ্দেশে নারীজাতিকে পৃথিবীতে যথোপযুক্ত স্বাধীনতা ও কর্ম্মাধিকার দিতে হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। নরনারীর জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই আমরা দেখিতে পাই, যে শিক্ষা পুরুষকে প্রবল করিয়াছে অপর দিকে সেই শিক্ষাই নারীজাতির প্রাণে নূতন উৎসাহ, নবীন আশা, নব জাগরণের ভাব আনয়ন করিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা গিয়াছে স্ত্রীলোকের ভিতরও বিকাশ ও উন্নতির বীজ নিভৃত ভাবে উপ্ত হইয়াছে, এবং তাহা উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্য্যার দ্বারা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে ইহা সহজেই আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যে সেই সময়ে নারীজাতির শিক্ষা ও জ্ঞান যথেষ্ট প্রশ্রয় লাভ করিয়াছিল। আমাদিগের দেশের সেই গার্গী, মৈত্রেয়ী, খণা, লীলাবতী প্রভৃতি মনস্বিনীগণ ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহাদিগের শুভজন্মগ্রহণে আমাদিগের দেশ ধন্য হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রভাবে আজিও জগতে শত শত নারী শিক্ষাকল্পে মনোযোগ দিয়াছেন। যে শিক্ষার দ্বারা প্রাচীন নারীগণ দেশের ও দশের উপকার করিতে উদ্যুক্ত ও সমর্থ হইয়াছিলেন সেই শিক্ষাই বিস্তৃত ও সুপরিচালিত হইলে ভবিষ্যতে জগতের যে মহান্ উপকার সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

খৃষ্টশিষ্য ভক্ত পল বলিয়াছেন নারী নরের গৌরব। ("The woman is the glory of the man") ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরিপূর্ণ মানব জীবনের পক্ষে যে সকল গুণ ও উপকরণ একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা যোগাইবার জন্য নারীত্বের সমাবেশ ও সহায়তা আবশ্যক।

নারীজাতিকে যদি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনোবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবে না, বরং তাহা অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নারীজাতি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য বিধাতৃ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে ইহা কোনরূপেই বলা চলে না। তাহারা কি চিরদিন সর্ব্ববিষয়ে কেবল পুরুষের পদতলে থাকিয়াই অমৃতময় জীবন জলাঞ্জলি দিবে? জীবনের প্রারম্ভে যে বলবতী ইচ্ছা ও আগ্রহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহার উপর একটা কাল্পনিক আবরণ টানিয়া দিলে চলিবে না। যদি সেই ইচ্ছা ঐকান্তিকী ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্বভাবের নিয়মে একদিন না একদিন সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। নারীজাতির আত্মার ভিতর যে আগ্নেয়োচ্ছ্বাস লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা সুযোগ পাইলেই বন্ধনমুক্ত হইয়া তীব্রতার সহিত তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হইবে।

মানবীয় জীবনের পূর্ণ উৎকর্ষ সাধনে নরনারীর যে স্থান প্রয়োজন এবং জগতে তাহাদের জীবনের যে আপেক্ষিক মূল্য তাহা প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক ডাক্তার স্মাইলসের গভীর চিন্তাপূর্ণ উক্তিতে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "Man is the brain, but woman is the heart of humanity; he its judgment, she its feeling; he its strength; she is grace, ornament and solace." পুরুষ মানব সমাজের মস্তিষ্ক, কিন্তু নারী মনুষ্য সমাজের হৃদয়, পুরুষ যুক্তি ও বিচার পথের পথিক; নারী তাহার অনুভাবনা দ্বারা জীবনকে সরস ও সরল করিয়া তুলে। পুরুষ বল বিক্রম সম্পন্ন, কিন্তু নারী এই পৃথিবীর শোভা, অলঙ্কার এবং সান্ত্বনা। যদিও উক্ত মন্তব্যে পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি শক্তি ও বিশেষত্বের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য ও বৈষম্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইলেও আধুনিক জগতের পরিবর্ত্তিত ইতিহাস আমাদিগের নিকট এই অভিনব সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছে যে নারীকে সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করিলে পুরুষ ও নারীর কর্ম্মশক্তির মধ্যে অনেক ব্যবধানই তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে।

নারীজাতির শিক্ষার যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। সভ্য সমাজে বাস করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তো আরও বেশী। জাতীয় উন্নতি, কি সামাজিক উন্নতি, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল উন্নতিরই মূল সুশিক্ষা। পুরুষের এই সকল উন্নতি কোন ক্রমেই সহজলভ্য হইবে না, কারণ জগতের উন্নতি নরনারী উভয়ের সমবেত চেষ্টার দ্বারাই হইতে পারে। নারীজাতি শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সকলই বিফল। নারীজাতি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে গৃহোন্নতির পথ সুগম হইবে।

শিক্ষিতা নারীর গার্হস্থ্য জীবন অতি মধুর। বাল্যকালে সন্তানের শিক্ষা গৃহেই হয়; সুতরাং যে সন্তান গৃহে শিক্ষিতা মাতার সহবাসলাভে বঞ্চিত হয়, সে উত্তরকালে কিরূপে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে দাঁড়াইবে? নারীজাতির অন্তঃকরণ সাধারণত কোমল, সরল ও কর্ত্তব্য পারায়ণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত বৃত্তিগুলি সুশিক্ষা পাইলে সমধিক পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হয়।

পরসেবা, আত্মত্যাগ, স্নেহপ্রবণতা, এই সকল বৃত্তি নারীজাতির ভিতর সুপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুশিক্ষা প্রভাবে নারীজাতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণ বিকশিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নারীশিক্ষা না পাইলে তাহাদিগের জীবন অসাড় নিস্পন্দ হইবে। নর একটি কার্য্য করে কিন্তু সেই আরব্ধ কার্য্যটির পরিসমাপ্তি হয় নারীজাতির সহায়তার দ্বারা। নারীজাতির জীবনের প্রারম্ভে অনেক মহৎ ও প্রয়োজনীয় বৃত্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা শিক্ষার অভাবে জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অন্ধকারে লীন হইয়া থাকে। নারীর সংস্পর্শে ও প্রভাবে অনেক পুরুষের জীবন সুগঠিত ও সুশোভিত হয়।

নারীজাতিকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে যাহাতে তাহারা স্বাধীন ভাবে স্বীয় শক্তির উপযুক্ত নিয়োগে, মানব সমাজের বহুমুখীন জটিল সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিতে পারে। গার্হস্থ্যজীবনের ভিতর থাকিয়া সুশিক্ষিতা নারী গৃহের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, শৃঙ্খলা স্থাপন ও শান্তিবিধানে সমর্থ হয়। সংযম, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় গুণ সকল গৃহেই শিক্ষা করার সুযোগ উপস্থিত হয়। সুশিক্ষার প্রভাবে নারীজাতির অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিগুলি জাগ্রত হইয়া শুধু তাহাদেরই নিজ জীবন মধুময় করিয়া তুলিবে তাহা নয়, পরন্তু তাহা দ্বারা পরিবারের ও সমাজের সমষ্টি জীবনও সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। সহজ ধর্ম্মপরায়ণতার যে বীজ রমণী-হৃদয়ে নিহিত আছে, তাহার অবাধ ও উপযুক্ত বিকাশের সুযোগ প্রদত্ত হইলে মানব পরিবার হইতে হিংসা দ্বেষ, ক্রূরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি নিশ্চয়ই হীনবল হইবে।

মানব সমাজে পুরুষ ও নারীর ভিতর যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং সমাজের সকল কার্য্যই পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত সাধনা ও উদ্যোগেই হইয়া থাকে। নারীকে যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে বঞ্চিত করা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যটি কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না। যদি নারীকে নির্ম্মম নিপীড়নের ভিতর বদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে পুরুষ কিরূপে মুক্ত হইবে? নারীর মুক্তি ভিন্ন পুরুষের মুক্তি নাই। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি শেলী বলিয়াছেন—"How can man be free, if woman be a slave!" সত্যই ত যে স্বাধীনতার বাণী একবার পুরুষকে উন্মত্ত করিয়াছে তাহা সেই পরিমাণে নারীর ভিতর প্রসার লাভ না করিলে পুরুষের পক্ষে একাকী স্বাধীনতা যজ্ঞে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে।

নারীর প্রকৃতির স্বাভাবিক কোমলতা এবং নমনীয়তা বশতঃ পুরুষের অনুষ্ঠিত বা পরিচালিত অনেক বিধি ব্যবস্থাতেই নারীত্বের দাবী অস্বীকৃত ও অবহেলিত হইয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানব সমাজের অনেকবিধ উন্নতিই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহান্ অনর্থ উপলব্ধি করিয়াই মানবের শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণকে মানব সমাজে নারীর অপহৃত অংশ প্রত্যর্পণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সুসভ্য পাশ্চাত্যজাতির ভিতরেও ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। এই জন্য ইংলণ্ডের যুগ কবি টেনিসন লিখিয়াছিলেন:—

The woman's cause is man's; they rise
or sink
Together, dwarf'd or godlike, bond
or free.

অর্থাৎ নারীরপক্ষে পুরুষকে তাহার নিজের এবং মানব সমাজের কল্যাণের খাতিরেই গ্রহণ করিতে হইবে। নর ও নারীর জীবন নিয়ত এমনভাবে গ্রথিত যে পুরুষ ও নারীকে উত্থান বা অধঃপতনের পথে একত্রই যাইতে হইবে। একত্রেই তাহাদিগকে হয় একটু একটু করিয়া জীবনকে খর্ব্ব ও সংকুচিত করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয় তাহাদিগকে দেবত্বের উচ্চাসনে উঠিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে হইবে। একত্রই হয় তাহাদিগকে সম্মিলিত জীবনের বর্দ্ধিত শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অযুক্ত অবস্থায়ই পড়িয়া থাকিতে হইবে, না হয় উভয় জীবন-ধারার পূর্ণতায় উপকরণ সম্ভারের

মহাসম্পদে মুক্তির সার্থকতালাভ করিবার মাহেন্দ্রসুযোগ বরণ করিয়া লইতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবন মন্ত্রের মহাসাধনে পুরুষকে নারীর সহকারিতা অকুন্ঠিত ভাবে গ্রহণ করিয়া এবং নারীর ও নারীত্বের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার নিজস্ব শক্তির অনুযায়ী পুরুষের বিবিধ প্রচেষ্টায় যুক্ত হইয়া জাতীয় জীবন যজ্ঞে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীমণিলতা দেবী সরস্বতী।

নবদ্বীপের কলঙ্ক মোচন।

(১)

নবদ্বীপের অনেকগুলি দুর্নাম মানুষের মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। তাহার পক্ষে একটী কথা বলিবার লোকও বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে পাওয়া যায় না। ছেলে বুড়া পুরুষ মোর দুই চারিজন একত্র হইলেই নবদ্বীপের কথা লইয়া হাসা হাসি টিটকারীর সীমা থাকে না। পণ্ডিত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী ঢাকেঢোলে দশদিকে নবদ্বীপের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন।

সে দিন প্রকাশ্য সভায় রাজেন্দ্রবাবু নবদ্বীপের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অত্যন্ত কদর্য্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। শ্রোতারা মহাভারত পাঠ না শুনিয়া শাস্ত্রীজীর নবদ্বীপ চরিতামৃত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অপরাধের কথাটা কিন্তু সকলেই নিজ নিজ মনগড়া রকমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কথার উপর অলঙ্কার যে যত বেশী পারে,—তাহার কথাই তত বেশী রসাল ও শ্রুতি মধুর হয়। শাস্ত্রীর সঙ্গে দোসর হইলেন আর এক ব্যক্তি সুরজিৎবাবু।

প্রথম কথা উঠিয়াছিল নবদ্বীপের শিক্ষাদীক্ষা লইয়া, তারপর তাহার চরিত্রের উপর চিমটী কাটিয়া কথা বলিতে কেহ কেহ সুরু করিলেন। ক্রমে সেটা দুনীয়ার যত রকমের ঘৃণ্য হইতে পারে তাহাই গিয়া দাঁড়াইল।

তখনো বাংলায় ট্রেণ হয় নাই, তখনো গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকঘর ছিল না। মানুষ হাঁটিয়া দিগ্‌দিগন্তে বেড়াইয়া আসিত। তখনো চিঠি পত্র দিয়া দূরদেশের হাল বন্ধুকে হাল অবস্থা জানানো সহজ ছিল না। এহেন সময় নবদ্বীপের বিরুদ্ধে গাঁ ময় বড় বিশ্রী গোলমাল উঠিল।

(২)

নবদ্বীপ চন্দ্রশেখর বাচস্পতির একমাত্র পুত্র। সে টোলে পড়িত—সন্ধি, চতুষ্টয় ও আখ্যাত বৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া সে ব্যাকরণের শেষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল,—এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল।

গ্রামের পাঁচু বাগ্দীর চারি বৎসরের ছেলে লক্ষেশ্বর পুকুরের জলে পড়িয়া যায়। পাঁচুর স্ত্রী চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠে। নবদ্বীপ বাপের নিকট একটা ফাঁকির কায়দা শিখিতেছিল। সহসা পুকুর পাড়ে স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনিয়া এক লম্ফে তথায় ছুটিয়া গেল। এবং কালবিলম্ব না করিয়া জলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ছেলেটাকে বুকে করিয়া ভাসিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে বহুলোক পুকুর পাড়ে জড় হইয়াছিল। নবদ্বীপ সেই ছেলেটাকে তুলিয়া বিবিধ প্রক্রিয়ায় তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মানিক কবিরাজ কহিলেন, কেউ যদি ছেলেটার মুখে ফু দিতে পারিত তবেই ঠিক হইত।

নবদ্বীপ কাল বিলম্ব না করিয়া সেই বাগ্দী ছেলের মুখে মুখদিয়া ফু দিল। ভৈরব পঞ্চানন, জগৎ সার্ব্বভৌম, বিশ্বনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ছ্যা ছ্যা করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ছেলেকে যা তা গালি দিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ গ্রাহ্য করিল না।

তাহার যত্নে পাঁচুর ছেলে বাঁচিয়া উঠিল।

(৩)

সমাজে নবদ্বীপ পতিত হইয়া গেল। দুপুর বেলায় যখন তাহার মা পৃথক বারান্দায় নবদ্বীপের আহারের ঠাঁই করিয়া ছেলের মহা প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ্দ স্বামীর নিকট চাহিলেন,—তখন উঠানের—প্রান্ত হইতে নবদ্বীপ আরক্ত মুখে প্রস্থান করিল। গৃহ দেবতা রুদ্রেশ্বর শিবের দুয়ারে সভক্তি প্রণিপাত করিয়া গেল। সুতরাং গ্রামে তাহার সম্বন্ধে কত কু আলোচনা সংখ্যা হইতে লাগিল,—তাহার সীমা নাই।

... ...

দশ বৎসর পরের কথা। অর্দ্ধোদয় যুগে মুর্শিদাবাদে ভীষণ মড়ক লাগিয়াছে। কলেরায় দিন রাত্রি অগণিত যাত্রী মরিতেছে। কেউ কাহারো সংবাদ লয় না যে যে দিকে পথ পায়—পলাইয়া বাঁচে। সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার কোন

বন্দোবস্ত নাই। তখনো বাংলা দেশে সেবা সঙ্ঘের নাম গন্ধ নাই।

নৌকায় নৌকায় কান্নার রোল। বাংলার অগণিত স্ত্রী পুরুষ নৌকায় চড়িয়া পুন্য কার্য্য করিতে গিয়াছিল। কাহার পুত্র, পত্নী, স্বামী, মা বাপ মরিয়াছে—কেহ ভুগিতেছে—মহা হৈ চৈ কাণ্ড!!

মুর্শিদাবাদের মাইল দুই উজানে, গাঙ্গার চড়ায় কে এক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অনেকগুলি চটি তৈয়ার করিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত—করিয়াছেন। এই বাংলার প্রথম সেবাশ্রমের সূত্রপাত। সেই সেবাশ্রমে সর্ব্ব-জাতি রোগীতে ভর্ত্তি করিয়া, এক রুদ্রাক্ষ ধারী ত্রিপুণ্ড্র শোভিত চন্দন চর্চ্চিত ললাট গোৎরূান্তি দীর্ঘ দেহ ব্রাহ্মণ, রোগী চর্য্যায় দিন রাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন।

… … … … … …

সুস্থ হইয়া যখন একদল একদল যাত্রী নৌকায় উঠিতে-ছিল, তখন সেই সেবক ব্রাহ্মণ আসিয়া একখানি নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন—আমার এই সেবাশ্রমে রোগীদের জাতি নির্ণয় করিতে পারি নাই। আর আমার সহকর্ম্মীগণের ও জাতির বিচার নাই। কেহ হাঁড়ি, বাগ্দী, চাঁড়াল,—সব আছে। আপনাদের ঔষধ পথ্য তারাই দিয়াছে। যা প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে হয়—দেশে গিয়া করিবেন।

ভৈরব পঞ্চানন দুর্ব্বল শিঃর সঞ্চালন করিয়া কহিলেন—"আতুরে নিয়ম নাস্তি।" অন্যান্য পণ্ডিতেরা সেই কথায় সৎসাহে সায় দিলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ কহিলেন—দশ বৎসর আগে কিন্তু এই নিয়ম ছিল না।

চন্দ্র বাচস্পতি কহিলেন—হা এই নিয়ম চিরদিনই আছে—যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

"তবে আর পাঁচু বাগ্দীর ছেলের জীবন বাঁচাইয়া আপনার ছেলে পতিত এইত না।

বড় কষ্টে এক বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী বাহির হইয়া সেই যুবককে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন বাবা নব। তুই—তুই—বেঁচে— কথা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

… … … … … …

পণ্ডিতেরা এক বাক্যে সায় দিলেন নবদ্বীপের কোন পাপ নাই। তাহার মত পুণ্যবান জগতে বিরল ইত্যাদি ইত্যাদি।

… … … … … …

নবদ্বীপ দেশে আসিলে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী বড় গলায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন—নবদ্বীপের চরণস্পর্শে অনেক পাপী মুক্ত হইতে পারে। তাহার মত সৎ সাজ্ঞ ইত্যাদি গুণযুক্ত ছেলে ভূভারতে কখনো জন্মায় নাই—জন্মিবে ও না।

সুরজিৎ কবিরাজ তখন এস্রাজের কাণ মলিতে মন্ত ত্তাহার স্ত্রীর সঙ্গে নবদ্বীপ চরিত্রের আলোচনায় হারিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—

"কালাহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

ময়মনসিংহের বিখ্যাত কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্য বিগত ২৫শে আশ্বিন বুধবার রাত্রিতে দীর্ঘকাল বাতব্যাধি, ব্যারামে ভুগিয়া সজ্ঞানে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ১২৭৫ সনে ২৭শে মাঘ বুধবার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার নিকটবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী বাঙ্গলা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, পরে প্রাপ্ত বয়সে বাঙ্গলার সন্নিকট সহিংপুর গ্রামে বসত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

ইঁহার পিতার নাম ৺রামমোচন আচার্য্য। মাতার নাম ৺বিশাখা দেবী। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য পড়িয়া (পরে শিমুলজানি গ্রামে স্বর্গীয়া বিজয়া দেব্যা মহাশয়ার স্থাপিত বাঙ্গালা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া) পরে নেত্রকোণা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন, এবং ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর মোক্তারী পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হন, কিন্তু কূটবুদ্ধি পূর্ণ আইন ব্যবসায়ে তাঁহার ভক্তি রসাত্মক সরস প্রাণ বসিল না। বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে ৺লোকনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তি কবিগানের চর্চ্চা করিতেন, কবি বিজয়-নারায়ণ অনেক সময় উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট গিয়া কবিগানের অনুশীলন করিতেন এবং নিজেরও তখন রচনা শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। এরূপ কিছু কিছু রচনা করিতে করিতে তাঁহার রচনা শক্তির ক্রমে বিকাশ হয়। ১৪।১৫

বৎসর বয়সের সময় ধারিয়া গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; তথায় রামেশ্বরপুর নিবাসী ৺রাজকিশোর আচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রথম কবিগান হয়। এবং এই সভায় কবিবরের বিশেষ সুখ্যাতি লাভ হয়। তাহার পর এ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি রামু সরকার, রামগতি সরকার, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হরিহর আচার্য্য বরিশালের কবি মদন শীল প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবির সহিত গান করিয়া দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চাতেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি "বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার" "বৈষ্ণব সঙ্গিনী" "আনন্দ" ময়মনসিংহের মাসিক পত্র "সৌরভ" প্রভৃতির নিয়মিত লেখক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় "সৌরভ" সম্পাদক ৺কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে তিনি "সৌরভে" "ময়মনসিংহের কবিকাহিনী নামক প্রবন্ধ দীর্ঘকাল লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ময়মনসিংহের বিলুপ্ত প্রায় কবিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "উপদেশামৃত" "প্রার্থনা শতক" "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" নামক ৩ খানা গ্রন্থ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাভাবে অনেক রচিত পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাভাবে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া আবেকময়ী ভাষায় একখানা মুদ্রিত পত্রও প্রচার করিয়াছিলেন।

"ময়মনসিংহের কবিকাহিনী" প্রভৃতি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এখন ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। কবি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত "কবিকাহিনী" পুস্তকখানা মুদ্রিত করিতে না পারিয়া বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কবির পীড়িত অবস্থায় নেত্রকোণার সুপ্রসিদ্ধ উকীল সহৃদয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত মহাশয় কবির বাড়ীতে আসিয়া কবিকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং আর্থিক ও নানারূপে কবিকে বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এবং রচিত "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" পুস্তক তাঁহাদের প্রেসে স্বল্প ব্যয়ে মুদ্রনের ব্যবস্থা করিয়া কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও গুণ গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (commercial. Inspector) ধর্ম্ম প্রাণ, সুলেখ শ্রীযুক্ত অতুল গোপাল রায় (মুখোপাধ্যায়) নিকট কবির লিখিত "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" "প্রার্থনা শতক" পাঠান হইয়াছিল, তিনি অযাচিত ভাবে পুস্তক মুদ্রেনের সহায়তা করিয়াছেন।

মহুয়া নিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবির লিখিত "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" পাঠে মুগ্ধ হইয়া উচ্চ সমালোচনা ও সাহায্য প্রেরণ করিয়া কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

কবি, গৌরীপুর গিয়া একবার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, গৌরীপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় কীর্ত্তন শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কবির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কাশিমবাজারাধিপতি স্বনাম ধন্য মহারাজ শ্রীযুক্তমনীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের উদ্যোগে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী" নামক মহাসভার যে অধিবেশন হয় ঐ অধিবেশনে কবির নিমন্ত্রণ ছিল এবং মহারাজ সাদরে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছিলেন!

শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এরূপ ভগবদ্ভক্ত বড় দেখা যায় না।

নামকীর্ত্তন ও সাহিত্য চর্চ্চার ব্যাঘাত হয় বলিয়া তিনি অধিকাংশ সময় গৌরীপুর সরকারের এলাকাভুক্ত ঠাকুরকোণা বাজারে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেন।

কবির রচিত প্রার্থনা শতকের ভাষা অতীব মর্ম্মস্পর্শী। ইহা শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণে লিখিত। ইহা পাঠে ভক্ত লেখক শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুগ্ধ হইয়া উচ্চ সমালোচনা করিয়াছেন।

কবির রচিত "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" ও কবির বহুকালের পূর্ব্বের রচিত "উপদেশামৃতের" অমূল্য উপদেশবাণীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

গৌর নিষ্ঠা।

(নাগরী-উক্তি)

"সইরে!

কে আঁকিল গোরা? রসের মুরতি
সারাটা বিশ্বের গায়।

যে দিকে যখন, ফিরাই নয়ন,
শুধু গৌর দেখা যায় ॥
সূর্য্য শশধরে তারার ভিতরে
সারাটা আকাশময়।
কাননে কুসুমে, স্থলে কি জীবনে,
গৌর বই কিছু নয় ॥
মানব নয়নে তারায় তারায়,
গৌরাঙ্গ মূরতিখানি।
কে রাখিল আঁকি, কহ প্রাণ সখি,
স্বরূপ কাহিনী শুনি ॥
যদি বা নয়ন, মুদিয়া নির্জ্জনে
একাকিনী শুয়ে থাকি।
তবু নহে ছাড়া, পরাণ পিয়ারা
মন চোরা গোরা দেখি ॥
দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে
কি কব মনের খেদ।
গোরাতে আমাতে, আর কোন মতে
থাকে না কিছুই ভেদ ॥
নিজে হই গোরা জপি গোরা গোরা
ননদিনী কত কয়।
বলিছে বিজয় বড় মন্দ নয়
এতটা হইলে হয় ॥"

(শ্রীশ্রীগৌর গীতাবলী)

"ওরে মন! বলিতে হৃদয় ফাটে দুঃখে!
লয়ে পুত্র কন্যা নারী, সুজনের সঙ্গ ছাড়ি.
সময় কাটিছ মহাসুখে।
অনিত্য এ ধন জনে, তুমি কিনা নিত্য জ্ঞানে,
নিরন্তর করিছ রক্ষণ,
যখন দশার শেষে, শমন ধরিবে কেশে,
নিত্যানিত্য বুঝিবে তখন!
তুমি যদি নিত্য ধনে, ধনী হ'তে কর মনে,
এক মনে ভজ নিত্যানন্দ।
গৌর গৌর গৌর বলি, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলি,
সাধু সঙ্গে করহ আনন্দ।
বৈষ্ণবশাসনাধীনে হলে, বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পেলে,
হরি বলি নাচ সদানন্দে।
সংসার হইবে ক্ষয় হবে মহসুখোদয়
ভাসিবে রে! প্রেমের তরঙ্গে।
প্রভু বৃন্দাবন প্রতি যদি কর নিষ্ঠা রতি,
সুমতির সঙ্গে কর বাস;
তোমার স্বভাব দেখি, বিজয় হইবে সুখী,
ছিন্ন হয়ে যাবে অষ্টপাশ ॥"

(উপদেশামৃত)

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কালীন কবিবরের স্বাভাবিক ভাষায় রচিত—"কালিকে ভবপালিকে, বাঙ্গালীকে নিও না আসাম" ইত্যাদি গান পূর্ব্ববাঙ্গালার হাটে ঘাটে মাঠে শুনা যায়। এইরূপে অনেক বিষয়ে অনেক সঙ্গীত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এবার সম্যক দেওয়া হইল না। বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বাঙ্গালা গ্রামে "শ্রীশ্রীহরিসভা" স্থাপন এবং বাঙ্গালাগ্রামে "মহোৎসব" ও বাঙ্গালা গ্রামে শ্রীশ্রীহরি সভায় উৎসব উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা ৺বনমালি সেন মহাশয়ের আগমন, ঐ সকল কার্য্য বিজয় নারায়ণের সম্পূর্ণ চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট জেলায় কবিবরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রতিবর্ষে শ্রীহট্টে তাঁহার বায়না হইত এবং কবিগান করিয়া প্রভূত নাম যশঃ অর্জ্জন করিয়া আসিতেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ও তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের স্পৃহা বলবতী ছিল। ঠাকুরা কোনা থাকা কালীন শিমুলজানি বিজয়া চতুষ্পাঠীর ভূত পূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আলাপ করিতেন যে "এরূপ জ্ঞানী ও স্বাভাবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি বড় দেখা যায় না; ইহাঁকে পড়ান পথ প্রদর্শন মাত্র ইনি জ্ঞানের ভাণ্ডার। বাগ্‌দেবী ইহাঁর রসনায় বিরাজ মানা আছেন।"

প্রত্নানুশীলন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্মরণ শক্তি এরূপ প্রখর ছিল নিতান্ত খুটি নাটি বিষয় ও তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ থাকিত। প্রত্যক্ষ তাঁহার অনেক প্রমান পাইয়াছি।

এরূপ স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোক বিরল। ভক্ত বিজয় নারায়ণের অর্থের স্পৃহা মাত্রও ছিল না। যাহা পাইতেন ভ্রাতাগনকে এবং কন্যা জামাতাগণকে বিভাগ করিয়া দিতেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত ও বিরল। জোরাম নিবাসী শ্রীটকু করনীর সম্পূর্ণ জোত তাঁহার প্রাপ্য টাকা ও বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইয়া যায়, বিজয়নারায়ণ তাহা ক্রয় করিয়া আধি বর্গা সূত্রে পত্তন করিয়াদেন। টকু করনী ৪। ৫ বৎসর পর আসিয়া ঐ জমির জন্য কবিবরের কৃপা প্রার্থী হয়। কবি কৃপা পরবশ হইয়া টাকা না লইয়াই জমি ছাড়িয়া দেন .তাঁহার জীবনে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কবির কোন পুত্র সন্তান নাই। দুইটী কন্যা এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবী বর্ত্তমান আছেন। স্বামী শোকে তিনি অধীরা হইয়াছেন।

বহু কবির সরকার তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেতাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ধর সরকার, কবি মহম্মদ সাধু সরকার, শ্রীযুক্ত রাম সুন্দর গোপ সরকার প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। আশাকরি তাঁহারা মৃত কবির গৌরব রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন।

শ্রাদ্ধ সভায় কবি শ্রীযুক্ত রাম সুন্দর গোপ সরকার "ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি" শীর্ষক মুদ্রিত একখণ্ড স্বাভাবিক বর্ণনায় পূর্ণ শোকোচ্ছাস সূচক সুললিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন।

কবিবরের মধ্যম ভ্রাতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য্য ও অতীব অমায়িক প্রকৃতির সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৮। ১০ বৎসর হয় তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশীভূষন আচার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য এবং কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত রামকুমার আচার্য্য বর্ত্তমান আছেন। আশা করি বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ কবির লিখিত অমুদ্রিত পুস্তকগুলির মুদ্রনে যত্নবান হইবেন এবং দেশের শিক্ষিত অর্থশালী ব্যক্তিগণ গ্রন্থ মুদ্রনে সহায়তা করিয়া মৃত কবির আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সংস্কৃতের প্রভাব।

একটু মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিলে ইহাই জানা যায় যে, একদা পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভাষা সমূহের অধিকাংশেরই মৌলিক শব্দ বা ধাতুসমূহ ঠিক সংস্কৃত বা তাহারই অনুরূপসংস্কৃতই বটে। বাঙ্গালা ভাষার সাড়ে পনর আনা শব্দই সংস্কৃত; তবে ইহা মানিতে হয় যে, "গ্রামান্তরেই ভাষার রূপান্তর হয়" অর্থাৎ উচ্চারণাদির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

এক প্রদেশের, এক জিলার, এক মহকুমার বা এক থানার ভাষাই কত বিভিন্ন তাহা প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। সুতরাং সুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন মহাদেশের ভাষা; শব্দের উচ্চারণ ও লেখার পার্থক্য যে জন্মিতে পারে ইহা স্বতঃসিদ্ধই বটে। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ভাষা ইংরেজীতে ও সংস্কৃতের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তবে তাহাতেও স্বর পরিবর্ত্তন, লিখার ধারা-বিনবর্ত্তন, শব্দের প্রয়োগ নির্ব্বাচন, ব্যাকরণের প্রত্যয় সাধন এবং ধাতু ও শব্দরূপের আকার সংগঠন দ্বারা উভয় ভাষার একতা বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর অপরিত ভাবেরই অভিব্যক্তি জন্মাইয়া থাকে।

গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে সমস্ত ভাষারই প্রাচীন নামগুলিতে সংস্কৃতের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে। গ্রীক্, জার্ম্মণ, উর্দ্দু, পার্সী ও লাটীন ভাষায় ইহার প্রভাব অপ্রতি হতেই আছে। সংস্কৃতের "মা" বা 'মাতর' শব্দটী বহু ভাষারই শব্দরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

সংস্কৃতে ক্লিদ্+ড প্রত্যয় করিয়া "ক্লে" হয় ইহার অর্থ কাদা আবার ইংরেজীর "Clay" 'ক্লে' শব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উভয়েই কর্দ্দম বোধক বটে।

এই প্রকার হন্ ধাতু+টক্ প্রত্যয় যোগে 'ঘ্ন' শব্দ ও ইংরেজীর Gnow (ঘ্ন) শব্দের ন্যায় হনন করাই বটে; তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন ইংরেজীর 'ঘ্ন' শব্দকে মাত্র 'ন' বলা হয়, প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে সমস্ত অক্ষরের সমাযোগ ও সমাধানই সমীচীন বটে। কারণ আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও বহু শব্দের মাত্র একাংশই উচ্চারণ করা হয়, স্নানকে 'ছান' আত্মাকে আত্তা, পক্ষীকে পক্কী, লক্ষ্মীকে লক্ষী ইত্যাদি কত বলিব, 'সায়লেন্ট' করা সংস্কৃত বা বাঙ্গলায়ও চলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়া লিখিত প্রকৃত শব্দ বিন্যাস ত্যাগ করা চলে না, এই প্রকারেই ইংরাজীও সংস্কৃতের বহু শব্দই এক হইয়া যাইতে পারে এ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

ভাষার ভিতরে শব্দের সামঞ্জস্য ছাড়াও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেশ, মহাদেশ, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, নদ, নগর, প্রভৃতির বহু নামই সংস্কৃতে দৃষ্ট হয়।

"আসিয়া" মহাদেশের কৃষরাজ্য মহারাজ কৃষদ্রথের নামে, কাস্পিয়ান হ্রদ কশ্যপমুনি হইতে, রাজা 'পার' হইতে পারস্য দেশও সাগরের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া কৈলাস, অনাদি উপসাগর, "মঙ্গলদেশ" (কুরু হইতে) কুরিয়া, সুমিত্রা, যাবা, মলয়, সীতাদ্বীপ, শ্রীরামদ্বীপ, লক্ষ্মণদ্বীপ ব্রহ্ম, শ্যাম, অর্ঘ্য, অঙ্গ বঙ্গক, অনামদেশ, যবদ্বীপ, ইরাবতী, চীন, পদ্মনায়ক কেতু (কেতুমাল হইতে) ইত্যাদি স্থান সংস্কৃত প্রভাবেরই নিদর্শন। ভারতবর্ষ (ভরত হইতে) ত সংস্কৃতের জাজ্বল্যমান প্রতিষ্ঠানই বটে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ স্থান "জিলা" (Geelong) পরমাত্মা (Paramatta) "পার্থ" (Perth) ইহা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী এবং 'কুরঙ্গ' প্রভৃতি স্থান অতীব রমণীয় ও নানা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

আমেরিকার "বক্তা" নদিয়া, তমসা, শান্তারাম, ক্লীব, সুবন, কৌরবসাগর প্রভৃতি আফ্রিকার রজমা, ব্যোম, বাত্মময়, সুফলা, অশান্তি, ত্রিপল্লী, সুদান প্রভৃতি ইয়ুরোপে পিংবর্গ হেমবর্গ, অর্ণঃ (নদী) আপশালা, ব্রাহ্মণ, কুলীনবর্গ, মিলন, রথ, মর্ম্মর, বালা, দণ্ডী, কালীশ, ওদনবর্গ, হলাণ্ড সারেশ, প্রাগ, বৃন্দেশী, ক্রণ, কান্তার, কণকবর্গ, তামস, নিস্তার ও স্কটলণ্ডের পূর্ব্ব রাজধানী 'পার্থ' প্রভৃতি স্থান সংস্কৃত নামেই বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন আমাদের চন্দ্রকে অন্য ভাষায় Chandra 'চণ্ড্র' বা 'চণ্ডার, বলিলেও আমরা চন্দ্রই বলিব, এই প্রকারেই আমরা পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলির নাম সংস্কৃত ভাবেই লিখিলাম।

ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই অবগত আছেন। এক্ষণে এই তরুণ সাহিত্য সম্মিলনী যে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ নিয়া সংগঠিত হইয়াছে তাহাতেও সংস্কৃতের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত রহিয়াছে এ প্রবন্ধে তাহারই কয়েকটী উদাহরণ দেখাইয়া মহামনস্বী সভাপতি ও শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে যত্নবান হইতেছি।

এই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের হিন্দু মুসলমান বালক বালিকা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই মনের স্বাভাবিক নিয়মে অজ্ঞাত ভাবে আপন আপন মাতৃ ভাষারূপে সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

সংস্কৃতে গমনার্থে 'যা' ধাতু হইতে "আমরা যাই" বুঝাইতে "যাম, "যায়াম" হয়, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ বাসী গণ ও 'যাম' এবং আমরা "যায়ামহ" বলিয়া থাকেন। এই প্রকারেই অন্যান্য সংস্কৃত ধাতু রূপানুযায়ী ক্রিয়া পদে আমরা 'করবাম' 'করোম, দোহাম (গাভী দোহন) ধরবাম 'ধরবাম', পায়াম প্রভৃতি শব্দ শিশুগণ ও বাক্য স্ফুটের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের মাতৃ ভাষা। এই ভাষা দ্বারাই আমাদের মনের ভাব, শোক দুঃখ, আমোদ আহ্লাদ, প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকি। বাস্তবিক অন্যান্য বিজাতীয় ভাষায় সুপাণ্ডিত্য লাভ করিলেও মাতৃ ভাষার ন্যায় জোর করিয়া সুস্পষ্টরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না।

এ অঞ্চলে ভদ্র মহোদয় গণ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে নিম্ন লিখিত সংস্কৃত প্রবাদগুলি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।
কালস্য কুটিলা গতি।
অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্ব ন মুঞ্চতি।
যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।
আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।
কপালং কপালং কপালং মূলং।
নিয়তি কেন বাধ্যতে।
ক্রোড়ে মনোধাবতি।
মূর্খত্বং মরণাদপি।
স্বভাবো বলত্তরঃ।
ফলেন পরিচীয়তে।
নচ দৈবাৎ পরং বলং।
মূর্খ বৈদ্যো যম স্বরূপঃ।
উদ্যোগী পুরুষঃ সিংহঃ।
অতি দর্পে হতালঙ্কা।
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

পুনর্মূ'ষিকোভব।
যত্র ক্ষুধা তত্র সুধা।
যত্র মতি স্তত্র গতিঃ।
যত্র জীবস্তত্র শিবঃ।
কা চিন্তা মরণে রণে।
স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।
পরবুদ্ধি বিনাশিনী।
মক্ষি ব্রণ মিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।
দশ বৈদ্যঃ সমবহ্নি।
হরের্ণামৈব কেবলম্।
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ।
তাতান্মাতা গরীয়সী।
পাপেন তাপঃ, যত্নেন রত্নং।
ন চ বিদ্যা সমোবন্ধুঃ ন চ ব্যাধি সমোরিপুঃ।
আচারাৎ লভতে আয়ুঃ।
বর্ব্বরস্য ধন ক্ষয়ং।
কুখাদ্যং প্রাণ-নাশনম্।
কুকথা বর্জ্জয়েৎ সদা।
সফলা সরলানীতিঃ।
ভুক্তে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।
ধীপশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
সর্ব্বত্র খল কণ্টকম্।
পয়ঃ কুম্ভো বিষ মুখঃ।
সেবাহি পরমোধর্ম্মঃ।
যমদণ্ডং মহাদণ্ডং।
যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।
নারীষুরম্ভা স্নেহেষু অম্বা।
উপাধি র্ব্যাধিরেব চ।
রাজা হি দেবতা।
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।
শতং বদ মা লিখ।
অত্র চিন্তা চমৎকারা।
নচ পুত্র সমঃ স্নেহঃ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু।
মাতৃবৎ পরদারেষু।
সত্যংবদ প্রিয়ংবদ।
দারিদ্র্যং মরণাদপি।
কাকস্য পরিবেদনা।
চৌরে গতে কিমু সাবধানম্।
নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্।
চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলাচল মিদং সর্ব্বম্।
অমৃতং বাল ভাষিতম্।
অহিংসা পরমোধর্ম্ম।
হিংসাই পরমাব্যাধিঃ।
নচ ভার্য্যা সমোবন্ধুঃ।
বসুধৈব কটুম্বকম্।
পরহস্ত গতং ধনম্, পুস্তকস্য বিদ্যা।
গতস্য শোচনা নাস্তি।
যৌবনং ক্ষণ ভঙ্গুরম্।
বিপদি ধৈর্য্যং কুরু।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চন মাশ্রয়ন্তি।
সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং।
বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি।

প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালা ভাষার মাধুর্য্য ও গৌরব রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার বিখ্যাত ও মনস্বী কবিগণ ওতঃপ্রোত ভাবে বাঙ্গালার সঙ্গে সংস্কৃতেরই প্রচলন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রভাব বাঙ্গলায় কতদূর প্রবল তাহা বঙ্কিম,মাইকেল, ভূদেব, মদনমোহন, কালীপ্রসন্ন, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকান্ত দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ পদে পদে দেখাইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের এই পরমকল্যাণ কর, হৃৎ মজ্জাগত জাত সনাতন সংস্কৃত ভাষাকে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃ ভাষারূপে বাধ্যতা মূলক শিক্ষাভার্থ বিধিবদ্ধ করা যায় তৎপ্রতি প্রণিধান ও প্রতিবিধান করা প্রত্যেক মনস্বী মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য বটে, বিশেষতঃ সংস্কৃত দ্বারাই আমাদের স্বদেশী রুচি ও ভাব রক্ষা করিয়া জাতীয়তার মূল সুদৃঢ় করিতে হয়, নিবেদন ইতি।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

দৈত্যধর্ম্ম ও দেবধর্ম্ম।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্যে হরিদত্তের কালিকাপুরাণের কথা লিখিয়াছি। এই কালিকাপুরাণ সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে নানা উপাখ্যান ও নানা ধর্ম্মমতের সুন্দর আলোচনা আছে। হরিদত্ত লিখিয়াছেন—নিরীশ্বর বাদ, দৈত্যধর্ম্ম; ও ঈশ্বরবাদ, দেবধর্ম্ম। প্রহ্লাদের উপাখ্যানে এই দৈত্যধর্ম্ম ও দেবধর্ম্ম সম্বন্ধে সুন্দর দার্শনিক আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনার কিয়দংশ, এই—

হিরণ্যকশিপু বাহুবলে স্বর্গ অধিকার করিয়া ঘোষণা করিলেন—

"আমার অজ্ঞাতে কর যত ইতি কর্ম্ম।
আমাকে পূজিবা সবে এহিমাত্র ধর্ম্ম॥

স্বর্গে মর্ত্তে বৈদিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইল, দেবপূজার পরিবর্ত্তে দৈত্যপূজা আরম্ভ হইল। হিরণ্যকশিপু দেবতাদিগকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিলেন, বাদশাহ ফেরাউনও এইরূপ করিয়া ছিলেন বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রে লিখিত আছে। যুগে যুগেই এইরূপ হয়। মানব ও দানব আপন ক্ষমতায় উদ্ধত হইয়া এইরূপেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে।

প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দৈত্য পুত্র হইয়াও প্রহ্লাদ, প্রাক্তন শুভ ফলে ইহজন্মেও কৃষ্ণভক্ত। হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদকে শুক্রের পুত্রের নিকটে পড়িতে দিলেন শুক্রপুত্র, প্রহ্লাদের হাতে যে পুথি দিলেন, প্রহ্লাদ দেখিলেন উহার পাতে পাতে, কেবলই হরিনিন্দা ও বেদনিন্দা। বালক, হাতের পুথি ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। শুক্রপুত্র দেখিলেন প্রমাদ, তিনি একথা রাজাকে জানাইলেন। হিরণ্যকশিপু, ডাকিয়া নিয়া বুঝাইলেন—

"আরে পুত্র কেন তোর হইল দুর্ম্মতি।
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া ভজহ দুষ্টরীতি॥
শত্রুর বচন ধর, কহো তার দাস।
সাক্ষাতে তোমার খুড়া যেহি কৈল নাস॥"

কৃষ্ণ আমাদের কুল-শত্রু, তাহার নাম আর লইও না। শুক্রপুত্রকে কহিলেন—

"দুষ্ট কৃষ্ণ কপটেত বালক হৃদয়ে।
গোপেতে আসিয়া সব ভেদ কথা কহে।"

তুমি ভালরূপে বালককে দৈত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে থাক।

শুক্রপুত্র, প্রহ্লাদকে লইয়া গমন করিলেন। গৃহে আসিয়া কৃষ্ণ নাম না লইতে নানা উপদেশ দিলেন; কিন্তু সে উপদেশ বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। প্রহ্লাদ, কৃষ্ণ নাম লইতে লাগিলেন। বিপদ্ দেখিয়া শুক্রপুত্র আবার রাজার নিকট আসিয়া সে কথা জানাইলেন। এবার হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ হইল। প্রহ্লাদকে শুরুগৃহ হইতে আসিয়া বলিলেন—

"পড়িবারে দিনু তোকে পড়িবার স্থানে।
তাহা না পড়িয়া কহো উন্মাদ বচনে॥
দৈত্যরাজ পুত্র তুমি আপনে না জানো।
আমার বিপক্ষ যেহি, তাকো তুমি মানো॥
হেন কর্ম্ম পুন না করিহ কদাচিত।
যে আছে পঢ়হ গিয়া দৈত্যকুলনীত॥
রাজার বালক তুমি অভাব কিসের।
কেনে পুত্র অনুগত হইবা অন্যের॥
ত্রিভুবন মধ্যে দেখ আমি মাত্র রাজা।
দেব অসুর মনুষ্যে যার করে পূজা॥
তুমি কেনে অন্য জনে ভাবহ হৃদয়॥
সেহি বড় যাকে তুমি হইবা সদয়॥

কিন্তু পিতার, এ উপদেশে পুত্রের চিত্ত, দৈত্যধর্ম্মানুরাগী হইল না। প্রহ্লাদ বলিলেন—বাবা তুমি রাজপদ খুব ভাল মনে করিতেছ কিন্তু ইহার মূল্য কি? ইহা ত হয় আবার যায়। যদি ইন্দ্রত্ব পাইলেই পরম সুখ হইত, তবে ইন্দ্রের আজ দুর্দ্দশা কেন?

হিরণ্যকশিপু বুঝিলেন, কৃষ্ণ, প্রহ্লাদের চিত্ত হরণ করিয়াছে। হয়ত একেলা পাইলেই প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিবে, অথবা—

"নহে কিবা মোর বধে জন্মিয়াছে প্রহ্লাদ।
মোর শত্রু ইহার হৃদয়
কতক্ষণে হয় নাশ, সর্প সঙ্গে গৃহবাস,
ছিদ্র পাইলে করিবে প্রলয়॥"

হিরণ্যকশিপুর ভয় হইল। শেষে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দৈত্যশাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রহলাদকে শুক্রাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু শুক্রও প্রহ্লাদকে দৈত্যশাস্ত্র পড়াইতে পারিলেন না দেবনিন্দা বেদনিন্দা দেখিয়া প্রহলাদ, শুক্রপ্রদত্ত পুথি ফেলিয়া দিলেন। শুক্র বলিলেন—

ত্রিভুবননাথ তুমি আপনা জান।
স্থিরচিত্ত হৈয়া বাপু যে কহি সে শুন॥
কিসের অভাব তোমার রাজার কুমার।
তুমি কেন করহ অন্যের পুরস্কার॥
দীন দরিদ্র নহ ব্যাধি পীড়িত।
তুমি কেনে কৃষ্ণপদ ভাবো সুনিশ্চিত॥
অন্ধ আতুর নহো না হও নির্ব্বল।
কোন হেতু কৃষ্ণপদ চাহো তো বর্ব্বর॥"

যে আত্মবলেই বলীয়ান্, সে কেন দেবতার ভজন করিবে? যে দুর্ব্বল, নির্ধন, ব্যাধি-পীড়িত বা অন্ধ-আতুর তাহারাই ঈশ্বর-উপাসনা করে। ইহাই শুক্রের উপদেশ—দৈত্যের নীতি ও ধর্ম্ম। কিন্তু প্রহ্লাদ এই শক্তি-মদ-মত্ততার বাহিরে ছিলেন। হাসিয়া শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন—"আপনি বলিতেছেন, যে, দুর্ব্বল সেইই কৃষ্ণ ভজনা করে; যে, সবল তাহার কৃষ্ণভজনে প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি ত সবল-দুর্ব্বল, ছোট বড় কাহাকেও দেখি না। আমি দেখি, এক প্রভু সকল দেহে আছেন। তিনি যাহাকে দিয়া যাহা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করান। জীবের নিজের কোন শক্তি নাই।" শুক্রের উপদেশ ব্যর্থ হইল।

হিরণ্যকশিপু দেখিলেন আর সসর্পগৃহে বাস করা সঙ্গত নহে। প্রহ্লাদকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু জল অগ্নি ও বিষে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না। মত্তহস্তী প্রহ্লাদকে আঘাত করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিল। হিরণ্য কশিপু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—

"কোন্ বলে বেটা তুঞি না বাসহ ডর।"

প্রহ্লাদ কহিলেন—বাবা আমার বল কৃষ্ণ। আমার কেবল আমারই নহে, ত্রিভুবনে যত শিশু আছে সকলেরই বল তিনি। তোমার বলও তিনি। তুমি অসুর ভাব ত্যাগ করিলে দেখিবে কৃষ্ণ তোমার শত্রু নহেন। তোমার দেহের মধ্যে ছয়জন শত্রু বাস করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া বাহিরে মিছামিছি শত্রুর অনুসন্ধান করিতেছ, কৃষ্ণকে শত্রু মনে করিতেছ। তুমি ভাবিতেছ, সবই করিতে পার, সবই করিতেছ, কিন্তু বাবা তোমার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। কর্ত্তা সেই এক কৃষ্ণ। তিনি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও তাঁহার ইচ্ছাতেই হইতেছে। ইহা তুমি বুঝিতেছ না। দেহকেই হিরণ্যকশিপু ভাবিয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করিতেছ।

প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া হিরণ্য কশিপু কহিলেন:—

দৈত্যরাজ বোলে সেটা আমাকে বুঝাও।
অজ্ঞান নিন্দিঃ যেন তাহাকে ভাঁড়াও॥
জীব ব্যবহার বেটা আমা ঠাঁই শুন।
অনব্যরূপ জীব হয় নিত্য নৌতুন॥
ইচ্ছা এ বিলসে জীব দেহত সঞ্চারে।
জীর্ণ বস্ত্র ছাড়ি যেন নৌতুন বস্ত্র পরে॥
কর্ম্মনিবন্ধনে জীব পাযে দুঃখ শোক।
বিনে কর্ম্ম কোথা হৈয়াছে সুখ ভোগ॥
তুমি কহো সকল হয়েত কৃষ্ণসেব।
আমি কবে কৃষ্ণসেব হৈয়াছি সুখী।
কৃষ্ণ সঙ্গে বৈরভাব সর্ব্বদিন হৈল।
হিরণ্যাক্ষ বধ করি পলাইয়া গেল॥
তারপাছে দেখ মুঞি জিনিলু সংসার।
তাহে কি করিল আসি কৃষ্ণ তোমার॥
দেবগণে কৃষ্ণপদ ভাবে নিরন্তর।
তবে কেন তারা সভে হারিল সমর॥
তাহাতে না বুঝ তোমার কৃষ্ণের মহিমা।
তত কৃষ্ণ বলি বেটা করিস গরিমা॥
যদি কহো কৃষ্ণ থাকে সভার হৃদয়ে।
তবে কেন শত্রুভাব মোর মনে হয়ে॥
এহি ত না বুঝ মূঢ় বিষম কারণ।
কহো সর্ব্বজীবে কৈসে প্রভু নারায়ণ॥
শূকর × × থাকে বিষ্ঠা মূত্র খায়।
এহি হেতু ধরিলেক শূকরের কায়॥
বোল দেখি দিব্য দেহ কোন ঠাঁই তার।
কপট করিয়া ফিরে ভাড়াইয়া সংসার॥

বিলসন করে জীব ধরিয়া শরীর।
তোর কৃষ্ণ ফিরে কেন হৈয়া নানা জীব॥
ইহা না জানিয়া মূঢ় করহ বড়াই।
দেহ × জীব হইলে সব সুখ পাই॥
মায়ের উদরে থাকে অমৃত আহারে।
ভূমেতে পড়িয়া মাতৃ দুগ্ধ পান করে॥
নানা যত্ন করি আগে তাহার খাওয়ায়।
কান্দিলে নানান যত্ন পায় বাপ মায়॥
সেহি বালক ক্রীড়াকালে নানাক্রীড়া করে।
যৌবন হইলে সেহি নারীপুত্র করে॥
তাহাতে যতেক সুখ কহনে না যায়।
কর্ম্ম অনুরোধে সেহি রাজাসন পায়॥
যুদ্ধে ত সামর্থ হৈলে নানা দেশ জিনে।
পুত্র যোগ্য হৈলে তাকে দেয় রাজাসনে॥
জীর্ণ দেহ ছাড়ি জীব আর দেহ ধরে।
পুরাতন ঘর ছাড়ি যায় নয়া ঘরে॥
এহিরূপ ফিরে জীব আপন ইচ্ছাতে।
দেহধর্ম্ম ধরে জীব সুখ ভোগ তাথে॥"

জীব, স্বয়ং কর্ত্তা; কর্ম্মানুসারে তাহার সুখ দুঃখ ভোগ হয়। ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জীব, আপন ইচ্ছাতেই "দেহধর্ম্ম" ধারণ করে। এই যে নিরীশ্বর মত ইহাই "দৈত্য-ধর্ম্ম।" দৈত্যমতে সংসার কেবলই সুখময়—"রসের কুটি"; ভোগই পরম পুরুষার্থ। জীব—স্বাধীন।

প্রহ্লাদ, পিতার মুখে এই দৈত্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন—"না, না, সংসার সুখময় ত নহেই, ইহা কেবলই দুঃখে ভরা। ইহার আরম্ভে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ, অন্তেও দুঃখ। বাবা, তুমি যাহাকে সুখ বলিতেছ, উহা বস্তুতঃ সুখ নহে, দুঃখেরই প্রকার+ভেদ মাত্র। কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত সুখ নাই। জীব, স্বয়ং কর্ত্তা নহে, কৃষ্ণই কর্ত্তা, তিনিই সুখ দুঃখের বিধাতা।

ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু কহিলেন—
"আমারে মূঢ় তুমি কহো কৃষ্ণ সব কর্ত্তা।
তবে কেন বোলহ ভয় পলাইল ডরে॥
তুমি কহো ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী হয়।
একেলা জীব তাহা পালে কিরূপ॥

তোর কৃষ্ণ প্রসবয়ে হেন বুঝি রীতি।
কহো মূঢ় সেহি কেবা, কেবা তার পতি॥
নৈরাকার কহি তাহ সেহি ব্রহ্ম জ্ঞান।
আমি যে কহিয়ে তাহা সত্য করি মান॥
ধাতু দিয়া দ্রব্য গঠি সেহি নাম কয়।
তাহা ভাঙ্গি আর কোন এহি নাম হয়॥
বিচারিয়া দেখ মূঢ় একি ধাতু হৈতে।
ভাঙ্গিয়া কহয়ে নাম পৃথকে পৃথকে॥
এইরূপ জান জীব গতাগত করে।
যে দেহে যখন থাকে সেহি নাম ধরে॥"

ইহাই দৈত্য-দর্শন। এ মতে জীব, তাহার জন্ম-কর্ম্ম-সুখ দুঃখের আপনিই কর্ত্তা; অন্য কর্ত্তা নাই। বোধ হয় এ দেশে এক সময় এই মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। মানুষ যখন শক্তি—অভিমানী হয়, তখন এই মতই তাহার প্রিয় হইয়া উঠে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

পর্ব্বতের জন্ম কথা।

বিশালতার তুলনা দিতে হইলে আমরা অভ্রভেদী পর্ব্বতের দৃষ্টান্ত দেই। আর স্থায়িত্বের উদাহরণ দিতে হইলেও আমরা 'কল্পস্থায়ী' গিরিমালার উল্লেখ করিয়া থাকি। কোন্ অচিন্তনীয় দূরবর্ত্তী অতীত যুগে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা একমত অসাধ্য।

রাজা ও জাতির অভ্যুদয় ও পতন কয়েক শতাব্দীর সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে হিমালয় বিন্ধ্যগিরি, আল্পস্ ও আন্দিস্ প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলা অসম্ভব। যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া উহারা একই ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কালস্রোত যেন উহাদের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তি নিচয় পর্ব্বত সমূহের কঠিন প্রস্তর দেহে অবিশ্রান্ত আঘাত করিয়া যেন ব্যর্থ মনোরথ হইতেছে। গিরিরাজি প্রকৃতির সকল উৎপাত উপেক্ষা করিয়া অটলভাবে বিরাজমান রহিয়াছে।

এক শত ফিট বহলবিশিষ্ট একটী কাগজ পোস্তক অনুভব করিয়া যদি মনে করা যায় যে উহাই আমাদের পৃথিবী তাহা

হইলে হিমাদ্রির অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় আধ ইঞ্চির ও কম হইবে। আর ইয়ুরোপের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মণ্ট ব্লাঙ্কের (Mont Blanc) উচ্চতা প্রায় সিকি ইঞ্চির মত হইবে। যদি দুই ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটী গোলককে পৃথিবী কল্পনা করা যায় তবে সেই গোলকের গায় তুলি দিয়া একটু রঙের আস্তর দিলেই উহা হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের সমান হইবে।

ভূপৃষ্ঠে যেমন অতিশয় উচ্চ পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান আছে তেমনই সুগভীর সমুদ্র সকলও অবস্থিত আছে। কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলের তুলনায় পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতার জন্য ভূপৃষ্ঠ অতিশয় অসমান, উচ্চ নীচ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর বিশাল আয়তনের তুলনায় হিমালয়ের উচ্চতা ও প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা অতি নগণ্য। আয়তনের তুলনায় পৃথিবীতে যত জল একটী কমলা লেবুতে তার চেয়ে অধিক রস। একটী কমলা লেবুকে পৃথিবী মনে করিলে উহার খোসার উপরি ভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত যে অংশ আছে এইগুলির উচ্চতা তুলনায় হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতার চেয়ে অধিক হইবে। আর সেই খোসার গায় একটী সূক্ষ্ম সূচ দিয়া $\frac{1}{300}$ এক ইঞ্চির তিন শত ভাগের এক ভাগ গভীর করিয়া একটী আঁচর দিতে পারিলে উহার গভীরতা, গভীরতম সমুদ্রের গভীরতার সমান হইবে। বহু সংখ্যক গিরিমালা এবং সমুদ্রসমূহ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভাগ কমলা লেবুর খোসার উপরিভাগের চেয়েও তুলনায় অধিকতর সমতল। পৃথিবীর বিশাল আয়তনের তুলনায় সমুদ্রের গভীরতা ও পর্ব্বতের উচ্চতা এই দুই অতি অকিঞ্চিৎকর! সুতরাং সেই হিসাবে সমুদ্র ও পর্ব্বতের জন্য ভূপৃষ্ঠকে খুব অসমান বলা যাইতে পারে না।

পর্ব্বত সকলের বিশালতার কথা বলিয়াছি এখন উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পর্ব্বত সমূহের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যাইবে উহারাও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। অপরাপর জড় পদার্থের ন্যায় পর্ব্বত সমূহ ও পরিবর্ত্তনশীল। উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের [illegible] অনেকটা কাল্পনিক অবিশ্রান্ত পর্ব্বত দেহ ক্ষরিত ও [illegible] হইতেছে। পর্ব্বতদেহের পরিবর্ত্তন বহু সহস্র বৎসরে সাধিত হয় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কোন পণ্ডিত হিসাব করিয়া বলিয়াছেন ইয়ুরোপের দক্ষিণভাগে যে বিরাট আণ্ডিস (Andes) পর্ব্বত আছে উহা আর নব্বই লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে একবারে মুছিয়া যাইবে। এইরূপে বহু পর্ব্বতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় ৯০ লক্ষ বৎসর অতি সামান্য সময়।

বৃষ্টির জলধারা উচ্চ ভূমি সকল ধৌত করিয়া মৃত্তিকারাশি নদ নদীতে নিক্ষেপ করে। বর্ষাকালে নদ নদীর স্রোতরাশি তীর ভাঙ্গিয়া জল কর্দ্দমাক্ত করে। এইরূপে বর্ষাকালে নদ নদীর জল স্রোতে প্রচুর পরিমাণ মৃত্তিকারাশি মিশ্রিত হয়। শত শত নদ নদী মৃত্তিকারাশি বহিয়া নিয়া অবিশ্রান্ত সমুদ্রে ফেলিতেছে। নদ নদী বেগে বহিয়া গিয়া যখন সমুদ্রে পতিত হয় তখন সমুদ্রের লোনা ভারী জলে উহাদের স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়। কর্দ্দমাক্ত স্রোতের জল স্থির হইয়া দাঁড়াইলেই উহার সহিত মিশ্রিত মৃত্তিকারাশি নিম্নে পতিত হইয়া পলি-স্তরের সৃষ্টি করে। বর্ষাকালের নদীর ঘোলা জল একটী গ্লাসে কিছুক্ষণ রাখিলে গ্লাসের তলায় মাটি জমিয়া থাকে। পাহাড় পর্ব্বতগুলি রৌদ্র বৃষ্টি ও বায়ুর প্রভাবে সর্ব্বদা ক্ষরিত হইতেছে। পাহাড়ের ফাটায় জল প্রবেশ করিয়া যখন উহা শৈত্যপ্রভাবে বরফে পরিণত হয় তখন বরফে পরিণত জলের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় পাহাড়ের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়ে। অনেক সময়ে পাহাড়ের শিখর হইতে পুঞ্জীভূত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ সকল গাছপালা দলিয়া ভাঙ্গিয়া ভীষণ শব্দে নিম্ন ভূমিতে আসিয়া পতিত হয়। তখন ঐ সকল বরফ স্তূপের সহিত বহু সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকারাশি নদী স্রোতে ভাসিয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। এইরূপে প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণ প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি সমুদ্র গর্ভে স্থান পাইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রতি বৎসর প্রায় প্রায় সাড়ে ষোল কোটি টন কর্দ্দম বহিয়া নিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। মিসিসিপি ও নীল নদী ইহার ছয় গুণ কর্দ্দমরাশি সমুদ্রে বহিয়া নেয়। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইজিপ্ট প্রদেশ নীল নদীর পলিদ্বারাই গঠিত হইয়াছে (Egypt is gift of the Nile)। নিম্নবঙ্গ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের [illegible]

সমুদ্রে পলি পড়িয়া এইরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসরে এক একটী মহাদেশের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর কঠিন আবরণটীকে (Crust) প্রস্তরময় বলেন। সাধারণতঃ প্রস্তর বলিলে আমরা যাহা বুঝি ভূতত্ত্ববিৎগণ তাহা বুঝেন না। তাঁহাদের ভাষায় ধূলা, বালু, মাটি হইতে কঠিন মার্‌বল্‌ পাথর (marble stone) পর্য্যন্ত সকলই "প্রস্তর" (rocks) প্রস্তরকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অগ্নিদগ্ধ প্রস্তর (Igneous or erruptive rocks) আর পলিমাটি গঠিত প্রস্তর (Sedementary rocks) এককালে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের পরিমাণ অতি ভীষণ ছিল। অনন্ত আকাশে তাপ বিকিরণ করিয়া যখন পৃথিবীর উত্তপ্ত উপাদান সকল অপেক্ষাকৃত শীতল হইল তখন উহার একটী কঠিন স্তর (crust) গঠিত হইল। সেই স্তরের নিম্নেই ছিল ফুটন্ত গলিত নিঃস্রববাজি. পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল আর উহার একটীর পর একটী করিয়া স্তর গঠিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব নিম্নের স্তরগুলি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহার ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে ৪০।৫০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরগুলিই অগ্নিদগ্ধ প্রস্তরে (Igneous rocks) পরিণত হইয়া গেল।

পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্বোক্ত দগ্ধ কঠিন প্রস্তরগুলি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূগর্ভের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যকই ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কালে অনেক দগ্ধ প্রস্তর (Igneous rocks) ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়।

সমগ্র পৃথিবী এককালে জলমগ্ন ছিল। মহাদেশগুলি সমুদ্র গর্ভ হইতেই উত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান আছে। লণ্ডন সহরের মৃত্তিকায় নিম্নে বহু জলজ প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহারও নিম্নে খড়ি মাটির স্তর পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রজাত জীবের কঙ্কালরাশিই দীর্ঘকাল পরে খড়ি মাটিতে পরিণত হয়। আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের ৮৫০০ হাজার ফিট উচ্চে, আন্দিস্‌ পর্ব্বতের ১৬৮৮০ হাজার ফিট উচ্চ এবং হিমালয় পর্ব্বত দেশের ১৬০০০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে সমুদ্রজাত জীবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আসাম অঞ্চলের কতগুলির পর্ব্বতের প্রায় ৪০০০ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে চূণের পাথর (lime stone) পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রজাত জীবের পুঞ্জীভূত খোসা (shells) জমিয়াই চূণের পাথরে পরিণত হয়। এই সকল সমুদ্রজাত জীবের কঙ্কাল যে এককালে সমুদ্র গর্ভেই পলিমাটির নীচে সমাহিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল মৃত্তিকা স্তর এককালে সমুদ্রের জলরাশিতে নিমগ্ন ছিল তাহা কিরূপে হাজার হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিল?

পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশ সর্ব্বত্র সমতল নয়। উহার কোথাও উচ্চ পাহাড় কোথাও গভীর সমুদ্র। প্রধানতঃ পাহাড় পর্ব্বত ও সমুদ্রের জন্যই ভূপৃষ্ঠ অসমতল হইয়াছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেকালের পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ভীষণ নৈসর্গিক উৎপাতের ফলে ভূগর্ভ হইতে পর্ব্বতসমূহ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ভূগর্ভস্থ পুঞ্জীভূত বাষ্পরাশির আকস্মিক ধাক্কায় আগ্নেয়গিরিগুলির জন্ম হইতে পারে কিন্তু হিমালয়, আল্পস্‌, এলিগেনি, আন্দিস্‌ প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বতমালা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বৎসরে গঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পৃথিবীর দেহ শীতল হইলে উহার কঠিন আবরণটী (crust) গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার আবরণ গঠিত হইলে পরও পৃথিবীর দেহ শীতল হইতে লাগিল। পৃথিবী দেহ যতই শীতল হইতে লাগিল ততই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উহার দেহ কেন্দ্রের দিকে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল; একটী আতাফল কিছুকাল পোড়াইয়া রাখিয়া দিলে উহা যখন শীতল হয় তখন উহার উপরিভাগ কুঞ্চিত হওয়ায় স্থানে স্থানে উচু নীচ হয়। তাপ ক্ষয় হেতু পৃথিবীরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর দেহটী ভিতরে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়ায় উহার কঠিন আবরণটী আশ্রয়হীন হইয়া নানা স্থানে উচু নীচু হইল। পৃথিবীর বিশাল আবরণের সংকোচন বড় সহজ ব্যাপার নয়। ইহার ফলে উচ্চ স্থানগুলি বিরাট পাহাড়ে এবং নিম্ন স্থানগুলি সমুদ্রে পরিণত হইল।

সমুদ্র গর্ভে যখন পলি পড়িয়া স্তর গঠিত হয় তখন সেই স্তরগুলি প্রায় সমতল থাকে। একটী স্তরের উপর আর একটী স্তর, তার উপর আর একটী স্তর, এইরূপে

স্তরগুলি সজ্জিত হয়। সমুদ্র জাত প্রাণী সকলের কঙ্কাল রাশিও এই স্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইতে থাকে। পলি গঠিত স্তরগুলি চিরকাল সমুদ্র গর্ভে এইরূপ সমতল অবস্থায় থাকে না। পৃথিবীর দেহ যখন তাপ ক্ষয় হেতু সঙ্কুচিত হয় তখন সংকোচনের ভীষণ চাপের প্রভাবে ঐ স্তর ধনুকের মত বাঁকিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে হাজার হাজার ফিট্ উর্দ্ধে উত্থিত হয়। আবার কোথায়ও অতিশয় নীচু হইয়া যায়। চাপের আধিক্যে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ধনুকের মত বক্র স্তরগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়াও যায়। ভাঙ্গা স্থানগুলি আবার অসমান ভাবে জোড় লাগিয়া যায়। এইরূপ অসমান ভাবে জোড় লাগা স্থানকে ইংরেজীতে Fault কহে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত ধনুর ন্যায় বক্র স্তরগুলিই পলি গঠিত পর্ব্বত-মালা (Sedementary rocks)। হিমালয় আলপস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলিও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত পলি মাটি দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। এই জন্য বড় বড় পর্ব্বতের হাজার হাজার ফিট উচ্চ শিখরে সমুদ্রজাত জীবের কঙ্কাল-রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল পাহাড়গুলির জন্মই এইরূপে হইয়াছে।

পৃথিবী দেহের সংকোচনের ফলে পর্ব্বতগুলি যখন প্রথম সমুদ্র গর্ভ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল তখন তাহাদের আকৃতি ছিল অর্দ্ধচন্দ্রের মত অথবা দালানের খিলানের (arch) মত বক্র। এখন আর উহাদের সেই চেহারা নাই। কালক্রমে বৃষ্টির জল, বায়ু এবং সূর্য্যের উত্তাপের প্রভাবে সেই ধনুকের বক্র শীর্ষদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বত শিখরে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বত শিখরসমূহও পূর্ব্বোক্ত নৈসর্গিক কারণে দিন দিন ক্ষয়িত হইতেছে।

সমুদ্রগর্ভ হইতে যেমন পাহাড় পর্ব্বত উত্থিত হইয়াছে তেমনি উহারা জল বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপের প্রভাবে ক্ষয়িত হইতেছে এবং উহাদের উপাদান সকল সমুদ্র গর্ভে গিয়া পতিত হইতেছে। 'মিসিসিপি' নদী উহার দুই তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহকে প্রায় ৬০০০ হাজার বৎসরে এক ফুট নীচু করিতেছে। 'রোন' নদী প্রায় ১৫০০ হাজার বৎসরে এক ফুট ও 'পো' নদী প্রায় ৭০০ বৎসরে এক ফুট উহাদের তীরবর্ত্তী প্রদেশকে ক্ষয় করিতেছে। গড়ে ৭০০০ হাজার বৎসরে এক ফুট মাটি ক্ষয়িত হইলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বৎসরে সমগ্র ইউরোপ এবং এক কোটি বৎসরে পৃথিবীর সকল মহাদেশগুলি সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু নৈসর্গিক কারণে ভূভাগের এক অংশের যেমন ক্ষয় হইতেছে আবার অন্য অংশে নূতন ভূভাগের সৃষ্টি হইতেছে।

প্রকৃতি চির পরিবর্ত্তনশীল। লক্ষ লক্ষ বৎসরে মহাদেশ ক্ষয় হইয়া সমুদ্রে পরিণত হইতেছে; পর্ব্বত ক্ষয় হইয়া সমভূমিতে পরিণত হইতেছে। আবার মহাদেশ ও পর্ব্বত দেহের উপাদানসকল সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে নূতন মহাদেশ ও নূতন পর্ব্বতের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। পুরাতনের ধ্বংস ও নূতনের সৃষ্টিই প্রকৃতির নিয়ম। এই ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঘাই ব্রত

মাঘী শ্রীপঞ্চমীর পর যে ষষ্ঠী তিথি, সেই ষষ্ঠী তিথিতে রবি ও বৃহস্পতিবার থাকিলে রাখালেরা মাঠে এই ব্রত করিয়া থাকে। ঐ তিথিতে অন্য বার থাকিলেও এই ব্রত হইতে পারে। কোন কোন গ্রামে রাখালেরা গোয়াল ঘরের সম্মুখে এই ব্রত করিয়া থাকে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গ্রামের রাখাল সকল মিলিত হইয়া মুখে চুণ কালি দিয়া বাঘ সাজে ও প্রতি বাড়ীতে যাইয়া বাঘের মত শব্দ করে। এই ভাবে গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করিয়া পরে সকলে মিলিয়া সুললিত কণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া 'মাগন' গায়। এই ভাবে সারা মাসে প্রতি বাড়ী হইতে চাউল কড়ি সংগ্রহ করিয়া ব্রতের দিন প্রসাদে ব্যয় করে ও পূজা হইলে বাঘ সাজিয়া প্রসাদ খায়। আগেকার দিনে প্রতি গ্রামেই বাঘের খুব উপদ্রব ছিল। গোবৎস রক্ষার নিমিত্ত রাখালেরা বাঘের পূজা করিত।

মাগনের গান—

এই বাড়ীং আইলাম আগে হুবদ্দু বাড়ীতে খাইল বনের বাঘে
বড়ঘর বড়দুয়ার, বড় ঘরের উপুর ছানী লম্বা আইলাম চারি কাছি
আইলাম লম্বা বিয়ালিশ [illegible] চাউল কড়ি বাহির কর
চাউল দিবি না কড়ি দিবি, বাঘাই আসে দিবি দিবি

চাউল না দিয়া দিলে কড়ি তারে কড়ি লড়িধরী
লড়ীধরী আনয়ে সোণার মুটুক ভাঙ্গয়ে
সোণা না রূপা ভালা এই ঘর খান দেখতে ভালা
বড় বড় চাটুনী গীরতাইন বড় গাথুনী
ও গো গীরতাইন আনাইয়া বর আমারে দিবি কতর ধন
আমি মাগিয়া খাই বাঘাইর চরণ গাই
বাঘাই গেলেন্ চাগাইপুর কিল্লা আন্‌লাইন্ চাম্পাফুল
চাম্পাফুল বর্ত্তমান হাইস্তা হাইস্তা কর দান।
দান কইরা পাইবা কি সূতার কাপড় হরতকী

আইলামরে ভাই বড় বাড়ী লাউ জিঙ্গলা কলাবাড়ী
কলা বাড়ীর ধলা লাউ সেই সব বাড়ী নিম লাউ
নিম ধরছে উজাইয়া সারা সংসার ভাসাইয়া
সাগর সংসার নারীর কুল নারীর মাথাৎ নাইকো চুল
সেই নারী কুল পিন্ধে শীতের কাঁটা কান বিন্ধে
শীতের কাটা লোহার বেল মাপতে পাইলাম ধান দেল
ধান দেল গো বাড়ীৎ যাই শীতে বড় কষ্ট পাই।

চালা চালা কচুর পাতা দাঁত মরাইলাম ছাই
হাতী আইয়ে ঘুড়া আইয়ে ফুল মানিকের ভাই
ফুল মানিকের ভাই নারে উড়াল্লা কইতর
উড়িতে উড়িতে যায় খুপের ভিতর
একজুড়া খুপ নারে নয় জুড়া পিন্তল;
তা দিয়া গড়াইলাম একখান নাও—
তারির মধ্যে চড়িয়া যায় দেবী দুঃখার মাও
দেবী দুঃখার মা নারে হাসিতে হাসিতে
কাল কাল দুই চুকরী আইল নাচিতে নাচিতে
আইওরে জুইন সকল জলেরে যাই
জলেরে যাইতে শ্রীফল খাই
শ্রীফল খাইতে দাঁতে ফুটল কাঁটা
আইজ হইতে ফুরাইল সতীনের খুটা
সতীন্ সতীন্ বদ্দুর খেলা মারলাম চাম্পাফুল
আয়রে চাম্পা কলা গাছ বাইয়া
হরবুড়ি লাথ মারি তর দেশ্ বাইয়া।

খুব বালা খুব বালে চাউল কড়িটা খুব বালে
চাউল দিবে না দিবে কড়ি তারে কড়ি লড়িধরী

লড়িধরী সামরে রূপার থামে বানয়ে
রূপা কি সুনা ভালা এই ঘরটী দেখতে ভালা
ঘর বুলে ঘরনী মায় বুলে ছাঠুনী
কেন গো মা বিরস বদন আমারে দিবা কত মন
আমি ত মাগিয়া খাই বাঘের বয়ান গাই
বাগাই গেছে নাগাই পুর কিল্লা আনছে চাম্পাফুল
চাম্পাফুল বর্ত্তমাইন হাস্তা হাস্তা দেইন ধান
দেও ধান যায় দূর আমার বাড়ী অনেক দূর
মধ্যে পড়ল সমুদ্দুর

চক্কর চক্কর জংলী পীরের ছেলে আইল বাড়ীর ভিতর
জংলী পীরের ছেলে দেখ্যা যেবা করে হেলা
তার দুইটী চোখ যায় ঠিক দুইপরা বেলা
হেলা নারে ঢুলা নারে গায়ে আইল জ্বর
কেমনে সইব জংলী পীরের ভর
জংলী পীর খাটা খুটা মুখে চাপদারী
লাল বুড়া দৌড়াইয়া যায় গুয়ালনীর বাড়ী
গুয়ালনী বুলে আছে বালা, গুয়াল বুলে নাই
বাতাসে পড়িয়া কান্দে নবলক্ষ গাই
নবলক্ষ গাই নারে নবলক্ষ বাছুরী
বক্কগুদ্ধ লাইড়া দিছে গরুর চামরী
এক বেটা ফকিরে চড় করল থানা
সাত দিনের মরা গাভী উঠ্যা লইল দানা

শুড় শুড় বাট টই মারি রাই রাই সই
হাল্ ভাইতে যাব আমি ভাত রান্ধিও তুমি
কালে ভাইতে যাবে তুমি শুধু ভাত রান্ধব আমি
শুধু ভাত রান্ধব আমি হালের পাজন ভাঙ্গবে তুমি
হালের পাজন ভাংব আমি বাপের বাড়ী যাবে তুমি
বাপের বাড়ী গেলে তুমি চুল ধরিয়া আনব আমি
কান্দ ভরিয়া ঢালবে তুমি গাজে নিয়া ধুইব আমি
গাজে নিয়া ধুইবে মাছ হইয়া যাব আমি
মাছ হইয়া গেলে তুমি জাল দিয়া ছাপ্‌ব আমি
জাল দিয়া ছাপলে তুমি গর্ত্তের মধ্যে যাব আমি
গর্ত্তের মধ্যে গেলে তুমি লাঠী দিয়া খুজব আমি
লাঠী দিয়া খুজলে তুমি ছনের নীচে যাব আমি

ছনের নীচে গেলে তুমি আগুন ধরাইয়া দিব আমি
আগুন ধরাইয়া দিলে তুমি চিল হইয়া যাব আমি
চিল হইয়া গেলে তুমি তীর মারিয়া ফেলব আমি
বাঘা বুলে বাঘুনী অরুণ বনে যাইও
করুমামুদের গরু দেখলে হেলায় জানাইও
মানুষ খাইবা গরু খাইবা আর খাইবা কি
সামনে আছে দেইখ্য চাইয়া করুমামুদের বাড়ী
করুমামুদ করুমামুদ কি কর বসিয়া
হুনাল্যা ছুই বন্দুক লইয়া বাঘ শীকারে যাই
বাঘ শীকারে গিয়া দেখি বাঘা ডুরী নাই
বাঘা ডুরী মেল্যা মারল তারাগড়ের মধ্যে
খুত্তা বলায় কামড় মারল টেগ্রা চোখের মধ্যে
মামদির মা গো মামদির মা বলি একটা কথা
চোখের মধ্যে বাট্যা দেওরে দারুণ চুতরার পাতা
দারুণ চুতরার পাতা দিলেরে বাটিয়া
ছয় মাস থইয়া খাজুরার চোখ মুরা নোথ দিয়া

পুব দুয়াইরা পুব দুয়াইরা—
পুব দুয়াইরা কানাইর ঘর আগা পাছা চাইর ঘর
চাইর ঘরের ভমরের নাতি
আইলাইন গো বাঘাইর নাতি
আইলাইন্ বাঘাই দিলাইন বর ধান চাউল বাইর কর
ধান দিবে না কড়ি বাঘাইর নামে সিন্নী দিবে
ওহো হো বাঘাই পান ভুরী
বোল সত্তর বাচ্চা লইয়া নামিছে বাঘুনী
বোল সত্তর বাচ্চা মারে বোলখানি গাঁও
আমার বাঘাইরে নি দেখেছ কোন গাঁও
আমার বাঘাইর হাও বুলবুল্যা ছাগল
সেই ছাগল দেখা! অইল লক্ষীনুর পাগল
লক্ষীনুর লক্ষীনুর কি কাজ করিলে
বাঘ মাইরা সারা রাইত চাউল কড়িটা মাগাইলে
চাউল দেও কড়ি দেও হাড়ী ভরা ঘি
হাড়ী ভরা ঘি নারে গাঁওছের ঝি
আমরারে সিন্নী দিতে যে করিল হেলা
তার দুটা চোখ খাইব ঠিক দুপইরা বেলা
ঠিক দুপইরা বেলা নারে আলিজুলি বায়
আলিজুলি বাইরা যেটা
স্বামীর কান্ধ ভরদিয়া গুয়াল বাড়ীত্তায়
গোয়াল ঘর গিয়া দেখে বোল সত্তর গাই
চাউল না দিলে কড়ি না দিলে গুয়ালপাড়া যাই
গুয়াল্যারা একজাৎ মাক্যা তুলে ঝি
সিন্নী দেও গো গীরস্থের ঝি
গুয়াল্যারা সাত ভাই নূতন কামেল।
হাড়েগুড়ে টাঙ্গা তুলে মরা গরুর চামড়া
গুয়াল্যারা সাত ভাই ডকায় মাইলা বাড়ী
এমুন সময় ডেকলনীলা ডেকলনী পিঠা খাইবে নি
স্বামীর ডরে ভাইয়ের ডরে পিঠা থইছে উগার তলে
হাত বাড়াইয়া নাগাল পায় ডেকলনীরে বাঘে খায়
ছিকা লড়ে ছিকা লড়ে ঝামুর ঝুমুর টেকা পড়ে
ওহলা টেকা পাইলামরে বাঙ্গা বাড়ীৎ গেলামরে
বাঙ্গা বাড়ীৎ বাঘের ছাও হামুর হুমুর করে রাও
আমি জানি না দাদা জানে ছয়কুড়ি ছয় রাখাল কিনে
রাখালরে দেয় মুরকী কলা গরু লইয়া যায় সিমুল তলা
বাঘা আর বাঘী সভ্য করে লাফ দিয়া তার ঘার চড়ে।
এক বাঘ রামা গোয়াইলত নেয় গা মামা
এক বাঘ একী গোয়াইলত নেয়গা ঢেকী
এক বাঘ উগারের খুঁটা চাউল চাবায় মুঠা মুঠা
এক বাঘ উচিমুচি ঘরত নেয় গা ভাঙ্গা খুচী
এক বাঘ মঙ্গলা নিত্তাই ভাঙ্গে জঙ্গলা
এক বাঘ তাম্রা নিত্যাই বানে বাড়া
এক বাঘ ঢইরা ঘরত নেয় গা থইয়া
এক বাঘ কানি তার তলপেট লাগল পানী
যাহা কিছু জানি সব আমরায় শুনালী

চাল ধরে চাল কুমড়া বেড়ায় ধরে লাউ
সেই লাউ দিয়া রান্ধো অইল সাত পাইলা ভাউ
সেই ভাউ খাইয়া কয়র কয়ল বল
একে থাকায় কাকল গদাই বুড়ার ঘর
গদাই বুড়া গদাই বুড়া খুব বন্দি কর
বুড়ার পিন্দে সাত কাপড় বুড়ীর পিন্দে শাড়ী
সেই শাড়ী পিন্দিয়া আইল তিন বুড়াবুড়ী
এক বুড়ায় রান্ধে বাড়ে দুই বুড়ীরে খায়
তপুইড়া খুদুইরা গুলার বাইঙ্গালী খেড়ায়
আমতলায় পানী পুটা আমতলা দিয়া যায়।

[illegible]

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীমেয়েদের

চির আদরের কেশ তৈল

সুরমা

"সুরমা" তার সুগন্ধে লক্ষ লক্ষ মহিলার চিত্তকে এতদিন ধরে তৃপ্ত করে আসছে। সুরমা সুগন্ধে অতুলনীয়। মাথায় মাখিলে অনেকক্ষণ অবধি গন্ধ থাকে---মাথা ঠাণ্ডা রাখে, আর চুলগুলি খুব হাল্‌কা ও মসৃণ হয়, সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়। তার পর সুরমা এক শিশিতে পরিমাণেও বেশী থাকে, আর দামও কম। মূল্য প্রতিশিশি বার আনা, ডাক ব্যয় দশ-আনা।

আজ থেকেই আপনি **সুরমা** ব্যবহার করুন।

এই নবজাগরণের দিনে আপনি কি বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী ?

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"মিল্ক অবরোজ"

ব্যবহার করুন। ইহা ত্বকের কোমলতা মসৃণতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে, সুন্দরকে আরও সুন্দর করে। প্রতি শিশি আট আনা মাত্র।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"বঙ্গ-মাতা"

মনের ও প্রাণের অবসাদ দূর করে। হাসনা-হেনার মৃদু সুরভিতে ইহা পূর্ণ। গন্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী বিলাসীর শ্রেষ্ঠ ও সহজলব্ধ বিলাসভোগ। বড় শিশি ১, মাঝারি ৸৹ ছোট—৷৷৹ আনা।

"তাহা হইলে"

এস, পি, সেনের

"সাবিত্রী"

এই মৃগমদ-বাস সুরভিত সুন্দর এসেন্সটী আপনার চিত্তকে খুব প্রফুল্ল রাখবে। রুমালে একটু ঢাললে বেশী ক্ষণ গন্ধ থাকে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, মাঝারি ৸৹ আনা, ছোট—৷৷৹ আনা।

এস্, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৯।২ লোয়ার-চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

Shourabh—Reg. No. C. 743.

দি ব্রহ্মপুত্র আইস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড।

(বরফ পাউরুটী ও সোডা লিমোনেডের কল)

(Registered under the Indian Company's Act 1913.)

মূলধন—১,০০,০০০৲ একলক্ষ টাকা।

দশ টাকা করিয়া, দশ হাজার সেয়ারে বিভক্ত।

সেয়ারের টাকা ২৲ টাকা করিয়া ৫ কিস্তিতে দেয়, বর্ত্তমানে ৩ কিস্তির বেশী নেওয়া হইবে না

ডিরেক্টরগণের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা; সেক্রেটারী লেণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসন, ময়মনসিংহ।

২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মেম্বার, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল; ম্যানেজার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, এম, এ, এল; চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটী; ডিরেক্টার দি ময়মনসিংহ ব্যাঙ্ক ইন্ডাষ্ট্রীজ্ এণ্ড কমার্স লিমিটেড্ (ইলেকট্রিক কোম্পানী); দি লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস লিমিটেড, ঢাকা; ময়মনসিংহ।

৪। শ্রীযুক্ত কে, সি, মজুমদার, বি ই, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, ময়মনসিংহ; ঠাকুরাকোণা, ময়মনসিংহ।

৫। শ্রীযুক্ত পি, বসু, বি এস্ ইন্ এম্ ই, স্বত্বাধিকারী দি হাসানাবাদ আইস্ ফ্যাক্টরী, ৫নং ফার্ণরোড, কলিকাতা।

৬। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি এস-সি, কমিশনার ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটী, মেম্বার নেত্রকোণা লোকেলবোর্ড, ডিরেক্টার কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক, ময়মনসিংহ।

৭। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার রায়, মার্চ্চেণ্ট; ডিষ্ট্রীক্ট ম্যানেজার, দি ম্যানুফ্যাকচারর্স লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ময়মনসিংহ।

গত ২০শা নবেম্বর হইতে এই কোম্পানীর সেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; এই অল্পকাল মধ্যেই ২০।২৫ হাজার টাকার সেয়ারের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া আরও ১০ জন এজেণ্ট আবশ্যক।

বিস্তারিত জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডিভালপমেণ্ট কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্,

অমৃতবাবুর রোড, ময়মনসিংহ।